আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়





মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

স ম্পা দ না

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্র চ্ছ দ প ট

অঙ্কন—অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রণ—সান লিথোগ্রাফী

ASUTOSH MUKHOPADHYAYA RACHANAVALI VOL VI
An anthology of collection of complete works of Asutosh Mukherjee Vol-6. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073.

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস সি অফসেট ৩০/২ বি, হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ীর খুব কাছেই থাকতেন। সেটা ষাটের দশকের শুরু বোধহয়। একটা গল্প শোনাতে গিয়েছিলাম। গল্পের মধ্যে এক নারীর পতনের কাহিনী ছিল। আশুদা শুনে বললেন, পাপটা দেখিয়েছ— কত যন্ত্রণা থাকে জীবনের তা জানো? একজন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর প্রসঙ্গ এনে বললেন, কী গভীর বেদনায় তাকে একটা অন্ধকার জগতের শিকার হতে হযেছে জানো? সেদিনই বুঝেছিলাম উনি মানবদবদী শিল্পী।

প্রাযই যেতাম আর তিনি এমন হঠাৎ চলে গেলেন। ভোববেলা লেকে বেড়াতে বেরিয়ে দেখা হত, কথা হত—সর্বাণীর অনুরোধে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর এই খণ্ডটি সম্পাদনার দাযিত্ব নিয়েছি—কঠিন কাজ—তবু এর মধ্যে শিল্পীকে জানার একটা সুযোগ পাব—তাঁর বিস্তারিত গল্প-সাহিত্যের একাংশে তাঁর সৃষ্টিচেতনার কোন দিকটি ফুটেছে তার পরিচিতি দেবার চেষ্টা করব। জানি না কতটা সফল হব।

শরৎচন্দ্রব পরে গাল্পিক-সরসতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন আশুবাবু। উপন্যাসে জীবনবহস্য উপস্থাপনাব ক্ষেত্রে গল্প-কাহিনীজাল বিস্তারের একটা বিশেষ মূল্যবান দিক। বঙ্কিমচন্দ্রই এই কাহিনী প্লট নির্মাণের প্রথম স্থপতি। Story-force একটা মৌল আঙ্গিক। কেননা এই গল্পের ভিত্তিব ওপরেই চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে—জীবনরসাপলব্ধির একটা দর্শন-জিজ্ঞাসায়। আর গল্প বা কাহিনীর বেখাই সরল-বক্ররীতিতে পরিণামের দিকে এক-এক ভাবে অগ্রসর হয। ইতিহাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রোমান্সের কাহিনী চয়ন করে কবি-কল্পনার বামধনুতে এক আশ্চর্য বর্ণযোজনা করেছেন, তেমনি সামাজিক পারিবারিক জীবন থেকে, যে জীবনপরিবেশ আঠারো-উনিশ শতকের সামন্ততন্ত্রের— বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে সঞ্চালিত হয়েছে মানব-প্রবৃত্তি-নির্দেশিত কাহিনীরসধারা।

বোহিণী-কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী-ভ্রমর প্রভৃতি চরিত্র—উনিশ শতকের সমাজ-পরিবেশের মর্মমূল থেকে কাহিনীরসের— "ডেস্‌টিনি"র প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য-অভিঘাত-প্রখর গাল্পিকতা থেকে জীবনকে ব্যক্তিত্বের তুঙ্গ-শীর্ষ এককত্বে—তাঁর উপন্যাসের নরনারীকে চেনবার একটা স্বাধীন রাস্তা তৈরি করলেন। আর এই ব্যক্তিমানসের নিভৃত গহন থেকে আমরা উঠে আসতে দেখলাম—বিনোদিনী-সুচরিতা-দামিনী-লাবণ্য-বিমলা-এলা ও কুমুদের—, যারা পুরুষবিহিত সমাজের নোঙ্গরঘাটে বাঁধা পড়তে চায় নি। মানসিকতার স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথই উপন্যাসের আধুনিকতার নান্দীকার। শরৎচন্দ্র গল্পরস ও জীবনামৃতের সমন্বয় সাধক। এরপর কল্লোলপর্বের লেখককুল একেবারে দুই বিশ্বসমরের মধ্যকালীন সংশয়-সংকট-কণ্টকাকীর্ণ অর্থনীতিক যৌনতান্ত্রিক ও রাজনীতিক চৈতন্য-এর মধ্য থেকে নরনারীদের বাস্তব চেহারায় যেন তপ্ত-তাম্র-কাঠিন্যের অবয়ব

নির্মাণে অভিনিবিষ্ট হলেন। তবে তারাশঙ্করে—একটা যুগ-চেতন-ইতিহাসের গাল্পিকতা কালিন্দী-গণদেবতা-দুইপুরুষ প্রভৃতি উপন্যাসের বুননসমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট তৈরি করার ব্যাপারে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করি না। জনতাতনুর বেগ ও সমাজ-বাস্তবতার দুর্প্রতিরোধ্য আঘাত-সংঘাত কখনই ব্যক্তি-প্রেরিত নিভৃতির মানসপরিমণ্ডলে আমাদের একলা করে দেয় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানতীক্ষ্ণ মনোদর্শনে গাল্পিক আগ্রহ আর জীবনপ্রশ্ন দুয়েরই মিশেল আছে—বিশেষ তাঁর পুতুলনাচের ইতিকথা (প্রতীক দ্যোতনায় অবশ্য প্রখর) সম্পর্কে আমি এই দাবী করে থাকি।

প**াশ-ষাটেব দশকে সাম্যবাদী-চেতনা জাতীয়তাবাদ অনেকটা সংবৃত করে—বাঙ্গালীজীবন অতীত আলোআঁধারিব স্বপ্নতন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে চাইছিল। চাকুরি-কেবিয়ব পুত্রকন্যা-পত্নীদের নিয়ে ক্ষুদ্রতর পরিবার—এজেন্ট-অফিস-আধুনিক আদব মধ্যবিত্তকে অনেকটা পারিবেশিক কণ্ডূয়নের বশীভূত করে ফেলছিল—এব মধ্যে ছিল কিছু উচ্ছলতাময় জীবনসন্ধানের বেগ। আদর্শেব ভাঙচুর হচ্ছিল। উদ্বাস্তু কলোনীব কলুষ-নাশন পবিত্রতা আর নাগবিক-কলকাতা-কেন্দ্রিক একটা নবধারাপাত লেখা হয়ে চলছিল। বিভূতিভূষণ-জীবনানন্দের প্রকৃতিমুখীন নষ্টালজিযার দিন শেষ হয়ে এসেছিল।

অফিস কেরিয়ার-ধান্দাবাজ রাজনীতিতে মানুষ সেঁধিয়ে গেছে 'টুপাইস' করে নেবার জন্যে। পঞ্চাশ-ষাট দশকের সেই নাগরিক জীবনের জটিল মানসিকতাকে রূপ দিচ্ছিলেন বিমল কর-নবেন্দ্রনাথ মিত্র-আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এঁরা সব। তবে বাংলা কথাসাহিত্যেব অবয়ব থেকে সহসা প্রেম-স্বপ্ন আর দাম্পত্যনীড়-বাঁধা জীবনের বেগ-আবেগ অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে না। কথাসাহিত্যে তাই ওই আমাদের গাল্পিক চালটা যথাপূর্ব চলছিল, কিন্তু চরিত্ররচনরীতি থেকে যেন লেখকরা একটু একটু সরতে চাইছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, হোটেল-বেস্তোবাঁ-স্টল-অফিস-মোটরের রুটিনবাঁধা গতাগতির মধ্যে ব্যক্তিজীবনেব নিটোল চেহারাটা ফোটবাব অবকাশ কই ? এই নাগরিকতাব গল্পই হয়েছিল উপন্যাসের উপজীব্য। সংবাদপত্র-চালিত সাহিত্যপত্রিকাগুলির মধ্যে শব্দসম্ভার একটা বড আকর্ষণ—পাঠকসমাজ চেয়েছিল অবকাশরঞ্জন গল্প—আর এই গল্পরসের সঙ্গে জডিযে পড়ল রুপালি পর্দার রোমান্টিক রসসৃজনের প্রয়াস। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতেব গল্প সিনেমাব পর্দায় একটা বড়রকমের উপহারের ডালা সাজিয়েছিল দর্শকসমাজে। তারাশঙ্কর 'সপ্তপদী' থেকেই অনেকটা সরে এসেছিলেন শহুরে গল্পের দিকে। বিমল মিত্র নরেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত মানসিকতার আন্তর নিভৃতিতে একটা উষ্ণ মৃগনাভিতে আবিষ্ট করেছিলেন। কল্লোলের কালে মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্করের মহাজীবন স্বপ্ন ও সংগ্রামী মানবসত্তার বৈচিত্র্য আমাদের কথাসাহিত্যের সম্পদ ছিল। ওদিকে খণ্ডিত দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা ও উচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার রক্তক্ষরণের দিনও শেষ হয়েছিল।

এই পটভূমিতেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গাল্পিকতার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। পঞ্চতপা-চলাচল-বলাকার মন-বকুলবাসর-আমি সে

ও সখা—বাস্তবজীবনসমস্যা ও মানসজটিলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেক উপন্যাস লিখেছেন। সে তুলনায় ছোটগল্প কম। মঞ্চসমৃদ্ধির দিকে পা বাড়াননি। সাংবাদিক ব্যাপৃতির মধ্যে গাল্পিকতার টান শিথিল ছিল না সন্তোষ ঘোষের মতই। নরেন্দ্রনাথ মিত্রও সংবাদপত্র সেব্য সাহিত্যপথিক। আশুতোষকে দেখেছি "যুগান্তরে"র কাজে ব্যস্ত থাকতে। কিন্তু নিয়ম করে সৃজনশীল লেখায় ছিলেন অক্লান্ত।

* * *

আশুতোষের উপন্যাসের জগৎ, তার পরিবেশ মানুষজন নাট্যরসাক্রান্ত ঘটনার আবর্তে কলকাতার পবিবেশের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে নেই। "সেই অজানার খোঁজে" উপন্যাসখানির গল্পের সূচনা চলন্ত ট্রেনে। সপরিবাবে লেখক চলেছেন হরিদ্বার—কালীকিংকর অবধূত-এর মত এক নির্মোহ মজলিশি তন্ত্রসাধকেব জীবনসন্ধানী বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বিধৃত হয়ে আছে দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবাব পরই পাঠকমহলে দারুণ সাড়া পড়ে গেল—কে কোথায় এই অবধূত ? তন্ত্রাচারেব বীভৎসতা মাঝে মাঝে এলেও উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য। গৃহী তান্ত্রিকসাধক কালীকিংকর অবধূত শতসহস্রজনের হৃদয়েব অন্তঃপুবে পৌঁছে যাওযায লেখক আনন্দিত।

এই উপন্যাসেব ২য় খণ্ডে ঘটনা-কাহিনী উজান বেযে চলে এসেছে কোন্নগরে। অবধূতের "অক্ষয়যৌবনা গৃহিণী কল্যাণী দেবী"ব অনির্বচনীয় রূপ ও ভক্তি লেখককে মুগ্ধ করেছে। অথচ অবধূত এই রূপের বন্ধনে নিঃশেষে বাঁধা পড়ে নি। তাঁর মনে প্রশ্নের ভীড়— "কে ঘটায ? কেন ঘটে ? কে সাজায় ? কে কবে ? জবাব পাই না। আমি খোঁজ করছি। খুঁজে যাচ্ছি। ঈশ্বর আছে কি নেই আমি জানি না।" মনে হয় লেখকেব ব্যক্তিগত জীবনের কোনো সংকটমুহূর্তের অন্ধকাব থেকে একটা আলোর পিপাসা নিয়ে তিনি কালীকিংকরের "Spiritual Quest"কে সাহিত্যে রূপ দিতে চেযেছিলেন। চরিত্রটিব মধ্যে ধর্মীয় কোনো ভয়াল সংস্কারের ছাপ তিনি রাখেন নি। অবধূত হাস্যপরিহাসরসিক — ধূম ও মদ্যপানে উদারহস্ত—পেটো কার্তিককে দিযে যে শিষ্যপ্‌ চর্যার যোগাড় করে থাকেন তাব মধ্যে ভক্ত ধরাব ফাঁদ তিনি পাতেন না, লোভ-লালসাহীন এই অবধূত ঠিক পেশাদাবী সাধু নন। তন্ত্রসিদ্ধ ঠিকই তবে বন্ধুস্বভাবস্নিগ্ধ গৃহীব মাধুর্যে পাঠকেব মন জয় করে নেন। সংসাবেব মোহ-মালিন্য তাঁর নিজেব না থাকলেও, নানা উড়ো-ঝামেলা তাঁকে ব্যাপৃত-আবৃত করে। অবধূত যেমন ঘৃণা পাঁক গাযে মাখেন না—তেমনি বৈরাগ্য-বিভূতি তাঁকে তূরীয় মার্গে তুলে দেয না। পেটো-কার্তিক অবধূত আব কল্যাণী মাতাজীর চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে— "মাতাজীব হলো গিযে অধ্যাত্ম তেজেব ঘর, অনেক কঠিন ব্যাপার। আর বাবা হলেন গিয়ে একখানা সূর্যেব মতো, ছোটবড় সক্কলকে কিরণ দিচ্ছেন—আমাদের সুখ-দুঃখের শরিক।"

পাঠকের অসংখ্য জিজ্ঞাসা আর লেখকের দায়বদ্ধতা ও অজানার সন্ধানী পথের পথিকের জীবনদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বের আকুলতা নিয়ে শুরু হযেছে এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব।

এবার কালীকিংকরকে দেখি রোগ-নিরাময়ক সংস্কারকের ভূমিকায়, যিনি রতনলাল সারাওগির মত অসাধু ব্যবসায়ীকে শাসন করছেন। আবার সেই সঙ্গে চলেছে স্ত্রীর সঙ্গে মশকরা—লেখকের সামনেই—কেননা লেখক তো তাঁর রসচক্রের অংশীদার হয়েই গেছেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী-ঘরসংসার-শিষ্যপরিচর্যার নোঙ্গরবদ্ধ নয় অবধূতের জীবনতরী। অজানার খোঁজে ঘর ছেড়ে যান মাঝে মাঝে। গল্পের শেষের চিঠিতে লেখককে জানিয়েছেন—অজানার হদিস তিনি যেন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়ে যান— "মনের ঘরই শক্তির ঘর।"

* * *

"পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি" উপন্যাসখানির প্রকাশ ১৩৮২-তে। সত্তরের দশকের ভঙ্গুর জীবনবোধের পটভূমিতে মধ্যবিত্ত-মানসিকতা গল্প। অসাধু উপায়ে দু'পয়সা রোজগার করে বাড়ীঘরের সম্পত্তি গুছিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পের সূত্রপাত। শঙ্কর চাটুজ্জে-নেড়াদা-সমীর চেনাজগতের মানুষ। এখানে বড় কোনো জীবনসন্ধানের আলো ফেলতে চান নি লেখক। নকশাল আন্দোলন শেষ হলেও আকণ্ঠ সমস্যায় কলকাতা কণ্টকিত। তারি মধ্যে বাড়ী উঠছে—পাতালরেলের মহড়া চলছে—চাঁদার উৎপাত—এসব তো আছেই। কিন্তু শঙ্কর চাটুজ্জে আর জগা পাঠকের দু'পয়সা করে নেবার ফিকিরফন্দী সমান-তালেই চলেছে। "শহর কলকাতায় সমস্যা যত সমাবেশও তত। অতএব জগা পাঠকের মত ব্যস্ত কে?"

এই পটভূমিতে আমরা দেখতে পাই শীতের সকালে সুবর্ণা স্নান সেরে বে-আব্রু শাড়ীটায় সায়া-ব্লাউজ নিয়ে নিজের ভব্যতা রক্ষা করতে বিব্রত। ভাইবোনের বৌদির সংসার। দাদার ব্যবসাপত্তর দেখাশোনা করে সুবর্ণা। সুবর্ণার অকালবৈধব্যের মধ্যে কেমন একটা কারুণ্য লেগে আছে। সমস্ত পরিবারটার অবস্থা ধরা পড়ে সমুর (সমীর) অনুভূতিপ্রবণ মনে। সমুর এই অনুভূতিবেদ্যতা যেমন তার দিদির নারীত্বকে ছুঁয়ে যায় কিছুটা নবাগতের মতো, তেমনি আবার তার বৌদি গায়ত্রী সম্পর্কেও তার অবচেতনার যৌনতা আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে লেখকের অনুসন্ধিৎসায়।

বিনা-সমুর রোমান্সের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও—লেখার গুণে কেমন একটা বৈকালিক ম্লান করুণ আলোর স্পর্শ পাওয়া যায়। সমু-বিণার প্রেম— শঙ্কর-গায়ত্রীর দাম্পত্যজীবন—সুবর্ণার নিঃসঙ্গতা—মানুর রাজনীতি ও সর্বনাশা "যুদ্ধের কাল" একটা বিচিত্র নাগরিক আবর্ত সৃষ্টি করে বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। এমনি করে বাড়ীটা শেষ হয়ে যায় আর ওরা উঠে আসে সেই বিশাল বাড়ীটায়। কিন্তু এই আগমনীতে একটা বিষাদের সুরও বেজে ওঠে। বিনাদের সাহায্য করার জন্য সমু শংকরের সিমেন্টের গুদাম থেকে তিরিশটা বস্তা সরায়। কিন্তু অসমাপ্ত বাড়ীর মেয়েটা ছাদে উঠে মরণঝাঁপ দিয়ে একটা ভালবাসার স্বপ্নকে আছড়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায়—পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি তোলে মৃত্যু আর বিপর্যয়। এই মৃত্যুর ললাটে জ্বলে "যুদ্ধের কাল"— ওরা অপেক্ষা করে থাকে যুদ্ধের কাল শেষ হলেই সমু ফিরে আসবে।

* * *

প্রথম প্রকাশ—"ঝংকাব"; গল্পরসে আকর্ষণীয় এই উপন্যাসের স্থানান্তরণ কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে—সিনেমার অমরাবতী। গল্পের পর্দা উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আসামীর কাঠগড়া, তারপর সমস্ত আদালত দর্শকের সামনে যেন একটা গোটা বহস্য-লোকের বিচিত্র জটিল বিসর্পিল চিত্র সমুদঘাটিত হতে থাকে। একজন ঝানু ব্যাবিস্টারের সামনে এক রমণী—যে তার প্রেমের অন্তরায় তার স্বামীকে শেষ কবে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ— 'মার্ডাব, প্রিপ্ল্যাণ্ড কোল্ডব্লাডেড মার্ডার!"—"জ্বলন্ত ক্রোধে আর ঘৃণায় আর বিদ্বেষে আর যন্ত্রণায় সমস্ত আদালতঘব আমাব চোখের সামনে দুলে দুলে উঠলো"—জ্ঞান হারাবার আগে বমণীর অন্তিম আর্ত চিৎকাব—"না না না! সব মিথ্যে! সব ষডযন্ত্র! না না না—না না না—" পবিচালকের উল্লাসভবা কণ্ঠস্বব— 'কাট!' * * *

একটা সিনেমার শুটিং-এব কোর্টসীন দিয়েই এভাবেই উপন্যাসেব শুরু। এই দৃশ্য থেকেই এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীব কাহিনীর সূত্রপাত। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটিকে এই নায়িকা সহজভাবে নিতে পারে না। ব্যাবিস্টারেব সওয়াল জবাব-এব সঙ্গে লোকটাও যেন তাব সমস্ত সত্তাকে অক্টোপাসেব মতো জড়িয়ে ধরে। সুজাতা পাণ্ডুবং-এব সামনে বিনায়ক প্যাটেল মস্ত ব্যাবিস্টাব একটা প্রশ্নচিহ্নেব মত এসে দাঁড়ালেন। একটা শিল্পিত জীবন এবাব বাস্তব সংঘাতে বিচিত্র জটিল হযে উঠতে থাকে। আগে থেকেই সুজাতা চিনত বিনাযককে, মনে রেখেছে তাব অতীত ব্যাবিস্টারি কীর্তি। কিন্তু প্রথম আলাপেব জ্বালায় ভেতবে ভেতরে অসহিষ্ণু সুজাতা। অভিনেত্রীব জীবনে এসে দাঁড়িযেছে আব এক পুরুষ রমেশ সামতানি। ক্ষমতাবান পুরুষ। তবু প্যাটেলকে অস্বীকাব কবা যায না। এমন কি সুজাতাব অবচেনাতেও তাব অভ্রান্ত উপস্থিতি— "তাবপব দিনেব পব দিন ঘুমেব মধ্যে আধা-ঘুমেব মধ্যে এমন কি জেগে থেকেও সেই আঙুল নাড়া আব পুরু ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য কত দেখেছি ঠিক নেই।"

লোনাভালার বসন্তবাও বীবকবেব মেয়ে সুজাতা বীবকব। বিয়ের আগে তাব মাযেব পদবী ছিল পাণ্ডুবং। সত্তর মাইল দূবেব লোনাভালা থেকে বোম্বাইযে সুজাতাব জীবনের জট পড়ে যাওয়া প্রতিটি গ্রন্থিতে উত্তেজনা ও আবেগের ভাষা। দ্বিতীয় পর্বে সুজাতাব অতীত—বমেশ সামতানির স্মৃতি—মংগেশযোগীব বাড়ীব বাগান—কৈশোবেব স্মৃতিবিধুর দিনসন্ধ্যা—; তাবপর সুজাতাব ছাত্রীজীবন—মা-বাবার সঙ্গে তার জীবনেব যোগ-বিযোগ। বমেশ-সুজাতাব মধুর সম্পর্ক। বাবাব বড় কোম্পানি তৈবি হওয়া—অবস্থাব উন্নতি—দ্রুতগতি এনে দিয়েছে উপন্যাসে।

হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কবেপোবেশন নামে এক ভুযো প্রতিষ্ঠানেব ডাইবেকটর সুজাতাব বাবার পুলিশের হাতে ধবা পড়ে যাওয়া সত্যি যেন নীলমেঘে বজ্রপাত। উধাও হয়ে গেছে শেখব নায়েক। আদালত-ব্যারিস্টারেব জেবার সামনে তছনছ হযে যাওয়া সুজাতার বাবার জীবন। সেই ব্যাবিস্টাব বিনায়ক পটেল! অংশটি খানিকটা অতিনাটকীয় ভঙ্গীতে লেখা—এ্যাকশনটাকে লেখক জোবদাব করতে চেয়েছেন। সুজাতার মাব মৃত্যু

—ভাগ্যের পাকচক্র ঘটনাস্থল সরে এসেছে সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর এই ফ্ল্যাটে। আর এখান থেকেই সুজাতার দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছে—"ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল।"

এই সময়টা সুজাতার জীবনে একটা বিরস নিশ্চলতা। রমেশই এবার একটুখানি দোলা দেয়—সুজাতার রূপালিপর্দায় ভেসে ওঠার এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। নায়িকা হবার রেকাবে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার উন্নতির অশ্ব দৌড় দেয়— টেলিফোন-ফ্ল্যাট-প্রোডিউসর হরিহর শর্মার খোশামোদ আর রমেশ সামতানির উষ্ণসান্নিধ্য। কিন্তু এরি মধ্যে প্যাটেলকে সুজাতা সহ্য করতে পারে না। তার বাবার সেই মামলার স্মৃতি জ্বলন্ত ক্ষত হয়ে আছে। তবু প্যাটেলের সঙ্গে মিশতে হয়—এ অভিনয়—সুজাতার কাছে সত্যি নিদারুণ। এর পরেই গল্পের মুখ যেন নিদারুণ রহস্যময় পরিণামের দিকে বাঁক নিয়েছে। প্যাটেলের সঙ্গে সুজাতার বিয়ে—আবার ঘৃণা ও পূর্বস্মৃতির জ্বালায় সেই বিয়েকে অস্বীকার করে ত্রিশঙ্কুর মত বেঁচে থাকা—নাট্যমুহূর্তে রমেশের আবির্ভাব ও সুজাতাকে একটা জঘন্য চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলা— শেষ পর্যন্ত সেই প্যাটেলেব কাছেই সুজাতার বেগবান অগ্নিক্ষরা জীবনের শেষ আশ্রয় একটা অচেনা জগতের "ডিকাডেন্সে"র অন্ধকারের কাহিনী ; এই সাহিত্যচিত্রায়ণ জীবনরহস্যেব প্রাণাবেগ ও বাসনার মর্মদাহী সামাজিক দলিল।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড



সেই অজানার খোঁজে
২য় খণ্ড

কলম হাতে নিয়ে অনুভব করছিলাম পাঠকের কাছে লেখক কতটা দায়বদ্ধ। হাওড়া থেকে হরিদ্বাবেব দীর্ঘ পথ-যাত্রায় যে মানুষটিকে আবিষ্কারের আনন্দে তাঁকে পাঠকের সামনে হাজির করেছিলাম সেই গৃহী তান্ত্রিকসাধক কালীকিংকর অবধূত শত সহস্রজনের হৃদযের অন্তঃপুরে এ-ভাবে পৌঁছুবেন আমি ভাবি নি। এই মানুষকে নিয়ে তাঁদেব এখন অনেক প্রশ্ন অনেক কৌতূহল অনেক দাবি। তাঁর সকাশে উপস্থিত হবাব আশ্চর্য তাগিদ। এই তাগিদের স্রোত ব্যাহত করার অধিকার আমার নেই জেনেও চুপ কবেছিলাম। আব অসহায বোধ কবছিলাম। তাঁদের শত শত চিঠির উত্তর না দিয়ে চুপ কবে থাকাটা তৃষ্ণার জলের হদিস দিযেও উৎসটিকে গোপন করে বাখার মতো।

...কলকাতাব বে-সবকাবি কলেজেব এক অতিসাধারণ মাস্টারেব ছেলের এমন বিচিত্র জীবনে পা ফেলাব ইতিবৃত্ত অনুসবণ করে প্রৌঢ় প্রহবে দেবভূমি তাবকেশ্বরে তাঁব জীবনেব যে অত্যাশ্চর্য নাটকটি আমার সামনেই পরিণতির মোহনায় এসে সম্পূর্ণ হযেছিলো—তাবপব কোন্নগবেব বাড়িতে এসে যে-কথাগুলো আমার কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমাব বুকেব তলায তা সোনাব অক্ষবে খোদাই হয়ে গেছল।

..আমি বলেছিলাম, আমাকে একটু পথ দেখান।

তাব একটু আগে অবধূতেব প্রায় অক্ষয়-যৌবনা গৃহিণী কল্যাণী দেবীর মুখে সংশয-শূন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক অনির্বচনীয় রূপ দেখেছিলাম। সহজ দ্বিধাশূন্য গলায সেদিন তিনি বলেছিলেন, যা ঘটে, কেউ কেউ ভাবতে পারেন তাব পিছনে তাঁর বাহাদুবি আছে (কটাক্ষ স্বামীব প্রতি), কিন্তু যিনি ঘটালেন আর ঘটনাব শেষ করলেন, তিনি হাসেন।

কল্যাণী দেবী ঘর ছেড়ে চলে যাবাব পবে আমাব ওই আরজি।

মনে আছে, পেটো কার্তিক তাব বাবাব পা টিপছিল আব হাঁ কবে তাঁব শ্রীমুখ দেখছিল। আয়েস করে মাংসেব বডা তল কবে ড্রিঙ্ক-এব গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে অবধূত ফিবে প্রশ্ন করেছিলেন, তাব মানে? কি পথ?

আমি বলেছিলাম, বিশ্বাসেব পথ, শান্তিব পথ।

অবধূত চুপচাপ চেযেছিলেন একটু। বলেছিলেন, শান্তি জিনিসটা যাব যাব মনের কাঠামোব ওপব নির্ভব করে...কিন্তু আপনি কোন বিশ্বাসেব কথা বলছেন?

বলেছিলাম, আপনাদেব যা বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাস।

শুনে আবাব খানিক চেয়েছিলেন। তাবপব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, শুনুন, আমার স্ত্রীকে দেখে আমার বিচার করবেন না। আমার মতো টানাপোডেনের মধ্যে দুনিযায কতজন আছে জানি না।...অনেকে চোখ বুজে বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। অনেকে চোখ বুজে অবিশ্বাস কবে ঈশ্বব নেই, কিন্তু ঈশ্বর আছে কি নেই এই সন্ধান কতজনে করে?

এই কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাতে আমার মনে হযেছিল অবধূতেব দু'চোখ কোথায় কোন দূরে উধাও। গলাব স্বব আরো গভীর। নিজেই সে-কথার জবাব

দিযেছিলেন। বলেছিলেন, আমি কবি। কবছি।...ঘটনাব সাজ দেখে দেখে প্রশ্ন কবি, কে ঘটায? কেন ঘটে? কে সাজায? কে কবে? জবাব পাই না।...আমি খোঁজ কবছি। খুঁজে যাচ্ছি। ঈশ্বব আছে কি নেই আমি জানি না।

...একজনেব জীবন-মহিমাব বিচিত্র পথে বিচবণেব ইতিবৃত্ত নয, দ্বাবভাঙাব কাঁকুবঘাটিব মেযে পার্বতী প্রসাদেব সদ্য-জাত হাবানো সন্তানকে পাঁচ বছব বাদে ফিবে পাওযাব বোমহর্ষক প্রহসনও নয—এই-সব বোমাঞ্চকব ঘটনাব নিযামক হিসেবে অগণিত ভক্তজন যাঁকে ঈশ্ববেব এক জাগ্রত অংশ বলে জানে, বিশ্বাস কবে—স্বযং সেই মানুষই এমন জিজ্ঞাসাব মুখোমুখি দাঁডিযে, এমন খবব কি মানুষেব ঘবে ঘবে পৌঁছে দেবাব মতোই হৃদযেব সম্পদ নয? শুধু এটুকু মনে বেখেই বিগত প্রসাদ পূজা-বার্ষিকীতে সেই অজানাব খোঁজে ৰূপাযণেব ভিতব দিযে অবধূতকে এই জিজ্ঞাসাব জীবন-দর্শনে এনে কাহিনীব যবনিকা টেনে দিযেছিলাম।

...পাঠকেব কাছে দাযবদ্ধ লেখকেব সেই যবনিকা আব একদফা তুলতে হবে ভাবি নি।

কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। কলকাতায ফেবাব আগে ঠাট্টাব ছলে অবধূত যা বলেছিলেন তাতে হোঁচট একটু খেযেছিলাম বইকি। আলতো কবে জিজ্ঞেস কবেছিলেন, এতদিনে লেখাব মতো জমজমাট কিছু বসদ পেলেন ভাবছেন বোধহয?

আমাব উদ্দেশ্য তিনি অনেক দিনই বুঝেছেন। হবিদ্বাব থেকে ফেবাব পবেও দেড বছব ধবে সঙ্গ কবছি, তাঁব মতো চতুব মানুষেব আমাব লক্ষ্য কি তা না বোঝাব কথা নয। তাবকেশ্ববে বসে এ-নিযে তিনি ঠাট্টাও কবেছিলেন, নিঃস্বার্থ উপকাব কবা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আপনাব লেখা যখন ছাপাব অক্ষবে বই হযে বেরুবে আমাকে কি তাব বযেলটিব ভাগ দেবেন?

অর্থাৎ, এক বছবেব ওপব ধবে আমাব মগজে যে ৰূপ আকাব নিচ্ছে তা তিনি ভালোই জানতেন।

প্রশ্নটা শুনে একটু খটকা লেগেছিল, জিজ্ঞেস কবেছিলাম, কেন বলুন তো, আপনাব আপত্তি আছে?

তাঁব সকৌতুক জবাব, না, আমাব আব আপত্তি কি। তবে, বহু ধৈর্যং...আমাব পবামর্শ যদি শোনেন কিছুকাল অপেক্ষা করুন, নইলে মুশকিলে পডে যেতে পাবেন।

বিদায নেবাব আগে কল্যাণীও সামনে ছিলেন। মুশকিল কি হতে পাবে ভেবে না পেযে তাঁব দিকে তাকিযে বলেছিলাম—কিছু বুঝতে পাবছেন?

হেসে জবাব দিযেছেন, ওঁব কথা সব-সময বুঝিও না, তা নিযে ভাবিও না। তবে ওঁব অনেক বাজে কথা অনেক সময ফলে যেতে দেখেছি, বলছেন যখন কিছুদিন অপেক্ষাই করুন।

অবধূতেব দিকে ফিবে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, কিছুদিন অপেক্ষা কবব বলতে কতদিন?

তিনি স্মিত মুখেই জবাব দিযেছিলেন, আমি তো কিছুদিন বলিনি, কিছুকাল বলেছি...

শুনে একটু হতাশ আমি।—এখনই তো মুশকিলে ফেললেন দেখছি, তবু কতকাল?

—এই ধরুন যখন আমি আর কল্যাণী থাকব না।

মুখের ওই হাসি দেখে আমাব ভিতরটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। কাল-নির্দেশ আবো অসহিষ্ণুতার কাবণ। সঙ্গে সঙ্গে আমার তির্যক প্রশ্ন, কাল রাতে বললেন আপনি সন্ধানী, খোঁজ করছেন—কিন্তু এখন তো দেখি বেশ সর্বজ্ঞ ভবিষ্যতদ্রষ্টার মতো কথা বলছেন—আপনি আমার থেকে তিন বছরের বড আর কল্যাণী আমার থেকে ছ'বছরেব ছোট—আপনাবা দুজনে না থাকার পরেও আমি থাকব এমন গ্যারান্টি দিচ্ছেন কি কবে?

—যাঃ কলা! জোবেই হেসে উঠেছিলেন।—একটা সহজ কথাবও কিভাবে অন্য অর্থ হয়ে যায় দেখুন, যখন থাকব না মানে কি মবে যাওযা! ধরুন, আপনি লেখা থেকে রিটায়ার করলেন, তার মানে কি আপনি মবে গেলেন? তখন নেই মানে আপনি আর কর্মেব মধ্যে নেই—

তাতেও আমি বিবত হই নি।—আপনাব বা কল্যাণীব শিগগীবই সেইরকম না থাকার অবস্থা আসছে ভাবছেন?

জবাবে হাসি মুখে অবধূত স্ত্রীব দিকেই ঘুবে তাকিযেছিলেন।—কি গো, আমি তোমাব কোন হুকুমেব দাস আব কি-জন্যে এখনো আমাদেব বেশ কিছুদিন এখানে পড়ে থাকা—ভদ্রলোককে বলে দেব নাকি?

—থাক, আব বলতে হবে না, সব-সময়ে আমাকে কর্ত্রী বানিযে বাহাদুরি!

আগেও দেখেছি এ-রকম মুখ-ঝামটা অবধূত ভাবী প্রসন্ন মনে গ্রহণ কবেন। আমাবও ভিতরটা যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে অস্বীকাব কবি কি কবে। কল্যাণীর বয়েস এখন বাহান্ন। কিন্তু দেহশ্রী আব সুঠাম স্বাস্থ্য এখনো বত্রিশের জাদু-কাঠামোয বন্দী। আমার বিবেচনায় এ-ও বমণীর এক দুর্লভ যোগ-বিভূতির মহিমা। তাঁকে ছেড়ে দুচোখ আবাব অবধূতের মুখের ওপবেই সন্ধানী হযে উঠেছিল। জিগ্যেস করেছিলাম, এই সৎপবামর্শ কেন, কি-রকম মুশকিলে পড়ার কথা ব... ছেন?

আবাবও হেসে উঠেছিলেন।—আপনি অল্পেতে ঘাবড়েও যান দেখছি, সে-রকম কিছু না। আচ্ছা আমার একটা কথার জবাব দিন, ভাবলে তাব মধ্যেই আপনার প্রশ্নেব উত্তব পেযে যাবেন। আপনি তো কত চবিত্র দেখেছেন, কত বকমেব মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কবেন, আজ পর্যন্ত এমন একটি মানুষ দেখেছেন যে প্রাণেব আনন্দ থেকে বলে, পরম শান্তিতে আছি, কোনো খেদ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ জমা দেবাব মতো শোক জমা দেবাব মতো কোনো আশ্রযের দবকার নেই—দেখেছেন এমন একজনও?

জানি দেখি নি। তবু নিবীহ মুখ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের দু'জনকে ছাড়া?

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি। এমন হাসি, যে কল্যাণী দেবীও হাসি মুখে ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিলেন, বাবারে বাবা, হাসি শুনলে কাক-চিলেও ভযে পালায়!

হাসি থামিয়ে শেষে উনি বলে উঠেছিলেন, এতদিন ধরে এত দেখাশোনা বোঝার

পর আপনার মুখে এই কথা! আরে মশাই আমাদের দুজনের একজন তো সেই ষোল বছর বয়েস থেকেই তার খেদ ক্ষোভ শোক দুঃখ তার শিবঠাকুর কংকালমালী ভৈরবের ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে বসে আছেন, উপপতি ছেড়ে এখন তার পতির ঘরে যাবার জন্য হাঁসফাঁস দশাখানা এই মুখ দেখে আপনি বুঝবেন কি করে? নেহাত ওই পতিটিরই আর এক চক্রান্তের কলে আটকে গেছে তাই...।

কল্যাণীর আবির গোলা মুখ, সঙ্গে উষ্ণ মন্তব্য, জিভের যদি একটুও লাগাম থাকত—

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে অবধূত বলেছিলেন, আর ভক্তজনের দেওযা আধা-ঈশ্বরের খোলস পরে এই হতভাগা কি টানাপোড়েনেব মধ্যে পড়ে আছে সে-তো কাল রাতেই বললাম আপনাকে।

এই বিগত প্রসঙ্গ আটাত্তর সালের শেষের দিকের। এব পবেও দীর্ঘ চাব বছবেব ওপর অর্থাৎ তিরাশি সালেব গোড়ার দিকে পর্যন্ত এই দম্পতির সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ঘনিষ্ঠ যোগ বলতে খুব ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো এমন নয়। চোখের যোগ থেকে মনের যোগ বেশি ছিল। পরস্পরের খবরাখবর রাখতাম। পেটো কার্তিকের যাতায়াতের ফলে সেটা আবো সহজ হতো। পেটো কার্তিক আবাব অনেকসময তার বাবা অথবা মাতাজীর ওপর রাগ করেও আমার এখানে চলে আসত। লক্ষ্য করে দেখেছি মাতাজীর থেকেও তার বাবার ওপর অভিমান একটু বেশি। বলে মাতাজীর হলো গিয়ে অধ্যাত্ম তেজের ঘর, অনেক কঠিন ব্যাপার, ভয়ে নাক গলাইনে। আর বাবা হলেন গিয়ে একখানা সূর্যের মতো, ছোট-বড় সক্কলকে কিবণ দিচ্ছেন। আমাদের সুখ-দুঃখের শরিক—সকলে সেইজন্য বাবার থেকে সুবিধেও বেশি নেয।

একবার হঠাৎ এক সন্ধ্যায় চলে আসতে মুখ দেখেই মনে হয়েছিল রাগের ব্যাপার ঘটেছে কিছু। খবর জিজ্ঞেস করতে মুখের ওপর জবাব, আমার কি কারো ভালো মন্দের খবর রাখার অধিকার আছে?

পরে শুনলাম একশ দুই জ্বর নিয়েও বাবা গত মঙ্গলবার শ্মশানে গেছেন। এমনিতে যেতেন না, কার কি ক্রিয়া-কাজ করার কথা ছিল। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, পরের শনি বা মঙ্গলবারে করলেও হতো। কিন্তু সেই লোক ঠিক সন্ধ্যায় এসে হাজির। দোষের মধ্যে বাবার খুব জ্বর বলে পেটো কার্তিক তাকে হটিয়ে দিয়েছিল। সে-ব্যাটা এমনি ত্যাঁদড় যে বাড়ি ফিরেই বাবাকে ফোন। বাবা ফের তাকে আসতে বলে শ্মশানে যাবার জন্যে তৈরি হলেন, আর জ্বরের জন্যে হোক বা যে-জন্যে হোক খুব রেগে গিয়ে মাতাজীকে হুকুম করলেন, পেটোকে কান ধরে এখানে নিয়ে এসো। বাবা হঠাৎ-হঠাৎ বেশ রেগে যান বটে, কিন্তু ঠাট্টা করা ছাড়া কানটান ধরার কথা কখনো বলেন না। ডাকতে এসে মাতাজীই ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন বাবা দারুণ রেগে আছে। পেটো আর ধারে কাছে থাকে, সোজা সটকান। বাবা রাগেন কমই আর রাগ জল হতে সময়ও লাগে না। শ্মশানের ক্রিয়াকাজ সেরে রাত চারটেয় বাড়ি ফিরেছেন। পেটো স্বপ্নেও ভাবে নি পরদিন পর্যন্ত বাবার মাথায় রাগ চড়ে থাকতে পারে। সকালে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই প্রথম কথা,

ফের এ-রকম হলে তোকে নিয়ে আর আমার পোষাবে না, তোকে নিজের রাস্তা দেখতে হবে।

বলতে বলতে দুঃখে অভিমানে পেটো কার্তিক কেঁদে ফেলেছিল।—বলুন তো, এতদিন বাদে আমাকে কিনা এই কথা! কুকুরেরও তো তার মনিবের ভালো-মন্দ দেখার অধিকার আছে—আমি কি কুকুরের অধম! যাক, দু'চারটে দিন আপনার এখানেই পড়ে থাকব, দয়া করে চাট্টি করে খেতে দেবেন, তার মধ্যে নিজের ব্যবস্থা কিছু করতে পাবি ভালো, না পারলে যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—

আমি কেবল শুধিয়েছিলাম, এখানে যে এসেছ বাড়িতে বলে এসেছ?

—আমার কে আছে যে বলে আসব, টাকা পয়সা যা আমার কাছে ছিল পুঁটলি করে মাতাজীব ঘরেব তাকের ওপব বেখে এসেছি।

রাতে আর কিছু বোঝাতে চেষ্টা কৃরি নি, তাতে কেবল গোঁ আর অভিমান বাড়বে।

অবধূতের কোন্নগবের বাড়িতে ফোন এসেছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে বার পাঁচেকও সে-ফোন ধবতে পেবেছি কিনা সন্দেহ। ধৈর্যও থাকে না। একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম; শেষ হতে বাত বারোটা। ভাবলাম এ-সময় একবার চেষ্টা করে দেখা যাক যদি পেয়ে যাই। ভদ্রলোকেব জ্বব শুনেছি, তাব ওপর পেটো যা বলছে একটু ভাবনাব কথাই। ও-বাড়িব বাত বাবোটা কিছুই না। কল্যাণী দেবী শুনেছি এখন তাঁর মাযেব মতোই বাতে দু-আড়াই ঘণ্টাব বেশি ঘুমোন না, আর অবধূতেব তো ঘুমের ব্যাঘাত বলে কোনো কথাই নেই।

অত রাত বলেই হযতো চট কবে পেয়ে গেলাম। উনিই ধরলেন। জিজ্ঞেস করেছি, খুব জ্বর নিযে শ্মশানে গেছিলেন শুনলাম, এখন কেমন?

জবাবে হা-হা হাসি।—ভালো আছি, এত রাতে আমাব শরীরের জন্য চিন্তা না কার্তিকের জন্য?

ভণিতা বাদ দিয়ে আমাকে কার্তিকের মতলব বলতেই হয়েছে।—ও দু'চারদিন আমাব এখানে থেকে নিজেব ব্যবস্থা দেখবে, আব ব্যবস্থা কিছু না হলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে বলছে।

আবারও হাসি।—আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন, দু'চারদিন ছেড়ে কাল সকালেই দেখুন কি করে।

দেখেছি। সকালে চা জলখাবারের সময়েই সে উসখুস ভাব। আমার প্রস্তাব, চলো তোমাকে নিয়ে একটু বাজারে ঘুবে আসি, আছ যখন বাজারে ভালো-মন্দ কি পাওয়া যায় দেখি—

আমতা-আমতা মুখ।—আমি ভাবছি সার রোদ চড়ার আগে চলেই যাই...

অবাক-ভাব দেখাতেই হয়।—কোথায়?

রাগত জবাব।—কোথায় আর, কোন্নগর ছাড়া আমার যাবার আব কোন্ চুলো আছে? মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়ে দিয়েছেন সার—বুঝলেন? যাকে বলে ব্রেন ওয়াশিং, এত আরামে শুয়েও কাল সমস্তটা রাত ভালো ঘুম হলো না—সেই আগেরদিন হলে এই ব্রেন কেবল জ্বলত, আর এখন কিনা কেবল মনে হচ্ছে এ-ভাবে চলে

এসে ডবল অন্যায় করলাম। যাই হোক, আপনি ফাঁক-মতো বাবাকে একটু সমঝে দেবেন সার, আমার সঙ্গে এমন ব্যাভার করলে কোন্‌দিন নিজের গলায় ব্লেড দিয়ে বসব।

আমার নিরীহ গোছের পরামর্শ, তুমি নিজেও তো বলতে পারো...

—পারি বই কি, মওকা পেলে আমি কিছু বলতে ছাড়ি। নিজেই তো দেখেছেন, বাবার তখন সমস্ত মুখ যেন হাসিতে গলে গলে যায়।

ও চলে যাবার পর গত রাতে অবধূতের গলার প্রত্যয়ের সুরটুকু আবার মনে পড়েছে। বলেছিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন, দু'চার দিন ছেড়ে কাল সকালেই দেখুন ও কি করে।

আর পেটো কার্তিক সম্পর্কে সেই পুরনো কথাই আবার মনে হয়েছে। আজকের এই কার্তিক নয়, পাঁচ বছর আগে যা ছিল অমন হাজার হাজার বেকার বোমাবাজ পেটো কার্তিক শহর শহরতলী আর মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে আছে। ধরে ধবে এদের সক্কলকে যদি অবধূতের কাছে পাঠানো যেত!...সেবারে তারকেশ্বরে যাবার সময়েও ট্রেনে দেখেছি অভাবী খেটে খাওয়া মানুষের জন্য ওর বুকের তলায় কত দরদ। বিনা প্রয়োজনে ট্রেনের হকারদের কাছ থেকে এটা কিনছে ওটা কিনছে, তারপর ট্রেন থেকে নেমেই সব বিলিয়ে দিচ্ছে। যারা বেচল তারা খুশি, যারা পেল তারাও খুশি।

প্রসঙ্গ থেকে দূরে এসেছি। আগেই বলেছিলাম, প্রাসঙ্গিক ঘটনার ভিতর দিয়ে কালীকিংকর অবধূতের জীবন-দর্শন আর জীবন-জিজ্ঞাসা আমার অনুভবগোচর হয়েছিল সেই আটাত্তর সালে। তারপর যতবার লিখব বলে মন স্থির করে বসতে চেষ্টা করেছি ততবার অবধূতের হাসি-ছোঁয়া সতর্ক-বাণী একটা বাধার মতো উঠেছে। উনি বলেছিলেন, রহু ধৈর্যং, আমার পরামর্শ যদি শোনেন কিছু-কাল অপেক্ষা করুন, নইলে মুশকিলে পড়ে যেতে পারেন।

কি মুশকিল আমি ভেবে পাই নি। কিন্তু ওই পলকা নিষেধেও হয়তো কান দিতাম না যদি না কল্যাণী বলতেন, ওঁর অনেক বাজে কথা অনেক সময় ফলে যেতে দেখেছি, বলছেন যখন কিছুদিন অপেক্ষাই করুন।

...কালীকিংকর অবধূতকে নিয়ে 'সেই অজানার খোঁজে' কাহিনী বিস্তারে নেমেছি আরো দীর্ঘ দিন পরে—পঁচাশি সালের প্রসাদ পূজা বার্ষিকীতে। আমার বিবেচনায় আর অপেক্ষা করার মতো কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবধূতের সেই হাসি-ছোঁয়া সতর্ক-বাণী আর কোনোরকম বাধা হয়ে ওঠে নি। ততদিনে অর্থাৎ তিরাশি সালের শুরু পর্যন্ত ওই একটি পুরুষ আর একটি রমণীর জীবনের অনেক অতীত অধ্যায় আমার কাছে অনাবৃত হয়েছে। নতুন ঘটনার সংযোজনও কম দেখি নি। রমণীটি অর্থাৎ কল্যাণীর ভিতরের সঠিক রূপটি আজও বোধহয় আমি নিজের বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসতে পারি নি। অনেক সময় মনে হয়েছে পেটো কার্তিকের কথাই ঠিক।...বলেছিল, মাতাজীর হলো গিয়ে অধ্যাত্ম তেজের ঘর, অনেক কঠিন ব্যাপার। আর বাবা হলেন গিয়ে একখানা সূর্যের মতো, ছোট-বড় সক্কলকে কিরণ দিচ্ছেন—আমাদের সুখ-দুঃখের শরিক।...হ্যাঁ, পরের অধ্যায়ে মাতাজী কল্যাণীর

অধ্যাত্ম তেজের কিছু হদিশ আমিও পেয়েছি বইকি। কিন্তু 'সেই অজানার খোঁজে' লিখতে বসে আমি কেবল আমাদের সুখ দুঃখের শরিক কালীকিংকরের দর্শন আর জিজ্ঞাসার চিত্রটাতেই মনোনিবেশ করেছিলাম। অর্থাৎ সেই আটাত্তর সালের পরের কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সেই অধ্যায়ে টেনে আনি নি। কারণ আগেও বলেছি। ...রোমাঞ্চকর সব ঘটনার নিয়ামক হিসেবে অগণিত ভক্তজন যাঁকে ঈশ্বরের এক জাগ্রত অংশ বলে জানে, বিশ্বাস করে—স্বয়ং সেই মানুষই এমন সন্ধান-অভিসারী, যিনি বলেন, ঈশ্বর আছে কি নেই আমি জানি না, আমি খোঁজ করছি, খুঁজে যাচ্ছি। শুধু এটুকু মনে রেখেই 'সেই অজানা'ব খোঁজের কাহিনী বিস্তার করেছিলাম। শুধু এই খবরটুকু মানুষের ঘবে ঘরে পৌঁছে দেবার মতো সম্পদ ভেবেছিলাম।

কিন্তু পৌঁছে দেবার পব কি হলো?

প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন।

ফোন-গাইড থেকে আমার ঠিকানা বার করে, পাবলিশাব আর প্রসাদ পত্রিকা থেকে ঠিকানার হদিস নিয়ে, অথবা লোকমুখে জেনে নিয়ে কেবল প্রশ্ন আর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন।—কালীকিংকর অবধূত কোথায়? কল্যাণী মাতাজী কোথায়? আমরা বড় বিপন্ন, অবধূতজীকে আমাদের বড় দবকার। কল্যাণী মাতাজীকে যে আমাদের বড় দবকার। কোন্নগর চষেও তাঁদেব হদিস পাচ্ছি না কেন? বাড়ির হদিস পেলেও সেটা শূন্য ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে কেন? অথচ তাঁরা যে নেই এমন কথাও তো কেউ বলছেন না। বরং বলছেন, আছেন কোথাও—ওই লেখকের কাছেই খোঁজ করুন, মনে হয একমাত্র তিনিই বলতে পাববেন।

প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। আকৃতি দেখে আমি দিশেহারা। চিঠির জবাব না পেয়ে তাঁদের অনেকে বাড়িতে এসে হানা দিয়েছেন। ত্রিবেণী শ্রীরামপুর নদীয়া মুর্শিদাবাদ বহরমপুর এমন কি বাবাণসী লক্ষ্ণৌ হরিদ্বার থেকে পর্যন্ত এক-একটি দম্পতি ছুটে এসেছেন। সকলের মুখেই এক কথা এক আকৃতি, অবধূতজী কোথায়? কেমন করে তাঁর সন্ধান পাব। তাঁকে যে বড় দরকার।

আমার বুকের তলায় কত যে মোচড পডেছে তার হিসব দিতে পারব না।

তখনই অবধূতের সেই হাসি-ছোঁয়া নিষেধের সাব বুঝেছি। কি মুশকিলে পড়ার কথা তিনি বলেছিলেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তাঁর হালকা কথার সূত্র ধরে তখনো যদি একটু গভীরে ডুব দিতে পারতাম, ওই নিষেধের তাৎপর্য বোঝা তো জল-ভাত ব্যাপার ছিল! আর প্রকারান্তরে তিনি সেটা বলেও দিয়েছিলেন।...আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই সৎ পরামর্শ কেন, কি-রকম মুশকিলে পড়ার কথা বলছেন? জবাবে তিনি হাসি মুখে ফিরে প্রশ্ন করেছিলেন, আজ পর্যন্ত এমন একটি মানুষ দেখেছেন যে প্রাণের আনন্দ থেকে বলে পরম শান্তিতে আছি, কোনো খেদ নেই কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ জমা দেবার মতো, শোক জমা দেবার মতো কোনো আশ্রয়ের দরকার নেই—দেখেছেন এমন একজনও?

...হ্যাঁ রসিকতার ছলে এই মুশকিলে পড়ার কথাই অবধূত বলেছিলেন, আর মনে হয় কল্যাণীও সেটা বুঝেছিলেন। পরম শান্তিতে কেউ নেই। দুঃখ জমা দেবার মতো শোক জমা দেবার মতো কোনো আশ্রয়ের দরকার নেই এমন কেউ নেই।

অন্যের কথা কেন, দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের যাদুশক্তি ধরে, একমাত্র ছেলের জন্য সমস্ত ভারত ঘুরে এমন মানুষ তো একদিন আমি আর আমার স্ত্রীও খুঁজে বেড়িয়েছি। আমার সেই লেখা থেকে পাঠক সে-রকম শক্তিধর কোনো একজনের হদিশ পেয়েছেন ভেবেছেন—সকলে না হোক, যাঁরা বিপন্ন, যাঁরা শোক দুঃখ বা সংকট জমা দেবার মতো আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ভেবেছেন। কালীকিংকর অবধূতকে তাঁরা খুঁজছেন। এমন লোকের সংখ্যা যে কত আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু অবধূতের ছিল।

এ-ভাবে বিপর্যস্ত হবার ফলে একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। এত বছর ধরে আমাকে ওই লেখা থেকে বিরত রেখে অবধূত আমার মুশকিলে পড়া ঠেকিয়েছেন না নিজের গা বাঁচিয়েছেন? কিন্তু পবে আরো ভেবে মনে হয়েছে ওটা নিজেরই বিমূঢ় চিন্তা। ওই মানুষ কোনোদিন ছলনার আশ্রয় নেন নি, যদি নিয়েও থাকেন সেটা তাঁর লোকের মঙ্গল করার কৌশল। পাঠকের মনে থাকতে পারে ট্রেনে হরিদ্বারেব পথে তার অন্তর্দৃষ্টি দেখে আমরা যখন অনেকটাই অভিভূত, আব চৌদ্দ বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে আমাদের একমাত্র ছেলে চলে গেছে, শুনে তাঁর মুখখানাও যখন বিষণ্ন গম্ভীর, আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার হাতে এলে আপনি কিছু করতে পারতেন? সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নেড়েছিলেন, বলেছিলেন, কিচ্ছু পাবতাম না মা, কেউ পারত না।

...কল্যাণীর মা, তারাপীঠের ভৈরবী মা মহামায়ার শিক্ষাই অবধূতের পরবর্তী জীবনের সব থেকে বড় পুঁজি। ওই মায়েব কাছ থেকেই তাঁর দৃষ্টির সাধনা অধিগত। এই দৃষ্টি চালনার ভিতর দিয়ে মানুষের অন্তঃস্থলের অনেকটাই তাঁর চোখে ধরা পড়ে। রোগ ব্যাধি শুধু নয়, শোকতাপ পরিতাপের ছায়াও তিনি দেখতে পান। কপাল আর লক্ষণ দেখেও অনেক কিছু নির্ভুল আঁচ করতে পারেন। হাত দেখা বা জ্যোতিষী বিদ্যাও ওই মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। আর সব থেকে বড় পাওয়া মায়ের আয়ুর্বেদনিষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্যা। এই থেকে অবধূত নিজেও দ্রব্যগুণে বিশ্বাসী। লোকের মন আর মানসিকতা বুঝে তাঁকে তাবিচ-কবচও দিতে দেখেছি। এইসবের সঙ্গে অসাধারণ বুদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিষ্ঠা আর আত্মপ্রত্যয়ের যোগ ঘটলে যা হয়—কালীকিংকর অবধূত কেবল তাই। নিজে তিনি কোনোদিন অলৌকিকের পিছনে ছোটেন নি। কত সময় হেসে বলেছেন এ-সবের কোনো কিছুর মধ্যে অলৌকিকের ছিটে ফোঁটাও নেই—আমি যা পারি আর করি তার সবটাই শিক্ষা আর নিষ্ঠার সাধনাব ফল, এই শিক্ষা আর নিষ্ঠা থাকলে ইচ্ছে করলে আপনিও পারেন—সকলেই পারে।

...কিন্তু মানুষ তাঁর কাছে যতটুকু পেয়েছে, বিশ্বাসে আর ভক্তিতে তাতেই তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ধরে নিয়েছে। তারাই তাঁকে গড-ম্যানের আসনে বসিয়েছে। সেই গড-ম্যান নিজের গড খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ঘটনার সাজ দেখে দেখে তাঁর প্রশ্ন, কেন ঘটে কে ঘটায়, কে সাজায় কে করে—এই বৈচিত্র্যটুকুর দাগ রেখে যাবার তাগিদেই কালীকিংকর অবধূতকে আমি পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছিলাম। সঙ্গে আমার না-বোঝা পেটো কার্তিকের ভাষায় তাঁর আধ্যাত্ম তেজের ঘরের স্থির-

যৌবনা স্ত্রী কল্যাণীকেও। কাবণ আমাব বিবেচনায় একজনকে বাদ দিলে অন্যজন অসম্পূর্ণ।

...কিন্তু পাঠকও তাঁদেব ভক্তজনেব পথেই চলেছেন। শোক দুঃখ ভয তাপ জমা দেবাব জন্য তাঁদেব খুঁজছেন। তাঁবাও তাঁদেব গড-ম্যান গড-মাদাবেব আসনে বসিযেছেন। দুজনেব মধ্যে অলৌকিক শক্তিব রূপ দেখেছেন। তাঁবা একেবাবে মিথ্যে ভাবছেন এমন বলাব ধৃষ্টতাও আমাব নেই। কাবণ, অলৌকিক না হোক যুক্তিব বাইবে শক্তিব রূপ পবে এঁদেব মধ্যে আবো দেখেছি। যা-ই হোক, পাঠকেব অন্বেষণ বা অনুসন্ধিৎসাব আডালে বাখাব মতো কালীকিংকব অবধূত মানুষটি আমাব নিজস্ব সম্পদ নন। যে-পর্যন্ত আমি জানি সেই পর্যন্ত তাঁকে চেনা বা জানাব সমান অধিকাব তাঁদেবও। পাঠকেব কাছে লেখক দায-বদ্ধ। সেটা স্বীকাব কবেই অবধূতেব জীবনেব আব একটি বিস্তৃত অধ্যায (শেষ অধ্যায কিনা জানি না) পাঠকেব সামনে তুলে ধবছি।

সেইসঙ্গে দিব্যাঙ্গনা স্থিব-যৌবনা আধ্যাত্ম তেজেব ঘবেব মেযে কল্যাণীকেও। কাবণ, একজনকে ছেডে আব একজন যে কত অসম্পূর্ণ সেটা ততদিনে আমি ঢেব বেশি অনুভব কবতে পেবেছি।

২

সম্ভব হলে অথবা অবধূতেব বাডি কোন্নগবে না হযে কলকাতায হলে এক বুধবাব বাদ দিযে বোজই আমি হযতো দুই এক ঘণ্টাব জন্য তাঁব ডেবায গিযে বসে থাকতাম। বুধবাব নয কাবণ সেদিন তিনি কোনো কেস নেন না। ওই একটা দিন সকালে তাঁব ওষুধেব গাছগাছডা শিকড-বাকড লতাপাতাব স্তূপেব মধ্যে বসে কাটে। আব দুপুব থেকে বিকেল পর্যন্ত কাটে ওষুধ তৈবিব তদাবকিতে। ভৈববী মা মহামাযাব সেই যোগানদাব লোকটি, যাব নাম হারু, এ-ব্যাপাবে সে-ই এখন অবধূতেব ডানহাত। মা-ই বলে দিযেছিলেন একে ছাডিস না, তোব ওব দুজনেবই উপকাব হবে। ছাডেন নি। এই হারুবও এখন বযেস হযেছে, অবধূতেব থেকে কিছু ছোট। কিন্তু দেহেব বাঁধুনি দিব্বি শক্ত-পোক্ত এখনো। কোন্নগবে এসে বসবাসেব শুরু থেকেই সে আছে। কাছাকাছিব মধ্যে তাব জন্যেও টালিব ঘব তুলে দেওযা হযেছে। কলকাতায আসাব ফলে গাছগাছডা শেকড-বাকড লতাপাতা ফল-ফলাদি সংগ্রহেব জন্য আব তাকে বনে-বাদাডে ঘুবতে হয না। এখানে এ-সব কাঁচা মালেব ব্যবসাব অনেক ঘাঁটি আছে। হারুব অধীনে আবাব ঝাঁডাই বাছাইযেব ঠিকে লোক আছে দুজন। এ ব্যাপাবে তাবও অভিজ্ঞ চোখ কম সজাগ নয। এছাডা ওষুধ তৈবিব জন্য মাঝ-বয়সী কবিবাজ আছেন একজন। কিন্তু এখানে তাঁব বিদ্যে ফলাবাব কোনো সুযোগ নেই। নির্দেশেব নিক্তি মেপে তাঁকে কাজ কবতে হয। বুধবাবটা অবধূতেব এ-সবেব তদাবকিতেই কাটে। বাডিব পিছনেব আঙিনাব শেষ মাথায বডসড আউট-হাউসটা তাঁব ল্যাববেটাবি। অবধূত প্রথম যেদিন আমাকে সেই ল্যাববেটাবি দেখাতে নিযে যান, কল্যাণী দেবী আলতো সুবে আমাকে সতর্ক কবেছিলেন, ওই ল্যাববেটাবি থেকে হামেশা চেলা

বিছেটিছেও বেবোয, একটু সাবধানে দেখবেন।

বক্রেশ্ববে ভৈববী মাযেব সব ওষুধেব দাম ছিল শুনেছি চাব আনা। এখানে সব ওষুধেব দাম এক টাকা। এ-সম্বন্ধে অবধূত আব কল্যাণী দেবীব সামনেই পেটো কার্তিকেব বিবস মন্তব্য শুনেছি, বাবাব কি বিবেচনা বলুন তো, যে দিন পডেছে, সব-কিছুব দাম বাডছে, ঠায এক জাযগায় দাঁডিযে আছে কেবল বাবাব ওষুধেব দাম—লোকজনেব মাইনে ধবলে বেশিব ভাগ ওষুধেই এক টাকাব বেশি খবচ পডে —যাবা গবিব তাবা না-হয এক টাকাই দিল, কিন্তু নানা জাযগা থেকে গাডি ঘোডা হাঁকিয়ে কত বডলোকও তো আসে, তাদেব কাছ থেকেও এক টাকা নেবাব কি মানে হয?

ওঁবা দুজনেই হাসছিলেন। হুল ফুটিযে অবধূত বলেছেন, ওষুধেব দাম যা-ই হোক তুই যে লোকেব ট্যাঁক বুঝে আবো ফী আদায কবিস?

পেটো কার্তিক লজ্জা পাওযাব কাবণ কল্যাণী দেবী ব্যক্ত কবেছেন। পুবনো যাবা তাবা ওষুধেব দামও জানে, যে-যাব সাধ্য মতো প্রণামী কত দেবে তা-ও জানে। কিন্তু নতুন বোগীও তো হবদম আসে। কার্তিককেই তাবা চুপি চুপি জিজ্ঞেস কবে, ওষুধেব দাম কত। কার্তিক তখন অম্লান বদনে ওষুধেব এক টাকা দাম জানিযে বাবাব প্রণামীব কথাটা বলে। বলে, ওষুধেব কোনো দাম নেই, বিনে পযসাব ওষুধই বলতে পাবেন। তাবপব গবিব মনে হলে বলে, এক-টাকা দু'টাকা যা পাবেন ভক্তিভবে বাবাব পাযে প্রণামী বেখে মনে মনে প্রার্থনা কবে যান। মাঝাবি অবস্থাব লোক মনে হলে কার্তিক এক-টাকা দু'টাকাকে পাঁচ-টাকা দশ-টাকায তুলে একই কথা বলে। আব বড অবস্থাব লোক মনে হলে প্রণামী অর্থাৎ টাকাব অঙ্ক মোটে মুখেই আনে না। বলে, ওষুধেব আবাব দাম কি, ওই ওষুধেব বাক্সে একটা টাকা ফেলে বেখে চলে যান—

গাডি হাঁকিযে যাবা আসে এক টাকা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই তাবা অবাক হয। অনেকে সেই কাঠেব বাক্সে এক টাকাব জাযগায দশ-বিশ টাকা ফেলতে যায। কার্তিক তক্ষুনি হা-হা কবে উঠে বাধা দেয, ওষুধেব ওই এক টাকাই দাম, তাব বেশি এক টাকাও নয, আব দিযে তৃপ্তি যদি পেতে চান যত খুশি বাবাব পাযে প্রণামী ফেলে যান—যা দেবেন সবই আবাব বাবাব মাবফৎ দবিদ্রনাবাযণেব কাছেই পৌঁছে যাবে।

দু'দশ টাকাব জাযগায তখন দু'শ পাঁচশও প্রণামী পডতে দেখা যায।

জব্দ হযেও পেটো কার্তিক কটকট কবে প্রতিবাদ জানাতে ছাডে না। আমাকেই সালিশ মানে, টাকা যা-ই আদায় কবে দিই তাব কতটুকু আমাদেব ভোগে আসে জিজ্ঞেস করুন তো? বাবাব সিগাবেট আব ড্রিংক তো ভক্ত গৌবী সেনেবা জোগায়, মাতাজীব তো নিজেবই লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব, দেওযা ছাডা নেওয়া নেই—ও-দিকে খোঁজ নিযে দেখুন বাবাব নামে কোনো ব্যাঙ্কে পাঁচ টাকাব অ্যাকাউন্টও নেই—তাহলে এত যে টাকা আসে সে-সব যায কোথায? ফি মাসে খবচেব টাকা তুলতে মাযেব চেক ভাঙানোব জন্য আমাকে ব্যাঙ্কে যেতে হয় বুঝলেন—বাবাব টাকাব কোনো হিসেব নেই।

পাঠকেব স্মবণ থাকতে পাবে 'সেই অজানাব খোঁজে' প্রথম পর্বেব কাহিনীতে বিযেব আগে কল্যাণীব বিত্ত সম্পর্কে মোটামুটি কিছু হিসেব দাখিল কবা হয়েছিল। তাব বাবাব কলকাতা আব বামপুবহাটেব বিশাল বাড়ি আব জমি-জমা বিক্রি কবে কল্যাণীব নামে ছ'লক্ষ টাকাব ফিক্সড ডিপোজিট ব্যাঙ্কে মজুত ছিল। সুদে আসলে সেই টাকা বেড়ে চলেছিল। আব বক্কো-মুনিব থানেব কংকালমালী ভৈববেব নির্দেশে তাঁব পুলিশ অফিসাব শিষ্য মোহিনী ভটচায সেই টাকা থেকে কিছু তুলে কোন্নগবেব এই বাড়ি কবে এখানে এঁদেব স্থিতি কবে দিযে গেছলেন। বাকি টাকা কল্যাণীব নামেই মজুত ছিল। সেই টাকাব অঙ্ক এখন কতোয দাঁড়িযেছে আমাব ধাবণা নেই। পেটো কার্তিককে মাতাজী তাঁব বিত্তেব হিসেব দিতে গেছেন বলে মনে হয না, কিন্তু ব্যাঙ্কেব কাজ-কর্ম তাব মাবফতই হয যখন, তাব মোটামুটি ধাবণা থাকা স্বাবাবিক। তা নাহলে সে বলে কি কবে মাতাজীব লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব। কিন্তু বাড়িব খবচ এখনো এই টাকা থেকেই আসে শুনে আমি একটু অবাকই বটে। বলেছিলাম, এবাবে আমি কার্তিকেব দিকে, এত টাকা দিযে কি কবেন হিসেব দিন—

অম্লান বদনে অবধূত জবাব দিযেছেন, প্রণামীব টাকা সবই তো কার্তিকেব পকেটে জমা পড়ে, ও তাব মধ্যে কতটা ফাঁক কবে আমি জানব কি কবে?

--শুনলেন মা—বাবাব কথা শুনলেন? আমি পাঁচটা টাকা সবালেও ওনাব যেন জানতে বুঝতে বাকি থাকে। অভিমানাহত চাউনি আবাব আমাব দিকে।—চিনিব বলদ চিনি খায না চিনিব বস্তাই কেবল টানে?

অবধূতেব নিবাসক্ত টিপ্পনী, বেশি না হোক একটু একটু চিনি খাস সেটা স্বীকাব কব।

কার্তিকেব অসহায মুখ, যেন আমাব সামনে চোব প্রতিপন্ন কবা হচ্ছে তাকে। —মা, আপনি এখনো কিছু বলছেন না? ববাদ্দ হাত-খবচেব এক পযসাও বেশি নিই আমি?

কল্যাণী হাসছিলেন। উসকে দিযেছেন।— তুই এত বোকা কেন, টাকাগুলো কোথা দিযে পাখা মেলে উড়ে যায সে-হিসেব এঁকে দিযে দিলেই তো পাবিস।

আমাবও এ-টুকুই জানাব কৌতূহল। এক হবিদ্বাবে যাতাযাতেব পথেই তো পাযে হাজাব কযেক টাকা প্রণামী পড়তে দেখেছিলাম। আব এই দেড় দু'বছব ধবেও কম দেখছি না। এ-দিকে দামী সিগাবেট আব মদেব খবচ অন্যেব ঘাড়ে, আব সংসাবেব খবচও শুনছি কল্যাণীব জমা টাকা থেকে। তাহলে টাকাগুলো যায কোথায।

স্ত্রীব কথা শুনেই অবধূত ব্যস্ত হযে বাধা দিযেছেন, থাক, আব হিসেব দিতে হবে না, তোমাব খাতিবে মেনেই নিলাম কার্তিক ববাদ্দ থেকে খুব বেশি টাকা হাপিস কবে না—

আমাব দিকে ঘুবে বসে কার্তিক পোড়া গাগেব মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীব কবে বলেছে, মাযেব পবোযানা পেযে গেছি যখন বাবাব টাকাব হিসেব শুনুন তাহলে। ...যদি কখনো শোনেন কাবো যক্ষ্মা-টক্ষ্মা হযেছে, হাসপাতালে সীট পাচ্ছে না, উপযুক্ত পথ্য পাচ্ছে না—এখানে কোন্নগবে বাবাব ঠিকানা দিযে দেবেন, ব্যবস্থা হযে যাবে।

যদি শোনেন কোনো বিধবার ছেলে স্কুলে পড়তে পারছে না বা পরীক্ষার ফী দিতে পারছে না, তাকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। বিশ তিরিশ চল্লিশ টাকা করে মাসে মাসে হাজার বারোশ' টাকা মনি-অর্ডার যায় কিনা এখানকার পোস্ট-অফিস থেকে সে-খবরও নিতে পারেন। যদি শোনেন টাকার জন্য কোনো গরিব ঘরের মেয়ের বিয়ে আটকে যাচ্ছে, চোখ বুজে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, ধার করে হলেও তার টাকা এসে যাবে—

অবধূত ধমকে উঠেছেন, তুই থামবি এখন। হাসি মুখে আমার দিকে ফিরেছেন, ভালো পাবলিসিটি অফিসাব জুটেছে আমার—

কার্তিক গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে, আরো কত রকমের লোককে এখানে পাঠাতে পারেন তার একটা ফুল লিস্ট আপনাকে সময় মতো দিযে দেব।

গটগট করে ঘর ছেড়ে প্রস্থান। আমি অন্য দুজনের কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। অবধূতের কাঁচুমাঁচু মুখ। আর কল্যাণীর প্রসন্নসুন্দর মুখখানা দেখে সেই প্রথম আমাব মনে হয়েছিল স্বামী নিয়ে তাঁর সব থেকে বড় গর্ব এই কারণেই।

হালকা সুরে অবধূত নিজেকেই নস্যাৎ কবতে চেয়েছেন।—এক-দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর মানুষ বড সরল, বুঝলেন। চোখের ওপর ভাঁওতাবাজী দেখেও ওপর-ওপর যা দেখে তাই ধরে নিয়ে বসে থাকে। বামকৃষ্ণ ঠাকুর ফতোযা দিলেন, কামিনী আর কাঞ্চন সব থেকে বড় বন্ধন, মন থেকে ত্যাগ কবো। সেই ত্যাগেব মহড়া কত সময়ে কত জনে দেখছে, কিন্তু মন থেকে হলো কিনা সেটা কত জনে জানছে? আঙুল দিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, ওই কামিনীব বন্ধন ত্যাগ করতে গিয়ে কতবার নাজেহাল হয়ে ফিরে এলাম সে-তো আপনিও জানেন, কিন্তু লোকে ভাবে, আ-হা, কি মুক্ত মনের অধিকারী—এমন দিব্যাঙ্গনা রূপসী স্ত্রীকে বেখে বিবাগী হয়ে কতবার ঘর ছাড়ল ঠিক নেই। ফিরে আসাটা কামনা বাসনার উর্ধ্বে কিনা তা ওই উনিই সব থেকে ভালো জানেন, কিন্তু লোকেব ভুল ভাঙাতে তাঁবও আপত্তি—

কল্যাণীর সমস্ত মুখ রাঙা। বলে উঠেছেন, নিজের সম্পর্কে তোমাব এই ব্যাখ্যা কে শুনতে চেয়েছে?

—কেউ না, কেউ না—ভাঁওতাবাজীর জিতের মজাটাই এঁকে বলছি। আমার দিকে ফিরেছেন।—তারপর শুনুন, আর এক সর্বনেশে বন্ধন হলো গিযে কাঞ্চন। এখানেও ভাঁওতাবাজীর জিত এমন যে আমার স্ত্রীর কাছেও তা বড় আনন্দের ব্যাপার। কিনা, কাঞ্চনের মোহ নেই, টাকা যা পাই বিলিয়ে দিই। কিন্তু কোন জোরেব ওপর তা করি সেটা কারো চোখে পড়ে না। একটা ছেলেপুলে নেই যে চিন্তা থাকবে, ওর (স্ত্রীকে দেখিয়ে) যা আছে পায়ের ওপর পা তুলে খেয়ে পরেও তার বেশিরভাগ পড়ে থাকবে—দেহ ছাড়লে পর টাকা ট্রান্সফার করা যায় এমন কোনো ব্যাঙ্কও অন্য জগতে নেই—এমন কি এখানকার নেশা আর ভালো খাওয়া-দাওয়ার রসদও ভক্তরা জুটিয়ে দিচ্ছে, তাহলে আমি টাকা দিয়ে করব কি? লোকের টাকা লোককে বিলোচ্ছি, দাতাকর্ণ নাম হচ্ছে আমার—কাঞ্চন মোহমুক্ত মানুষ হয়ে বসে আছি—পৃথিবীটা কেমন মজার জায়গা ভাবুন একবার, সর্বত্র ভাঁওতাবাজীর জয়।

...এই ভাঁওতাবাজীর বিরাট এক জয়ের নজির আমি নিজের চোখে দেখেছি। প্রথমে বুঝি নি কেবল অবাক হয়েছি। পরে এই মানুষের কথা থেকেই বোঝা গেছে আক্ষরিক অর্থে সমস্ত ব্যাপারটা ভাঁওতাবাজীই বটে। কিন্তু সেটা জানা আর বোঝার পরেও এই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়েছে।

ঘটনাটা বলি।

মন টানলে হঠাৎ এক-এক সময় যেমন এসে উপস্থিত হই তেমনি এসে গেছলাম। এই হঠাৎ আসার মধ্যেও দিন বাছাইয়ের ব্যাপার আছে। বুধবার বাদ কাবণ গল্প করার সুবিধে থাকলেও সেদিন তাঁর মন পড়ে থাকে ওষুধ তৈরির দিকে। শনি মঙ্গলবারে আসি না কারণ বাতে সেই দুদিন তিনি শ্মশানে বসেন বলে বহু-বকমেব আর্জি নিযে লোকে বিকেল পর্যন্ত তাঁর দ্বারস্থ হয়। রবিবারও বাদ কারণ লোকের ভিড়ে বেলা তিনটে-চাবটের আগে সেদিন তাঁর খাওয়া-দাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। বিকেলের দিকে ওই একটা দিনই কোথাও না কোথাও তাঁর আবার সফবসূচীও থাকে। অ্যাপযেন্টমেন্ট অনুযাযী কেউ না কেউ এসে ধরে নিয়ে যায়। তাই আমাব হঠাৎ-আসাটাও সোম বৃহস্পতি আর শুক্র এই তিনদিনের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা। সেই দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। দেড় মাসেব মধ্যে দেখা হয় নি তাই মন টানছিল। বিকেলের আগেই চলে এসেছিলাম।

এলে খুশির অভ্যর্থনা পেযে থাকি। অবধূত অনেক আগন্তুককেই হতাশ করেন, অর্থাৎ দু'চার কথায় বিদায় করে দ্যান, অন্যদিন আসতে বলেন। সেদিন লক্ষ্য করলাম কথাব ফাঁকে ফাঁকে অবধূত নিজেব হাতঘড়ি দেখছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কারো আসাব কথা আছে নাকি?

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, বড়সড এক বোয়ালমাছ জালে পডার কথা, দু'পাঁচ মিনিটেব মধ্যে এসে যাবে।

—তাহলে সরে পড়ি?

সবে পড়বেন কেন, জাঁকিযে বসে মজা দেখুন, মৃত্যুব ছায়া সামনে দুলছে এমন কোটিপতি মানুষ ক'জন দেখেছেন?

আমি উৎসুক।—আপনি সেই ছায়া সরাবেন?

হাসিমুখে জবাব দিলেন, আমি কিছুই কবব না, কিন্তু সরলে ক্রেডিটটা আমার হবে, আব তাব ফলে ভদ্রলোকেব কয়েক লাখ টাকার ভার কমবে।

কযেক লাখ শুনে আমি থ। বাবার এ-ভাবে বলাটা পেটো কার্তিকের একটুও পছন্দ হলো না। হড়বড় করে বলে উঠল, বিশ্বাস কববেন না সাব, বাঁচলে ভদ্রলোক বাবাব জন্যেই বাঁচবে, গত মঙ্গলবার বাবা সমস্ত রাত ধরে শ্মশানে বসে ওই ভদ্রলোকেব জন্য কাজ করেছেন—

অবধূত হালকা সুরে ধমকে উঠলেন, এখানে বসে কে তোকে সর্দারির বচন ঝাড়তে বলেছে, তোর 'স্যার' বাতে কি খে... যাবেন সে ব্যবস্থা কিছু করেছিস?

এর মধ্যে এক-প্রস্থ চা জল-খাবারের পর্ব শেষ হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, না না, আমি সন্ধ্যার আগেই পালাব, আপনি আর এ হুজুগ তুলবেন না—

কিন্তু বাবার ইচ্ছে বুঝেই চেলাটি অন্তর্ধান করেছে। অবধূত বললেন, মোটে

তো আসেন না আজকাল, ড্রাইভার সঙ্গে আছে একটু রাত হলেই বা, আপনাকে দেখেই মনে পড়েছে একটা ভালো জিনিস মজুত আছে, তাছাড়া একখানা ঢাউস বোয়াল মাছ জালে পড়বে এমন মওকার দিনে এসে গেছেন যখন আপনাকে এখন ছাড়ি! সেলিব্রেট করার চোটে রাতে বাড়িতে যদি ফিরতে না-ই পারেন. একটা ফোন করে দিলেই তো হলো।

অগত্যা ঢাউস বোয়াল সম্পর্কে আমার কৌতূহল। ভদ্রলোক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী। তেল ঘি মাখন চীজ ইত্যাদির মস্ত কারবার। তাব গলার পাশে বাঁ-দিকের কাঁধ জুড়ে ক্যান্সার। বায়পসিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তারপর থেকে চিকিৎসার উৎসব চলেছে। ড:ক্তারদের শেষ কথা, অপারেশন করে দেখা যেতে পাবে কতদূর ছড়িয়েছে, এ-ছাড়া আর কিছু করার নেই। আত্মীয় পরিজন শুধু নয়, রোগীও বুঝেছে বাঁচার আশা শতেকে একভাগও নেই। অপাবেশনের ফলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে, এ ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না, রোগী আর তাব আত্মীয় পরিজনদের এটাই বিশ্বাস। এখন দৈব নির্ভর। অবধূতেব নাম শুনে তাঁব এখানে এসে হত্যা দিয়ে পড়েছে। কিছু যদি করতে পারেন তারা চিরকাল তাঁর হুকুমের দাস হয়ে থাকবে।...ভদ্রলোক এসে তাঁর পায়ের ওপব আছড়ে পডেছিল। অবধূত বললেন, মৃত্যুব থেকেও মৃত্যু-ভয় কত বেশি ভয়ংকর যদি দেখতেন—

ইনি দু'বার করে বলেছেন ঢাউস বোয়াল জালে পড়বে—আমি ভুলি নি। আমাব ভিতরে একটা অবাঞ্ছিত সংশয়ের আঁচড় পড়েছে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও কাউকে তিনি কোনোরকম স্বার্থের জালে জড়াতে পারেন এ আর আমি এখন কল্পনাও করতে পারি না। পেটো কার্তিকেব মুখেও শুনেছি দুবারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের আশা নিয়ে কত লোকই বাবার কাছে আসে, হাজার ছেড়ে লাখ টাকা খবচ করতে রাজি এমন পয়সাঅলা লোককেও এখানে এসে বাবার পা জড়িয়ে ধবতে দেখেছে। কিন্তু বাবা বিষণ্ণমুখে দু'হাত জোড করে নিজের অক্ষমতা জানিযে তাদের বিদায় করেছে। ফল কিছু হোক না হোক শেষ চেষ্টা হিসেবে যাগ-যজ্ঞ করার জন্যও কত লোক দশ-বিশ হাজার টাকা নিয়ে সাধাসাধি করেছে। কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয় বুঝলে বাবা তাদের প্রার্থনার বাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, নিজেবা প্রার্থনা করুন আর চিকিৎসার অন্য রাস্তা আছে কিনা খুঁজুন—পথ থেকে থাকলে তিনিই হদিস দেবেন, আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

শুনে কত ভালো লেগেছিল আমিই জানি। কিন্তু এই লোকই কোটিপতি ক্যান্সার রোগী হাতে পেয়ে বোয়াল মাছ জালে পড়াব কথা বলছেন কেন ভেবে পেলাম না। সন্দেহ বড় বিচ্ছিরি জিনিস। কখন কোন ফাঁক দিয়ে হুল ফোটায়, আঁচড় কাটে বলা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই কোটিপতি ব্যবসায়ীর জন্য শ্মশানে গিয়ে বসেছিলেন?

মুচকি হেসে জবাব দিলেন, বসেছিলাম।

—কিন্তু আপনি নিজেই তো বলেন অলৌকিক কিছুতে আপনি বিশ্বাস করেন না?

—কবি না তো।

—তাহলে এ ভদ্রলোককে জালে ফেলছেন কি করে?

অবাক ভাব।—আমি ফেলছি আপনাকে কে বলল। তার নিজের ভাগ্যই তাকে জালে টানবে মনে হচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি না মানে কি? মানুষের অঘটনকে ঘটিয়ে দেবার, বা ঘটনাকে অঘটনের দিকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা বলে কি আমার বিদ্যা বুদ্ধির অগম্য কিছু কি ঘটছে না? হামেশাই ঘটছে। সেটাকে অলৌকিক বলব কেন —এ-সবের পিছনে আমার অজানা কোনো সায়েন্স বা কোনো শক্তি কাজ করছে না, এ আমি জোর করে বলব কি করে? আপনাকে তো বলেছি কেন ঘটে কে ঘটায় সেই খোঁজই আমি করে বেড়াচ্ছি।

অপ্রিয় কথাটা মুখে আপনিই এসে গেল।—তাহলে এই যে ভদ্রলোক আজ আপনার জালে পড়তে যাচ্ছেন সেটা আপনি ঘটাচ্ছেন না?

হাসতে লাগলেন। তারপর বেশ মিষ্টি করে বললেন, আমাকে আপনি যে একটি ঠগ ভাবছেন সেটা আপনার চোখে মুখে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।...কিন্তু আপনার দোষ নেই লোকের হিতের জন্য মওকা বুঝে একটু-আধটু অ্যাকটিং তো আমাকে করতেই হয়—

গাড়ির শব্দ কানে আসতে থেমে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। দুটো ঝকঝকে গাড়ি এসে বাংশের গেটের সামনে দাঁড়ালো। একটা এয়ার কনডিশনড বিলিতি গাড়ি অবধূত বললেন, এরপর আপনার খানিকক্ষণ কেবল নির্বাক দর্শকের ভূমিকা, হেসেটেসে ফেলে আমাকে ডোবাবেন না যেন—

মুহূর্তের মধ্যে মিষ্টিমুখে গাম্ভীর্যের মাধুর্য দেখলাম। এর, কতটা খাঁটি কতটা মেকি বোঝা দায়। কয়েক মুহূর্তের আগের মানুষ নন যেন আর। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। চৌকি ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোলেন। পরনে সিল্কের রক্তাম্বর ধুতি, গায়ে তেমনি রক্তাম্বর ফতুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সর্বাঙ্গে লালের জেল্লা। যে মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপে মগ্ন ছিল এ যেন আর সেই মানুষ নন।

এয়ার কনডিশন গাড়ি থেকে দুজন লোক ধরাধরি করে এক প্রৌঢ়কে নামালো। আমি জানলায় দাড়িয়ে লক্ষ্য করছি। বছর বাহান্ন-তিপান্ন হবে বয়েস। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। বাঁ-দিকের ঘাড় কাঁধ জুড়ে চামড়া-ওঠা দগদগে পোড়া ঘায়ের মতো। সেখানে দুটো ফোলা-ফোলা লাল মাংসখণ্ড। মনে হয়, ডিপ-রে'র দরুন জায়গাটার ওই চেহারা হয়েছে। মোটা সাটা মোটেই নয়, রোগের প্রকোপে বরং শীর্ণ দোহারা চেহারা। তার পিছনে যে মহিলাটি নামলেন, তার মুখখানা মিষ্টি, নাকে মস্ত একটা জ্বলজ্বলে হীরের নাকছাবি—কিন্তু মেদবহুল স্থূল বপু। সামনের এয়ার কনডিশন গাড়ি থেকে এরা দুজন নামলেন। অন্যেরা অর্থাৎ পিছনের গাড়ি থেকে নেমে রোগীকে ধরে নিয়ে আসছে।

আমারও মনে হলো রোগীর মুখে মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখছি।

অবধূত দু'হাত জুড়ে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন।

তিনি দু'তিন হাত পিছিয়ে আসতে কোটিপতি রোগীটি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে অবধূতের দু'পা জড়িয়ে ধরলেন। পায়ের ওপর নিজের কপাল ঘষতে লাগলেন। মহিলাটি ভদ্রলোকের স্ত্রী হবেন। তিনিও আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ঘরের হাওয়া স্তব্ধ কয়েক মুহূর্তে। এ-দিকের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পেটো কার্তিক থেকে থেকে গলা বাড়াচ্ছে।

অবধূত দু'চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু বাদে তাকালেন। সঙ্গের লোকদের বললেন, সাবাওগিজীকে ধরে তুলুন—

অল্প বয়স্ক যে দুটি ছেলে তাঁকে ধরাধরি করে তুলল, পরে শুনেছি তারা ভদ্রলোকের ছেলে। আর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তৃতীয় জন তাদের মামা। কোটিপতি রোগীর নাম রতনলাল সাবাওগি।

অবধূতের নির্দেশে ছেলেরা তাঁকে সামনের সোফায় বসিয়ে দিল। মহিলাকে বললেন, মা আপনি ওঁর পাশে ওই সোফাতেই বসুন।

আদেশ পালন করে কৃপা প্রার্থনার ভঙ্গীতে তিনি দু'হাত জোড় করে রইলেন। তৃতীয় ভদ্রলোক আর ছেলেরা অন্য সোফায় বসতে অবধূত আমার দিকে ফিরলেন। —দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

আমি চৌকিতে বসতে পরিচয় দিলেন, ইনি আমার বিশেষ আত্মজন, আর আপনাদেরও শুভার্থী জানবেন।

বলতে বলতে ঘরের কোণের টেবিলটার কাছে গিয়ে কিছু কাগজপত্র বার করে নিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। একটা ভাঁজ করা কাগজ ছেলেদের একজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওঁর বায়পসি রিপোর্টটা রাখুন—

রতনলাল সারাওগি ঈষৎ অসহিষ্ণু আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, কি দেখলেন বলে ফেলুন, কোনো আশা নেই তো?

খুব কোমল গলায় অবধূত বললেন, উতলা হবেন না, কোনো আশা না থাকলে আপনাদের এখানে আসার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম না, লোক পাঠিয়ে খবর দিতাম আসার দরকার নেই।

প্রত্যেকের মুখ আমি লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে রোগী আর তাঁর স্ত্রীর মুখ। এমন আকৃতি-ভরা আশার কারুকার্য এ-যাবত কেবল একজনের মুখে দেখেছি। আমার স্ত্রীর মুখে। একমাত্র ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হবে এমন আশা আর আশ্বাস তিনিও একজনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। পরের বিপরীত হতাশার মূর্তি এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

শ্যালক ভদ্রলোকটি সাগ্রহে বলে উঠলেন, মঙ্গলবারের শ্মশানের কাজের ওপর সব নির্ভর করছে বলেছিলেন, সে কাজ সফল হয়েছে তাহলে? আদেশ পেয়েছেন?

অবধূত জবাব দিলেন না। ফুলস্ক্যাপের তিন পাতা জোড়া নিজের কষা অঙ্কগুলো মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরের আবহাওয়া আশ্চর্য-রকম থমথমে। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে রোগীর দিকে তাকালেন। বললেন, আপনার জন্মের তারিখ সময় সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে...।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে জবাব দিলেন, আমার পিতাজীর কাজে ভুল হবার কথা নয়, এ-সব ব্যাপারে তিনি খুব পার্টিকুলার ছিলেন—

হ্যাঁ, আমার হিসেবের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে।

তার পবেই যে চিত্রটা দেখলাম, ভোলার নয়। অবধূতের দু'চোখ রতন সাবাওগির মুখেব ওপব অপলক। এক মিনিট যায় দু'মিনিট যায় তিন মিনিট যায় চোখের পাতা পড়ে না। ভদ্রলোকের সমস্ত ভিতরটা যেন আঁতি-পাতি করে দেখে নিচ্ছেন তিনি। সেই দেখার একাগ্রতায় অবধূতের সমস্ত কপাল মুখ ঘেমে উঠেছে। কিন্তু চোখে পলক পড়ছে না। বতনলাল সারাওগি এ-দৃষ্টি সহ্য করতে পারছেন না। বাব বাব চোখ নামিযে নিচ্ছেন, চিবুক নিজের বুকে ঠেকছে। অবধূতের বিস্ময়কর চাউনিব এই অন্তর্ভেদী দিকটা আগেও লক্ষ্য কবেছি, হঠাৎ-হঠাৎ যেন সব-কিছু দেখে নেবাব মতো তীক্ষ্ণ হযে ওঠে—কিন্তু এমন দীর্ঘ-মেয়াদি দৃষ্টি সঞ্চালনেব কশাঘাত আব দেখেছি বলে মনে হয না। আমার মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক না এই দৃষ্টির আঘাতে মূর্ছা যান অথবা ঘুমিযে পড়েন।

ফতুয়ার হাতা দিয়ে কপালের আব মুখেব জবজবে ঘাম মুছলেন। তাঁর থমথমে গলা শুনে ঘরের সকলে ছেড়ে আমিও সচকিত। দু'চোখ এখন ওই শ্যালক ভদ্রলোকেব মুখেব ওপব।—হ্যাঁ, আদেশ পেযেছি। উনি ভালো হযে যাবেন। রোগ নির্মূল হবে। সেজন্য কি কবতে হবে পরে বলছি। বোগীর দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু আবো যা জেনেছি সেটা আপনাব জানা আব শোনা দরকার—আপনাব স্ত্রী আব ছেলেদেব মুখ চেয়ে আপনাব সাধ্য মতো প্রতিকার করাও দরকার।

জবাবে বতনলাল সাবাওগি আকৃতিব আবেগে দু'হাত জোড করে তাঁর দিকে তাকালেন।

অবধূতেব গলাব স্বর অনুচ্চ কিন্তু জলদগম্ভীর।—আপনার ব্যবসাব তেল ঘি মাখন খেযে হার্টেব বোগে এ পর্যন্ত তিনশো সাতাশি জন লোক মারা গেছে, আর কত হাজাব লোক পেটেব বোগে ভুগেছে আব ভুগছে তার সবও আমি চেষ্টা করলে বাব কবতে পারি...এর জবাবদিহি আপনি কি করে করবেন?

ঘরেব মধ্যে একটা বাজ পড়লেও বোধহয় এত চমকের ব্যাপার হতো না। বোগী নিযে যাবা এসেছে তাবা নির্বাক বিমূঢ় বিবর্ণ। বেশ একটু সময় নিয়ে দু'হাত জোড কবেই বতনলাল সাবাওগি বললেন, আমাব কাববাব মুঙ্গেবে, সেখান থেকে ফিনিশড প্রোডাক্ট সব জায়গায় চালান যায়, সুস্থ থাকলে আমি নিজে গিযে দেখাশুনো করতাম, এই অসুখটার পব আমাব ছেলেরা মাঝে মাঝে যায়, আর সেখানে আমার তিন ভাই প্রোডাকশন দেখে...আর পাঁচজন ব্যবসাদাব যেভাবে কারবাব চালায় আমরাও ঠিক সেভাবেই চালাচ্ছি—

ঈষৎ কঠিন গলায় অবধূত প্রশ্ন করলেন, আপনাদের প্ল্যান্টে কোথাও কোনোরকম ভেজালের ব্যাপার থাকছে না—কোনোরকম কারচুপি থাকছে না?

অসুস্থ ভদ্রলোক ঘামতে লাগলেন। নাকের হীরের জ্যোতিতে তাঁর স্ত্রীর থলথলে মুখ রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। ভদ্রলোকের শ্যালকের মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর। মন্তব্যের সুরে

বললেন, আপনি যা বললেন সে-রকম হলে তো এদের এত দিনের ব্যবসা উঠে যাবার কথা—

অবধূতের দু'চোখ তার দিকে ঘুরল। চাউনি নয়, দৃষ্টির চাবুক তাব মুখেব ওপর যেন কেটে কেটে বসতে লাগল। কথাগুলো একটা একটা করে গলা দিযে বেরিয়ে আসতে লাগল।—আমাব প্রশ্নের জবাব আপনার ভগ্নিপতি দিতে পারেন নি...আপনি দিতে পারেন? এঁদের হয়ে হলপ করে বলতে পারেন আপনাদের জ্ঞানত কোনোরকম ভেজাল বা কারচুপি থাকছে না?

বিপাকে পড়েও ভদ্রলোক দমে গেলেন না। জবাব দিলেন, ইনি তো বললেন আর পাঁ' জনেব মতো করেই ব্যবসা চালিযে আসছেন, বিপজ্জনক কিছু কবছেন না।

অবধূত আরো খানিক চেয়ে থেকে বতনলাল সাবাওগিব দিকে ফিবলেন। খুব কোমল অথচ স্থিব গলায় বললেন, আপনাদের সম্পর্কে আমাব প্রাথমিক বিচাবেই ভুল হয়ে গেছে দেখছি, জ্ঞানত আপনারা যখন কোনো গলদেব মধ্যেই নেই, আমি কোন প্রতিকাবেব বাস্তা ধবে এগবো...ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি, আপনাব জন্য কিছু কবা আমার ক্ষমতায কুলবে না। ছেলেদেব বললেন, এঁকে ধবে নিযে গিযে গাড়িতে তুলুন—

প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ পাংশু। চোখে আঁচল চাপা দিযে মহিলা ফুঁপিযে কেঁদে উঠলেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁব ভাই এবাবে বলে উঠলেন, কিন্তু আপনি যে একটু আগে বললেন, শ্মশানে কাজে বসে আপনি আদেশ পেযেছেন...উনি ভালো হয়ে যাবেন!

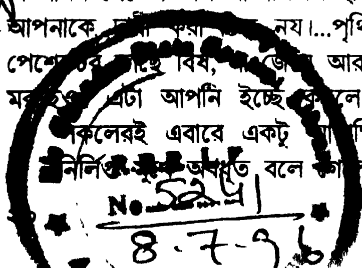
অনুচ্চ কঠিন গলায অবধূত জবাব দিলেন, আদেশ পেযেছি, কিন্তু সেটা কোনোরকম মিথ্যের সঙ্গে বেসাতি কবার আদেশ নয। ওঁব ভালো হবাব একটাই শর্ত, সেটা সত্যেব কাছে বিনীত সমর্পণ, কিন্তু গোড়াতেই আপনাবা সেই সত্যেব দিক থেকে মুখ ফিরিযে আছেন!

বোগ জর্জবিত বতনলাল সারাওগি এবাবে দু'হাতে জোড় কবে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।—আমাকে ক্ষমা করুন বাবা, দযা করুন, এ-ব্যবসায ষোল-আনা সৎ রাস্তায় কেউ চলে না, আমিও চলি নি...কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাব তেল ঘি মাখন খেয়ে তিনশ সাতাশিজন মাবা গেছে এ আমি জানতাম না, এখনো ভাবতে পারছি না...আপনি প্রতিকারেব উপায বলুন, আমি সব কবতে প্রস্তুত। আমাকে দয়া করুন—

অবধূতের কঠিন মুখ আবার নরম কোমল। বললেন, বসুন। আপনাব তেল ঘি মাখন খেয়ে তিনশ সাতাশিজন হার্ট অ্যাটাকে মাবা গেছে সে-জন্য অবশ্য কেবল আপনাকে [illegible] নয়।...পৃথিবীর সেরা নির্ভেজাল তেল ঘি মাখনও হার্ট পেশে[illegible] বিষ, [illegible] আর জেনেও হাজার হাজার লোক এই বিষ খেয়ে ম[illegible] এটা আপনি ইচ্ছে [illegible]লেও ঠেকাতে পারবেন না।

[illegible]কলেরই এবারে একটু [illegible]স্বিত মুখ।

[illegible]নির্লিপ্ত [illegible] অবধূত বলে [illegible]লেন, ভালো হয়ে মাস চারেকের মধ্যে স্ত্রী আর



ছেলেদের নিয়ে মুঙ্গেরে আপনার কারবারের জায়গায় যেতে পারবেন। সেখানে গিয়ে আপনার প্রথম কাজ হবে, আপনার মোট মুনাফা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেলেও কোথাও কোনোরকম ভেজাল বা কারচুপির ব্যাপার থাকবে না তার পাক্কা ব্যবস্থা করা। এতে আপনি কক্ষনো আর এতটুকু আপোস করবেন না—এটা আমার প্রথম শর্ত।

রতনলাল সারাওগির রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে আশার আলো।—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কারবারের জায়গায় যাব—আপনি এ-কথা এমন জোর দিয়ে বলতে পারলেন! যদি তাই হয়, আমি যাব—নিশ্চই যাব! চার ভাগের এক ভাগ লাভ কেন, ব্যবসা তুলে দেব তবু আর কোনোদিন ভেজাল বা কারচুপির রাস্তায় যাব না—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি!

অবধূত হাসলেন, ব্যবসা তোলার দরকার হবে না, এখন দ্বিতীয় শর্ত শুনুন, আমি ইনকাম ট্যাক্সের লোক নই জেনে খুব খোলা মনে জবাব দেবেন।...এক নম্বর দু নম্বর মিলিয়ে আমি যদি ধরে নিই আপনার কোটি টাকার ওপর আছে তাহলে কি খুব ভুল হবে? আপনার বাড়ি-ঘর জমি-জমা আর ব্যবসার অ্যাসেট বাদ দিয়ে বলছি—

প্রশ্নটা এমনি চাঁছাছোলা গোছের স্থূল যে আমি সুদ্ধু বিড়ম্বনা বোধ করছি। রতনলাল সারাওগি ব্যাধির প্রকোপে জীবন সম্পর্কে হতাশ, কিন্তু মানুষ আদৌ নির্বোধ নন। চুপচাপ চেয়ে রইলেন একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় ফিরে প্রশ্ন করলেন, আপনার অনুমান ঠিক হলে আমাকে কি করতে হবে বলুন?

অবধূতের মুখে সংকোচের আঁচড়ও পড়ে নি। নির্লিপ্ত গম্ভীর।—আজ থেকে আড়াই তিন মাসের মধ্যে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা একমত হয়ে যদি ঘোষণা করেন আপনার দেহে ওই ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র নেই, তাহলে আপনার নগদ যা আছে তার দশ পারসেন্ট এখানকার দুটো ক্যান্সার হাসপাতালে দান করতে হবে, কোনোরকম প্রচারের দান নয়, নিঃশব্দে নিঃস্বার্থ দান—এমন কি আমাকেও জানাবার দরকার নেই, সময় হলে দুই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে পনি টাকাটা তুলে দেবেন—এই টাকায় তাদের অভাব দূর হবে না, কিন্তু কিছু কাজ হবে।

অবধূতের চোখ-কান-কাটা প্রশ্ন এই মীমাংসায় এসে থামবে রতনলাল সারাওগি বা তাঁর পরিজনেরা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্যালকের ভ্রূকুটি তো স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল। অবধূত তাঁর বক্তব্য শেষ করার পর সকলে নির্বাক।

রোগক্লিষ্ট ভদ্রলোকের নীরব বিস্ময়টুকু বোধহয় আমি আঁচ করতে পারছি। ...অবধূত বলেছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বয়ং তিনি মুঙ্গেরে যাবেন তাঁর কারবার দেখতে আর সমস্ত রকমের দুর্নীতি দূর করতে।...অবধূত আরও বলেছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা একমত হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ঘোষণা করার পর তাঁর নগদ টাকার এক দশমাংশ হাসপাতালে দান করতে হবে। এই কাল-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার আগে কোনো কড়ার বা শর্তের কথা এখনও পর্যন্ত অন্তত বলেন নি। তবু রতনলাল সারাওগির মুখে আশার আলোই বেশি স্পষ্ট।—আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে

যাব আপনি এতটাই সিওর হয়ে এই নির্দেশ দিচ্ছেন?

সিওর না হলে আপনাকে এ সব কথা বলে আমার লাভ কি—সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার আগে তো শর্ত মানার কোনো দায় নেই আপনার।

...হ্যাঁ এই কারণেই শর্তের তাৎপর্য দশগুণ হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এর আগে আপনার জন্য কি করতে হবে?

অবধূতের অবাক মুখ।—আমার জন্যে আপনার আবার কি করতে হবে, যা করার সে তো আমি আপনার জন্য করব! তাহলে আরো একটু স্পষ্ট কবে শুনুন, আপনাকে ভালো করে তোলাটাই আমার ষোল আনা স্বার্থ, কাবণ, আপনাব সামনে আমি অন্য জীবন দেখতে পাচ্ছি, আপনি নীরোগ হলে এবপর বহুজনের মঙ্গল —এটাই আমার সব থেকে বড় স্বার্থ, এছাডা আমার আর কোনো স্বার্থ নেই। শ্যালক ভদ্রলোকটির দিকে আঙুল তুলে বললেন, আমি আপনাব আর্থিক সঙ্গতির কথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ওই সম্বন্ধীর মুখে সন্দেহের আঁচড় পড়তে দেখেছি, তাই খুব বিনীতভাবে একটা কথা আপনাদের জানিয়ে আরো নিশ্চিন্ত করে বাখি, আপনাদের অনেক টাকা থাকতে পাবে কিন্তু আমাকে দিতে পারেন এমন ঐশ্বর্যেব কানা-কড়িও আপনাদের নেই।

সকলে এমন কি ছেলে দুটিও হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনাব আকৃতি প্রকাশ করল। রতনলাল ক্লান্ত টানা সুরে বললেন, আমরা বড় অধম বাবা, এক কোটি নয়, আমার প্রায় দেড় কোটি টাকা আছে, আপনাকে কথা দিচ্ছি সুস্থ হযে উঠলে পনরো লক্ষ টাকার চেক আমি দুই হাসপাতালে পাঠিযে দেব—কোনো পাবলিসিটি চাইব না—আমার ছেলেদের নামে শপথ করে আপনাকে আমি এই কথা দিচ্ছি। ...কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করুন, আপনার ক্রিয়াকাজের জন্য যেটুকু দবকাব সেটুকু আমাকে করতে দিন।

বিমনার মতো অবধূত একবার আমার মুখের ওপর চোখ বুলিযে নিলেন। অনুক্ত কৌতুকটুকু বুঝতে বাকি থাকল না। অর্থাৎ, কেমন জমিয়ে তুলেছি দেখে নিন—

বতনলাল সারাওগির দিকে ফিরলেন, আমাব ক্রিযাকাজেব মধ্যে আপনাদেব কেবল দুটি কাজ করার আছে—

ভদ্রলোক আর মহিলা হাত জোড় করেই আছেন।

—প্রথম কাজ, এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের সকলকে মনে প্রাণে বিশ্বাস কবতে হবে আপনি সেরেই গেছেন, দেহের কষ্ট যেটুকু আছে তা-ও শিগগীবই চলে যাবে। আপনি ভালো হয়ে গেলে সকলে কি করবেন না করবেন সেই আলাপ আলোচনাও নিজেদের মধ্যে করতে পারেন। মনে কোনো যদি রাখবেন না, স্থির জেনে রাখবেন আপনি ভাল্লো হয়ে যাবেনই।

বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু এমন জোরের কথার পর না করাটাও যেন কঠিন।

কিন্তু অবধূতের পরের নির্দেশ এঁদের ছেড়ে আমাকেও বিচলিত করেছে। দুই ছেলে আর তাদের মামার দিকে চেয়ে বললেন, আজ বেস্পতিবার, যে দুজন বড়

ডাক্তার অপারেশনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন কালকের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যে বড নার্সিং-হোমে তাঁরা অ্যাটাচড এই রবিবারের মধ্যেই এঁকে সেখানে ভর্তি কবে দিন। উঠে টেবিল থেকে পঞ্জিকাটা নিয়ে আবার বসলেন। পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দিন-ক্ষণ দেখলেন। পঞ্জিকা বন্ধ কবে আবার ওই তিনজনেব দিকেই তাকালেন।—সার্জেনদের বলে দেবেন সামনের সতেরো তারিখ থেকে বাইশ তারিখের মধ্যে সকালে অপারেশন হবে।

এত আশ্বাসেব পব হঠাৎ যেন মৃত্যুর পরোযানা সামনে তুলে ধবা হলো। শ্রীমতী সারাওগি আঁতকেই উঠলেন।—অপারেশন। অপারেশন করতে হবে!

—শুনুন, এবপব থেকে আমি ধবে নেব আপনাদের সব ভাবনা-চিন্তা আমার কাছে জমা দিযেছেন—সার্জন কেবল অপাবেশনই কববে কিন্তু দায়িত্ব আমার—অপারেশনেব দিনে আমি নিজে নার্সিংহোমে উপস্থিত থাকব—আর উনি সুস্থ হলে আমি নিজে গিয়ে ওকে সঙ্গে কবে নিয়ে আসব, এ নিয়ে আপনারা আর কোনো কথা বলে ওঁর বা নিজেদেব মন দুর্বল কববেন না। যা বললাম সেই ব্যবস্থা করুন —করে আমাকে খবব দেবেন। আপনারা একবাবও ভাববেন না সার্জন কিছু করছেন —এটাই আপাতত ক্রিয়া-কাজ—যাঁব নির্দেশে এটা হচ্ছে সে আমিও নই, সার্জনও নন। আপনাবা খুব নিশ্চিন্ত মনে এঁকে নিযে বাডি চলে যান, আর যা বললাম তাই করুন—সব থেকে বড সার্জনেব সঙ্গে যোগাযোগ কববেন, আব তাদের পরামর্শ মতো সব থেকে ভালো নার্সিংহোমে দেবেন।

বিধাতাব নির্দেশ কাকে বলে জানি না। কিন্তু আমার কাছে এই নির্দেশ তেমনি অমোঘই মনে হলো।

ওঁবা চলে গেছেন। সন্ধ্যা হয়-হয। আমি সামনে বসে অবধূত যেন ভুলেই গেছেন। নিজেব মধ্যে তলিয়ে গেছেন। ভাবছেন কিছু। কপাল মুখ ঘামে জবজব করছে। পায়ে পাযে কল্যাণী ঘবে ঢুকলেন। আলো জ্বালতে অবধূত আত্মস্থ একটু। কল্যাণী দুই এক পলক দেখলেন তাঁকে। বেরিযে গিয়ে একটা তোয়ালে হাতে ফিরলেন। নিঃসংকোচে তাঁব কপাল ঘাড আর কনুই থেকে হাত দুটো নিজের হাতে বেশ কবে মুছে দিলেন। আমাব মনে হলো দু'চোখ ভবে দেখাব মতোই এটুকু। অবধূত হেসে বললেন, কপাল ভালো থাকলে আমাব স্ত্রীব সেবাও জোটে দেখলেন তো?

—তোমাব ভিতবেব অবস্থা জানলে উনি বুঝতেন কেন জোটে।—শোনো, এই শেষ, নিজেকে তুমি আব এ'বকম টানা হেঁচডাব মধ্যে ফেলবে না।

অবধূতের মুখের হাসি স্বাভাবিক হযে আসছে। বললেন, আমি নিজেকে টানা হেঁচড়ার মধ্যে ফেললাম না তুমি উৎসাহ দিযে আমাকে উসকে দিলে?

মহিলা আমার দিকে ফিরলেন।—কেমন জ্বালায দেখুন, তিনদিন আমাব পিছনে লেগে থেকে আমার ভিতর থেকে কথা টেনে বার করলেন, আব এখন কিনা আমি উৎসাহ দিয়ে উসকে দিলাম।

অবধূত সানন্দে নিজেব ফর্মে ফিরলেন।—যাক দেবী, টানা ক'টা দিনের ধকলের আজ নিষ্পত্তি, এরপর আমার মাথায় লাঠি পড়বে কি গলায় ফুলের মালা তোমার

ঈশ্বর জানেন, এখন পেটোকে আমাদের বোতল গেলাস নিয়ে আসতে বলো, আর অতিথির মুখ চলার মতো তুমি কি দিতে পারো দেখো—আপাতত সব ভাবনা চিন্তা রসাতলে পাঠিয়ে মনে মনে কেবল তোমাকেই জাপটে ধরে থাকি।

আমার সামনে এ-সব কথাতেও কল্যাণীকে আজকাল আর তেমন লজ্জা পেতে দেখি না। আমার দিকে চেয়ে টিপ্পনীর সুরে বললেন, বাংলাভাষায় আপনার আর কি দখল, ওঁর হাতে ছেড়ে দিলে ভাব-ভাষা দুই-ই উল্টোদিকে দৌড়বে।

মাথা চুলকে অবধূত ত্রুটি সংশোধনের সুরে বললেন, আ-হা, উনি কি তা বলে ধরে নিলেন ওঁর সামনেই তোমাকে জাপটে ধরে থাকব—এই জাপটে ধরার অর্থ তোমার স্বস্তি-বচন আঁকড়ে ধরে থাকা।

কল্যাণী হেসে বললেন, বুড়ীকে নিয়ে রঙ্গ-রসের কথা কেউ লেখেও না পড়েও না, তবু এঁকে দেখে লোক হাসাবার জন্যেও আপনি কিছু লিখতে চেষ্টা করুন।

অবধূত প্রায় গর্জন করে উঠলেন, খবরদার। কতদিন বলেছি তোমার নিজেকে বুড়ী বলাটা আমার সব থেকে বেশি অসহ্য।

কল্যাণী হাসতে হাসতে চলে গেলেন। হাসছি আমিও। কিন্তু এই প্রায়-বৃদ্ধ বয়সেও একটা সত্যি কথা কবুল করতে আপত্তি নেই। বয়েস যা-ই হোক এমন সুঠাম সৌষ্ঠবের সঙ্গে বার্ধক্যের যোগের কল্পনা আমার মনেও আসে না।

পেটো কার্তিক বোধহয় সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিন মিনিটের মধ্যে ট্রেতে সরঞ্জাম সাজিয়ে হাজির। সে-সব সামনে রেখে মেঝেতে তার বাবার পায়ের সামনে বসে গেল। অবধূত গম্ভীর মুখে বললেন, পা টিপতে হবে না, খাবার কি আছে দ্যাখ—

—মা পাঁপড় ভাজছেন, তারপর মাছ ভাজা আর মেটের চচ্চড়ি আসছে। একখানা পা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল।

—পা টিপতে হবে না বললাম যে!

পেটো কার্তিক ভ্রূক্ষেপ না করে তার কাজ শুরু করে দিল। তারপর ঘরের দেওয়ালকে শুনিয়ে বলল, আরামের জন্য টিপতে হবে না বুঝেছি, আমি নিজে আনন্দ পাবার জন্য টিপছি।

অবধূত হাসতে লাগলেন।—হারামজাদার ট্যাকটিকসটা লক্ষ্য করেছেন কি ব্যাপার বোঝার জন্য ক'দিন ধরে ওর মায়ের পিছনে ঘুর ঘুর করছে—কিন্তু সেখানে তো দু-কথার পর তিন কথাতেই ধমক, এখন আপনার জেরা শুরু হবে বুঝেই এসে পা টিপতে বসে গেল—

পেটো কার্তিক হেসে ফেলে আমাকেই সালিশ মানল, বলল, শুনুন সার এই কেসটা আসার পর থেকে বাবাকে চিন্তিত দেখছি, কেবল ভাবছেন আর ভাবছেন, পাতার পর পাতা কি-সব অঙ্ক আর হিসেব করে চলেছেন, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, মঙ্গল বুধ পর পর দু'দিন শ্মশানে গিয়ে বসলেন—যা সচরাচর করেন না, যে মা কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারেন না তাঁকেও বাবার জন্য চিন্তিত দেখছি—আজ সকালে মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর বাবাকে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হলো—এখন আপনিই বলুন স্যার, ভাবনা হয় না?—এত বছরের মধ্যে আর একবার

মাত্র বাবাকে খুব অস্থির হতে দেখেছিলাম, সে অবশ্য এর থেকেও ঢের বেশি—

এবারে অবধূত সত্যি সত্যি একটা দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, এই! ফের মুখ খুলবি তো তোকে আমি সত্যিই ঘর থেকে বার করে দেব। মুখ দেখে মনে হলো পেটো কার্তিক বেফাস কিছু বলে ফেলেছিল। জিভ কেটে সামলে নিয়ে নিজের দু'কান একবার মলে আবার পা টেপায় মন দিল।

আর একবার ঢের বেশি অস্থিরতার কি কারণ ঘটেছিল সে-কৌতূহল আপাতত বড় নয়। একটু আগে যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি দেখলাম পেটো কার্তিকের এ-কথার পর সে-সম্পর্কেই দ্বিগুণ কৌতূহল এখন। ক্যান্সার অপারেশনের ফতোয়া দেবেন একজন দেড়কোটিওয়ালা মানুষকে সেটাই এই লোকের অস্থিরতার বড় কারণ আমার একবারও মনে হলো না। কারণ শর্ত যা হলো তাতে ব্যক্তিগত লাভের কানা-কড়ি স্বার্থও নেই।

অবধূত ততক্ষণে দুজনের গেলাসই রেডি করেছেন। কল্যাণী দেবীও গরম পাঁপড় ভাজার থালা হাতে উপস্থিত। বললাম, ব্যাপারটা ভালো করে না জানা আর না বোঝা পর্যন্ত এ-সব পরম উপাদেয় জিনিসও স্বচ্ছন্দে তল হবে না কার্তিক বলছিল এই একটা কেস নিয়ে আপনিসুদ্ধ উতলা হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রী[illegible] সুন্দর একটা ভ্রূকুটি করে কার্তিকের দিকে তাকালেন, তোর বুঝি সবেতে সর্দারির কথা না বললেই না? তারপর আমার কথার জবাবে বললেন, আমি উতলা হয়েছিলাম ওর এত ভাবনা-চিন্তা দেখে যার কাজ তিনি করছেন করাচ্ছেন আর উনি ভেবে সারা একটা লোকের জীবন-মরণের দায়িত্ব নেবেন কি নেবেন না—

গেলাসে বড়-সড় একটা চুমুক দিয়ে অবধূত মিটি মিটি হাসছিলেন। মন্তব্য করলেন, কথাটা ঠিক বললে না, আমি ভাবছিলাম মন যা বলছে সেই সাহসের জমির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়াব, না কাপুরুষের মতো লোকটাকে সোজা মৃত্যুর রাস্তায় এগোতে দেব—

—ওই একই হলো, দুইয়ের কোনোটারই তুমি মালিক নও।

—কিন্তু মালিকের কাজখানা তো আজ সকালে তুমিই [illegible]লে, ছক্কার ওভার বাউণ্ডারিখানা হাঁকিয়ে আমার হার জিতের ফয়সালা করে দি[illegible]।

—আমি ছাই করলাম। হাসি মুখে ঘর ছেড়ে প্রস্থা[illegible]।

বার দুই গেলাসে চুমুক দিয়ে পাঁপড়ভাজা চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে আপনি পর-পর দু'দিন শ্মশানে গেছলেন?

—গেছলাম তো।

—নির্দেশ পাবার জন্যে?

—মাথা নাড়লেন। তাই।

—নির্দেশ পেলেন?

—মনে তো হচ্ছে পেলাম, না হলে এতবড় ঝুঁকি নিই কি করে।

এবারে আমি বেশ চেপে ধরবার সুরেই বললাম, এরপর আমি আপনার কোন কথা বিশ্বাস করব—নিজের মুখে অনেকবার বলেছেন আপনি কোনোরকম অলৌকিককে বিশ্বাস করেন না, আপনি যা করেন আর যা পারেন সেটা কেবল শিক্ষা অভ্যাস

আর অধ্যবসায়ের ব্যাপারে—

অবাক মুখ।—ঠিকই তো বলি এর মধ্যে আপনি অলৌকিকের কি দেখলেন?

ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন। পা টেপা ভুলে পেটো কার্তিকও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। গেলাস তুলে এক চুমুকে চার ভাগের তিন ভাগ শেষ করে তোয়ালেতে মুখ মুছলেন। তখনো হাসছেন। বললেন, শুনুন মশাই, আমি কখনো কোনো অলৌকিক নির্দেশ পাবার আশায় শ্মশানে যাই না, যাই নিজের মনঃসংযোগ করতে। নিজের মনকে সব-দিক থেকে গুটিয়ে এনে লক্ষ্যের দিকে স্থির করার মতো এমন জায়গা পৃথিবীতে আর নেই। আমার সবই ক্যালকুলেশনের ব্যাপার, অঙ্কের মতো মিলে না গেলে বুঝতে হবে গলদ আছে। শ্মশানে গিয়ে মনস্থির করে বসলে গলদ আছে কি নেই সেটা ধরা পড়ে। আর নির্দেশও তখনও নিজের ভিতর থেকেই আসে।

কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি। দু'দুবার শ্মশানে গেছলেন শুনেই ভাবছিলাম অলৌকিক কোনো ঘটনার ওপর নির্ভর করেই তিনি এমন এক রোগীকে অপারেশনে যাবার ফতোয়া দিয়ে বসেছেন। কিন্তু এমন জোর তিনি কোথা থেকে কি করে পেলেন সেটা এখনো বোধের অতীত। কল্যাণী দেবী একটা বড় রেকাবিতে মাছভাজা নিয়ে ঘরে এলেন। অবধূত তখন নিজের গেলাসে বোতলের জিনিস ঢালছেন। ঠাট্টার সুরে কল্যাণী বললেন ক'দিন বাদে আজ যে ফুর্তি দেখছি ওই বোতল খালি হতে বেশি সময় লাগবে না—আপনার নিজের ভাগ আগেই সরিয়ে রাখুন।

অবধূত হাসি মুখে স্ত্রীকে জানান দিলেন, ইনি ভেবেছিলেন আমি কোনো অলৌকিক নির্দেশ পাবার আশায় পর পর দু'রাত শ্মশানে কাটিয়ে এসেছি।

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা যেন আমাকেই সমর্থন করলেন।—ভুল কি ভেবেছেন, বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে না আসা পর্যন্ত সব-কিছুই অলৌকিক, তুমি যদি কলম নিয়ে বসে এঁর মতো একটা গল্প লিখে ফেলতে পারো আমি তো হাঁ হয়ে বসে সেটাই অলৌকিক ভাবব।

মাছ ভাজার রেকাবি রেখে হাসি মুখে প্রস্থান করলেন। মনে মনে ভাবলাম, এই দিব্যাঙ্গনা প্রিয়দর্শিনীটি চারু-ভাষিণীও কম নন। এখনো আমার সমস্ত মন জুড়ে আছেন রতনলাল সারাওগি। এমন ফতোয়া দেবার মতো জোর অবধূত পেলেন কি করে সেটা আমার কাছে অলৌকিকের মতোই রহস্যজনক। জিজ্ঞেস করলাম, এখন বলুন তো কোন্ জোরের ওপর নির্ভর করে লোকটাকে অপারেশনে পাঠাবার মতো রিস্ক আপনি নিতে পারলেন?

অবধূত হাসি মুখে পলকা জবাব দিলেন, এর মধ্যে রিস্ক আবার কি দেখলেন, লোকটা বেঁচে গেলে দুটো হাসপাতাল পনেরো লক্ষ টাকা পাবে, আরো বহু লোকের উপকার হবে—আর না বাঁচলে তার ছেলেরা বড়জোর এখানে এসে ভাঁওতাবাজ বলে আমাকে গলা ছেড়ে গালাগাল করে যাবে—তাতে আমার মতো লোকের গায়ে কি বা ফোস্কা পড়বে?

একটুও বিশ্বাস হলো না। পেটো কার্তিকও দেখলাম অবিশ্বাসে মুখ মচকে জোরে জোরে পা-টেপা শুরু করেছে।

বললাম, এইটুকুই কেবল সত্য হলে মনঃসংযোগ করার জন্য দু'দিন আপনি শ্মশানে গিয়ে বসতেন না, বা ক'টা দিন এত অস্থিরতার মধ্যে কাটাতেন না, বলতে বাধা থাকলে অবশ্য জোর করব না—

হৃষ্ট মুখে গেলাসে ছোট ছোট দু'তিনটে চুমুক দিযে খানিকটা ভাজা মাছ ভেঙে মুখে পুবলেন। তারপর গেলাসে আর একটা বড় চুমুক দিযে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাতেই পেটো কার্তিক চট করে উঠে দাঁড়িয়ে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে আবাব পা নিযে বসে পড়ল।

এক মুখ ধোঁযা ছেড়ে অবধূত বললেন, আপনাকে বরাবব যা বলে এসেছি এ-ও তেমনি এক ঘটনাব সাজ। কেউ ঘটালো, সাজালো। তারপর কারো না কারো ডাক পড়াব কথা, ঘুবে-ফিরে এই সাজেব আসবে শেষে আমার ডাক পড়ল। তবে বতনলাল সাবাওগিকে যদি জীবনে ফেবানো যায সে বাহাদুরি আমার নয়, আমার শাশুড়ী মাযের...বক্রেশ্বব শ্মশানেব আমাব সেই ভৈববী মায়ের। কারণ লোকটাকে দেখা মাত্র প্রথমে আমি তাঁকে খবচেব খাতাতেই ফেলে দিয়েছিলাম।

শুরুটাই আমাব কাছে অলৌকিকেব মতো ঠেকল, কাবণ এর মধ্যে বহুকালের নিরুদ্দিষ্ট সেই ভৈববী মা এসে গেলেন কি কবে! কিন্তু বাধা না দিয়ে রুদ্ধশ্বাসেই শুনছি

...বতনলাল সাবাওগিব এই ব্যাধি তিন বছরের। কলকাতা বম্বে আর মাদ্রাজের কোনো বড বিশেষজ্ঞকে দেখাতে বাকি বাখেন নি। গোড়া থেকেই রে-ট্রিটমেন্ট শুরু হযেছিল, তাই অমন বিশাল দগদগে ঘা। বিদেশে যাবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু যাবতীয় বিপোর্ট দেখে সেখানকাব বিশেষজ্ঞদেব জবাব এসেছে করার কিছু নেই। সকলেই তিলে তিলে মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তার মধ্যেই একযোগে অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিবাজী হেকিমি দৈব সমস্ত চিকিৎসাই চলছিল।...এই দৈবেব বাস্তা ধবেই কি কবে তাঁবা অবধূতেব সন্ধান পান। এয়ারকণ্ডিশন গাড়ি নিয়ে বতনলালেব দুই ছেলে এসে হাজির। টাকাব জোবে তাদের কোনো চাহিদাই অপূর্ণ থাকে না। তাদেব আর্জি বাবাকে একবাব দেখতে যেতে হবে। কি ব্যাপার অবধূত শুনে বললেন, আমি তো ঈশ্বর নই বাবারা, গিয়ে কি কবব।...তবে তোমাদের বাবাকে এখানে একবাব নিয়ে এলে চোখেব দেখা দেখতে পাবি।

ছেলেবা জানালো, বাবাকে কলকাতা থেকে এতদূবে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, দয়া কবে তাঁকেই একবাব যেতে হবে, এ-জন্য তিনি যত টাকা চান পাবেন।

অবধূত হেসে বললেন, আমার একটা বদ স্বভাব কেউ আমাকে টাকা দেখালে আমি তাকে বেরুবাব দবজা দেখিয়ে দিই, এখন তোমরা এসো বাবারা—

তাবা চলে গেল। কিন্তু ওই উক্তিই যে একটা আকর্ষণের কারণ হবে তা কি ভাবতে পেরেছিলেন! পরদিনই সেই এয়ারকণ্ডিশন গাড়ি আর তার পিছনে আর একটা গাড়ি বাড়ির দোবে হাজির। রতনলাল সারাওগি, তাঁর স্ত্রী, শ্যালক আর দুই ছেলে। ধরাধরি কবে বোগীকে এই ঘরেই এনে বসানো হলো। তাঁকে দেখা মাত্র অবধূত একটা মৃতদেহ দেখলেন। এই দেখাটা যে প্রাথমিক অনুভূতির দেখা এটা পরে বুঝেছেন। রোগীর সম্পর্কে যা শুনেছেন আর প্রথম দর্শনে যা দেখলেন তাই

থেকেই একটা ধারণা! কিন্তু তার পরেই রোগীর দিকে ভালো কবে চেয়ে কিছু যেন একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী মায়ের একটা শিক্ষা হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল।...বলেছিলেন, কপালে কানে আর নাকে এই এই চিহ্ন আর ছায়া না দেখলে মৃত দেহও সম্পূর্ণ মৃত নয় ধবে নিতে হবে, অর্থাৎ দেহে তখনো আত্মা উপস্থিত বুঝতে হবে। আব দুবারোগ্য ব্যাধিব কাবণে মৃত্যু অবধাবিত হলে ছ'মাস এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছর আগে থেকেও কপালে কানে আর নাকে সেই লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে। ভৈববী মায়েব কৃপায় সেই লক্ষণ অবধূত খুব ভালোই চেনেন। কিন্তু আশ্চর্য, বতনলাল সাবাওগিব কপালে কানে বা ন্যকে সেই লক্ষণ আদৌ দেখলেন না। তবু ভাবলেন, ভযংকব বকমেব ক্যানসাব যখন, সেই লক্ষণ আব চিহ্ন এখনো না পডলেও শিগগীবই পডবে। আবাব মনে হলো, যে ব্যাধি, তিন বছবের মধ্যে তো শেষই হযে যাবাব কথা।

মনসংযোগ কবে দেখতে লাগলেন। যে ছাযা বা চিহ্ন পড়বে তাব আভাসও অনেক সময় আগে থাকতে দেখতে পান। অবধূতেব এই দৃষ্টি সঞ্চালনেব কথায় এখন আব আমাব অবিশ্বাস হয না। হবিদ্বাবেব পথে ট্রেনে আমাব স্ত্রীব মুখে নির্ভুল ভাবে শোকের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন।...এত বড ব্যাধি সত্ত্বেও বতনলাল সারাওগির সমূহ মৃত্যুব কোনো সম্ভাবনা তাঁব তো চোখে পডছে না।

অবধূতের হাত-টাত দেখাব খুব একটা দবকাব হয না। সংশযে পডলে তখন দেখেন। কিন্তু এব থেকে বড সংশয কি আব হতে পাবে। তাঁব কেবলই মনে হচ্ছিল বড় বকমেব অস্ত্রোপচাবেব লক্ষণই কেবল দেখছেন। মৃত্যুব যোগ দেখছেন না। হাতের বেখাতেও তাই দেখলেন। সমূহ অস্ত্রোপচাব জনিত বক্তক্ষয আব ভোগ দেখছেন কিন্তু আয়ুবেখা দীর্ঘ সবল। কৌতূহল বাডতেই থাকল। বোগীব জন্ম সন তারিখ সময় আছে কিনা জিজ্ঞেস কবতে তাঁব ছেলেদেব একজন ঠিকুজি বাব করে দিল। এ-বকম জাযগায আসছে বলে সঙ্গে নিয়েই এসেছে।

নিবিষ্ট মনে দেখলেন।...বাহান্ন বছব মাত্র বযেস কিন্তু আটাত্তবেব আগে মৃত্যু-যোগ নেই। সাধারণ হিসেবে তাঁব অন্তত চোখে পডছে না।

এরপর অবধূতের নিজেব কৌতূহলই তুঙ্গে। ঠিকুজিব নকল লিখে বাখলেন। কি ভেবে বায়োপসিব রিপোর্টও চেযে বেখে দিলেন। তাবপব জানালেন, এখানে হবে না, তাকে তাঁর আসনে গিযে বসতে হবে—আদেশ পেলে কিছু কবাব আছে কিনা জানাবেন।

...বতনলাল সারাওগি আব তাঁব স্ত্রী কি কারণে অভিভূত নিজেবাও জানেন না। আমার ধাবণা অবধূতেব দৃষ্টি সঞ্চালন দেখেই। সাধাবণেব কাছে সেটা গাযে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতোই ব্যাপাব। এই চাউনি, দৃষ্টি কত যে বদলে যায় নিজেব চোখেই দেখেছি। তখন সত্যই মনে হয় দেহের অভ্যন্তবে যা-কিছু আছে তার সবটুকু দেখে নেবার ক্ষমতাও এই লোকেব আছে। সেই ভাবে দেখে নেবার সময ভরা শীতকালেও তাঁর কপাল আর মুখ ঘামতে থাকে। পরে জিজ্ঞেস করতে নিজেই বলেছেন, ওটা মনঃসংযোগের ধকল ছাড়া আর কিছু না, আর তার মধ্যে কিছুটা শো-বিজনেসেও আছে, লোকে অভিভূত হয, তার ভিতরের দোষগুণ আরো বেশী

ধবা পড়ে।

রতনলাল সাবাওগি বললেন, আদেশেব জন্য আসনে গিয়ে বসতে হবে বলছেন...সে কোথায়?

এখানকারই শ্মশানে। আজ রোববার, মঙ্গলবার রাতে গিয়ে বসব...বুধবার হবে না, আপনি বেস্পতিবার বিকেলের দিকে ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।

চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে রতনলাল আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন, আমার ভাগ্য জানতে আমি নিজেই আসব। একটু থেমে আবার বললেন, এই এক রোগের কারণে এত দিনে কত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে ঠিক নেই, কিন্তু আপনার কাছে আসার পর আমার ভিতর থেকে কেন একটু আশা হচ্ছে জানি না..।

অবধূতের ভিতরটা তক্ষুণি সজাগ আবার। দু'চোখ একাগ্র। কপাল দেখছেন, মুখ দেখছেন। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি নিজের মন থেকে বলছেন না আরো অনেককে এ-কথা বলে শেষে হতাশ হয়েছেন?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বিস্মিত একটু। আবার মাথা নাড়লেন। বললেন, বিপদ কাটিয়ে দেবার জন্য অনেক সাধু মহারাজকে অনুরোধ করেছি, কিন্তু কাউকে দেখে এ-রকম আশা আর কখনো হয় নি।

অবধূতের বিবেচনায় এ-ও এক ধরনের সুলক্ষণ। কিন্তু তা আর মুখে ব্যক্ত করলেন না। বিদায় নেবার জন্য উঠে দাড়ানোর পরেও সকলের চোখে মুখে একটু ইতস্তত ভাব। ছেলে দুটির আরো বেশি। এতদিনে এদেরই একজনকে অবধূত বলেছিলেন, কেউ টাকা দেখাতে এলে তাকে তার বেরুনোর দরজা দেখিয়ে দেবার বদ অভ্যাস।

আমার দিকে চেয়ে অবধূত হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, প্রণামী নেবার ব্যাপারে আমার অরুচি নেই নিজের চোখেই তো দেখছেন, কিন্তু এদের বেলায় আমার মাথায় হঠাৎ যেন বক্রেশ্বরের শ্মশানের কংকালমালী মেজাজ ভর করল। নিজেই দো-টানার মধ্যে পড়ে গেছি বলেই বোধহয়। ওই ছেলে দুটোর দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, বেস্পতিবারে আবার আসতে চাও না ফের টাকা দেখিয়ে বেরুনোর দরজা দেখে নিতে চাও...ভয়ে সকলে একসঙ্গে হাত জোড় করে ফেলল।

...বলে ফেলার পরেই নাকি অবধূত আবার নিজের স্বভাবে ফিরলেন। রতনলাল সাবাওগির দিকে চেয়ে হাসি মুখেই বললেন, কেউ না বললেও আমি জানি আপনি কোটিপতি মানুষ, সেই সুদিন এলে আপনাকে দিয়ে আমার খরচ করানোর ক্ষমতাটাও দেখে নেবেন—তখন আমার খাই দেখে পালাবার পথ না খোজেন—এখন আসুন, এই ক'টা দিন যতটা পারেন মনটাকে নিরাসক্ত রাখতে চেষ্টা করুন।

...রতনলাল সাবাওগির কি ব্যবসা আগের দিন ছেলেদের মুখেই শুনেছিলেন। সেদিন তাঁর কপাল আর হাত দেখে জেনেছেন ভদ্রলোকের টাকার কোনো লেখাজোখা নেই।

এ-রকম কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অবধূত নিজেকে কমই ফেলেছেন। এ-যাবত তাঁকে অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তার বেশির ভাগই

নিজের প্রত্যক্ষ চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, আবার ব্যর্থতার নজিরও কম নেই। যে-চেষ্টার নাম পুরুষকার, বিচার বিবেচনা অনুযায়ী নিজেব সেই চেষ্টার ওপরেই তাঁর প্রধান নির্ভর। কিন্তু এ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চিকিৎসা তাঁর হাতে নয়, অপারেশন করবে আর একজন, তাঁর নিজস্ব চেষ্টার কোনো ব্যাপারই নেই। সকলেই জানে মৃত্যু অবধারিত, অথচ ওই জীর্ণ দেহে তিনিই কেবল পরমায়ুর জোর দেখছেন। তাঁব হিসেবে ভুল হলে কি হবে? হয়তো অপারেশন টেবিলেই মরবে বা তার দু'দশ দিনের মধ্যে মরবে। আর অপারেশন না হলে বড়জোব ছ'মাস আট মাস ॅচবে, তারপর মরবে। ভুল হলে পবিণামেব তফাৎ শুধু এইটুকু।...কিন্তু এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব নেবার অধিকার কি তাঁব আছে? ছ'মাস আট মাস ছেড়ে ছ'ঘণ্টা আট ঘণ্টার জন্যও কারো মৃত্যু এগিযে আনাব উপলক্ষ কি তিনি হতে পারেন?

অবধূত ভেবে চলেছেন। ভাবনার জট বাড়ছে ছাড়া কমছে না। মন যা বলে হুট-হাট তা করে ফেলার অভ্যাস। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভিতবে দ্বিধা কেন, দ্বন্দ্ব কেন? কাগজ কলম নিয়ে রোগীব জন্মক্ষণ ধরে হিসেব করে চলেছেন, আগে বা পবে পাঁচ-সাত মিনিটেব ব্যতিক্রম কি হয সেই হিসেবও কবেছেন। তাতেও বে.গীব মৃত্যুব ছায়া পর্যন্ত দেখছেন না। মানুষটাকে বাব বার চোখেব সামনে এনে দাঁড কবিযেছেন। মৃত্যু যন্ত্রণার ভোগ দেখছেন লক্ষণ দেখছেন, কিন্তু মৃত্যু দেখছেন না, ভোগযন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ মুখই চোখে ভাসছে।

মঙ্গলবার রাতে শ্মশানে গিযে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য নিজেকে ছাড়িযে যেতে পারলেন না। লক্ষ্যের দিকে মন সে-ভাবে নিবিষ্ট হলো না। কেবলই মনে হতে লাগল এতকাল ধবে মানুষকে বিধান আর নির্দেশ দিযে দিযে একটা অহং-ভাবেব বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হযে পড়েছেন তিনি। রতনলাল সারাওগির সম্পর্কে যে বিধান আর নির্দেশ মনে এসেছে সেটা ওই অহং-এর নির্দেশ না ভৈববী মায়েব শিক্ষাব নির্দেশ?

রাত ভোর হলো। তিনি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পাবলেন না। ঘবে ফিরতে মুখের দিকে চেয়েই কল্যাণী কি বুঝলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞেস কবলেন, মন স্থির করতে পারলে না?

অবধূত অসহায়ের মতো মাথা নাড়লেন। তারপব জিজ্ঞেস করলেন, কেন পাবছি না বলো তো, হিসেবে যা স্পষ্ট দেখছি বিশ্বাস দিযে তা আঁকড়ে ধবতে পারছি না কেন?

কল্যাণী ছোট করে মন্তব্য করলেন, এ তো ভালো লক্ষণ...।

অবধূত অবাক।—ভালো লক্ষণ কেন?

—যে-বিচার তোমার মনে এসেছে সেটা তুমি তোমার বিচার ভাবছ, তাব সঙ্গে তুমিটা যুক্ত হয়ে পড়ছে, তোমার দৌড় কতটুকু সেটা কেউ তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

হতভম্বের মতো খানিক চেয়ে থেকে অবধূত চুপচাপ ঘরে এসে বসলেন। ...কল্যাণীর বিশ্বাসের ধারা আলাদা, পথ আলাদা। সেই ধারায় বা পথে অবধূত কখনো

চলেন নি। জাগতিক কর্মের পথই তাঁর বিশ্বাসের উৎস। কল্যাণীব চোখে এই কর্মের মধ্যে কিছু গলদ চোখে পড়েছে। নিজের অগোচবে তিনি কর্তা হয়ে বসেছিলেন। তাই সংশয়, তাই বিভ্রম।

দিনটা একটা গ্লানির মধ্যে কাটল। রাতে নিঃশব্দে আবার শ্মশানে চলে গেলেন। এইদিনে সমর্পণটাই বড় হয়ে উঠল। মনঃসংযোগে কোনো বাধা হলো না। ভৈরবী মা সত্যিই কি তাঁব সামনে এসে দাঁড়িযেছেন? না, তা কখনো হয় না, হতে পারে না। সমর্পণেব ভিতব দিয়েই তিনি তাঁব উপস্থিতি অনুভব কবতে চেষ্টা কবেছেন, অনুভব কবতে পেবেছেন। তাঁব শিক্ষাব পাতাগুলো পর পর উল্টে গেছেন।...সদ্য বর্তমানের এই ঘটনাব সাজে তাঁব কোনো কর্তৃত্ব নেই সেটা অনুভব করেছেন। কেউ ঘটিযেছে, কেউ সাজিযেছে।...বতনলাল সারাওগির আয়ুর জোব তিনি দেখেন নি তাঁকে দেখানো হযেছে। এই দেখাব বিশ্লেষণটুকুও আব বুদ্ধিব অগোচব নয়। বাইবে থেকে বোগেব প্রকোপ দেখে ভিতবেব শিকড যতটা ছড়িয়েছে বলে ধবে নেওয়া হযেছে, ততো দূব পর্যন্ত ছডায নি। যে-কাবণেই হোক এক জায়গা পর্যন্ত এসে থেমে আছে। অপাবেশন কবলে নির্মূল হযে যাবে, আব ছডাবে না। ঘটনার সাজে শুধু এই নির্দেশটুকু ঘোষণা কবাই তাঁব ভূমিকা, এব বেশি কিছুই না।

অনেকটা হালকা মনেই ঘবে ফিরেছেন। একটু কেবল সংশয এই নির্দেশ রতনলাল বা তাঁব আত্মীয় পবিজনেবা মানবেন কি না।...তবে, ভদ্রলোকের আয়ুর জোর যে-বকম স্পষ্ট, মনে হয মানবেন। ঘবে ফিবে আবো নিশ্চিন্ত। তাঁকে দেখেই কল্যাণী হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, ভাবনা চিন্তাব শেষ তো না আরো বাকি?

অবধূত জবাব দিলেন, মনে হয শেষ, কেন?

—মনে হয আবাব কি, আমি জানি শেষ।

—কি কবে জানলে?

খুব খুশি মুখে কল্যাণী বললেন, বাতে তোমার এই ব্যাপাবটা চিন্তা করতে কবতেই ঘুমিযে পডেছিলাম. ভোর বাতে স্বপ্ন দেখলাম আমার শিবঠাকুব হাসি মুখে সামনে দাঁডিযে আছেন, আব তোমাব নাম ধবে সেইসব মধুব সম্ভাষণ করে গালাগালি কবছেন—

—মানে শালা-শালা কবছেন?

কল্যাণী হেসে মাথা নেড়ে সায দিলেন।

—কি বলেছিলেন? অবধূত উদগ্রীব।

এব পবে কল্যাণী শালা শব্দটা মুখে উচ্চাবণ না করলেও তার শিবঠাকুব অর্থাৎ কংকালমালী ভৈরব কি বলেছেন বুঝতে অসুবিধে হয নি। বলেছেন, শালা দিনে-দিনে কর্তা হয়ে বসছিল, ওকে আবো ভালো-রকম ভোগাবো ভেবেছিলাম, তুই আর তোর মা শালাকে খুব বাঁচিয়ে দিলি।

না, এ-ও আলৌকিক কিছু ভাবেন না অবধূত। স্বপ্ন স্বপ্নই। মানসিক উদ্বেগ অথবা চিন্তাব প্রতিফলন। তবু ভিতরটা খুশি হযে উঠেছিল।

এর পর মাস চার সাড়ে চারের মধ্যে অবধূতের বা কোন্নগরের কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি। তার একটা কারণ পুজোর লেখার চাপ। এটা থাকে আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপরেই আমার নিজস্ব রুটিনের পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজের চাকরির পুজোর ছুটি বলতে তেমন কিছুই নয়। পুজোর লেখা শেষ হলেই সমস্ত বছরের পাওনা ছুটির সঙ্গে এই ক'টা দিনের ছুটি মিলিয়ে এক দেড় মাসের জন্য সপরিবারে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। মাঝে বছর দুই ছেলের কারণে বেরুনোয় ছেদ পড়েছিল। গেল বছর থেকে আবার বেরুচ্ছি। এবার রাজস্থানের দিকে প্রোগ্রাম।

রওনা হবার দিন দুই আগে ফোনে অবধূতের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, আপনার স্ত্রীকে দিন একটু, আমার স্ত্রী কথা বলবেন।

কেবল স্ত্রী নয়, মেয়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হলো। এক দিকের বাক্যালাপ থেকেই বোঝা গেল কি নিয়ে কথা। আমরা থাকছি না বলে অবধূত গৃহিণীর আগাম কালীপুজোর নেমন্তন্ন। আমার স্ত্রী জানান দিলেন, আপনি নেমন্তন্ন না করলেও শুধু এই জন্যেই কালীপুজোর আগে আমাদের ফেরার প্রোগ্রাম—আপনার গেল বারের কালীপুজো এখনো আমাদের চোখে লেগে আছে। আমার মেয়ে আর এক ধাপ ওপরে গেল। বলল, এমন কালীপুজো জীবনে দেখি নি, এবারেও যেতে না পারলে আপনাকে দায়ী করব, আপনি দেখবেন যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না হয়—

ও-দিক থেকে তিনি নাকি হেসে বলেছেন, বিঘ্ন হবে না।

বিঘ্ন হয় নি। সমস্ত রাজস্থান ঘুরে দিল্লি হয়ে কালীপুজোর চারদিন আগে আমরা কলকাতায় ফিরেছি। বেড়িয়ে ফেরার পর প্রতিবারের মতো এবারেও মনে হয়েছে, কলকাতাকে ভালো লাগার জন্যেই মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া দরকার। গেলে কলকাতার টান বোঝা যায়। রাতে ফোনে অবধূতকে সেই কথা বলতে তিনি হেসে সারা। বলে উঠলেন, মশাই সর্বব্যাপারেই আপনার এ-কথা খাটে, প্রিয়কে প্রেয়সী করে তুলতে হলে তাকেও মাঝে মাঝে ছাড়া দরকার—বিরহ কথাটার অর্থ কি ছাড়া না ছেড়ে পাওয়া? নিজের স্ত্রীকেই তো এ-পর্যন্ত কতবার ছাড়লাম, ফেরার পর মনে হতো চার গুণ মিষ্টি।

ফোনে রমণীর ভর্ৎসনা প্রায় স্পষ্ট কানে এলো, তোমার কি কোনোদিন আর বয়েস হবে না!

—ওই দেখুন মশাই সত্যি কথা বলে গাল খাচ্ছি, কালীপুজোর দিন সকালেই চলে আসুন তাহলে—

সকালে হয়ে ওঠে নি। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বেলা তিনটে নাগাদ রওনা হয়েছি। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলে আর হৈ-হল্লা বা বাজী পটকার মধ্যে পড়তে হবে না। দুটোকেই বড় ভয়।

...একই জিনিসের বিপরীত রূপ এত বয়েস পর্যন্ত কম দেখলাম না। কি শোকে কি উৎসবে। শোকে উৎসবের তাণ্ডব, আবার উৎসব শেষে শোকের ছবি। উৎকট

রকমের নানা ছাঁদে-ছন্দে 'বোলো হরি হরি বোল' ধ্বনির মত্ত উল্লাস কানে এলে মৃত্যুকে 'শ্যাম-সমান' কল্পনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় কিনা জানি না। তমিস্রনাশিনী শ্যামাপূজার পরদিন খবরের কাগজের ভাঁজ খুললেই মানুষের উল্লাসজনিত অঘটনে বলির অবধারিত বিবরণ থেকেও চোখ সরানো সম্ভব হয় না। কত সংসারের শোকের ছায়া মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ছেলের কারণে কলকাতার এই কালীপুজোকে বরাবর এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। কিন্তু শেষের দু'বছর তাকে নিয়ে আর নড়া সম্ভব হয় নি। কি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই কটা দিন আমাদের কাটত ভোলার নয়। বিকেল থেকেই তার দু'কানে মোটা করে তুলো গুঁজে রাখতাম। তা সত্ত্বেও বাজীর উৎকট শব্দে চমকে চমকে উঠত। বিসর্জনের উল্লাসের দিনে আরো কাহিল অবস্থা। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত, সমস্ত শরীর লাল হয়ে যেত, মনে হতো দম বন্ধ হয়েই না শেষ হয়ে যায়। আর আজ অবধূতের বাড়িতে কল্যাণী মাতাজীর সেই কালীপুজো দেখার আকর্ষণে আমাদের দিন কয়েক আগে বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরা।

অবধূত ভারী খুশী। তিনজনকেই নজর করে দেখে মন্তব্য করলেন, সকলকেই বেশ ..[illegible] দেখাচ্ছে আপনাদের।

কল্যাণীর খুশীর ভাব কেবল মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকুর মধ্যেই প্রকাশ। মেয়েকে বললেন, তোমার কথা সকাল থেকে অনেকবার মনে হয়েছে।

অতিথি অর্থাৎ ভক্ত সমাগমের দেরি আছে। কেবল কয়েকটি মহিলা এসে যোগানদারীর কাজে লেগেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে দেখে শুধু আমি কেন, মনে মনে আমার স্ত্রী আর মেয়েও অবাক একটু। আমার মনে হয়েছিল ঠিক সেই মহিলাকেই দেখছি না আর কাউকে দেখে ভুল করছি।

কল্যাণী মায়ের শিষ্য শ্রীরামপুরের সেই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ঘরণী—মাতাজীর প্রতি স্বামীর গদ-গদ ভক্তি-ভাব যিনি আদৌ সরল চোখে দেখতেন না। মাতাজীর রূপের টানটাই স্বামীর বড় আকর্ষণ ভাবতেন। মাতাজীটি' যে তার সম-বয়সী, বয়েস একান্ন বাহান্ন সে-তো দেখে কারোর বোঝার উপা. নেই। এই মহিলাও যৌবনকালে বেশ রূপসী ছিলেন বোঝা যায়, কিন্তু বয়সের ছাপ গেল বারে তাঁর পরিপাটি প্রসাধনের আড়ালে থাকা দূরে থাক, বরং যেন একটু বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে পড়েছিল মনে আছে। গেল বারে তিনি এসেছিলেন তার স্বামীরত্নটিকে তীক্ষ্ণ প্রহরায় রাখার গুরু দায়িত্ব নিয়ে। সেবারে এঁকেই ইশারায় দেখিয়ে অবধূত আমাকে বলেছিলেন, একটু রসের খোরাক পেতে চান তো ওই মহিলার ওপর নজর রাখুন —এত লোকের মধ্যে ওই মহিলাই কেবল আমার স্ত্রীটিকে বরদাস্ত করতে পারেন না, আবার তাঁর ভদ্রলোকটিকে আচল-ছাড়াও করতে পারেন না।

...গেল বারের সে প্রহসন ভোলবার নয়। সারাক্ষণই তাঁর উ. টানধরা মেজাজ। এই মেজাজের কারণ মাতাজীর অন্য ভক্তরাও জানত এবং লজ্জা পেত। আর স্বামীটির তো বিড়ম্বনার একশেষ। তিনি একাই মাতাজীর শিষ্য, স্ত্রী নন। তাই কারো লাজ-লজ্জার ব্যাপারে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। মাতাজী পুজোয় বসার আগে সক্কলকে পেট পুরে রাতের খাওয়া খেয়ে নেবার নির্দেশ শুনে আহারে বসেই তিনি শ্লেষের

শর নিক্ষেপ করেছিলেন, কল্যাণীর দিকে চেয়েই সকলকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মায়ের পুজোর আগে সকলকে খেয়ে নিতে হবে এটা কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ না মাতাজীর নিজের নির্দেশ।

...দোষের মধ্যে তার ভদ্রলোকটিই স্ত্রীর মুখ বন্ধ কবার জন্য আগ বাড়িয়ে বলে ফেলেছিলেন, মাতাজীর নির্দেশ মানেই শাস্ত্রের নির্দেশ। শোনামাত্র মহিলা স্বামীকে দাবড়ানি দিয়ে থামিযেছিলেন। এই নিয়ে অন্য ভক্তদেব সঙ্গেও মহিলার বিতণ্ডা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। পুরুষ ভক্তদেব কেন এত ভক্তির আদিখ্যেতা খুব সূক্ষ্মভাবে সে আভাস দিতেও ছাড়েন নি। হাসিমুখে শেষে কল্যাণীই তাঁকে ঠাণ্ডা করেছিলেন, বলেছিলেন, না মা, শাস্ত্রে, খেয়ে পুজোব কথাও নেই না খেয়ে পুজোব কথাও নেই—মানুষের অভিরুচিটাই সংস্কাব আর নিযমে এসে দাঁডিয়েছে। মাযের ছেলে-মেযেবা উপোস করে মা-কে ভোগ খেতে দেখবে এ আমাব ভালো লাগে না বলেই এখানে আগে খেযে নেবাব ব্যবস্থা। তাঁব সেই হাসিমুখেব কথাগুলো আমাব কানে লেগেছিল বলেই এই মহিলাকে দেখামাত্র গেল বারেব ওই প্রহসন মনে পড়ে গেল।...আব সঙ্গে সঙ্গে সেই শেষেব চমকও।...নিজস্ব পদ্ধতির সেই পুজো এবং বিচিত্র বকমেব আরতি শেষ করে সকলেব মাথায় ঘটেব শান্তি-জল ছিটিযে প্রদীপেব আশিস-ছোঁয়া তপ্ত হাত শ্রীবামপুবেব ওই ভদ্রমহিলাব মাথায বাখতেই তিনি তীক্ষ্ণস্ববে আর্তনাদ কবে উঠেছিলেন, কি হলো! কি হলো! এ আমাব কি হলো!...তাবপবেই পাশের মহিলাব কোলে ঢলে পড়ে অজ্ঞান। হতভম্ব বিমূঢ় সকলে...তারপবেই মাতাজীব তৎপব হাতের শুশ্রূষা—পুজোর ঘটি থেকেই জল নিয়ে তাঁর চোখে মুখে জোবে জোবে ঝাপটা দিতে তবে জ্ঞান ফেরে।...তাব পবেও ভযার্ত আর্ত দৃষ্টি।...উপুড় হযে মাতাজীর পাযে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন আমাদেব কাছে কল্যাণী নিজেই হাসিমুখে ওই ঘটনাব ব্যাখ্যা দিযেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষেব মন সবল হতে সময় লাগে, দুর্বল সহজেই হয়। পুজোব সময় এতগুলো মানুষের তন্ময়তার প্রভাব কিছু আছেই...এই প্রভাবে মহিলাব মন যত দুর্বল হযেছে নিজেব ভিতরের অপরাধ-বোধ ততো বেড়েছে, এই অবস্থায় তাঁর স্নায়ু তো স্পর্শকাতব হতেই পাবে—আমি ওর মাথায হাত রাখতে নিজেব স্নায়ুর সঙ্গে নিজেই আর যুঝতে পারেন নি—এতে আমার কোনো কেরামতি নেই।

...কল্যাণী ভিতরে চলে যাবার পর অবধূতের সেই মন্তব্যও কানে লেগে আছে, যেন একবছব নয, দু'পাঁচ দিন আগে শোনা। বলেছিলেন, আমারও ওই এক কথা, ওঁর কোনো কেবামতি নেই, কোনো ব্যাপারে আমাদেব কাবো কোনো কেরামতি নেই...কিন্তু আমাদেব অলক্ষ্যে একেবারে কারোরই কি নেই? কেন এমন হয়...কে করে...কে ঘটায়?

একবছর বাদে এসে শ্রীরামপুরের মহিলাকে দেখে মনে হলো অলক্ষ্যের কোনো ঘটন-পটিয়সীর কোনো মাহাত্ম্যই আবাব নতুন করে দেখছি।...কল্যাণী মাতাজীর পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছেন সেই ভদ্রমহিলা, তাঁর স্বামী তখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। তিনি রান্নায় সাহায্য করছেন, পুজোর আয়োজনে সাহায্য করছেন, ঘুরে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করছেন, মা এটা দিয়ে কি হবে, ওটা কি করে করব...। কল্যাণীকেও

একবার স্নেহের ধমকের সুরেই বলতে শুনলাম, যেমন করে হয় করো না বাপু, ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকলে যেভাবে করো তা-ই ভালো।

গেল বছর ওঁকে আপনি-আপনি করে বলতেন। এখন তুমি।

...আমি হাঁ হয়ে দেখছি। মহিলার পরনে খুব চওড়া লালপেড়ে গরদের শাড়ি, গায়ে ওই রঙেরই হালকা গরম কাপড়ের ব্লাউজ। এক পিঠ খোলা চুল। কপালে বড় সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে চওড়া টকটকে সিঁদুর। প্রসাধনের ছিটেফোঁটাও নেই। স্নিগ্ধ সুন্দর একখানা মায়ের মুখ। কল্যাণীর পাশে যেন এমন মূর্তিই মানায়। ফিরে দেখি অবধূত মিটি-মিটি হাসছেন। চোখো-চোখি হতে জিজ্ঞেস করলেন, চিনলেন?

—খুব...কিন্তু না-চেনার মতো নতুন।

বলতে বলতে আখের গুড় আর সেই মুখরোচক মশলা মেশানো সরবত হাতে সেই মহিলাই হাজির। বললেন, মা পাঠিয়ে দিলেন—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরবতের গেলাস হাতে নিলাম। অবধূত বললেন, দাঁড়াও, এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—

সপ্রতিভ মুখে মহিলা বললেন, পরিচয় মায়ের মুখে শুনেছি...তাছাড়া গেল বছরেও এঁদের সকলকে দেখেছিলাম।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, গেল বছর আমিও আপনাকে দেখেছি মনে আছে...

সঙ্গে সঙ্গে অবধূতের সরস প্রশ্ন, ঠিক এঁকেই দেখেছিলেন বলছেন?

আমি অপ্রস্তুত। এ-টুকতেই বোঝা গেল মহিলাও বুদ্ধিমতী কম নয়। জিভ কেটে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

মহিলার নাম শুনলাম প্রভা ঘোষ। ওঁর স্বামী বীরেশ্বর ঘোষের শ্রীরামপুরে সুতো আর রঙের মস্ত কারবার। দুটো ছেলে একটা মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেরা দু'জনের একজনও বাপের কাছে থাকে না এটাই দুঃখ। আর ছেলেদের অভিযোগ মা তাদের বউদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। আর মায়ের পাল্টা ক্ষোভ বাপের দৌলতে যে-ছেলেরা এতবড় কারবারের অংশীদার, তাদের বউদের অত দেমাক হবে কেন। মোট কথা ভদ্রলোকের গৃহ শান্তির বড় অভাব ছিল। তার ওপর নাগাড়ে অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েও তেমন ফল পান নি। লোক মুখে অবধূতের নাম শুনে এসেছিলেন। অবধূত তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ক্রনিক অ্যামিবিয়সিস, সারতে সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করতে হবে। তা তিনি ধৈর্যের পরীক্ষায় উতরেছেন এবং সেরেও গেছেন। সেবারের কালীপুজোর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসে মাতাজীর পুজো দেখে তিনি মুগ্ধ। ততদিনে অনেক ভক্তের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে শ্রীরামপুরের ভক্তও জনা দুই ছিলেন যাঁরা ঘোষমশাইয়ের বাড়ির অশান্তির কথা জানতেন। তাঁদের পরামর্শ মাতাজীকে ধরে পড়ুন, দীক্ষা নিন, সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। তাঁদের আবার ধারণা, বাবার সমস্ত শক্তির উৎস মাতাজী। হেসে হেসে অবধূত বলেছিলেন, কল্যাণীর সব থেকে বড় পাবলিসিটি অফিসার হলো গিয়ে হারু—ওষুধের গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় লতাপাতা যোগানের কাজ করেই যে চুল পাকালো। ব্যাটা করে আমার

কাজ আর গুণকীর্তন করে বেড়ায় কেবল ওই মাতাজীর।

রোগী বা ভক্ত যে-ই আসুক হারুর সঙ্গে তার খাতির হয়েই যায়। ওর একটা মন নাকি এখনো সেই বক্সোমুনির থানেই বাস করছে। রোগী বা ভক্তদের কংকালমালী ভৈরব আর ভৈরবী মায়ের মহিমার গল্প শুনতেই হয়। দশ বছর বয়সে যে মেয়েকে জাগ্রত-শিব-তুল্য মহাভৈরব কংকালমালী নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই মেয়ে অশেষ শক্তির আধার ছাড়া আর কি? ওই মহাভৈরবের আশীর্বাদে কালে-দিনে ভৈরবী মায়ের থেকেও অনেক বেশি শক্তির অধিকারিণী হবেন হারু সেটা বরাবরই বিশ্বাস করত। তখন অবশ্য হারু জানত না দশ বছরের সেই মেয়ে অর্থাৎ আজকের মাতাজী সেই ভৈরবী মায়েরই মেয়ে। অবধূতের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় জেনেছে, আর তখনই বুঝেছে মহাভৈরব কেন ওই মেয়েকে এত স্নেহ করতেন।

বিশ্বাসপ্রবণ ধাত যাদের, হারুর মুখে বক্সোমুনির থানের সেইসব চোখে দেখা কাহিনী শুনলে তারা রোমাঞ্চিত হবেই। অবধূত বা তাদের মাতাজীর অতীত জীবনের কথা শুনতে কার না সাধ?...যাক, বীরেশ্বর ঘোষ ধরে পড়তে অবধূতের কথায় কল্যাণী দেবী তাঁকে দীক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন। পেটো কার্তিকেব ধারণা, বাবার কথা বা অনুরোধ মাতাজী সর্বদা আদেশ হিসেবেই শিরোধার্য কবেন। ঘোষমশাইকে কল্যাণী দেবী বলেছিলেন, সস্ত্রীক আসুন একদিন, তখন কথা-বার্তা হবে।

অবধূতের ধারণা, স্বামীব পুরনো অসুখ সেরে যাবাব ফলে ভদ্রমহিলা একটু ভক্তি-বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেন হয়তো। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে তাঁকে দেখেই বিগড়ে গেলেন, ভক্তি-বিশ্বাসও রসাতলে। নিজেও বড ঘরেব রূপসী আর মোটামুটি শিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। সেই রূপ যে অবধাবিত ক্ষযের মুখে, চেষ্টা করেও আর ধরে রাখা যাচ্ছে না, এই খেদ মনের তলায় ছিলই। এখানে এসে যাঁকে দেখলেন তুলনামূলক বিচারে তিনি ঢের বেশি সুন্দরী তো বটেই, তাব ওপব ভরা-যৌবনই বলা চলে। মোট কথা তারই সমবয়সী যে এটা তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না। এই একজনের কাছে দীক্ষা নিতে হবে—এঁরই কাছে দীক্ষা নেবাব জন্য তাঁর ঘরের লোকের এত আগ্রহ এত উন্মাদনা!

আগ্রহ আর উন্মাদনার কারণ মহিলার কাছে জলের মতো স্পষ্ট।...দীক্ষা সম্পর্কে কোনো কথাই হলো না। দু'চার কথার পর কাজের তাডা দেখিয়ে মহিলা আগে ভাগে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

তারপর দেড় দু'মাসের মধ্যে ভদ্রলোকের আর দেখা নেই। তাঁরা চলে যেতেই কল্যাণী নাকি হেসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাঝখান থেকে আমারও ভক্ত গেল তোমারও রোগী গেল—কেন যে দীক্ষা নেবার জন্য তুমি হুটহাট লোককে বলো—

আমিও সায় দিয়ে বললাম, সত্যিই এটা অন্যায় আপনার, দীক্ষা নেবার জন্য লোক পাঠিয়ে আপনি নিজের স্ত্রীকে এ-ভাবে উত্যক্ত করেন কেন? কার্তিক বলছিল আপনি হুকুম করলে তবেই উনি দীক্ষা দিতে রাজি হন, নইলে নয়?

মুচকি হেসে অবধূত বললেন, স্ত্রীকে উত্যক্ত করি দুই কারণে, আর আমার বিবেচনায় দুটোই সায়েন্টিফিক।...আচ্ছা র‍্যাপরট শব্দটার বাংলা কি?

—মনোগত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ বলতে পারেন।

—বেশ...প্রাকৃতিক নিয়মেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের আর মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের এই র‍্যাপরট বা মনোগত সম্পর্কটা ভালো হয়—এটা একটা স্বীকৃত সত্য মানেন তো?

—মানি, তবে দুজনের কেউ যদি রিপালসিভ না হয়।

অবধূত জোরেই হেসে উঠলেন।—আপনি জানেন না, মনের ছোঁয়া পেলে রিপালসিভ হলেও র‍্যাপরট ভালো হয়। সে যাক, আমার স্ত্রীকে মুনি ঋষিরাও কেউ রিপালসিভ বলবে না।...আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও এই র‍্যাপরট কথাটা খাটে। আমার ভৈরবী মা আমার কাছে যতো কাছের, স্বয়ং আমার গুরুও ততো নন। এই সত্যটার ওপর গুরুত্ব দিয়েই দীক্ষা নেবার বেলায় আমার স্ত্রীর কাছে লোককে পাঠাই। আর, দ্বিতীয় কারণটা আরো বেশি সায়েন্টিফিক। দীক্ষা বলতে আমি বুঝি কর্মের গতানুগতিক সংস্কার থেকে যতটুকু পারা যায় মনটাকে অন্যদিকে সরানো। জপ মানেও অন্যত্র মনোনিবেশ। এখন এই বীরেশ্বর ঘোষের ব্যাপারটাই ধরুন। বাড়িতে দেমাকের স্ত্রী নিয়ে অশান্তি, ছেলে ছেলেব বউদেব নিয়ে অশান্তি আর তার সঙ্গে ব্যবসায়ের চিন্তা —এই চিন্তা আব অশান্তি থেকেই ভদ্রলোকের ক্রনিক পেটেব রোগ। ঘুমের মধ্যেও এগুলো অবচেতন মন থেকে সরে না। ওষুধে আর বিশ্বাসে অনেকটাই সুস্থ হলেন তিনি, কিন্তু রোগেব মূল কাবণ ওই অশান্তি আব চিন্তা থেকে তাঁব মনটাকে তুলে না আনতে পাবলে ফের রোগে পড়তে কতক্ষণ?...এখানকাব মাতাজীর সম্পর্কে নানাজনের মুখে নানারকম বিশ্বাসেব কথা শুনে আর তাবপর তার কালীপুজো দেখে ভরপুর বিশ্বাস নিয়ে নিজেই তিনি মাতাজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যগ্র হলেন, আর তক্ষুণি আমিও কর্মের চিরাচরিত সংস্কার থেকে তাঁব মন সরানোর খাঁটি রাস্তা পেয়ে গেলাম আর কল্যাণীকে ডেকে দীক্ষার ফতোয়া দিলাম, কিন্তু কল্যাণী গোল বাধালে এর মধ্যে আবার তাঁব স্ত্রীকে টেনে।

আমি উৎসুক।—দেড় মাস বাদে ভদ্রলোক আবার একাই এলেন?

—এলেন তো বটেই, একখানা ঝড়ো কাকের মতো এলেন। আগেব থেকেও ডবল দুশ্চিন্তা, এখানে আমাদেব মুখ দেখাবেন কি করে। আবার পেটেব বোগ শুরু হতে না এসে পারলেন না।

অবধূত এরপর কল্যাণীর ভুল শুধরাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে ডেকে বলেছেন, এঁর দীক্ষা নেওযা খুব দরকাব, এঁব স্ত্রীর এখনো দীক্ষা নেবাব সময় আসে নি—তুমি এঁব ব্যবস্থা করো।

...দীক্ষা হয়েছে। দেখতে দেখতে তাবপর ঘোষমশাই অন্য মানুষ। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি দ্বিগুণ উতলা, স্বামীর ভাবাবেগ আর জপে তন্ময়তা একটুও স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম মনে হয় নি। নাম জপ কবে না রূপ জপ করে কে জানে, সপ্তাহে দু'দিন তিনদিন করে কোন্নগরে ছোটার তাড়া কেন? শাসন করেও আটকানো যায় না কেন। গায়ে শান্তির বাতাস লেগেছে না মাতাজীর রূপের বাতাস?

এই প্রতিক্রিয়ার ফল গত বছর কালীপুজোর রাতে নিজের চোখেই দেখেছি। এ-বছর আবার শ্রীমতী ঘোষেরও এমন পরিবর্তন। শুনলাম সেবারে ফিট হয়ে বাড়ি ফেরার সাতদিনের মধ্যে স্বামীকে নিয়ে আবার এসেছেন। আকৃতি, তাঁকেও দীক্ষা

দিতে হবে। কিন্তু কল্যাণী বেশ সরল মুখেই এবারে তাঁকে একটু বেগ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে কিনা সেটা আপনাদের অবধূত বলে দেবেন, তিনি যেমন বলেন আমি তেমনি করি।

ঠাট বজায় রাখার জন্য মহিলাকে আরো মাসখানেক ঘোরাতেই হয়েছে, তারপব তাঁরও দীক্ষা হয়েছে। এখন তিনি মাতাজী অন্তঃপ্রাণ। তাঁর স্বামী ছেলেদের আর বউদের নিয়ে সন্ধ্যায় আসবেন, কিন্তু মাতাজীর সাহায্যের জন্য উনি সকালেই চলে এসেছেন।

হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মিটি মিটি হেসে অবধূত বললেন, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি বুজরুকির ধাপে-ধাপে পা রেখেও যদি বিশ্বাসের দরজায় পৌঁছনো যায় তাহলে তার এমনি জোর যে সাপের বিষও আর বিষাক্ত থাকে না।...এই পরিবারের ব্যাপারটাই দেখুন, কল্যাণীর হুকুমে মহিলা এরপব যেচে ছেলে আর ছেলের বউদের কাছে যেতে লাগলেন, তাদেব ভালো-মন্দের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। যিনি সর্বদা মেজাজে ফুটতেন তাঁর এই পরিবর্তন দেখে ছেলে বউরা অবাক। বাপের পরামর্শে শেষে একদিন ছেলের বউরাও এ-বাড়িতে এলো —এসে আটকে গেল। তারাও এখন কল্যাণীব শিষ্য। সপরিবারে দুই ছেলেই আবাব বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসতে চাইলো। কিন্তু এবারে কল্যাণীই আপত্তি কবল, না, বাবা-মাকে যতো পারো ভক্তিশ্রদ্ধা কর কিন্তু যে-যার স্বাধীনতা নিয়ে যেমন আছ তেমনি থাকো। এমন সচ্ছল এক পরিবারের সব অশান্তি যেন যাদু-মন্ত্রে উবে গেল...অথচ আমরা তো কিছুই করলাম না—তাহলে কে কি কবল বলুন তো?

অবধূতের এই প্রশ্নের জবাব কোনোদিন দেবার চেষ্টা করিনি।

বিকেল গড়িয়ে চলেছে। আমরা কখনো দাওয়ায় কখনো বা পিছনেব আঙিনায় পায়চারি করছিলাম। অবধূত মাঝে মাঝে এটা-সেটা বলছেন আর একেব পর এক সিগারেট টেনে চলেছেন। পেটো কার্তিকের শুনলাম সকাল থেকে ফুরসৎ নেই। সমস্ত কেনাকাটা আর ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব তার। গতবারে জনা পঞ্চাশেকের নেমন্তন্ন ছিল, এবারে শুনলাম পঁচাত্তর আশি হবে।

শ্রীমতী প্রভা ঘোষ ছাড়া আরো সাত আট জন মহিলা তাদের মাতাজীর সাহায্যে ব্যস্ত। এদের মধ্যে বার কয়েক একটি অবিবাহিত মেয়েকে দেখলাম। সেই থেকে মুখ বুজে কাজ করে চলেছে। দুর্বো বাছছে, পিটুলি বাটছে, এটা-ওটা নিয়ে আসছে, রেখে আসছে। এখন দেখছি পিছনের দাওয়ায় উপুড় হয়ে বসে নিবিষ্ট মনে বড করে আলপনা আঁকছে। আমার হাতে একটা আঙুলের খোঁচায় ইশারা করে অবধূত সেদিকে এগোলেন। কিন্তু পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও মেয়েটির নিবিষ্টতায় ছেদ পড়ল না, আমাদের লক্ষ্য করল না।

—এই মেয়ে মুখ তোল!

ধড়ফড় করে মুখ তুলে তাকালো তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

—তোকে দাঁড়াতে কে বলেছে...এঁকে চিনিস?

আঙুল তুলে আমাকে দেখালেন। মেয়েটি ডাগর দুই চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। বিব্রত ভাব। সামান্য মাথা নাড়ল, চেনে না।

ইশাবাব কাবণ না বুঝে মেয়েটিকে আমি ভালো কবে লক্ষ্য কবছি। বেশ দীর্ঘাঙ্গী। ভালো স্বাস্থ্য। বছব তেইশ চব্বিশ হবে বযেস। গাযেব বং ফর্সা তো নযই ববং একটু চাপা। আযত চোখ দুটো বেশ সুন্দব বলেই মুখখানা মিষ্টি দেখায।

অবধূত আমাব নাম বলে ফেব জিজ্ঞেস বললেন, এবাবে চিনলি?

এবাবে সামান্য মাথা নাড়ল। চিনেছে।

—এঁব কতগুলো বই পড়েছিস?

মুখেব বিড়ম্বনা আবো স্পষ্ট। জবাব দিতে পাবল না।

—সে কি বে, কোনো বই পড়িস নি তো নাম শুনে চিনলি কি কবে?. কথা বলছিস না কেন, শুধু ব্যাক-ডেটেড নয, ইনি তোকে বোবা ভাবছেন—

এবাবে মৃদু জবাব দিল, নাম শুনেছি.

—কোথায শুনেছিস?

—এ বাড়িতেই।

অবধূত হাসছেন।—তোব মাতাজীকে বলব তোকে আব একটু স্মার্ট কবে দিতে, কথা বলতে হলেই অত মিইযে যাস কেন? ঠিক আছে কাজ কব—

মেয়েটা যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল। আমবা ফিবলাম।

এ-ভাবে আমাকে ডেকে নিযে কথা বললেন যখন কিছু ব্যাপাব আছে। জিজ্ঞেস কবলাম, মেয়েটি কে?

হেসে জবাব দিলেন, ঘটনাব সাজেব আব একজন। ওব নাম সুষমা, শ্রীমতী প্রভা ঘোষেব খুড়তুতো বোনেব মেয়ে, কল্যাণীব নতুন বিক্রুট, মাস আড়াই যাবত তাব কাছে মানে এ-বাড়িতেই আছে। তাব আগে প্রভা ঘোষ তাকে নিজেব বাড়িতে এনে বেখেছিলেন। সে যাক, আগে বলুন কালো হলেও মেয়েটিকে দেখলেন কেমন?

হেসে ফিবে বললাম, আমাব মতামত জেনে কি হবে, কাবো সঙ্গে ওব বিযেব সম্বন্ধ-টম্বন্ধ কবাব দাযে পড়েছেন নাকি?

প্রশ্ন শুনে অবধূত হেসে উঠলেন। ভাবী খুশি।—ঠিক ধবেছেন। খানিক আগে আপনি বলেছিলেন না, ছেলে বা মেযে দুজনেব একজন যদি দেখতে বিপালসিভ হয তাহলেও তাদেব মধ্যে ব্যাপবট হতে পাবে না—আব আমি জবাব দিয়েছিলাম, মনেব ছোঁযা পেলে বিপালসিভ হলেও ব্যাপবট ভালো হয—এই মেয়েকে নিযে এখন আমাব সামনে সেই এক্সপেবিমেন্ট।

আমি বিমূঢ় একটু।—কিন্তু কালো হলেও মেয়েটি তো মোটেই বিপালসিভ নয, লম্বা, স্বাস্থ্য আব মুখশ্রীও ভালো—

একটা হাত তুলে অবধূত আমাকে থামিযে দিলে, আবে মশাই আপনি একেবাবে এক তবফা ভাবছেন, মেয়েটি বিপালসিভ আমি একবাবও বলেছি, ছেলেটি তো বিপালসিভ হতে পাবে।

আমি আবাব অথৈ জলে।

এবপব মেয়েটিব সমাচাব শুনলাম। শ্রীমতী প্রভা ঘোষেব খুড়তুতো বোনেব মেযে সুষমা—বাবো বছব বযসেব মধ্যে বাবা মা দুজনকেই হাবিযেছিল। দশ বছব বযসে বাবা গেছে, বাবো বছবে মা। জযেন্ট ফ্যামিলিব কাকা-কাকীমাবা ভবসা।

মা মারা যাবার পর থেকে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল এটা লক্ষ্য করেও কেউ খুব গা করে নি। ভেবেছিল শোক সয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয় নি। তার খেলাধুলো হাসি-খুশি সব গেল। মুখ বুজে স্কুলে যাতায়াত করে। কিন্তু কোনো কোনো দিন তা-ও যায় না, কাকীমারা বকাবকি করে কাকারা বিরক্ত হয়—কিন্তু সে বসে আছে তো বসেই আছে। কেন যাবে না বলে না, কারো কথার জবাব দেয় না।

পনেরো বছব বয়সে মেয়েকে ফিটের রোগে ধরল। পনেরো দিন বিশ দিন একমাস অন্তর স্কুলে গিয়ে ফিট হয়, নয়তো বাড়িতে। কাকারা কাকীমারা মহা বিরক্ত, মেয়ের নিজেরও ভালো থাকার কোনো চেষ্টা নেই। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু নিজে গরজ করে ওষুধ খাবে না, কারো সঙ্গে বেড়াবে না কথা বলবে না, হাসির কথায় হাসবে না পর্যন্ত। পারলে সারাক্ষণ নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। এমনি ডাক্তারের পবামর্শে মানসিক ডাক্তার দেখানো হলো। তার চিকিৎসার ফলে ঘুম আব শুয়ে বসে থাকাই বাড়তে থাকল, তেমন ফল বিশেষ দেখা গেল না। মনের ডাক্তার বিধান দিল, তার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাইকো অ্যানালিসিসের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত কাকা কাকীমাদের কারো এই রোগটার ওপরেই বিশ্বাস নেই। এ আবার একটা রোগ নাকি—ও তো ইচ্ছে করলেই ভালো থাকতে পারে—ইচ্ছে করবে না, কারো কথা শুনবে না, মর্জি আর গোঁ ধরে পড়ে থাকবে—এর আর চিকিৎসার কি আছে? সাইকো অ্যানালিসিস বলতে তারা বোঝে রোগীর সঙ্গে কথা বলে রোগ সারানো। কথা তারা দিবা-রাত্রই বলছে, কাব কথা মেয়ে শুনছে? মাঝখান থেকে সাইকো-অ্যানালিসিস তো হলোই না, মনের রোগের চিকিৎসাও বন্ধ হয়ে গেল। আর মেয়ের ফিট হওয়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকল।

...স্কুলে বেশ ভালো ছাত্রী ছিল। কিন্তু বছর নষ্ট করে করে সেকেণ্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করতেই সুষমার একুশ বছর গড়িয়ে গেল। শেষ যে বারে পাশ করতে হবে পণ করে মোটামুটি পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিল, সে বারে পাশ তো করলই—শেষের চার পাঁচ মাসের মধ্যে ফিটও হলো না। পরীক্ষার পরেই আবার যে কে সেই। তাকে আর কলেজেও ভর্তি করানো গেল না। কে একজন পরিচিত ডাক্তার তার বড় কাকাকে বলেছিল, এ-সব রোগ অনেক সময় ফাংশানালও হয়, অর্থাৎ রোগী নিজেই নিজেব রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজেই নিজের রোগ সৃষ্টি করাটাও যে বড় রকমের মানসিক অসুখই এটা কারো মাথায় এলো না। কাকারা এবার কড়া শাসনের দিকে এগোল। কিন্তু মার-ধোর করেও তাকে কলেজে পড়তে পাঠানো গেল না। উল্টে আরো ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। কাকারা রেগে গিয়ে বলে ফিট না হাতি, হিস্টিরিয়া—থাক পড়ে!

হিস্টিরিয়াও যে একটা রোগই তাই বা কে বলে দেয়। শেষে সকলের টনক নড়ল একদিন। বেলা গড়িয়ে যায়, মেয়ে ঘুম থেকে ওঠে না, ঘরের দরজাও খোলে না। চিৎকার চেঁচামিচি হাঁক-ডাক কিন্তু কোনো সাড়া নেই। দরজা ভাঙা হলো। সুষমা তার বিছানায় নিঃসাড়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। পাশে একটা খালি ট্যাবলেটের শিশি। ছোট টেবিলে তার লেখা একটা চিঠিও পেপার ওয়েট চাপা

দেওয়া আছে। লিখেছে, আমার মৃত্যুর জন্য এই পৃথিবীর কেউ দায়ী নয়। এই জীবন আর টানতে পারছিলাম না। তাই চলে যাচ্ছি।

তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেটে যা ছিল পাম্প করে বার করা হলো। দেখা গেল এন্তার ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। এত খেয়েছে যে আর দু'তিন ঘণ্টা গেলে কিছুই করা যেত না। কিন্তু যে মেয়ে বাড়ি থেকে মোটে বেরুতো না সে এত ঘুমের ওষুধ পেল কি করে—পেল কোথা থেকে?

পরে হাসপাতালের জেরায় সুষমা নিজেই স্বীকার করেছে মনের রোগের চিকিৎসার সময় ডাক্তারের প্রেসকৃপশন অনুযায়ী যে ঘুমের ওষুধ তাকে দেওয়া হতো তার বেশির ভাগ সে না খেয়ে জমাতো। তার মন বলত এগুলো একদিন কাজে লাগবে।

এরপর সুষমার কাকা কাকীমাদের উৎকণ্ঠাব শেষ নেই। যোগাযোগ এমনি যে ঠিক এ-সময়েই প্রভা ঘোষ তাঁর মাতাজীকে পেয়ে জীবন সার্থক ভাবছেন। বাবা আর মাতাজীর ওপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। বাপ-মা মরা খুড়তুতো বোনের এই মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করতেন। সুষমার রোগের খবর বরাবরই রাখতেন। কিন্তু তখন তাঁর বিশ্বাসও ছিল না, কবারও কিছু ছিল না। ঘুমেব ওষুধ খেয়ে সুষমার মরার চেষ্টাব কথা শুনে তিনি কলকাতায় তাদের বাড়িতে এসে হাজির। হাসপাতাল থেকে ফেরার পব মেয়ের আবার ঘন ঘন ফিট হচ্ছিল।

তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রভা ঘোষ স্বামীকে নিয়ে সোজা কোন্নগবে চলে এলো। অহংকার গিয়ে এখন তাঁব সকলের জন্য আবেগ আর আকৃতির দিকটাই বড়। তিনি বাবা আর মাতাজীকে ধরে পড়লেন মেয়েটাকে সারিয়ে দিতেই হবে। অবধূত পরের মঙ্গলবারে শ্মশানে যাবার দিন সকালের দিকে মেয়েটিকে একবাব নিয়ে আসতে বললেন। তার আগে অবশ্যই রোগের আর মেয়েটির সম্পর্কে সব খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

যথা দিনে সুষমাকে নিয়ে তাঁরা এখানে এসে উপস্থিত। সঙ্গে ঘোষ দম্পতী ছাড়া মেয়ের এক কাকা আর কাকীমাও আছে। মাসিব নির্দেশে সুষমা মাতাজী আর অবধূত দুজনকেই প্রণাম করল। অবধূত বললেন, ওরা আসাব পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেয়েটিব দিকে চেয়ে একটা মজা দেখলাম। আমাকে নয়, বার বার চোখ তুলে সে কল্যাণীকে দেখছে। এই দেখার সাদা দিকটা তিনি খুব ভালো জানেন। অনেকেরই দেখামাত্র কল্যাণীকে ভালো লাগে, এই মেয়েবও লেগেছে। মেজাজী আর অহংকারী মাসির পরিবর্তন দেখেও ওর প্রতি কিছুটা বিশ্বাস হয়তো আগে থাকতেই গজিয়েছিল। তাছাড়া কল্যাণীকে প্রণাম করে উঠতেই উনি বলেছিলেন, মাতাজী তোর সব যন্ত্রণা ম্যাজিকের মতো দূব করে দেবেন দেখিস—

যাই হোক মেয়েটিকে বেশ ভালো কবেই দেখলেন অবধূত। তাঁর প্রথমেই মনে হলো দীর্ঘদিন ধরে ওর ভিতরে সত্তার হাহাকার চলেছে। ওই সত্তা নিরাশ্রয়। চোখেব তারার গভীরেও কিছু একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। অসময়ে বাপ-মা চলে গেলে অনেক ছেলে মেয়ের আশ্রয়শূন্যতার অনুভূতি চাপা আবেগের দিকে গড়িয়ে সেটা পরিপুষ্ট হতে থাকে। তখন একটা কিছু আশ্রয় সে আঁকড়ে ধরতে চায়।

এই মেয়ে নিজের অগোচরে রোগের আশ্রয় আঁকড়ে ধরে আছে। এটা সাধারণ মানুষ ছেড়ে সাধারণ ডাক্তাবদেরও ধরা-ছোঁয়ার মতো রোগ নয়, কায়িক কোনো রোগও বলা চলে না হয়তো, কিন্তু রোগের বাড়া। এর যন্ত্রণা এমনি যে আত্মহত্যা করেও নিষ্কৃতিব পথ খুঁজেছে মেয়েটি।

হাত দেখলেন। আয়ু রেখা সরল সুস্থ। সংসার জীবনযাপনের লক্ষণও কপালে আর হাতের রেখায় স্পষ্ট।

যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এর চিকিৎসাও তিনি জানেন। কিন্তু এব পব ভডঙের দিকটা গুরু গম্ভীব কবে না তুললে বোগী বা তার আত্মীয-পরিজনেবা সে-বকম গুরুত্ব দেবে না।

—.তামার নাম কি?

মৃদু জবাব, সুষমা।

—সুষমা মানে কি?

নিরুত্তব।

—জানো, না জানো না?

—লাবণ্য...

—কত দিনের মধ্যে আযনায নিজেব মুখ দেখ না?

জবাব নেই।

—যা খাও ভালো হজম হয় না, প্রাযই অম্বল হযে যায তো?

মাথা নাড.। তাই হয।

—তবু টক ঝাল নুন আর ভাজাভুজিই বেশি খাও কেন?

সুষমাব দু'চোখে বিস্ময়েব ছায়া। তাব থেকেও বেশি ওব কাকা আব কাকীমাব চোখে।

—থেকে থেকেই জলতেষ্টা পায, আব সবসময কিছু না কিছু চিবুতে ইচ্ছে কবে—তুমি কি চিবোও, পান না সুপুবি না মৌরি?

ওব কাকীমা বলে উঠল, এই তিনটেব যা পায় তা-ই মুখে নিযে চিবোয —কাঁচা পান পর্যন্ত।

গল্প থামিয়ে আমাব দিকে চেযে অবধূত হেসে বললেন, এই ঝাপ-তালকে আপনি যেন আবার অলৌকিক ক্ষমতা ভাববেন না—সব নার্ভ-টেনশনের বোগীব বেলাতেই এ-সব লক্ষণ কম-বেশি খাটে। খাটে আমিও জানি। তবু অলৌকিক না হোক ক্ষমতা কিছু আছে সেটা মনে মনে অন্তত স্বীকাব না কবে উপায নেই। হরিদ্বারে যাবার পথে আমাব স্ত্রীব মুখ আব কপালে শোকের ছায়া দেখেছিলেন, মেয়ের জিভের বঙ দেখে লিভারের গোলযোগের কথা বলেছিলেন। উনি বলেন এগুলো শিক্ষা আব অভ্যাসের ব্যাপাবে, চেষ্টা করলে সকলেই বপ্ত করতে পারে। কিন্তু গত এক-দেড় বছর ধরে এই চেষ্টার এত নজির দেখলাম যে মাঝে-মাঝে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

কথা না বাড়িয়ে বললাম, জানি, তারপর?

তারপর অবধূত কল্যাণীকে বললেন, সুষমাকে তার পুজোর ঘরে নিয়ে যেতে।

মেয়েটির কাকা-কাকীমার প্রতি তাঁর মুখ-ভাব প্রসন্ন নয়। এটুকুও তাদের সীরিয়াস করে তোলার জন্য। মন্তব্য করলেন, এবারে সময়ে ধরা পড়েছে তাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পেরেছেন, ফের যদি চেষ্টা কবে আট-ঘাট বেঁধেই করবে, কিছু করার সুযোগ না-ও পেতে পারেন। সুষমার কাকা-কাকীমা আঁতকেই উঠলেন। কারণ আত্মহত্যার চেষ্টাব খবর শুনে মানসিক চিকিৎসকও তাদেব সতর্ক কবে দিয়েছেন, সর্বক্ষণ চোখ রাখতে বলে দিযেছেন।

সুষমার কাকীমা বলে উঠল, আবারও এই চেষ্টা কববেই বলছেন?

—করবেই বলছি না, করলে শক্ত ব্যাপারে হবে, আর আপনাবাও ফ্যাসাদে পড়তে পাবেন।

মহিলার ঘেমে ওঠাব দাখিল।—প্রভাদি বলেছিলেন আপনি আব মাতাজী হাতে নিলে আব চিন্তা নেই, আপনাবা দযা কবে কিছু বিহিত করুন।

অবধূত প্রভা ঘোষেব দিকে তাকালেন, এ-বকম কাউকে বলবে না, আমাদের নিজেদেব কারো কোনো ক্ষমতা নেই।...আজ মঙ্গলবার, শ্মশানে থাকব জানোই তো, সুষমাকে নিয়ে কাল বিকেলেব দিকে এসো...আজকেব রাতটা ওকে শ্রীবামপুবে তোমার কাছে রাখাব সুবিধে হবে?

প্রভা ঘোষ তক্ষুণি মাথা নাড়লেন, কেন হবে না, ওকে আমি সমস্ত বাত বুকে আগলে বাখব—

—এক বাত বাখবে কি কত বাত সে আমি কাল বলব। কাকা-কাকীমাব দিকে ফিবলেন, আপনাবাও কাল বিকালেব দিকে আসবেন, এখন কলকাতায় ফিবে যান।

তাবা উঠে ভাইজিব সঙ্গে দেখা কবতে আর ঠাকুব প্রণাম করতে কল্যাণীর ঘবে এলো। এসে স্তব্ধ, হতবাকও।...মাতাজী মেঝেতে সুষমাকে কোলে নিযে বসে আছেন, দুজনেবই দৃষ্টি মাযেব পটেব দিকে। সুষমাব দু'গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।

...না, আজ অনেক বছবেব মধ্যে কাকাবা বা কাকীমাবা বা বাড়ির কেউ এ-মেযের চোখে কখনো জল দেখে নি, তাকে কাঁদতে দেখে নি।

আমি বোকাব মতো জিজ্ঞেস কবে বসলাম, এটা হলো কি কবে...কল্যাণী দেবী কিছু কবেছেন?

—যা ঘণ্টা, মনস্তাত্ত্বিক লেখক হয়েও এটুকু বুঝলেন না। বাবো বছর বয়সের মধ্যে বাবা-মাকে খুইযে তেইশ বছব বয়সে কল্যাণীব কোলে বসে মেয়েটা মাযেব কোলে বসাব স্বাদ পেয়েছে—কাঁদবে না।

...পবদিন বিকেলেও কল্যাণী সুষমাকে নিযে ঠাকুবঘবে বসেছেন। এ-দিকেব ঘরে তার কাকা-কাকীমা শ্রী-শ্রীমতী ঘোষ দম্পতীকে নিয়ে অবধূত। না, তাঁকে শ্মশানে বসে সুষমাকে নিয়ে কোনো চিন্তাই করতে হয় নি। তিনি অবধারিত জানেন ওই সুলক্ষণা মেয়ের যন্ত্রণার কাল শেষ হযেছে। জানেন এই মেযের সুখের সংসাব হবে। কিন্তু সকলকে তিনি নিশ্চিন্ত করলেন অন্যভাবে। বললেন, আপনাদের এই মেয়েকে সম্পূর্ণ সুস্থ করাব ভার আমি নিলাম, খুব বেশি হলে তিন-চার মাস লাগবে। আমি ওষুধ দেব আর মাতাজী দীক্ষা দেবেন...কিন্তু একটা নির্দেশ আপনাদের মানতে হবে, সুষমা আপনাদের কাছে এখন আর কলকাতায় ফিরে যাবে না, ওর চেঞ্জ

অফ এনভায়রনমেন্ট দরকার—এই ক'টা মাস ও শ্রীরামপুরে প্রভার কাছে থাকবে, চিকিৎসা ওর মারফতই হবে, তাছাড়া ওদের গাড়ি আছে, সপ্তাহে দু'তিন দিনও ওকে মাতাজীর কাছে নিয়ে আসতে পারবে।

...সুষমার কাকা-কাকীমা মনে মনে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন। চেঞ্জ অফ এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশ বদলের জন্য সুষমাকে কিছুকাল বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া আর রাখার কথা মানসিক চিকিৎসকও বলেছিলেন। কিন্তু অত সময় কারো নেই, অত গরজও না। মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা না করলে একই ভাবে দিন গড়িয়ে যেত। মনে মনে তারা হাঁপ ফেলে বাঁচল। এর মধ্যে দৈবাত কোনো অঘটন ঘটলেও পুলিশ তাদের তাড়া করবে না—যে দিন-কাল। কাকাটি বিগলিত হয়ে বললেন, প্রভাদি দয়া করে যদি রাজি হন...খরচ-পত্র যা লাগে দেব—

প্রভা ঘোষ একটু ধমকের সুরে বলে উঠলেন, এখানে এসে টাকা-পয়সার নামও মুখে এনো না, বাবার হুকুম হয়েছে যখন প্রভাদির ঘাড়ে কটা মাথা যে রাজি হবে না!

মনে মনে ভাবছিলাম এ সেই প্রভা ঘোষ, মাত্র একটা বছর আগে তাঁর কি উগ্র রুক্ষ আর সন্দিগ্ধ মূর্তি না দেখেছিলাম।

...অবধূত তারপর সকলকে নিয়ে এইদিনও কল্যাণীর পুজোর ঘরে এলেন। এদিনও সুষমা তাঁর কোলে বসে। কাঁদছে না, চাউনি আগের দিনের তুলনায় সজাগ। কল্যাণীর কোল থেকে নেমে মাটিতে বসল। অবধূত বললেন, শোনো মেয়ে, তুমি ধরা পড়ে গেছ, তোমার সত্তা ঈশ্বরের আশ্রয় খুঁজছে, কিন্তু এত বোকা তুমি এটা জান না, সেই আশ্রয় মৃত্যুর রাস্তায় মেলে না—জীবনের রাস্তা ধরলে তবে মেলে—ওই যাঁর কোলে বসেছিলে তিনিই তোমাকে সেই আশ্রয়ের ঠিকানা বলে দেবেন—কিন্তু মাসকয়েক এখন তুমি আর কলকাতায় তোমার কাকা-কাকীমাদের কাছে থাকতে পারছ না—ওই শ্রীরামপুরের মাসির কাছে থাকবে আর তোমার এই মাতাজীর কাছে থাকবে—ভবিষ্যতে আমার এখানকার অনেক দায়-দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে, বুঝলে? এমনি-এমনি আমরা কারো জন্য কিছু করি না—পারবে তো?

অবধূত বললেন, আশায় আর অবিশ্বাস্য আনন্দে মেয়েটার বিভ্রান্ত চোখ-মুখ কি-রকম হয়ে উঠল যদি দেখতেন!

...যাবার আগে সুষমার কাকীমা অবধূতকে বললেন, আমরা তাহলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাচ্ছি?

দরমার গেটটা খুলতে খুলতে অবধূত জবাব দিলেন, খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারছি না...মেয়েটার ভালো বিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি...এখন থেকেই পাত্রের খোঁজে থাকার তোড়জোড় করতে পারেন।

কাকীমাটি প্রথম থতমত খেল, তারপর হেসে উঠে উৎফুল্ল মুখে বলল, তাই নাকি! তাহলে আর আমরা কেন, আপনি নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবেন।

...আমার আরো কিছু শোনার ছিল, শোনা হলো না। সুষমা প্রসঙ্গে শুরুতেই উনি বলেছিলেন, মনের ছোঁয়া পেলে আর ছেলে বা মেয়ের একজন রিপালসিভ হলেও র‍্যাপর্ট্ হয় এই মেয়েকে নিয়ে এখন তাঁর সামনে সেই এক্সপেরিমেন্ট।

...কালো হলেও মেয়েটা মিষ্টি, তাহলে কুৎসিত ছেলেটাই হবে।...সে কে? লোকজন আসা শুরু হয়ে গেছে। বিকেলের আলোয় অনেক আগেই টান ধরেছিল। এখন সন্ধ্যা। একজন দুজন করে যারা আসছিল, অবধূতকে প্রণাম করে সোজা ভিতরে চলে যাচ্ছিল। তাই আমাদের আলাপে ছেদ পড়ে নি। কিন্তু এবারে একসঙ্গে অনেকে এসে গেল। প্রথমে বীরেশ্বর ঘোষের গাড়ি। তিনি তাঁর ছেলেরা ছেলের বউরা নাতি-নাতনিরা সকলেই হাজিব। তাবপব যারা এলো তারা শুনলাম সুষমার কলকাতার কাকা-কাকীমা আর তাদের ছেলে-মেয়ের দল। এখন তারাও অবধূত আব মাতাজীর ভক্ত।...গতবারের দেখা আর না দেখা একে একে আরো অনেক মুখ। কিন্তু এদের মধ্যে কুৎসিত কোনো মুখ চোখেই পড়ল না। তাবপর হেড-লাইট জ্বেলে গেটের সামনে আরো দুটো ঝক-ঝকে গাড়ি। একটা বিলিতি একটা দিশি। বিলিতি গাড়ি থেকে নামলেন বতনলাল সাবাওগি, তাঁর স্থূলাঙ্গী স্ত্রী আব এক ছেলে। অন্য গাড়িতে দ্বিতীয় ছেলে, তার সেই মামা, আরো জনা কযেক মেয়ে পুরুষ। তাদেব সঙ্গে দুই গাড়ি থেকে নামল বাশীকৃত ফুল, ধূপেব বাক্স, একের পর এক মিষ্টির হাঁড়ি আর ঝুড়ি।

দাওয়ার সিঁড়িব সামনে দাঁড়িযে চাপা গলায় অবধূত বললেন, এই পুজোব সমস্ত খরচ রতনলাল সারাওগি দিতে চেয়েছিল, আমি শুধু বলেছি কিছু করতে হবে না, একটা বিলিতি মাল শুধু নিযে আসবেন...আনল কিনা কে জানে।

আমি হেসে ফেলেছি।

...কলকাতায় ফিরেই আমি ফোনে বতনলালেব খবর জানতে চেয়েছিলাম। অবধূত হেসে বলেছিলেন, কালীপুজোয় আসছে, কেমন আছে নিজের চোখেই দেখবেন। পরে বলেছেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তাবের পুরো টিম ওকে দেখে রায় দিয়েছে তার ব্যাধি নির্মূল।

—আর হাসপাতালেব টাকা?

—দুই হাসপাতালেব নামে পনেবো লক্ষ টাকার চেক আমার মারফৎ পাঠাতে চেয়েছিলেন, কে ও-সব দাযিত্ব নিয়ে ঝামেলা পোয়ায মশাই, গরিবের জন্য আমি কিছু টাকা পাইয়ে দিয়ে খালাস।

সাবাওগিবা সব অবধূতেব পায়ে লুটিয়ে পডে প্রণাম কবলেন। এই ভক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক-ফাঁকি নেই। টিপ্পনীব সুরে অবধূত এক ফাঁকে বললেন, আমরা কি করে গড-ম্যান হয়ে যাই লক্ষ্য করুন।

ব্যবস্থা সব আগের বারেব মতোই। পুজোর আগে সকলের খেয়ে নেবাব পর্ব। আয়োজনও গত বারের মতোই। পোলাও মাছ ভাজা মাংস আর চাটনি। নিরামিষাশীদের পোলাও বেগুন ভাজা ছানার ডালনা চাটনি। বাডতিব মধ্যে এবারে শেষ পাতে সারাওগির আনা মিষ্টি। পেটো কার্তিক আর তার দুই বন্ধু যোগান দিচ্ছে, কিন্তু পরিবেশনে এবার মাতাজী একা নন, সুবর্ণকে নিয়ে প্রভা ঘোষও নেমে গেছেন। তিনি আগেই ঘোষণা করে রেখেছেন বাকি সকলকে নিয়ে তিনি পরের ব্যাচে বসবেন। তাঁর মাতাজী আপত্তি করেন নি।

ভিতরের পরিষ্কার বড় উঠোনে সকলের পাত পড়েছে। নিরামিষাশীদের দু'তিন

হাত তফাতে। লক্ষ্য করলাম, কোটিপতি সারাওগি বা তাঁর আত্মীয় পরিজনেরাও মাটিতে বসে পরম ভক্তি ভরে খাচ্ছেন। অবধূতের মেজাজ এখন রীতিমতো প্রসন্ন। খানিক আগে আধঘণ্টার জন্য তিনি আমাকে নিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছিলেন। সারাওগির আনা বিলিতি বোতলের আর্ধেক শেষ করে দরজা খুলেছেন। ছ'আনা তিনি জঠরস্থ করেছেন, আর ভয়ে ভয়ে দু'আনা আমি। বলেছেন, আজকের দিনে তো কারণ পান বিধি মশাই, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন। খেতে বসেও তিনি কার্তিকের সর্দারি নিয়ে রসিকতা করেছেন। সকলকে শুনিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন গেল বাবেব তুলনায এবাবে প্রভা ঘোষকে অন্য-বকম দেখছি কিনা। গত পুজোয় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই হেসে উঠল। শ্রীমতী ঘোষের সপ্রতিভ মুখ লাল একটু। ধমকের সুরে কল্যাণী বললেন, মুখ বন্ধ করে খাও তো এখন!

অবধূতের খাওয়া থেমে গেল। অসহায় চোখে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আপনাদের মাতাজীর হুকুম শুনলেন মহাশয মহাশয়াবা? মুখ বন্ধ করে খেতে হলে কেবল বাতাস ছাড়া আব কিছু খাওযা যায কিনা বলে দিতে পারেন? খেতে হলে গোরুকেও মুখ খুলে খাবার মুখে নিতে হয়—হাসি আব আনন্দেব ছোঁয়া এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। কল্যাণীও হাসছেন। খানিক বাদে আবার একটু অন্য ধাঁচের খুশিব খোবাক পেল। সুষমা ধীর স্থির মেয়ে তার পবিবেশনও ধীবে সুস্থে। ফলে তার দিকেব কারো কারো পাত খালি। তাই দেখে পেটো কার্তিক তার হাত থেকে পোলাওযেব বালতিটা টেনে নিল, আর ব্যস্ত সমস্ত মাতব্বরেব মতো বলে উঠল, দিন দিন, হয়েছে—এ-ভাবে পরিবেশন কবলে খাওয়া হতে রাত দেড়টা বাজবে—সর্ব কর্ম মেয়েদের দিযে হলে আব কথা ছিল না—

পোলাওয়ের বালতি ছেড়ে দিয়ে সুষমা অপ্রস্তুত হযে দাঁডিযে বইলো। সঙ্গে সঙ্গে ও-দিক থেকে কল্যাণীর ঈষৎ তপ্ত গলা, কি বললি তুই—কি বললি?

ঘর্মাক্ত মুখে পেটো কার্তিক দাঁড়িয়ে গেল। তাবপব ঠক কবে পোলাওযেব বালতি মাটিতে নামিয়ে রেখে দুই হাতেব উল্টোদিক দুই কানে ঘষে বলল, এই কান মলছি—হলো? বালতিটা আবাব তুলে নিয়ে তেমনি মেজাজের সুবে সুষমাকে বলল, দয়া করে দাঁড়িয়ে না থেকে মাংসের বালতিটা এদিকে আনাব ব্যবস্থা করুন—

খালিপাতে হাতা ভরে ভরে পোলাও দিতে লাগল।

ওদিক থেকে আবার কল্যাণীর মন্তব্য শোনা গেল, আজ আমাব সঙ্গে কার্তিকেরও অমাবস্যার উপোস তো, তাই ওর মেজাজ ভালো নেই—পরিবেশন করা মাথায় উঠল, কার্তিকের গলা দিয়ে একটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো।—আমাব উপোস। আমি তো জানি না! তারপরেই দ্রুত এগিয়ে এসে পোলাওযেব বালতি আবার সুষমাব হাতে ধরিয়ে দিল।—নিন, পরিবেশন করে রাত কাবার করুন, আমার ঘাট হয়েছে —বাপরে বাপ!

সকলে সরবে হাসছে এবার। অদূরে কোটিপতি সারাওগি দম্পাতির দিকে চেয়ে মনে হলো মাটিতে বসে এমন আনন্দ আর তৃপ্তির খাওয়া তারা খুব বেশি খান নি। সে-কথা বলে তাঁদের দিকে অবধূতের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর এক রসের অবতারণা করলেন। ডেকে বললেন, সারাওগি সাহেব আপনাকে এ-ভাবে

সকলেব সঙ্গে খেতে বসতে দেখে আমার এই লেখক বন্ধু বলছেন, কমিউনিজম-এ ধর্মের জাযগা নেই, কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্টদের কেউ আজ এখানে থাকলে বুঝত, গণসাম্যবাদেব এমন ভালো প্ল্যাটফর্মও আর দ্বিতীয় নেই—এখানে এলে সকলেই সমান, কি বলেন?

রতনলাল সাবওগি হাসিমুখে জবাব দিলেন, তাই তো দেখছি।

বাত সাডে দশটার মধ্যে সকলের খাওযা-দাওযা শেষ। কিন্তু এবাবেব কালীপুজো বাত দেডটায। অনেক দেবি। বোঝা গেল সকলেই এখানে থেকে যাওযার লোক। সারাওগিবা পর্যন্ত ফেবাব নাম কবলেন না। কথায কথায অবধূত জানালেন, পুজোর সঙ্গে এবাবে একটা আহুতি-যজ্ঞ হবে, আপনাবা যে-যাব ইষ্টব পথে বাধা অর্থাৎ অনিষ্ট আহুতি দেবেন।

—আপনাব স্ত্রী করবেন?

—আব কে...।

আধ-ঘণ্টা গল্পগুজবেব পব অবধূত আবাব আমাকে নিযে তাঁব নিজস্ব ঘবে ঢুকলেন। বললেন, শত্রুব শেষ না হওযা পর্যন্ত শান্তি নেই মশাই—শত্রু বলতে বিলিতিব বোতলেব বাকিটুকু। ধীবে সুস্থে চলল। এবাবে আমিও কমে অব্যাহতি পেলাম না। আবো ঘণ্টাখানেক বাদে নিশ্চিন্ত হযে দবজা খুললেন।

—চলুন আযোজন কদ্দূব দেখি।

পুজোব ঘরটা হলঘবেব মতো বড। ওটাব ভিতবেব দিকেব দবজা ববাবর আঙিনাব খানিকটা জাযগা ছেডে সকলকে খেতে বসানো হযেছিল। এখন তার কাবণ বোঝা গেল। দবজা ববাবব আঙিনাব ওই জাযগাতে আহুতি-যজ্ঞ হবে। ইটের দুহাত প্রমাণ-চৌকো যজ্ঞ-কুণ্ডে পেটো কার্তিক বালি ফেলছে আব ছোট একটা টিনেব পাত দিযে চাব-দিক সমান কবছে। কল্যাণী পাশে দাঁডিযে তদাবক কবছেন। শেষ হতে দেখা গেল বালুব স্তরও প্রায বিঘতখানেক পুরু হবে। সব-দিক সমান হলো কিনা ভালো কবে দেখে নিযে কল্যাণী কুণ্ডেব বাইরে মাঝামাঝি জাযগায দুই হাঁটুব ওপব জানু-আসনে বসলেন। পবনে টকটকে লাল চওডা পাডেব গবদেব শাডি, গাযে গবদেব ব্লাউজ। স্নানার্দ্র ছডানো চুল পিঠেব ওপব দিযে মাটি ছুঁয়েছে। কুণ্ড-বচনাব কারু-কার্য দেখব না তাঁকে দেখব? দুই-ই দেখছি। হাতেব সরু বড একটা বেল-কাঁটা দিযে যজ্ঞ-কুণ্ডেব পালিশ কবা বালুব ওপব নানাভাবে দাগ কাটতে লাগলেন। তাব পাশে পেটো কার্তিক দাঁডিযে, আমবা সামনে।

অবধূত বললেন, ওই দাগগুলোতে পঞ্চ-গুঁডি পডলে কি দাঁডায় দেখুন।

হাসিমুখে টিপ্পনীর সুরে কল্যাণী বললেন, বোতলে আব অবশিষ্ট কিছু নেই বুঝি. তাই এখানে--

অবধূত আমাব মাথাটা টেনে নিযে কানে কানে বললেন, সুবার পরেই তো নাবী...কি বলেন?

তাই দেখে কল্যাণী মুখ নামাতে গিয়েও নামালেন না, সন্দিগ্ধ চাউনি।—আ-কথা কু-কথা হচ্ছে বুঝি?

সামলাতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, না...ভালো কথাই।

—ওঁর না-হয় পাপ-পুণ্যির পরোয়া নেই, আপনারও কি নেই?

অর্থাৎ আমি চোরের সাথী গাঁট-কাটা। হাসিমুখেই কাজে মন দিলেন। পেটো কার্তিককে তাঁর পাশে ছোট ছোট পাঁচটা মোড় খুলতে দেখা গেল ওতে পাঁচ রকমের রঙের গুঁড়ো—লাল, বেগনে, হলুদ, সাদা, সবুজ। এক-এক দাগে এক-এক রকমের রঙ দিতে দিতে যা দাঁড়ালো, দেখে সত্যিই শিল্পীর কাজ মনে হলো আমার। বেদীর ওপর মস্তবড় সুন্দর একখানা অষ্টদল পদ্ম।

আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাঃ!

অবধূত বাধা দিয়ে উঠলেন, অত উচ্ছ্বসিত হবেন না মশাই, ওখানকার আগুনে একখানা ভালো জিনিস উপহার দিতে হবে মনে রাখবেন—আচ্ছা, কার কি দোষ আহুতি দিচ্ছ তা প্রত্যেককে বলে-বলে দেবে তো?

স্মিত মুখে অষ্টদল পদ্মের চারদিকে চার রঙের বেখা টানতে টানতে কল্যাণী জবাব দিলেন, তোমাব কি আহুতি দেব এক্ষুণি বলে দিতে পাবি—সংশয়। মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, আপনারও তাই...তবে দু'জনেরটা দু'রকমের।

অবধূত গম্ভীর।—কি বুঝলেন মশাই?

আমার নিরীহ জবাব, বুঝে কাজ কি?

বেলপাতার ডাল থেকে মনের মতো একটা ত্রি-পত্র বেছে নিতে নিতে কল্যাণী বললেন, মায়ের সম-দৃষ্টি, বোঝার প্রারব্ধ থাকলে তুমিও বুঝবে উনিও বুঝবেন।

অবধূতের তর্কের মুড।—সম-দৃষ্টি প্রাবব্ধ এ-ও তো দুর্বোধ্য শব্দ।

পেটো কার্তিক বেল-কাঠ চূড়ো করে সাজাচ্ছে আর মা-বাবার কথায় মজা পাচ্ছে। বিল্ব ত্রি-পত্র একটু আড়াল করে কল্যাণী আঙুলে করে তাতে কিছু আঁকলেন কি লিখলেন জানি না। হাসছেন মিটিমিটি। ত্রি-পত্রটা অষ্টদল পদ্মের মাঝখানে উপুড় করে প্রথমে আমার দিকে পরে অবধূতের দিকে তাকালেন। জবাব দিলেন, কিছুই দুর্বোধ্য না। একই প্রদীপের আলোয় একজন মন দিয়ে গীতা-ভাগবত পড়ছে, আর একজন তেমনি মন দিয়ে সেই আলোতেই দলিল জাল করছে। প্রদীপের আলোটা হলো মায়ের সম-দৃষ্টি, আব যে যা করছে সেটা প্রারব্ধ।

কল্যাণীকে দেখলে চোখ জুড়োয়, কিন্তু তাঁর কথা শুনে কানও এমন জুড়োয় ধারণা ছিল না। অবধূত ঘটা করে নিজের স্ত্রীকেই দেখছেন। আমার দিকে ফিরলেন। —কি মশাই আব সাহিত্য করবেন না ছেড়ে দেবেন?

লজ্জা পেয়ে কল্যাণী ধমকের সুরে বলে উঠলেন, তুমি ওঁকে নিয়ে এখন যাবে এখান থেকে! এই কার্তিক, তুইও যা এখন—

—চলুন সরে পড়া যাক। আড়ালে এসে অবধূত হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত সুরে জানান দিলেন, যজ্ঞ-কুণ্ড বেদীতে যোনি-চিহ্ন আঁকা হবে এখন, তারপর বেলপাতা চাপা দেওয়া হবে—তাই গলা ধাক্কা।

পুজোর পরে যজ্ঞ হবে, যজ্ঞের পরে আরতি এবং মঙ্গলানুষ্ঠান। পুজোর সময় গেলবারের মতোই আমি আর অবধূত বাইরের বারান্দায় এসে বসেছি। উনি কথা-বার্তা কম বলছেন, পর পর সিগারেট টেনে চলেছেন। ভরা খাওয়ার আগে আর

পবে বোতলেব জিনিস যে পরিমাণ উদবস্থ কবেছেন, আব কেউ হলে ঘুমিয়ে পডত। থেকে থেকে আমাবই ঝিমুনি আসছিল। উনি আমাব তিনগুণ খেয়েছেন, কিন্তু চোখে ঘুমেব লেশমাত্র আছে মনে হয় না।

একবাব জিজ্ঞেস কবলাম, কিছু যেন ভাবছেন মনে হচ্ছে?

বাবদুই সিগাবেটে টান দিযে ওটা সামনেব উঠোনে ছুঁডে ফেলে জবাব দিলেন, ঠিক ভাবছি না, বাব বাব একটা কথা কেবল মনে আসছে—এ-সব কেন, আমি কেন, আপনি কেন, এইবকম—

হাল্কা সুবে বললাম, শ্রীবামকৃষ্ণ তো বলে গেছেন সব ঈশ্ববকে জানাব জন্য, সেটাই বিশেষ জ্ঞান আব বিজ্ঞান।...কিন্তু শুনেছি কর্মেব শেষে এ-সব প্রশ্ন মনে আসে, আপনাব এখনই মনে আসছে এটা ভালো কথা নয়—

আব একটা সিগাবেট বাব কবে শলাইযেব বাক্সে ঠুকছেন। মনে হলো এই মুহূর্তে উনি নিজেব মধ্যে নেই। চোখেব দৃষ্টি যেন সামনেব অন্ধকাবেব ভিতব দিযে অনেক দূবেব কোথাও উধাও। প্রায মিনিটখানেক বাদে তেমনি বিমনাব মতো সিগাবেট ধবিযে বললেন, তাব কিছু বাকি আছে, অন্তত সামনেব বছবেব গোডাব দিক পর্যন্ত, দেখা যাক...

কি কথায কি কথা। আমি কি বলেছি সে কি ওঁব কানে গেছে। উদগ্রীব হযে জিজ্ঞেস কবলাম, কিসেব কিছু বাকি আছে, সামনেব বছবেব গোডাব দিক পর্যন্ত কি?

আত্মস্থ হলেন আব হেসেও উঠলেন। বললেন, সামনেব বছব গোডাব দিকে আমাব একটি কর্মেব গাছে ফল ধববে, সেটা বিষ ফল কি অমৃত ফল দেখা যাক। সেই টানে বাঁধা পডে আছি, তাবপবে আব বোধহয কল্যাণীকে আটকানো যাবে না। চলুন, ও-দিকে যজ্ঞ শুরু হচ্ছে—

আমাব ভিতবটা কি-বকম দমে গেল। সবটাই দুর্বোধ্য লাগছে। তিনি কি অশুভ কিছু ইঙ্গিত কবলেন? কোন ফলাফল দেখাব পব কল্যাণীকে আব আটকানো যাবে না? আটাকানো যাবে না মানেই বা কি?

সকলে যজ্ঞেব সামনেব উঠোনে জমাযেত হযেছে। কেউ কেউ দাওযায বসে। পেটো কার্তিক আমাদেব জন্য দুটো চেযাব এনে দাওযাব অন্য ধাবে পেতে দিল।

মৃদু-মন্ত্রপাঠেব সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী কুণ্ডে আগুন দিলেন। বেলকাঠেব ওপব ঘি ঢাললেন। আগুন বাডতেই থাকল। আগুনেব তাপে সামনেব মেযে-পুরুষেবা সবে সবে যেতে লাগলেন। কিন্তু কল্যাণী ঠায তাঁব সামনে বসে। আগুনেব তাপে সমস্ত মুখ অগ্নিবর্ণ। মহিলা আমাব কেন সকলেব চোখেই এখন বোধহয বড বিচিত্র-রূপিণী। মন্ত্রেব সঙ্গে সঙ্গে হোমাগ্নি ছডাচ্ছেন, তপ্ত বাতাস সুগন্ধে ভবপুব। আমাব ভয হচ্ছে যজ্ঞেব আগুনে কল্যাণীব সোনাব ববণ অঙ্গ না জ্বলেই যায। অবধূতেব দিকে তাকালাম। তিনি নিরুদ্বিগ্ন, স্থিব নিশ্চল।

না, আহুতি দেবাব জন্য কল্যাণী সকলকে ডাকলেন না। নিজেই যজ্ঞ-কাষ্ঠ তুলে নিযে এক-একবাব মেযে-পুরুষদেব দিকে চেযে নিজেই মঙ্গলাহুতি দিলেন। আব পেটো কার্তিককে ডেকে নিযে আহুতি দেওয়ালেন। পেটো কার্তিকেব পব

সুষমাকে দিয়ে। তারপর ওই দূর থেকে সোজা তাকালেন অবধূতের দিকে। উনি উঠলেন, এগিয়ে গেলেন। স্ত্রীর হাত থেকে যজ্ঞ-কাষ্ঠ হাতে নিলেন। আহুতি দিলেন। তারপরেও সেখানেই বসে রইলেন।

...অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা এখানে বড় কিছু নয়, আমার মনে হলো এতগুলো মানুষের কোনো অদৃশ্য আবেগ মিলিত হয়ে অদ্ভুত নিটোলভাবে স্থির হয়ে আছে। কারো চোখে পলক পড়ছে না। সকলের দৃষ্টি ওই মহিলার আগুনের মতোই লালচে মূর্তির দিকে।

...একটা বেল-কাঁটা কল্যাণী নিজের কড়ে আঙুলের ওপর রেখে একটু জোরে টেনে নিলেন। অন্য আঙুল দিয়ে ওই আঙুলটা চেপে আহুতি বস্ত্রের ওপর ধরতে দেখলাম টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। বেশ কয়েক ফোঁটা পড়ার পর একটা নারকেল তুলে সেই রক্তাক্ত আহুতি বস্ত্রে বেশ করে মুড়ে কুণ্ডের জ্বলন্ত আগুনের সামনে ঠেসে বসিয়ে দিলেন। পূর্ণাহুতি শেষে যজ্ঞকুণ্ডে গঙ্গাজল ঢেলে ধীর পায়ে তিনি আবার পুজোর ঘরের দিকে চললেন।

গেলবারের মতোই আরতি-পর্ব। কিন্তু আমার কাছে দু'চোখ ভরে দেখার মতোই নতুন। পেটো কার্তিক ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছে। হল-ঘর আবছা অন্ধকার। দক্ষিণা কালীর সামনে দুটো প্রদীপের আলোয় কল্যাণীর মুখখানাই কেবল জ্বলজ্বল করছে। শুধু হাতের ওপর তুলোর প্রদীপ জ্বলে জ্বলে ছোট হচ্ছে, শঙ্খ-শুভ্র দুই সুঠাম বাহু মায়ের মূর্তির সামনে উঠছে নামছে ঘুরছে ফিরছে। এরপর তেমনি খালি হাতের চেটোয় কর্পূর জ্বালিয়ে কর্পূর-আরতি, বাঁ-হাতের ঘণ্টা বাজছে। তারপর তেমনি শূন্য হাতে চামর দোলানো আর হাতের শঙ্খমুদ্রায় শঙ্খ আরতি। শঙ্খমুদ্রা মুখে ঠেকিয়ে দীর্ঘ রবে তিনবার সত্যিকারের শঙ্খই বেজে উঠল যেন।

ভোর-ভোর। বিদায় পর্বে প্রায় সকলের চোখেই জল দেখেছি। কোটিপতি সারাওগিরা সকলেই কাঁদছেন। রতনলাল ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছলেন। যাবার আগে আমার দুহাত ধরে বললেন, জীবন সার্থক হলো, বাবা দেওতা, মাতাজী দেবী...আপনি বাবার পেয়ারের বন্ধু, আপনিও ভাগ্যবান।

চোখে জল সুষমার কাকা-কাকীমাদেরও দেখেছি।

অবধূতের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ভাগ্যের কথা সেটা এখন বিশ্বাস করি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ভাগ্যের থেকে অনেক দূরে সরে আছি। সহজ মানুষ সহজ বিশ্বাসে মাতোয়ারা হয়, অনায়াস সমর্পণে আত্মশুদ্ধি করে নিতে পারে। সেটা সাময়িক হলেও অনন্তকালের সূচ্যগ্র অংশ তো বটে। কিন্তু আমার কি দশা। স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস দূরের বস্তু, সমর্পণ কাকে বলে জানি না।

মাতাজী কল্যাণী কি ভিতর দেখতে পান? তিনি বলেছিলেন সংশয় আহুতি দেবেন। নিজের স্বামী অবধূতকেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু কোথায় অবধূত আর কোথায় আমি!

আমাদের যাওয়া দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। নিরিবিলিতে পেয়ে এর মধ্যে বারকয়েক অবধূতকে জিজ্ঞাসা করেছি, কাল রাতে আপনি কর্ম, কর্ম ফল দেখা, তারপর আর কল্যাণীকে আটকানো যাবে না—এ-সব কি বলছিলেন?

হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। একবার বলেছেন, কাল রাতে মাল কতটা পেটে পড়েছিল সে খেয়াল আছে আপনার?

শেষে মিনতি করে বলেছি, শুধু এ-টুকু বলুন, অশুভ কিছু নয় তো?

—অশুভ। জোরেই হেসে উঠেছেন।—আরে মশাই, কোনো অশুভ কল্যাণীর ত্রি-সীমানায় ঘেঁষে না, বুঝলেন? ঘেঁষলেও তার দায় এখনো তাঁর শিবঠাকুর কংকালমালী ভৈরবই নিজের হাতে তুলে নেন—এ আমার প্রত্যক্ষ করা সত্য—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

...মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, দূর-নীরিক্ষে যাবার জন্য মহাকাশ-স্টেশন স্থাপন করেছে-—এ-যুগ বিজ্ঞানের জয়-জয়কারের যুগ। কিন্তু পৃথিবীর কোণে কোণে অনন্তকাল ধরে আত্ম-দর্শনের এই যে সাধনা চলেছে—এ-ও বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান নয় বলে তো মন থেকে ছেঁটে দিতে পারছি না!

এই দুই জ্ঞান থেকেই আমি অনেক দূরে পড়ে আছি। প্রথমটার জন্যে মনে কোনো খেদ নেই কিন্তু দ্বিতীয়টার জন্য এক-ধরনের অগোচরের অস্থিরতা আর অসহায়-বোধ কেন?

৪

পৌষ মাস। দু'দিন হলো চেপে শীত নেমেছে। সন্ধ্যার পর কি কাজ নিয়ে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল গায়ে লেপ জড়িয়ে বসতে পারলে ভালো হতো। ও-ঘর থেকে হঠাৎ মেয়ের উৎফুল্ল গলা কানে এলো, ও মা, কার্তিকদা যে, খিচুড়ির গন্ধে গন্ধে কোন্নগর থেকে একেবারে কলকাতায়।

কড়া শীতের অজুহাতে রাতের মেনু খিচুড়ি ডিম ভাজা আর ঝাল আলুর দম।

বুঝলাম পেটো কার্তিক এসেছে, কাজ আর এগোবে না।...নিজের ইচ্ছেয় যদি এসে থাকে তো রাগ বা অভিমান করে এসেছে। আর অবধূত ন্দি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কিছু খবর আছে।

খিচুড়ির নামে কার্তিকের রসনা খুব সিক্ত মনে হলো না। তারও নিরাসক্ত গলা কানে এলো, আজ খিচুড়ি বুঝি, বেশ...সার কোথায়?

—সার একটা দরকারি কাজ নিয়ে বসেছেন, এসেছ যখন তাড়া কি, এক কাপ চা খেয়ে গরম হয়ে নাও—

ওর আসার কারণ না জানা পর্যন্ত আমারই আর কাজে মন বসবে না। উঠে এলাম। কার্তিক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। এ-বেলা ও-বেলা দেখা হলেও পায়ের ধুলো নিতে ছাড়বে না। সোজা হতে মুখখানা একটু শুকনো মনে হলো।—কি খবর, রাত করে এই ঠাণ্ডার মধ্যে যে?

—কিছু ভালো লাগছিল না সার, থেকে থেকে আপনার কথা মনে হতে এসে গেলাম...

তক্ষুণি বুঝলাম কিছু ঘটেছে এবং ওর মেজাজপত্র খুব ভালো নয়। জিজ্ঞেস করলাম, জানিয়ে এসেছ না, না জানিয়ে...আমাকে আবার ফোন করতে হবে?

পেটো কার্তিক থমকে তাকালো। রাগ বা অভিমান নয়, জবাবের সুর বিষণ্ণ। বলল, জানালেই বা কি না জানালেই বা কি, আমার ওপর নোটিস তো হয়েই গেছে, আমাকে তাড়াবার জন্য দুজনেই এখন এক-কাট্টা...আমার মেয়াদ তো সামনের মাঘ মাস পর্যন্ত।

আমি কেন, মেয়ে চায়ের কথা বলতে যাচ্ছিল সে-ও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল। রাগ বা মান অভিমানের থেকেও গভীরতর ব্যাপার কিছু।

—বোসো, কি ব্যাপাব খুলে বলো তো, কে তাড়াচ্ছে...তোমার বাবা আর মাতাজী?

—তাঁরা ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে আমি কেয়ার করি? এই রাইট আব কার? মোড়ায় বসল।

ওর রাগের কথাও এমন যে হাসি এসে যায়।—ওঁরা তোমাকে তাড়াতে চান?

চট করে বুঝছি না বলেই যেন অসহিষ্ণু।—চান মানে—আর চাওয়া-চাওয়ি নেই (হাত তুলে নিজের গলা জবাই দেখালো)—ফাইন্যাল সেনটেন্স হয়েই গেছে, দিন-ক্ষণ এলেই আমাকে গলা পেতে দিতে হবে।

এবাবে আমি সতর্ক একটু। অবধূত বা তাঁর স্ত্রী কল্যাণী যদি কোনো কারণে বিরূপ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, না জেনে না বুঝে আমার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একটু বিরক্তির সুরে বললাম, ধানাইপানাই না করে কি হয়েছে সোজাসুজি বলো দেখি?

ওর মুখোমুখি খাটের ওপর বসলাম। পেটো কার্তিক একটু থমকে গিয়ে মেয়ের দিকে তাকালো। সাদা অর্থ ধরে নিয়ে মেয়ে বলল, আমি চা করে নিয়ে আসি—

পেটো কার্তিক ঈষৎ আবেগের গলায় বাধা দিয়ে উঠল, না দিদি আপনি যাবেন না, আপনিও থাকুন, আপনিও তো মেয়েই, একটা মেয়ের হয়ে বিচার বিবেচনা করুন। আমার দিকে ফিরল, আর আপনি তো মস্ত লেখক সার, গল্প উপন্যাসে উদার হয়ে কত ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই—আপনিই বলুন আমি কি একটা বিয়ে করার মতো ছেলে? কোনো মেয়ে নিজের ভিতরের ইচ্ছেয় আমাকে বিয়ে করতে চাইতে পারে? আমার এই পোড়া দাগের মুখের দিকে এই জখম আঙুলগুলোর দিকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলুন।

আমি হাঁ খানিক। মেয়ের চোখ বড় বড়। আত্মস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি দরজাব কাছে এগিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মা কার্তিকদা এসেছে, খিচুড়ির ভাগ রেখো, আর আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা পাঠাও! প্রায় ছুটে ফিরে এসে ধুপ করে আমার পাশে বসল।—তোমার বিয়ে? এই মাঘে?

সমবেদনার বদলে মেয়ের এত আগ্রহ দেখে কার্তিকের আরো আহত মুখ। ইতিমধ্যে আমি সজাগ একটু। চকিতে কিছু মনে পড়েছে।...কালীপুজোর বিকেলে অবধূত বলেছিলেন, ছেলে বা মেয়ে দুজনের একজন দেখতে কুৎসিত হলেও মনের ছোঁয়া পেলে তাদের মধ্যে ব্যাপরট্ ভালো হয়। বলেছিলেন, এই মেয়েকে নিয়ে এখন আমার সামনে সেই পরীক্ষা। মেয়ের রং চাপা কিন্তু কুৎসিত আদৌ নয়। অতএব কুৎসিত বলতে ছেলে। মনে আছে কালীপুজোর রাতে যারা উপস্থিত ছিল

তাদেব সকলকেই এই কাবণেই আমি লক্ষ্য কবেছিলাম। কিন্তু তেমন কুৎসিত মুখ একটিও দেখিনি।

...না পেটো কার্তিকেব কথা আমাব মনেই আসে নি। না আসাব কাবণ কুৎসিত সে মোটেই নয বা ছিল না। তবু দেখলে গোড়ায গোড়ায ধাক্কা লাগত। সকলেবই লাগবে। বোমাবাজীব অঘটনেব ফলে বাঁ চোখেব পাশ ঘেঁষে গালে মুখে কপালে পুবনো পোড়া দাগ, বাঁ হাতেব দুটো আঙুল আধখানা কবে নেই, দু'হাতেবই অনেকটা জাযগা জুড়ে পোড়া দাগ। কিন্তু দেখে দেখে এমন সযে গেছে যে আব ধাক্কা লাগে না বলেই চোখও পীড়িত হয না।

বাগত মুখে পেটো কার্তিক মেযেকে বলছে, দেখে মনে হচ্ছে পাবলে এক্ষুণি নেমন্তন্ন খেতে ছোটেন। সবোষে অন্য দিকে মুখ ফেবালো।

আমি বললাম, দেখছিস তো ওব মেজাজ খাবাপ, বাগাচ্ছিস কেন? গলাব স্বব মোলাযেম কবে আলতো সুবে জিজ্ঞেস কবলাম, সুষমাব সঙ্গে বিযে? এমন কবে ঘুবে তাকালো আমাব দিকে যাব সাদা অর্থ, এটট্যু ব্রুটে!! মুখেও তাই বলল, আপনিও এই ষড়যন্ত্রেব মধ্যে..আব আমি কিনা মন হাল্কা কবতে আপনাব কাছেই এলাম।

মেযে বলে উঠল, অ্যাঁ বাবা তুমি জানতে আব আমাদেব কিছুই বলো নি?

পেটো কার্তিক চুপচাপ মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। গলা দিযে ক্ষুব্ধ একটা শব্দ বেরুলো, চলি—

মেযে তাব একটা হাত ধবে ফেলল, এই কার্তিকদা বোসো বলছি।

আমিও বললাম, বোসো—আমি সত্যিই কিছু জানতাম না, কিন্তু সেই কালীপুজোব দিন সুষমাব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিযে তোমাব বাবা এমন একটু ইঙ্গিত কবেছিলেন যে আমাব বোঝা উচিত ছিল। এখন তুমি বিযেব কথা বলতেই সে-কথা আমাব মনে পড়ে গেল, আব তাইতে মনে হলো মেযেটি সুষমাই হবে।

কার্তিক আবাব গোঁজ হযে মোড়ায বসতে স্ত্রী নিজেই চাযেব ট্রে হাতে ঘবে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেযে লাফিযে বলে উঠল, মা, কার্তিকদাব বিযে—সুষমাব সঙ্গে।

থতমত খাবাব ফলে পেযালাব চা ট্রেতে পড়ল একটু। ওমনি কার্তিক বলে উঠল, দেখলেন? সত্যি যা দেখলেন?—শুনে মাসিমাব হাত থেকে চাযেব ট্রে পড়ে যাবাব দাখিল।

স্ত্রী সামাল দিতে চেষ্টা কবলেন।—না না ওব চেঁচানিব চোটে আমি ধড়-ফড় কবে উঠেছিলাম—খুব ভালো কথা তো, কবে ঠিক হলো—কোন মাসে বিযে?

—এই মাঘেই। আবাব উঠে দাঁড়িযে কার্তিক ঠাস কবে জবাবটা দিল। হাত বাড়িযে ট্রে থেকে একটা পেযালা তুলে নিযে আবাব বসল।—আমি চেষ্টা কবব এমন আঙুল কাটা গাল-কপাল পোড়া অলক্ষণেব বিযে দেখতে বাবা যেন কাউকে না ডাকেন।

—ওমা কার্তিক দেখি বেগে আছে! স্ত্রী সাত পাঁচ না ভেবেই বলে বসলেন, তা আপত্তি থাকলে তোমাব বাবাকে বলো নি কেন?

কার্তিক খেঁকিয়ে উঠল, আমার বলার কোনো দাম আছে? আমি হুকুমের দাস না? আচ্ছা, আপনিই বলুন মাসিমা, এই মূর্তিকে কোনো মেয়ে মন থেকে বিয়ে করতে চাইতে পারে?

মাসিমা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। চোখের ইশারায় তাঁকে নিরস্ত করে আমি বললাম, সুষমা তো বাচ্চা মেয়ে নয়, না চাইলে সে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে কেন?

—রাজি হচ্ছে বাবা আর মাতাজীর কথায়, তাঁরা তার চোখে দেব-দেবী।

—এত দিন তোমার চোখেও তো তাঁরা তাই ছিলেন।

বাগত মুখে কার্তিক শূন্য ট্রে-তে ঠক করে পেয়ালাটা রাখল।

মেয়ে বলল, তুমি সরাসরি সুষমার সঙ্গেই কথা বলে নিলে না কেন কার্তিকদা?

—বলতে আর বোঝাতে বাকি রেখেছি?

—অ্যাঁ? সুষমা কি বলে? আমরাও উৎসুক।

—কি আবার বলবে? একবার ব্রেন ওয়াশিং হয়ে গেলে নিজস্ব আর কিছু বলার থাকে।

মেয়ে আরো উৎসুক, তার আরো জুলুম, তবু কি বলল শুনি না?

—বলল, বাবা মায়ের দয়ায় সে আমার ভিতরের সুন্দর চেহারাখানা দেখতে পেয়েছে—কোনো মানে হয়!

আমরা হাসি চাপতে চেষ্টা করছি। কিন্তু মেয়ে ফুলে ফুলে হাসছে। শেষে হাসি সামলে বলে উঠল, ঠিক বলেছে কার্তিকদা, আর একটুও না ভেবে ঝুলে পড়।

কার্তিকের মুখ দেখে মনে হবে এই সংকটে সে সব থেকে বড় ভুলটা করেছে আমার এখানে এসে। স্ত্রী ওদিকের ব্যবস্থা দেখার অছিলায় সরে গেলেন। একটু বাদে আমি বললাম, একটা গল্প শুনবে কার্তিক?

ও বোকার মতো আমার দিকে তাকালো।

—রবি ঠাকুরের নাম শুনেছ?

—বি. এ. ফেল, নামটাও শুনব না!

—তাঁর লেখা। শোনো, সৌরসেন নামে স্বর্গের এক গন্ধর্ব ছিল, সবার সেরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে। বাজনার তালে তালে উর্বশী নাচত, আর দেব-দেবীরা বাহবা দিত। একদিন প্রেয়সী মধুশ্রীর কারণে সৌরসেনের মন উতলা ছিল, তার বাজনার তাল কেটে গেল, উর্বশীর নাচে বাধা পড়ল, দেব-দেবীরা রেগে গেল, তাদের অভিশাপে কুৎসিত বিকলাঙ্গ হয়ে সৌরসেন গান্ধার রাজার ছেলে অরুণেশ্বর হয়ে জন্মালো। মধুশ্রী শোকে অধীর হয়ে মর্ত্যলোকে আসতে চাইলো। ইন্দ্রের দয়ায় সে মদ্ররাজার ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালো। মর্ত্যে কালে দিনে বিকলাঙ্গ গান্ধার রাজ অরুণেশ্বর মদ্ররাজ কন্যা কমলিকার ছবি দেখে মোহিত। সে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। কিন্তু রাজাকে রাজ্যের লোকই চেনে না, সে থাকে সকলের চোখের আড়ালে। অথচ মস্ত রাজা আর কলাবিশারদ হিসেবে তার নাম ডাক। মদ্ররাজ খুশি হয়েই মেয়ে কমলিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি হন। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে কমলিকাকে বিয়ে করতে

গেল তার বীণা, যে বীণা তিনি নিজের কোলে রেখে বাজান।

কমলিকা স্বামীর ঘরে এসে খুব খুশি। কিন্তু রাজস্বামীকে কখনো চোখে দেখে না। রাতের অন্ধকার ঘরে তাদের মিলন হয়। রাজা বীণা বাজায় সেই বাজনা শুনে রানী কমলিকার বুক মন ভরে ওঠে। কবেকার কোন্ হারানো নাচ মনে আসে, রাজা বাজায় রানী নাচে। দুজনে দুজনের ভালোবাসায় বিভোর। কিন্তু রানীর মনে একটা বিষম দুঃখ। এমন প্রিয় রাজস্বামীকে সে চোখে দেখতে পায় না, দিনের পর দিন তার দু'চোখ বঞ্চিত। রোজ তাগিদ দেয় জুলুম করে, তার রাজাকে সে দেখবেই। রাজা নানাভাবে তাকে বোঝায়, ভোলায়। একদিন রানী বায়না ধরল, এই রাত পোহালে তোমাকে দেখবই।

...দেখল। দেখে শিউরে উঠল। কি কুৎসিত, কি কদাকার। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বনে পালিয়ে গেল সে। এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা তার অসহ্য। বনের নির্জনে রাজার মৃগয়া ঘরে সে আশ্রয় নিল।

কিন্তু রোজ রাতে রাজার বীণা বাজে। সেই বাজনা দিনে দিনে বনের ঘরের কাছে আসে। বাজনার ওই আকৃতি মূর্ছনা শুনে কমলিকা পাগল হয়ে ওঠে। ছুটে যেতে চায়। কিন্তু চোখ বাধা দেয়। ওই কুৎসিতকে সে দেখবে কি করে?

কিন্তু ওই বাজনার আকুল ডাক শুনে শুনে কমলিকা একদিন আর সহ্য করতে পারল না। প্রদীপ হাতে উঠে দাঁড়ালো। নিজের মনে বলল, আমি যাব, এখন আর আমার চোখ দুটোকে আমি ভর করি না। কমলিকা বেরিয়ে এলো। জন্ম জন্মান্তরের সেই নাচ আর সুরের মূর্ছনা তার বুকের তলায় বাজছে। কমলিকা রাজার কাছে এলো। বাজনা থামল। প্রদীপের আলো তুলে কমলিকা রাজার মুখ দেখল। বলে উঠল, প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কি সুন্দর রূপ তোমার!

মেয়ের আদ্যোপান্ত জানা, সে সকৌতুকে দ্বিতীয় শ্রোতার মুখখানা দেখছিল। পেটো কার্তিক স্থান-কাল ভুলে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত প্রশ্ন, বিকলাঙ্গ রাজার চেহারা আবার ভালো হয়ে গেল?

জবাবে একটু নিজস্ব ব্যঞ্জনা মেশালাম। বললাম, এ কি ম্যাজিক নাকি যে তক্ষুণি ভালো হয়ে যাবে। আসলে কমলিকার পূর্ব স্মৃতি সব মনে পড়ে গেছে, সেই চোখ দিয়ে রাজার ভিতরের আসল চেহারাখানা দেখছে।

যথা সময়ে বেশ আনন্দ করেই খিচুড়ি ভোজনে বসা হলো। পেটো কার্তিকের মেজাজ এখন দস্তুর মতো ভালো। মেয়ের ঠাট্টা ঠিসারায় রাগ করছে না।

শোবার ঘরে ফোন বেজে উঠল। স্ত্রী বললেন উঠতে হবে না, তোমার হলে বলে দিচ্ছি খেতে বসেছ। কিন্তু কি মনে হতে আমিই উঠলাম। যা মনে হয়েছিল তাই। ও-দিক থেকে চেনা পুষ্ট গলা।—কার্তিক আপনার ওখানে?

—হ্যাঁ। যে মন-মেজাজ নিয়ে এসেছিল, এখন ঠাণ্ডা হয়ে খেতে বসেছে।

অবধূতের প্রশ্ন, কি মন-মেজাজ নিয়ে গেছল?

সংক্ষেপে বললাম।

—খেতে বসলেও আপনি গিয়ে ওর কানটা আচ্ছা করে মলে দিন, কাপুরুষ কোথাকার, এতদিন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল, যেই ঠিক হয়েছে এখন ঘাবড়েছে।

ও ধরে নিয়েছিল এক-তরফা ভালোবাসার নৌকায় ভেসে বেড়াবে।

—বলেন কি?

—ঠিকই বলি। ব্যাপারটা প্রথমে ওর মাতাজীর চোখে ধরা পড়েছে।...মেয়েটা আড়াই মাস ধরে আছে এখানে, দেখা গেল কার্তিক সহজে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না, তার আগে সুষমা যখন শ্রীরামপুরে মাসির বাড়িতে ছিল আর চিকিৎসা চলছিল, কোনো কাজে কল্যাণী ওকে শ্রীরামপুরে পাঠালে কি খুশি। প্রভা ঘোষকে বলেছে, পারলে বাবা আর মাতাজীর কাছে ওকে একদিন অন্তত নিয়ে যাবেন, আপনি না পারেন আমি এসে নিয়ে যাব। দুই একবার এনেছে, পৌঁছে দিয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, ওর মাতাজীকে বলেছে, বাবাকে তাগিদ দিয়ে ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলুন মা, মা-বাপ মরা দুঃখী মেয়ে, এ-রকম দেখলে খুব খারাপ লাগে। কল্যাণী কি ঠাট্টা করতে রাগ করে বলেছে, ছেলে-বেলায় বাপ-মা দুই-ই খোয়ানো কি ব্যাপার জানলে বুঝতেন।

...এখানে এনে রাখার পর আমাদের আড়ালে ও-ই সুষমার গার্জেনগিরি করত, যখন যা দরকার না চাইতে এনে দিয়েছে, ইদানীং আবার মান-অভিমান হম্বি-তম্বিও করত। ব্যাপার বুঝে কল্যাণীই আমাকে বলেছে, দুটোই তো আমাদের এখন, দ্যাখো যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাক। কার্তিকের মন আগেই বোঝা গেছল, মেয়েটার মন বুঝে তবে আমি এগিয়েছি।...দায়িত্ব নেবার ভয়ে হারামজাদার এখন স্নায়ুর ধকল চলেছে।

—আপনি ফোন করেছেন ওকে বলব?

—এক্ষুণি বলবেন না। আগে ওকে বলুন, ওর বিয়ে করতে খুব আপত্তি থাকলে আমাকে বলে আপনি এখনো এ বিয়ে নাকচ করে দিতে পারেন, দেখুন ও কি বলে।

ফোন ছেড়ে বিরক্ত মুখ করে আবার খেতে বসলাম। নিজের মনেই বললাম, পাবলিশার তাগিদ দেবার আর সময় পায় না—

স্ত্রীর অনুযোগ, খাবার ফেলে সাত-তাড়াতাড়ি উঠে যাবার কি দরকার ছিল। খেতে খেতে একটু বাদে বললাম, কার্তিকের মন-মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে তো না হয় নি?

কার্তিক বলে উঠল, আবার মনে করিয়ে দিয়ে দিলেন সার খাওয়াটা মাটি করে—

—শোনো কার্তিক, মুখে তোমাকে যা-ই বলি, মনে মনে আমি সেই থেকেই ব্যাপারটা ভাবছি...বিয়ে তো একটা ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, অন্যের ইচ্ছেয় বা অনুরোধে বিয়ের ঢেঁকি গেলা যায় না, তোমার বাবা চট্ করে আমার কথা উড়িয়ে দেন না...আমি গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললে হয়তো আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

পেটো কার্তিকের শুকনো মুখ। ঢোক গিলে জবাব দিল, কিছু লাভ হবে না, ওঁরা দুজনে মিলে ঠিক করেই ফেলেছেন—

—কিন্তু তোমার এত আপত্তি সেটা তো তিনি বোঝেন নি, বিয়ে হয়ে গেলে আর তো সেটা ফেরানো যাবে না—একবার চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধে কি, কাল

তোমার সঙ্গেই চলে যাব ভাবছি।

পেটোর মুখের দিকে চেয়ে হাসি চাপা দায়। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক্‌গে সার, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—তাই বাবা মায়ের আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নেব।

মেয়ে জোর দিয়ে বলে উঠল, এটাই খুব ভালো কথা।

আমার কথা তার বিরক্তির কারণ হচ্ছে বুঝতে পারছি। দুই এক গরাস জঠরে চালান করে এবারে ধীরে-সুস্থে বললাম, একটু আগে ওই ফোন অবধূত করেছিলেন, তিনি বললেন, এক্ষুণি তোমার কান ধরে আচ্ছা করে মলে দিতে...এই বিয়েতে কেন তাঁরা এগিয়েছেন তা-ও বলেছেন।

পেটো কার্তিকের দু'চোখ বিস্ফাবিত খানিক। তারপর হড়বড় করে বলল, মাসিমা আর খিচুড়ি খেয়ে কাজ নেই, উঠি আমি, এক্ষুণি কোন্নগর রওনা হব—

স্ত্রীর ভেবাচাকা খাওয়া মুখ।—কি হলো, এ-সব বলে ছেলেটার তুমি খাওয়া নষ্ট করছ কেন?

বললাম ওর পাতে ডবল খিচুড়ি দাও। এই বিয়ে কেন হচ্ছে সেটা শুনেই এ-রকম বলছি, কার্তিকবাবু একতরফা প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছিল, সেটা ধরতে আর বুঝতে পেরেই ওর বাবা আর মাতাজী এই ব্যবস্থা করেছেন, এখন দায়িত্ব ঘাড়ে চাপছে বলে ঘাবড়াচ্ছে।

পেটো কার্তিক লজ্জায় অধোবদন। মেয়ে কোনোরকমে হাসি সামলে দাবড়ানি দিয়ে উঠল, কার্তিকদা খেতে শুরু করো বলছি নইলে মা-কে বলব তোমাকে খাইয়ে দিতে—সুষমার প্রেমে পড়ে তোমাব হাবু-ডুব খাওয়ার রাইট আছে আবার এখন ঘাবড়ে যাওয়ার রাইটও আছে!

বলতে বলতে নিজেই হেসে অস্থির।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর কার্তিক এক ফাঁকে বলল, আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কয়েকটা কথা ছিল সাব...

ওকে নিয়ে লেখার ঘবে এসে বসলাম।—বলো...

একটু ইতস্তত করে পেটো-কার্তিক বলল, আমি একটু নার্ভাস হয়েছি সত্যি কথা, কিন্তু আরো বেশি নার্ভাস হয়েছি অন্য কারণে বাবা আর মাতাজীর মতি-গতি ঠিক বুঝতে পারছি না—

এরপর যেটুকু জানান দিল তাতে আমাবও একটু চিন্তার কারণ ঘটল।...বিয়ের পর ওদের কোন্নগরে বাবার বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না, দূরে শহরে ওদের জন্য বাড়ি দেখা হচ্ছে। মাতাজী ওদের জন্য একটু জমিও দেখতে বলেছেন, নিজের খরচায় দোতলা একটা বাড়িও তুলে দেবেন, দোতলায় ওরা থাকবে, এক-তলায় ভাড়াটে বসবে—তাতে বাড়ি রক্ষার খরচ চলে যাবে।...শহরেই একটা দোকানঘর দেখা হচ্ছে, সেখানে কার্তিককে কবিরাজি দোকান দিয়ে বসানো হবে, যে বুড়ো কবিরাজ এখন বাড়িতে ওষুধ বানায় সে আর তার ছেলে কবিরাজ হিসেবে দোকানে বসবে—দোকানের আট আনার মালিক হবে কার্তিক, ছ'আনার মালিক হবে বুড়ো কবিরাজ আর ছেলে, বাকি দু'আনার মালিক হবে যোগানদার হারু। কার্তিকের ধারণা,

বাবা নিজের কবিরাজি চিকিৎসা আস্তে আস্তে তুলে দেবেন। ওকে বলেছেন, আমি থাকতে থাকতে তোদের দোকান যাতে মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায় সে-ব্যবস্থা আমিই করে যাব।

এই শোনা পর্যন্ত কার্তিকের ত্রাস। বাবা আর মাতাজী একটা কিছু মতলব আঁটছেন...হয়তো এখান থেকে তাঁরা অন্য কোথাও চলে যাবেন।

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, তাঁরা এখানে না থাকলে তাঁদের বাড়িই তো তোমাদের হাতে—তাহলে আর তোমাদের জন্য আলাদা বাড়ি হচ্ছে কেন?

পেটো জবাব দিল, মা অনেক বছর আগেই বলেছিলেন, ও-বাড়ি থাকবে না। ওপার শুকিয়ে গঙ্গা এ-পারে সরে আসছে, বর্ষায় বড় বান এলে এখন উঠোন ছাড়িয়ে দাওয়ার কাছাকাছি জল উঠে আসে—ফি বছর বানের জলের হামলা বাড়ছে--চারদিক কেমন নোনা ধরে গেছে দেখেন নি? গঙ্গার কি কাজ হবে বলে এ-দিকটা বোধহয় রিকুইজিশনেও চলে যাবে।

খানিক চুপ করে থেকে কার্তিক আরো একটা ভয়ের আভাস দিল।—আবো একটা কথা আপনাকে বলছি সার, আপনি যেন কক্ষনো বাবাকে বলবেন না, তাহলে তিনি আর আমার মুখ দেখবেন না।...বাবার বোধহয় সামনেই কোনো বিপদ ওঁত পেতে আছে। আপনাকে একদিন বলেছিলাম না খুব উতলা হয়ে দু'বার বাবাকে শ্মশানে ছোটাছুটি করতে দেখেছি, একবার এই বতনলাল সাবাওগিকে অপারেশনের হুকুম দেবার আগে। আর একবার এর চারগুণ বেশি উতলা দেখেছিলাম সেই সাতাত্তব সালের গোড়ায়—যে-বছর আপনাদের সঙ্গে পুজোব সময আমরা হবিদ্বার হয়ে দেরাদুন যাই। খুব স্পষ্ট করে সব জানি না, কারণ বাবার কোন আত্মীয়-স্বজনরা আসত তখন, বাড়িতে ছেলে-পুলে হবে এমন একটি মেয়েছেলেও মাঝে মাঝে এসে থাকত —তখন আমি কাছেই অক্ষয়বাবুর বাড়িতে থাকতাম। যতদূর জানি, সেই এক আত্মীয়কে বাবা জেলে পাঠিয়েছিলেন, তার বোধহয় খালাস পেতে খুব বেশি দেরি নেই, সামনের বছর গোড়ার দিকে হয়তো ছাড়া পাবে—সেই লোক বলে গেছল জেল থেকে ফিরে তার প্রথম কাজ হবে বাবাকে খুন কবা।

চমকে উঠলাম। গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠছে।

কার্তিক বলল, বাবার সত্যি ক্ষতি করতে পারে, এমন লোক জন্মেছে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু বলুন তো সার, ভয় হয় না? কোথায় বাবার পাশে থাকব, দরকার হলে তাঁর জন্য এই ছাইয়ের প্রাণ দেব, না বিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাড়ি থেকেই সরিয়ে দিচ্ছেন।

...সমস্তটা রাত ভালো ঘুম হলো না। থেকে থেকে এ-বারেব কালীপুজোর রাতটা মনে পড়ছে। না, মদের নেশায় অবধূত কোনো বাজে কথা বলার লোক নন। তাঁর সে-দিনের প্রতিটি কথা আমার কানে বাজছে। আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, বার বার একটা কথা কেবল মনে আসছে—এ-সব কেন, আমি কেন, আপনি কেন, এইরকম—

...আমি রসিকতা করেছিলাম, শুনেছি কর্মের শেষে এ-সব প্রশ্ন মনে আসে,

আপনার এখনই মনে আসছে এটা ভালো কথা নয়।

...বিমনার মতো তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তার কিছু বাকি আছে, অন্তত সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত, দেখা যাক—আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, কিসের কিছু বাকি আছে—সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত কি?

...আত্মস্থ হয়ে হেসে উঠে বলেছিলেন, সামনের বছর গোড়ার দিকে আমার একটি কর্মের গাছে ফল ধরবে, সেটা বিষ-ফল কি অমৃত-ফল দেখা যাক। সেই টানে বাঁধা পড়ে আছি, তারপর আর বোধহয় কল্যাণীকে আটকানো যাবে না।

...পরদিন ও-কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, কাল রাতে মাল কতটা পেটে পড়েছে সে-খেয়াল আছে আপনার?

...পেটো কার্তিকও সেই সামনের বছরের গোড়ার দিকের কথাই বলল, সে-সময় জেল থেকে খালাস পেয়ে কার নাকি প্রথম কাজ হবে তার বাবাকে খুন করা।

অবধূত এমন কি কর্ম করেছিলেন, যে কর্মের গাছে বিষ-ফল ধরবে কি অমৃত-ফল তিনি জানেন না? জানা হয়ে গেলে পরে কল্যাণীকে আর আটকানো যাবে না মানেই বা কি?

বিনিদ্র রাতে হঠাৎ কেন যেন অবধূতের ভক্ত হরিদ্বারের পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর কমনীয় মুখখানা মনে পড়ে গেল। নিঃস্ব অবস্থা থেকে মানবিক দয়ায় অবধূত যাঁকে বহু লক্ষপতির জীবনে ফিরিয়েছেন। আমার জন্য তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত দেখে, আর মাত্র খাওয়া থাকা বাবদ এক-টাকা মূল্য ধরে দেবার কথা বলতে আমি জোর দিয়েই আমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনি একটা বড় ভুল করছেন, অবধূতজীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে—তার আগে কেউ কাউকে চোখেও দেখিনি।

...ভক্ত পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর সাদা-সাপটা জবাব, আপনাকে দেখার জন্য মহারাজ দেরাদুন থেকে নেমে আসতে পারেন বলেছেন...আপনাকে এখানে তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে দিতে বলেছেন—আপনি কি লোক বা কতদিনের আলাপ আমার আর জানার দরকার নেই—আপনার সঙ্গে তাঁর কত জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক আপনি জানছেন কি করে?

মনে পড়তে বিনিদ্র শয্যায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।... এই লোকের সঙ্গে মাত্র দু'বছরের আলাপ আমার। কিন্তু তাঁর বিপদের বা তাঁকে হারানোর ভয়ে আমার চোখে ঘুম নেই। মাত্র দু'বছরের আলাপে এ-রকম কি হওয়া সম্ভব? জন্ম-জন্মান্তরের আত্মিক বন্ধন হলে বরং এটা স্বাভাবিক ভাবা যায়।

পেটো কার্তিকের বিয়েতে ঘটা দেখালেন বটে কালীকিংকর অবধূত। কোন্নগরে নয়, কলকাতায় সাতদিনের জন্য মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করে বিয়ে। নইলে বাইরের অভ্যাগতদের আসা এবং থাকার অসুবিধে। যে বাড়িতে বিয়ে সেই বাড়িতেই বউ-ভাত। আর দূর দূরান্তরের অতিথিদের সেই বাড়িতেই থাকা।

আমাকে আগেই হেসে বলেছিলেন, কার্তিকের বরাবরই খুব দুঃখ ছিল ওকে

কেউ কিছু দেয় না, সবই বাবাকে দেয়, এবারে তোর পাওয়ার বরাতখানা দেখিয়ে দিচ্ছি।

...বেনারসের সেই মস্ত বড়লোক পার্টির তিন ভক্ত সস্ত্রীক এসেছেন। স্টেশনে মাছ নিয়ে এসে যাঁরা মাছ খাইয়ে একদিনেই অরুচি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, লক্ষ্ণৌয়ের পোলাউ-মাংসের পার্টি এসেছেন। হরিদ্বারের তিন-তিনটে হোটেলের মালিক পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। বাবার চিঠি পেয়ে তিনিও সপরিবারে এসেছেন। দেরাদুন বা মুসৌরী আর অন্যান্য জায়গার ভক্তদের আমি চিনি না, তারাও সকলেই এসেছেন এবং অবধূত তাঁদের সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবাক হয়ে দেখলাম ফিরে পাওয়া সন্তানকে আর অবধূতের দেওয়া তিন পালিত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দ্বারভাঙার কাকুরঘাঁটির পার্বতী লাজবন্তী আর অনন্তরামও নেমতন্ন রক্ষা করতে এসেছে।

মোট নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এক হাজারের কম নয়।

আমাদের তো বিয়ের আগের দিন থেকে বউ-ভাতের পরদিন পর্যন্ত নেমন্তন্ন। আমাকে অবধূত আগে থাকতেই বলে রেখেছিলেন, কলকাতার সব ব্যবস্থা-পত্রের কর্মকর্তা কিন্তু আপনি, সরে থাকলে চলবে না।

সরে থাকি নি। এত ভক্ত সমাগম দেখে আমার একবারও মনে হয নি পেটো কার্তিককে কেবল পাওয়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই অবধূত তাঁর ভক্তদের এখানে ডেকেছেন বা সমবেত করেছেন। কেন যেন একটা কাল্পনিক দৃশ্য মনে আসতে বার বার আমার চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছে। মানব-পুত্র যীশুর 'দি লাস্ট সাপার'। নিজের দিন শেষ বুঝে ক্রুশ-বিদ্ধ হবার আগে ভক্ত সমাবেশে যীশুর শেষ আহার—নিজে হাতে ভক্তদের তিনি সযত্নে সেবা করছেন, পবিচর্যা করছেন, খাওয়াচ্ছেন!...লিওনারডো দ্য ভিনচির আঁকা 'দি লাস্ট সাপার'-এর সেই বিশাল তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি কলকাতাব কোনো এক রাজপ্রাসাদে আমি দেখেছিলাম। ভক্তদের প্রতি অবধূতের আদর যত্ন আর অনাবিল স্নেহের আচরণ দেখে ভিতরটা বার বার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল সকলের এই শেষ মিলন।—বাবারে বাবা, কোনো বিয়েতে এমন পাওয়া আর জীবনে দেখি নি, তার বাবার দৌলতে পাওয়াব ভাগ্য বটে কার্তিকদা!

উচ্ছ্বাস আমার মেয়ের।

শুনলাম আসল হীরের সেট দিয়েছেন রতনলাল সারাওগি আর তাঁর দুই ছেলে দিয়েছেন আসল মুক্তোর সেট। কাঁকুরগাছির পার্বতী প্রসাদ দিয়েছে দামী জড়োয়ার সেট। বেনারসের পার্টি দিয়েছেন প্রত্যেকে একখানা করে দামী বেনারসী শাড়ির সঙ্গে বেশ ভারী ওজনের একটা করে গয়না। হরিদ্বারের পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর দেওয়া হারের ওজন কম্ম করে নাকি পাঁচ ভরি হবে। সব মিলিয়ে পাওয়ার আর শেষ নেই। সব মিলিয়ে সোনার গয়না পেয়েছে ষাট ভরির ওপর। খুব দামী মাঝারি আর সাধারণ মিলিয়ে শাড়ির সংখ্যা একশো সাতানব্বই। নগদ পেয়েছে তেরো হাজার ন'শ। এছাড়া আর যা-সব পেয়েছে একটা ঘরে ধরে না। ডাইনিং টেবিল ডিনার সেট পর্যন্ত।

—কার্তিককে খুব খুশি দেখলি?

একটু ভেবে মেয়ে মাথা নাড়ল।—তা কিন্তু দেখলাম না বাবা। বিয়ের পরদিন একফাঁকে আমাকে বলেছিল, আমার কিছু ভালো লাগছে না দিদি, বাবার কথা সারকে যা বলে এসেছিলাম সার যেন তা না ভোলেন, আপনি সর্বদা তাঁকে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলবেন।...কি বলেছিল বলো তো বাবা?

জবাব এড়িয়ে গেছি।

পেটো কার্তিকেব বিয়ে হলো মাঘের একেবাবে শেষের দিকে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিক এটা। নতুন বছবের শুরুই বলা যেতে পারে। পেটো কার্তিকের নতুন ঘর সংসাব দেখাব উপলক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যে কোন্নগবে গেছি এবং যতটা সম্ভব অবধূতেব সঙ্গেই কাটিযেছি। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বা আচরণে কোনোরকম দুশ্চিন্তার ছায়াও আমাব চোখে পড়ে নি।

অবধূতের সব তড়িঘড়ি কাজ। কার্তিক তাব ছিম-ছাম ছোট ভাড়াটে বাড়ি দেখালো, নতুন দোকান দেখালো। কবিরাজী দোকান আগেই দেখা ছিল, সরঞ্জাম সব তো অবধূতের বাড়িতেই ছিল। কেবল তুলে নিযে সাজানো। বুড়ো বাপ তার ছেলেকে নিযে দোকানে বসা শুরু কবেছেন। রাত পর্যন্ত হারুও দোকানেই থাকে। পেটোব জন্য তিন কাঠা জমিও কেনা হযেছে। বাড়ি তোলার টাকাও নাকি মাতাজী ওব আর সুষমাব নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছেন।

কিন্তু আনন্দ বা উৎসাহের বদলে পেটো কার্তিকের উতলা মুখ। আমাকে বলেছে, সব বড বেশি তাড়াতাড়ি হযে যাচ্ছে, আমার কিছু ভালো লাগছে না সার।

সুষমা বলল, ও খুব ঘাবড়ে যাচ্ছে, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলে যান তো, বাবা মা আমাদের বিপদে ফেলাব মতো কিছু একটা কববেন এ কখনো হয় নাকি।

কার্তিককে বোঝাব কি আমার নিজেরই একটু ভাবনা ধবে গেছে। অবধূতের কাছে এসে তাঁকে জেরা কবতে ছাড়ি নি, আপনাদের ব্যাপারখানা কি, সব ছেড়েছুড়ে বিবাগী হবাব মতলবে আছেন নাকি?

—কি ছাড়লাম? অবাক-অবাক মুখ।

—আপনি আব বোগীর চিকিৎসা করবেন না?

—কেন করব না, প্রেসকৃপশন করে ওষুধের জন্য কার্তিকের দোকানে পাঠাবো, আব দোকানেব কবিবাজও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্র্যাকটিসেব সুযোগ পাবেন, ওদের দুজনারই পসার বাড়বে—আমাব ব্যবসা বুদ্ধি কম ভাবেন নাকি! হাসতে লাগলেন, কার্তিকের বিয়েখানা কেমন দিলাম দেখলেন না?

—দেখলাম। ভাবলাম জিজ্ঞেস করে বসি, লাস্ট সাপার নয় তো? বললাম না। তার বদলে জিজ্ঞেস করলাম, এখন যেমন আছেন তেমনি চলবে, না কোনো প্রোগ্রাম আছে?

হেসে জবাব দিলেন, আমার কোনোদিনই কোনো প্রোগ্রাম ছিল না।...ঘটনার সাজে ডাক পড়লে সাড়া দিতে হবে নয়তো যেমন আছি তেমনি থাকব।

—শিগগির কোনো ঘটনার সাজে ডাক পড়বে আশা করছেন?

মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। এমন সময় কল্যাণী এদিকে আসতে গম্ভীর। যেন লক্ষ্য করেন নি এই ভাবে আমার দিকে চেয়ে জবাব দিলেন, আর আমি কিছু আশাও করব না, কোনো কর্তৃত্বও নিজের হাতে রাখব না, এখন থেকে আমি সর্বদা আমার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলব ঠিক করেছি।

কল্যাণী ভ্রূ-ভঙ্গি করে প্রসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, বরাবরই অনুগত হয়ে চলেছে, বাকি আছে বুড়ো বয়সে।

অবধূত আমাকেই সালিশ মানলেন, বিবেচনা করে দেখুন। আরে, যৌবন ধর্মে পাঁচ-দিকে ছোটাছুটি কবতে পারি, পাঁচ জনের অনুগত হতে পারি—কিন্তু বুড়ো বয়সে তো কেবল তুমিই ভরসা!

কল্যাণীও হাসি মুখে আমাকেই বললেন, এটা নালিশ বুঝলেন তো? সমস্ত জীবন ছেড়ে দিয়ে এখন একটু রাশ টানার দিকে চলেছি বলে ঠেস দেওয়া হচ্ছে। ...আচ্ছা আপনিই বলুন, সব কিছুতেই একটা রিটায়ারমেন্টের সময় থাকা উচিত নয়...আপনিও কি লেখার থেকে কোনোদিন রিটায়ার করবেন না?

অবধূতের গম্ভীর মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথ রিটায়ার করেন নি।

কল্যাণীর মুখে আরো সপ্রতিভ হাসি।—বলে ঠকলে। সে ভাবে চিন্তা কবলে ত্রৈলঙ্গস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ বামাক্ষ্যাপা বিবেকানন্দ কেউ রিটায়ার করেন নি—খুব ভালো কথা, তুমিও এদের রাস্তাই ধরো!

স্বীকার না করে পার নেই, মহিলাকে দেখলে ভালো লাগে, চুপ করে থাকলে ভালো লাগে, কথা বললেও ভালো লাগে।

৫

ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে মার্চ গড়াতে চলেছে। বলা নেই কওয়া নেই সকাল দশটায় সুষমাকে নিয়ে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওকে অবশ্য বলা ছিল, বউ নিয়ে একদিন যেন আমার বাড়িতে আসে। কিন্তু আসার খবরটা অবধূতের ওখান থেকে একটা ফোন করতে পারত, ডাকে একটা চিঠিও ফেলে দিতে পাবত। নতুন বউটা প্রথম এলো, আমি তক্ষুণি বাজারে যাবার জন্য ব্যস্ত হলাম।

সেটা বুঝেই কার্তিক আমাকে চোখের একটু ইশারা করল। খানিক বাদে ওকে নিয়ে আমার ঘরে এসে বসতে বলল, আপনি আমাদের জন্য একটুও ব্যস্ত হবেন না, ঘরে যা আছে তাই খাব...বাবা আর মাতাজী জানেন আপনি আমাদের অনেকবাব করে ডেকেছেন বলেই আজ আসছি, কিন্তু আসলে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি—আমার মনে হয় বাবার সামনে বিপদ, আপনার এখানে বসে থাকা চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভিতরে উৎকণ্ঠার দাপাদাপি।—কেন, কি হয়েছে?

—যে আত্মীয়কে পাঁচ বছর আগে বাবা জেলে পাঠিয়ে ছিলেন, সে হয়তো শিগগিরই ছাড়া পেতে চলেছে। মাকে ধরে পড়তে তিনিও বললেন কিছু দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। সে বলে গিয়েছিল, জেল থেকে বেরুলে তার প্রথম কাজ

হবে বাবাকে খুন করা—

—তা বাবা কিছু বলছেন?

—বলছেন না, তিনি যা করছেন দেখেই আমার হাত-পা ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে।

—কি করছেন তিনি।

—গত কাল গিয়ে দেখি ভিতরের দাওয়ায় বসে বড় একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া আর কি তেল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রিভলবার ঝকঝকে করে তুলছেন।...চামড়ার পাতের মতো খাপে রিভলবারের গোটা কতক গুলীও দেখলাম।

—রিভলবার! আমিও আঁতকে উঠলাম।—রিভলবার তিনি কোথায় পেলেন?

—কি করে জানব। ও সময়ে আমাকে দেখেই তো বিরক্ত। ধমক লাগালেন এ-রকম কাজের মন হলে ব্যবসার বারোটা বাজতে বেশি সময় লাগবে না।

আমি নির্বাক খানিক।—তোমার মাতাজীকেও চিন্তিত দেখলে?

—তেনাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায়? তবু একটু গম্ভীরই মনে হলো। ভিতরের ভয় আর আবেগে কার্তিক অস্থির হয়ে উঠল। কাতর স্বরে বলল, বাবার বিরাট বিরাট অবস্থার সব ভক্ত আছেন, আমি তাঁদের সকলকে দেখেছি—কিন্তু আপনার মতো বন্ধু তাঁর একজনও নেই, আপনাকে তিনি কত শ্রদ্ধা করেন কত ভালোবাসেন সে কেবল আমিই অনুভব করতে পারি—আপনি সার তাঁর কাছে যান, কিছুদিন তাঁকে আগলে রাখুন, আমি এসে আপনাকে এ-রকম বলেছি জানলে আমাকে হয়তো জুতোপেটা করবেন—করুন—তবু আপনি যান সার, আমার মন বলছে বাবার সামনে ভয়ংকর বিপদ!

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার দাখিল। অবধূত রিভলবার প্রস্তুত রেখে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন এ কি কারো কল্পনা করতে পারার কথা! এই ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের যুগে খুন-জখম-হত্যা কিছু কম হচ্ছে না। কিন্তু সেটা যাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অবধূতে তো তাদের কেউ নন। আত্মরক্ষার জন্য রিভলবার প্রস্তুত না রেখে তিনি আগে থাকতে পুলিশের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন। পুলিশের হোমরাচোমরাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ভক্ত এ-তো কার্তিকের বিয়ের সময় নিজের চোখেই দেখেছি। আগেও জানতাম। খাতিরের জোরেই পেটো কার্তিককে তিনি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

বউ নিয়ে কার্তিক বিকেলে চলে গেল। আমি পরদিন সকালে ট্রেনে রওনা হলাম। সঙ্গে ছোট সুটকেশে খান-কয়েক জামা-কাপড় আর কিছু প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সরঞ্জাম। বাড়িতে বলে গেলাম, ফিরতে দিন-কতক দেরি হলে কিছু ভেবো না, অবধূতকে টানতে পারলে একটু পুরী ঘুরে আসার ইচ্ছে।

বাড়িতে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। অবধূতকে কেউ হত্যা করার জন্য আসতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য তিনি রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন, আর তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়ছি জানলে বাড়ির আত্মীয়জনদের আহারনিদ্রা ঘুচে যাবে।

অবধূত বাইরের বারান্দার চেয়ারে বসেছিলো, কল্যাণী ও-দিক ফিরে তাঁকে কি বলছেন। বাঁশের ছোট গেটের সামনে রিক্সা দাঁড়াতে দুজনেই ফিরলেন। সুটকেশ হাতে আমাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে দুজনেই বেশ অবাক। ওঁদের মুখ দেখে

উল্টে আমারই অস্বস্তি এখন, কার্তিকটার পাল্লায় পড়ে আমি বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কিনা কে জানে—কারণ দুজনের কারো মুখে উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই।

দাওয়ায় উঠতে অবধূতই প্রথম বলে উঠলেন, রিক্সয় চেপে সুটকেশ হাতে...কি ব্যাপার?

সপ্রতিভ জবাব দিলাম, ব্যাপার মতিভ্রম, হাওড়া স্টেশনে এসে দূরের যে-কোনো টিকিট কাটার বদলে কোন্নগরের টিকিট কেটে বসলাম...আশা যদি সঙ্গী পাই।

অবধূত আরো অবাক।—কোথায় যাবেন ঠিক না করেই শুধু একটা সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন?

—পুরনো দিনের অভ্যাস ঝালানোর ঝোঁক চাপল, লেখা-পত্র নেই এখন, সকাল কাটে তো দুপুর কাটে না—কল্যাণী দেবী তো এখন রিটায়ারমেন্টের পক্ষে, কিন্তু মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই—চলুন তিনজনে মিলে দিন-কয়েক কোথাও থেকে ঘুরে আসি। কল্যাণীর আয়ত চোখে এখনো একটু বিস্ময়, চেয়ে আছেন। অবধূত গম্ভীর, বললেন, তিনজনে তো আর মেলা হয় না—আপনি ইচ্ছে করলে কল্যাণীকে নিয়ে যেতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

এমন স্থূল রসিকতায়ও কল্যাণীর মুখ লাল হতে দেখলাম না। আমার দিকেই চেয়েছিলেন, এবারে ফিরলেন, তুমি ওঁর কথা বিশ্বাস করছ?

অবধূতের নির্লিপ্ত জবাব, আমি হাবাগোবা মানুষ, যে যা বোঝায় তাই বুঝি, তাই বিশ্বাস করি। তুমি যখন করো না, বেরিয়ে একটা রিক্স নিয়ে দোকান থেকে কান ধরে কার্তিককে এখানে নিয়ে এসে যা ব্যবস্থা করার করো। হেসে উঠলেন, আরে মশাই, মিথ্যে কথা বলার সময় যুধিষ্ঠিরেরও আপনার মতো ধরা-পডা মুখ হতো কিনা সন্দেহ—আপনি দেখি তার থেকেও কাঁচা।

হাল ছেড়ে ধুপ করে সুটকেশটা মাটিতে ফেলে চেয়ার টেনে বসে বললাম, ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন চেষ্টা করব না—কেবল একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, সেই কালীপুজোর রাতে আপনি আপনার কর্মের গাছে বিষ ফল কি অমৃত ফল ফলে দেখার অপেক্ষায় আছেন শোনার পর থেকে আমি অস্বস্তির মধ্যে আছি, কার্তিকের বিয়ের পর থেকে আপনাদের জন্য আমার অস্বস্তি আরো বেড়েছে, আর কাল কার্তিকের মুখে যা শুনলাম, সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি—তাই সত্যিই একটা দুরাশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম যদি আপনাদের টেনে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারি।

শুধু অবধূত নয়, কল্যাণীর মুখখানাও অপূর্ব কমনীয় মনে হলো। দুজনেই আমার দিকে চেয়ে আছেন। অবধূত আলতো সুরে বললেন, হ্যাঁ মশাই, এ-দেশের সব লেখকরাই কি আপনার মতো নাকি?

জবাব দিলাম, আমার থেকে ভালো ছেড়ে খারাপ নয়।

অবধূতের সখেদ মন্তব্য, এত দেখলাম, মানুষ আর কটা দেখলাম, কেউ দেবতা বলে কেউ ভণ্ড বলে, রক্ত-মাংসের মানুষ যে, কেউ ভাবে না। স্ত্রীর দিকে তাকালেন, রাগের বদলে কার্তিকদের বরং রাতে এসে এখানে খেতে বলো, ওই হারামজাদার

দৌলতেই এঁকে দিন-কয়েকের জন্য কাছে পাওয়া গেল।

আমি তক্ষুণি জোরাল দাবি পেশ করে ফেললাম, আপনার কথার জালে পড়ে আমি আর চুপ করে থাকব না, কিছু করতে পারি না পারি আপনাদের ভালো মন্দের শরিক ভেবে আমাকে সব বলতে হবে।

শোনার মতো কিছু বলার থেকে অন্তরঙ্গ অতিথি অভ্যর্থনার উৎসাহই ভদ্রলোকের বড় হয়ে উঠল। আব এক প্রস্থ চা খেয়ে আমাকে নিয়েই বাজারে যাবার জন্য তৈরি হলেন। স্ত্রীকে বললেন, চান্স যখন পেয়েছ, ভদ্রলোককে একটু ভালো খাইয়ে দাইয়ে পুণ্যি করো—রাতে আমাদের বোতলের জন্য হাড়-ছাড়ানো চিলি মাংস চাই—

আমি জোর দিয়েই বাধা দিলাম, এ-সব নিয়ে এখন ব্যস্ত হবেন না, সব জানতে বুঝতে দিয়ে আগে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন, তার আগে আমার কিছুই ভালো লাগবে না।

এবাবে কল্যাণীই আগ বাড়িয়ে বললেন, আমাদেব কোনো ক্ষতিই কেউ করবে না জেনে নিশ্চিন্ত থাকুন, তবু আপনি এলেন খুব ভালো হলো, আপনি ছাড়া যত লোকই আসুন না কেন উনি নিঃসঙ্গ, কটা দিন চুপ মেরে ছিলেন আজ আপনি আসতেই এত উৎসাহ কেন বুঝছেন না? প্রত্যেক বারই আপনি চলে যাবার পরে বলেন, সব্বাই তাদের ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিযে দিয়ে যায়, আমাদের কথা ভাবতে কেবল ওই একজনই। যা করছেন করতে দিন—

বললাম, কিন্তু ভেবে করতে পারছি কি, করার সাধ্যই বা কতটুকু!

কবাব সাধ্য কারোই নেই, কবতে চাওয়াটাই আসল। অবধূতকে বললেন, রাতের জন্য তাহলে যতটা পারো হাড়-ছাড়ানো মাংস বেছে এনো।

হঠাৎ একটা কৌতুকেব কথা মনে পড়ে যেতে অবধূতের দিকে চেয়ে বললাম, হাড-ছাডানো মাংসয কাজ কি, এক-সময় উনি হাড চিবুতে ভালোবাসতেন শুনেছিলাম?

উনি বলতে কল্যাণী। অবধূত হা-হা কর হেসে উঠলেন।— সে-তো বিয়ের আগে! বিয়ের পর হাডের ওপব এমনি বীতশ্রদ্ধ যে মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়ে বসলেন।

এটা আজই প্রথম জানলাম। কল্যাণী হেসে মন্তব্য করলেন, দুজনেরই দেখছি বসেব দিনেব মধ্যে ঘোবা-ফেরা করতে খুব ভালো লাগে।

খবর পেযে পেটো কার্তিক বিকেলের মধ্যে সুষমাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। অবধূত ঘুরিয়ে কার্তিককে এক হাত নিলেন। গম্ভীর মুখে সুষমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন ক'হাত শাড়ি পরো?

এতদিনে বাবার ধাত কিছুটা বুঝেছে হয়তো সুষমাও। সঠিক না বুঝেও হাসছে অল্প অল্প।

—বাজারে চৌদ্দ হাত শাড়ি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করো, এখন তো শুধু নিজে পরলেই হবে না, আর একজনকেও ঢেকেঢুকে নিরাপদে রাখতে হবে—ও একদিন বোমবাজি করে নিজের মুখ পুড়িয়েছে আঙুল উড়িয়েছে—সে-সব দিন ভুলে যাও।

কিন্তু যার উদ্দেশে বলা সে-ও ত্যাঁদড় কম নয়। নিরীহ মুখে আমার দিকে তাকালো।—বিপদ ভেবে আপনার কাছে ছোটা মানে মেয়েছেলের কাছে ছোটার সামিল বলছেন বাবা...।

—এই হারামজাদা! তোর কান দুটো ছিঁড়ে নিয়ে আসব আমি। ওঁর কথা বলছি না তোর বীরত্ব দেখে অবাক হচ্ছি?

রাত আটটা নাগাদ অবধূত আমাকে নিয়ে বসেছেন। দুজনের এক-প্রস্থ করে গেলাস খালি হতে উনি দ্বিতীয়-প্রস্থ রেডি করে কার্তিক আর সুষমাকে খাবার তাড়া দেবার জন্য উঠে গেলেন। ওদের সাইকেল রিক্সার জন্য ছ'সাত মিনিট পথ হাঁটতে হবে, তার পরেও মাইল তিনেক দূরে বাড়ি। ছেলেমানুষ বউ নিয়ে বেশি বাত করা এইদিনে কারোরই পছন্দ নয়। দুপুরের ভারী খাওয়ার পর ড্রিংকের সঙ্গে চাট হিসেবে এখনো যা এসেছে আর আসবে তাতেই আমাদের রাতেব আহার শেষ হবে এ-কথা কল্যাণীকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কার্তিক তাকে-তাকে ছিল বোধহয়। তার বাবা উঠে যেতেই তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কি বুঝছেন সার?

—কিছুই বুঝছি না, বহাল মেজাজে আছেন দেখছি।

—ওতে ভুলবেন না, উনি ওই-রকম সবকিছু ঝেড়ে ফেলতে ওস্তাদ, আমি বলছি সামনে খুব বিপদ।

কিন্তু তোমার মাতাজীও তো বলছেন নিশ্চিন্ত থাকতে, তাঁদের কোনো ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে কার্তিক বলল, মাতাজী তো বাবার থেকেও এক-ধাপ ওপর দিয়ে চলেন...কেউ মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেও সেটা ক্ষতি বলবেন না, বলবেন ভবিতব্য। আপনি সার এসে গেছেন যখন একটু বুঝেসুজে যেতে চেষ্টা করুন, আমি জানি শিগগিরই কিছু ঘটবে।

অবধূত ফিরে আসার আগেই সরে গেল।

ওরা খেয়ে-দেয়ে বিদায় হবার পর কথায় কথায় উনিই প্রসঙ্গান্তরে আসতে আমার সুবিধে হলো। হেসে বললেন, কার্তিকের মুখে রিভলবার সাফ করতে বসেছি শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আপনি ধেয়ে-পেয়ে চলে এলেন?

—আপনার হাতে রিভলবার শুনলেও সেটা ঘাবডাবার কথা নয বলছেন?

জবাব না দিয়ে হাসতে লাগলেন।

তাগিদ দিলাম, বলুন এবার কি ব্যাপার...।

গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললেন, ছোট-খাটো তো নয়, লম্বা ব্যাপার। কি ভাবলেন একটু, আমার মুখের ওপর চাউনি উৎসুক একটু।—আচ্ছা, আপনি তো আমাকে নিয়ে দিন-কতকের জন্য কোথাও সরে যাবার মতলব ফেঁদেই এসেছিলেন...এ-দিকে যা ঘটার সম্ভাবনা তার এখনো সাত-আটদিন দেরি আছে, তাহলে চলুন আমাতে-আপনাতে কয়েকটা দিন ঘুরেই আসি।

প্রস্তাব শুনে খুশি।—কল্যাণী যাবেন না?

হাঁক দিলেন, কল্যাণী। উনি আসতে গম্ভীরমুখে হুকুম করলেন, রাতের মধ্যেই যেটুকু পারো গোছগাছ করে নাও, কাল সকালেই আমরা কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে পড়ব—ইনি তোমাকে ছাড়া নড়তে রাজি নন, বয়েসকালে তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হলে মুশকিলেই পড়তাম দেখছি—

অন্তরঙ্গ রসিকতা স্থূল হলেও তার ভিন্ন মাধুর্য। আমি গম্ভীর-মুখেই আর একটু ইন্ধন যোগালাম।—আপনার কথার আমি প্রতিবাদ করছি, আমার বিবেচনায় এঁর বয়েস-কাল এখনো গত হয় নি।

অবধূত হা-হা করে হেসে উঠলেন। হাসছেন কল্যাণীও।

—আ-হা, অবধূতের আক্ষেপ, যাঁরা তোমাকে মাতাজী-মাতাজী করেন তাঁরা যদি এঁর সরস বিবেচনার কথা শুনতেন!...তা কি করবে?

জবাবটা কল্যাণী আমার দিকে চেয়ে দিলেন, নিয়ে যেতে পারেন তো যান, বেশ কিছুদিন ধরে ভিতরটা ওঁর সত্যি সুস্থির নয়, আপনার সঙ্গে গেলে ভালোই থাকবেন।

—আমরা তো যাচ্ছিই, প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে।

—উনি খুব ভালো করেই জানেন এখান থেকে আপাতত আমি এক পা-ও নড়ছি না।

অবধূতেব গম্ভীর মন্তব্য, 'আপাতত', শব্দটা মার্ক করবেন।

কল্যাণী তাঁর দিকে ফিরলেন, কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

অবধূত জবাব দিলেন, প্রথমে তারাপীঠ তারপর বক্রেশ্বর। আমার দিকে তাকালেন, আপত্তি নেই তো?

—একটুও না। কোথায় যাওয়া হবে শুনে আমি সত্যি মনে মনে খুশি। কল্যাণীর পরের প্রশ্ন শুনে আমি ঈষৎ সচকিত। প্রশ্ন তাঁর স্বামীকে।—তপু ঠিক কবে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে খবর পেয়েছ? গেলাসে আবার একটা ছোট চুমুক দিয়ে অবধূত জবাব দিলেন, কাল মঙ্গলবার, তার পরের মঙ্গলবার সকালে।

—দুই একদিন আগেও তো ছাড়া পেতে পারে...?

—পারে। আমি দিন দুই আগেই ফিরব। হেসে আমার দিকে তাকালেন।—স্ত্রীর কেমন দুশ্চিন্তা দেখুন আমার জন্য। তপু মানে তপন চ্যাটাজী হলো একটি ছেলে যার প্রতিজ্ঞা পাঁচ বছর বাদে জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে আমার মতো নরাধমকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া—সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সে যদি আসে—আসে কেন আসবেই—উনি তাই বলির পাঁঠার মতো আমাকে আগে থাকতে এনে প্রস্তুত রাখতে চাইছেন।

আমার চোখে শংকা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কিনা জানি না। কল্যাণী হেসে বললেন, কেন ভদ্রলোককে মিছিমিছি ভাবাচ্ছ—

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে অবধূত বললেন, হ্যাঁ, ভাবনার কি আছে, কার্তিকের মুখে তো শুনেছেন আমিও রিভলবার সাফ করে তাতে গুলি পুরে প্রস্তুত হয়ে আছি।

কল্যাণী হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তক্ষুণি বুঝলাম এঁদের মনে কোনোরকম শংকার ছিটেফোঁটাও নেই।

...বোতলের তরল পদার্থ খুব একটা কাজ করল না, ঘুম আসতে দেরিই হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে আমি কিছু মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। মাত্র মাস কয়েক আগে কিছুটা স্বেচ্ছায়ই খবরের কাগজের অফিসের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। যতদিন ছিলাম, পদস্থ একজনই ছিলাম। প্রায় টানা তিরিশটা বছর সংবাদ-জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাই কোনো বড খবর স্মৃতির বাইরে চলে যাবার কথা নয়। এই রক্তক্ষয়েব যুগে যা মনে করতে চেষ্টা করছি তা অবশ্য খুব বড় খবর নয়। তবু যেন ধূ-ধূ মনে পড়ছে, বছর পাঁচ সাড়ে পাঁচ আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, কলকাতাব কাছাকাছি কোনো জায়গার একজন গৃহী সাধক তাঁর আশ্রিত এক খুনীকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়েছিল যার বিরুদ্ধে শুধু ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার নয়, মেয়ে অপহরণ ও ধর্ষণ, লুঠ আরসন আর নানারকম অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাকটিভিটিবও অভিযোগ ছিল।...সন বা বছর মনে পড়ল না, (পেটো কার্তিক অবশ্য বলেছিল সাতাত্তব সালের গোডার দিকের ঘটনা) আর বিচারে অপরাধীর কি সাজা হয়েছিল তা-ও মনে পড়ল না। কেবল এটুকু শুধু মনে পড়ছে, যে মেয়েকে অ্যাবডাকশান আর রেপিং-এর চার্জ দেওয়া হয়েছে—সেই মেয়েই আসামীর অনুকূলে সাক্ষী দিয়েছিল এবং তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল।

পরদিন সকালেব গাড়িতে আমরা রায়পুর হাটে। অবধূত আমাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ মোহিনী ভটচার্যের বাড়ি দেখালেন—যেখানে ছেলেবেলা থেকে কল্যাণী বড় হয়েছেন। বিয়ের পরও অনেকবার কল্যাণীকে নিয়ে শুধু এই এক জায়গাতেই এসেছেন শুনলাম। ভটচার্য মশাই অনেককাল গত, তাই ওঁদের ওখানকার আকর্ষণও শেষ।

একটা হোটেলে দুপুরের খাওযা সেবে সাইকেল বিক্সয় তাবাপীঠ রওনা হলাম। মাইল তিনেক পথ। অপ্রশস্ত নদী দ্বারকার (দ্বারক) ব্রিজ পেরুলে মহাশ্মশান তারাপীঠ। অবধূত জিজ্ঞেস কবলেন, আপনি বাতেব জন্য হোটেলে বা ধর্মশালায় ঘর নেবেন একটা?

শেষ যখন এসেছিলাম এখানে হোটেল ছিল না। এখন হয়েছে দেখলাম। মস্ত ধর্মশালা অবশ্য আগেই ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কদিন থাকার ইচ্ছে আপনার?

তা তো জানি না, ভালো লাগলে দুই এক রাত থাকব, নয়তো চলে যাব। দুজনের দুটো সুটকেশ রাখাব জন্যও ঘর একটা নিতেই হলো। হোটেলের ঘরই নিলাম। আমাকে ছেড়ে দিয়ে অবধূত তারামায়ের মন্দিবে উঠে গেছেন। হোটেলের খুপরি ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম। এখানে এলে মনে একটা অকাবণ ছাড়া-ছাড়া ভাব আসে। ঘণ্টাখানেক বাদে মন্দিরের সামনে এসে দেখি একটা ছাপরা দোকানঘরের সামনে কাঁচা মাটির রাস্তার ওপর টুলে বসে অবধূত আয়েস করে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে দোকানীকে হুকুম করলেন, বাবুকে, এক ভাঁড় চা দে। আর একটা টুল দেখিয়ে বললেন, বসুন—

বসলাম। চার-দিক যেমন নোঙরা, যেমনি রাজ্যের মাছি খাবারের দোকানে ভনভন করছে, কিছু মুখে দিতে প্রবৃত্তি হয় না। সেটা বুঝেই হয়তো অবধূত বললেন, ফুটন্ত জল ভিন্ন চা হয় না মশাই, নির্ভয়ে খেয়ে নিন, এখানে নার্ভাস হয়েছেন কি পেট বিগড়েছে, মনে একটা তুরীয় ভাব এনে ফেলুন।

রাত্রি সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে বেশ পরিতোষ সহকারে মাংস রুটি খেলেন, আমাকেও খাওয়ালেন। তারপর বললেন, এবারে আমি শ্মশানে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের চাতালে বসব...ওসব জায়গা আপনার ভালো লাগবে না, হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন বা ঘুমোন।

সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, সমস্ত রাত ওখানেই থাকবেন?

—তা বলতে পারি না।

আমরা শ্মশানে নেমে এলাম। নদীর পাড়টা আগাগোড়াই শ্মশান। তবু শব নিয়ে শব-বাহকরা বেশিরভাগ এ-দিকেই আসে। এই পরিবেশও যেমন নোঙরা তেমনি পীড়াদায়ক। হাড়-গোড়, শেয়ালে খাওয়া মৃতদেহের অংশ, আর শতচ্ছিন্ন কাঁথা ন্যাকড়া বা জীর্ণ তোষকের ছড়াছড়ি। একপ্রস্থ ঘুরে এসে আমাকে নিয়ে অবধূত চাতালে উঠে বসলেন। বললেন, এখানেই ছিল বশিষ্ঠদেবের সহস্রমুণ্ডীর আসন। বামাক্ষ্যাপাও এখানে বসেই তপস্যা করতেন। ওই আসনের ওপরই এই মন্দির তোলা হয়েছে। শুনি, অনেকে নাকি এই সহস্রমুণ্ডীর আসনে বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারে না।

কিন্তু স্থির হয়ে বসার পক্ষে বড় অসুবিধে অন্য কারণ। মশার উৎপাত। অজস্র মশা মুহুর্মুহু ছেঁকে ধরছে। খানিক বাদে অবধূত হেসে বললেন, আপনি হোটেলে চলে যান, বললাম তো আপনার অসুবিধে হবে—

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, ছেলের অসুখের সময় একজনের নির্দেশে আমি পর-পর তিন-রাত এই চাতালের আসনে বসে কাটিয়েছি, জলাহার ফলাহারে থেকেছি।

অবধূত নির্বাক খানিক। তারপর বলে উঠলেন, দিলেন মশাই মনটা খারাপ করে, আপনার ছেলের কথা মনে হলেই আপনার স্ত্রীর মুখখানা আমার চোখে ভেসে ওঠে। আবার খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন আপনি ভিতরে ভিতরে মানুষটা বেশ শক্তই...।

বসে আছি। হঠাৎ অদূরে শ্মশানের এক-দিক থেকে একটু শোর-গোল ভেসে এলো। আবছা অন্ধকারে দুটো লোক ছুটে বেরিয়ে গেল। আরো জনাকয়েক না ছুটলেও হনহন করে এ-দিকেই আসছে।

অবধূত বললেন, চলুন দেখি কি ব্যাপার—

দুজনে নেমে এলাম। একজনকে থামিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে—

দুজন লোক, তাদের স্পষ্টই ভয়ার্ত মুখ। আরো তিনটি লোক দ্রুত এ-দিকে আসছে দেখলাম। দুজন জ্যান্ত মানুষ দেখে এই দু'জন একটু যেন আশ্বস্ত হলো। তার ওপর অবধূতের পরনে আর গায়ে ঝকঝকে রক্তাম্বর। হাঁপাতে হাঁপাতে যা নিবেদন করল, তাজ্জব হবার মতোই। ক[illegible] একটা মৃতদেহ ফেলে রেখে সৎকার না করেই চলে গেছে। হয়তো খুব গরিব, কাঠের খোঁজে গেছে। এরা একদল এসেছিল শিবা-ভোগ অর্থাৎ শেয়ালের ভোগ দিতে। দগ্ধ অর্ধ দগ্ধ, বা মৃতদেহের

সামনে ভোগ দিতে পারলে সেটা সব থেকে প্রশস্ত। তাই সৎকার হয় নি এমন একটি মৃতদেহ দেখে খুশি হয়ে সেখানেই তারা শিবা-ভোগ সাজিয়েছিল। একটু বাদে তারা দূরে বসে অপেক্ষা করবে, শেয়ালের ভোজ খাওয়া দেখবে। কিন্তু তার আগেই তাজ্জব কাণ্ড, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা শব নড়ছে, একটা হাত বাড়াতে চেষ্টা করছে। তারা শুনেছিল, সৎকার হয় নি এমনি একটি মৃতদেহ নাকি ইদানীং খাবার চায়। ভয় পেয়ে কয়েকজন ছুটে পালিয়েছে। সাহস করে যারা দাঁড়িয়েছিল মৃতদেহকে আরো বেশি নড়াচড়া করতে দেখে তারাও পালাচ্ছে।

অবধূত বললেন, চলুন তো কি ব্যাপার দেখি—আপনার পকেটে টর্চ আছে তো?

টর্চ পকেটেই ছিল। দুজনে এগিয়ে চললাম। শ্মশান বাঁক নিয়ে বরাবর গেছে। গজ বিশেক গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে আপাদ-মস্তক নোংরা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া একটা দেহই বটে। তার গজ কয়েক তফাতে শাল-পাতায় শিবা ভোগ রয়েছে। টর্চটা আমার হাত থেকে নিয়ে অবধূত ওই দেহের ওপর ফেললেন। দেহ নড়ছে। আবার একটা হাত আস্তে আস্তে চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছি।

অবধূত হেসে উঠলেন।—বুঝেছি, ওরে ব্যাটা জ্যান্ত মড়া। উঠবি তো ওঠ নইলে জ্যান্ত চ্যালা-কাঠ দিয়ে এখানে তোকে পিটিয়ে মারব আমি!

হাতটা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল।

অবধূত প্রায় গর্জন করে উঠলেন, আর তিন সেকেণ্ড, তার পরেই আমি পিটতে শুরু করলাম, আমাকে চিনিস না!

অন্ধকার স্তব্ধ শ্মশানে তারপর একটা কাণ্ডই হলো। এক মূর্তি চাদর ফেলে শোয়া থেকে উঠে বসল। গাল-ভর্তি দাড়ি। চোখ দুটো গর্তে। জীর্ণ, কংকালসার। জ্যান্ত দেখেও অস্বস্তি। টর্চের আলোয় তাকাতে অসুবিধে হচ্ছে, অবধূতের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে জোড় করল।

ধমকের সুরে অবধূত জিজ্ঞেস করলেন, মড়া সেজে পড়ে আছিস কেন—শিবা-ভোগ খাবার লোভে?

করুণ জবাব এল, হ্যাঁ বাবা, বড় গরিব—

—লোককে এ-রকম ভয় দেখিয়ে তুই এই কাণ্ড করিস?

—ভয় না দেখালে যে বাবা কেউ চলে যায় না, শিবা-ভোগ খাওয়া দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকে—ওরা শেয়ালের ভোগ খাওয়া দেখে পুণ্যি করে, আমি জিয়ন মুনিষ খাত্তি পাই ন্যা—

অবধূত ওর মুখ থেকে সরিয়ে টর্চের আলোটা কলাপাতার ওপর ফেললেন। সেই আধ-সেদ্ধ মাংস-ভাত আরো কি-সবের চেহারা দেখেই গা ঘিনঘিন করে উঠল। আর ওই খাবার জন্য লোকটার দুচোখ জ্বল জ্বল করছে।

—উঠে আয়!

চাদরটা কাঁধে ফেলে আবার হাত জোড় করে লোকটা উঠে এলো।

—আয় আমার সঙ্গে।

লোকাটা প্রায় ডুকরে উঠে অবধূতের পায়ে ধরতে এলো।—এই ইট্রিবার ছাড়িন দে বাবা, ধরিন দিলে উয়ারা মু-কে মাইর‍্যে লাশ ফেলি দিবে, ছাড়িন দে বাবা—

অবধূত থমকে তাকালেন তারপর লালজামার নিচে গোঁজা কাপড়ের থলে বার করে হাত ঢোকালেন। যা বেরুলো তার থেকে একটা পাঁচটাকাব নোট তুলে তার দিকে বাড়ালেন।—নে ধর, পিটুনি খেয়ে মরাই বরাতে আছে তোর, ক'দিন লোককে ফাঁকি দিবি—আজ দোকান থেকে ভালো কিছু কিনে খেয়ে নেগে যা—

লোকটা টাকা নিল। ওর মুখ দেখে মনে হলো একসঙ্গে পাঁচটা টাকা কমই চোখে দেখেছে।

পরদিনই আমরা বক্কোমুনিব থানে অর্থাৎ বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে। তখন বিকেল। খোঁজ নিয়ে মন্দিরের চাতাল থেকে অবধূত যে আধ-বয়সী লোকটিকে ধরে নিয়ে এলেন সেই-হলো কংকালমালী ভৈরবের ডেরা দেখাশুনোর ভার নিয়ে আছে। কর্তাদের অর্থাৎ ভটচায মশাই আর তাঁর ভাইযের ছেলেদেব ব্যবস্থা এটা। আজ এটা তাদের তীর্থক্ষেত্র। ফি সপ্তাহে বামপুর হাট থেকে তাদেব কেউ না কেউ এখানে এসে ভৈরব বাবা আব ভৈরবী মায়ের পুজো দিযে যায়। লোকটার নাম যশোদাকান্ত। অবধূতকে দেখা-মাত্র চিনেছে এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছে। সাগ্রহে মাতাজীর খবর নিয়েছে। জোযান বয়সে দু'বার কলকাতা গেছল আর মাতাজীব সঙ্গে দেখা করেছিল বলল। বড দুঃখ ছিল একবাবও বাবাব সঙ্গে দেখা হয় নি। আমাদের নিয়ে সে ডেবাব সামনে এসে দাঁড়াতে অবধূতের মুখের অদ্ভূত পবিবর্তন দেখলাম। গম্ভীর শুধু নন, তাঁর প্রাণমন যেন নিজের কাছে নেই। প্রথমে দাওয়ায় মাথা কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপব দাওযায় উঠে সোজা উপুড হয়ে শুয়ে মেঝেতে কপাল বেখে পড়ে রইলেন প্রায় মিনিট খানেক। উঠলেন। যশোদাকান্ত সামনের ঘরের শিকল নামাতে বাইরে পা রেখে আবারও ঘবের মেঝেতে উপুড় হলেন। এবারে মিনিট দুই।

পরিবেশ গুণ আব এখানকার অনেককিছু অবধূতের মুখে শোনা বলেও হতে পাবে, এক অননুভূত ভাবের আবেগে আমিও নির্বাক। বিকেলের আলোয তখনো টান ধরে নি। ঘরে ধূপ-ধুনো দেবাব ব্যবস্থা দেখলাম। সামনে দেয়ালে জটাজুটধারী ত্রিশূল হাতে দীর্ঘাঙ্গ এক নগ্ন তান্ত্রিকেব মস্ত ছবি টাঙানো। বলাবাহুল্য ইনিই কংকালমালী ভৈরব। শোনার সঙ্গে মেলে। দেখে মনে হবে এই পৃথিবীর ওপরেই ক্রুদ্ধ বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু চোখদুটো ঝকঝকে। হাতখানেক দূবে অবধূতের পবম ইষ্ট ভৈরবী-মা অর্থাৎ কল্যাণীর মা মহামায়ার ছবি টাঙানো। দুজনের মাথাব ওপরে মস্ত কালীর ছবি। অবধূত একে একে ছবির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও করলাম। তারপর দুজনকে ভালো করে দেখায় মন দিলাম।

হ্যাঁ, এই ভৈরবী মা-ও অপূর্ব সুন্দরীই বটে। কিছুটা কল্যাণীরই মুখের আদল। কিন্তু বেশ-বাসের জন্য হোক, বা মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধার জন্য হোক, আমার অন্তত মনে হলো তুলনা করলে কল্যাণীকেই বেশী সুন্দরী বলতে হবে।

অবধূত একবার এঁকে দেখছেন একবার ওঁকে।

...মনে পড়ল, বাইরে উগ্ররাগী এই কংকালমালী ভৈরবকে নাকি কল্যাণী শিব-

ঠাকুর বলে ডাকতেন, আর তাই শুনে মহাভৈরব গলে যেতেন।...আঠারো উনিশ বছরের কল্যাণী ভিতরে ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করতেন, শিব-ঠাকুর, ঠিক-ঠাক মতো আছ? ভিতরে ঢুকব?...সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে খুশি-ঝরা দরাজ গল শোনা যেত, আমি ঠিক-ঠাক মতোই আছি, তোর অসুবিধে হলে একটু দাঁড়া, বাঘছালটা কোমরে জড়িয়ে নিই।

...আর একবার কল্যাণী জন্মাষ্টমীর দিনে এই মহাতান্ত্রিককে ফুলের মুকুট চুড়ো আর বাঁশি দিয়ে সাজাতে এসেছিল, বলেছিল, আমার হাতে পড়ে তুমি আজ মুরলীধর হবে। কংকালমালী ভৈরব হা-হা হেসে বলেছিলেন, ঠিক আছে, সাজা—তারপর থেকে রাধিকা হয়ে আমার কোলে বসে আমার সঙ্গে বাঁশী ধরতে হবে—যা ডবকাখানা হয়েছিস—রাধিকাও এমন ছিল না। সাজানোর পরে বজ্র হুংকারে ডেকে উঠেছিলেন, অবধূত! এই শালা ভূত। অবধূত ভিতরে ঢুকে দেখেন ভৈরব-বাবাকে সত্যিই ফুলসাজে সাজানো হয়েছে, ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের বাজুবন্ধ মাথায় শিখী-চূড়া, হাতে বাঁশী। বলে উঠেছিলেন, দ্যাখ শালা, ভালো করে দ্যাখ, রাধিকা বলল, ডেকে দেখাও, হিংসায় জ্বলে যাবে...ঠিক বলেছে, জ্বলছিস, হা-হা-হা—

...রাধিকা (অর্থাৎ কল্যাণী) কেন বলেছিল হিংসায় জ্বলে যাবে, অবধূত কল্পনাও করতে পারেন নি। ওই একজনের তাঁর জীবনে আসাটা আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার মতো, কিন্তু কল্যাণী তখন থেকেই এই ভবিতব্য অবধারিত জানতেন। সবই অবধূতের মুখে শোনা আমার, কিন্তু এই পরিবেশে এসে সেইসব শোনা স্মৃতি আমার কাছেই জ্যান্ত হয়ে উঠছে। অবধূতের স্থির ভাবাবেগ আঁচ করা কঠিন নয়।

যশোদাকান্ত জানান দিল, সন্ধ্যার আগে রোজ এসে সে ভৈরব বাবার এই ঘর আর দাওয়া পরিষ্কার করে, বাবার ঘরে প্রদীপ জ্বেলে ধূপ-ধুনো দিয়ে যায়। ঘরের কোণে দু'খানা শিতলপাটিও গোটানো দেখলাম। এখানকার কর্তারা এসে বসেন বোধহয়। জলের কুঁজো গেলাসও আছে।

প্রায় আধ-ঘন্টা বাদে বাইরে এসে অবধূত বললেন, বিয়ের আগে পর্যন্ত আমি এই দাওয়াতেই থাকতাম, এখানেই তিন রাত থাকব...আপনার তো অসুবিধে হবে।

জবাব দিলাম, আমি থাকার জন্য আপনার অসুবিধে না হলে আমার অসুবিধে হবে না।

হাসলেন। খুশিও হলেন মনে হয়। যশোদাকান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, হোটেল থেকে আমাদের দুজনের রাতের খাবার এখানে দিয়ে যেতে পারবে?

—যা বলবেন এনে দেব।

—ঠিক আছে, আমরা একটু ঘুরে আসি। তুমি তোমার কাজ সারো, আর রাত আটটা নাগাদ আমাদের খাবার দিয়ে যেও—বলা-টলার কিছু নেই, রুটির সঙ্গে মাছ মাংস তরকারি যা পাও নিয়ে আসবে। শিতলপাটি দুটো বাইরে পেতে রেখো, কুঁজোয় যেন জল থাকে।

কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে অবধূত আমাকে নিয়ে শ্মশানে বেড়াতে বেরুলেন। তাঁর গুরু কংকালমালী ভৈরব যেখানে বসতেন সেই জায়গাটা দেখালেন, সেখানেও কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যায় লোকালয়ের দিকে এলেন। এ-দিক সে-দিক হয়ে একটা নির্জন জায়গায় এসে দেখি সামনে একটা দিশি মদের দোকান। বেপরোয়ার মতো ঢুকে পড়ে দুটো সীল করা পাঁইট কিনলেন। বলাবাহুল্য নির্জলা দিশি।

বেরিয়ে এসে বললেন, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, যে দেশের যা—খাসা জমবে দেখবেন।

ফিরে এসে দেখি বাইরের দাওয়ায় পাটি পেতে যশোদাকান্ত আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, শেয়াল-টেয়াল এসে টেনে নিয়ে যাবে, তাই যেতে পারছিলাম না।

—ঠিক আছে।...ভালো কথা, আগে দুটো মাঝারি সাইজের ভাঁড়, এই ধর টাকা খানেকের ছোলা-সেদ্ধ কয়েকটা কাঁচা-লঙ্কা কিছু আদা কুচি, একটা পাতি লেবু আর খানিকটা নুন দিয়ে যাবে।

মনে হলো উদ্দেশ্য বুঝেই লোকটা চলে গেল। আমি মন্তব্য করলাম, যে দেশের যা—

—না তো কি, তিনি এখন নিজের মেজাজে, এই জিনিসের ওপর দিয়েই দ্বারভাঙার কমলাগঙ্গার ধারে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে আমার তিন-তিনটে বছর কেটেছে মশাই।

—কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে আমি তো নার্ভাস হচ্ছি!

—সঙ্গদোষে সব ঠিক হয়ে যাবে। পাটিতে বসে বোতল দুটো সামনে রাখলেন। নিজেব গায়েব জামা খুলতে খুলতে বললেন, জামা খুলে ফেলুন, গরম লাগছে-–ঘরে হাত পাখাও আছে বোধহয়, যশোদাকান্ত আসুক—সত্যি বেশ গরম লাগছে। যে ঘবে ঢুকতে লোক ভয়ে কাঁপত, যশোদাকান্তব অপেক্ষায় না থেকে আমি অনায়াসে সেই ঘরে ঢুকে গেলাম। একটাই হাত পাখা আছে, সেটা এনে বসলাম।

সরঞ্জাম নিয়ে যশোদাকান্ত আধঘন্টার মধ্যেই ফিরল। অবধূত হুকুম করলেন ভাঁড় দুটো ভালো করে ধুয়ে দিয়ে যাও, আর জলের কুঁজোটাও বাইরে রেখে যাও।

যাবার আগে যশোদাকান্ত বলে গেল ঘন্টা দেড়েক বাদে আমাদের রাতের খাবার দিয়ে যাবে, মাংসও পাওয়া যাবে।

অবধূত বললেন, ভেরি গুড—এসো।

দিশি জিনিসেব গন্ধটা আমাব ভালো লাগছে না। কিন্তু অবধূত দেখলাম নির্বিকার। স্কচ হুইস্কি আর মাংসের চাট যে পরিতৃপ্তি নিয়ে খান, এই দিশি বস্তু আদাছোলা কাঁচা লংকা আর নুন সহযোগে সেই পরিতৃপ্তি নিয়ে খেয়ে চলেছেন। অন্ধকার রাতের এই পরিবেশ বড় অদ্ভুত লাগছে আমার। অনেক দূরে একটা চিতা জ্বলছে। এ-দিক ও-দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে। দাওয়ায় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের দরজার সামনে রাখা হয়েছে। পুরনো দিনের কথাই বেশি বলছিলেন অবধূত। রোগীরা কতদূর পর্যন্ত লাইন করে দাঁড়াতো, ভৈরবী মা কোথায় কি-ভাবে বসতেন, তাঁর চোখের দৃষ্টিই এমন ছিল যে কত লোক ভাবত ওই চোখ দিয়েই মা অর্ধেক রোগ তুলে নিচ্ছেন। অবধূতকে নিয়ে কল্যাণী ক্ত ভাবে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার ফিকির খুঁজে বেড়াতো, ইত্যাদি।

প্রথম পাঁইট শেষ হবার পর দ্বিতীয় বোতল খোলা হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

বিয়ের পর আর আপনি এখানে মোটে আসেন নি?

—গোড়ায় কল্যাণীকে নিয়ে বছরে দু'একবার রামপুরহাট আসতাম, তখন দুই এক ঘন্টার জন্য এখানেও ঘুরে যেতাম। শেষ এই দাওয়ায় বসে এক রাত কাটিয়েছি সেই একষট্টি সালে আরো বাইশ বছর আগে...আমার ছ'বছরের ছোট বৈমাত্রেয় ভাই সুবীর—সুবুকে নিয়ে।

মনে পড়ল ঘর ছাড়ার সময়ে ওঁদের সংসারের বিমাতাটি ছিলেন কড়া স্কুল মাস্টার। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়েকে কড়া শাসনে মানুষ করতেন, এঁটে উঠতে পারতেন না কেবল এই সতীনপো'র সঙ্গে। তাঁর নালিশে বাবার হাতে এই ছেলেকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হতো। কল্যাণীকে বিয়ে করে কোন্নগরে বসবাসের সময় ওই সংসাবেব সঙ্গে অবধূতেব নিশ্চয়ই আবার যোগাযোগ হয়েছিল, নইলে বৈমাত্রেয় ভাইকে তিনি পেলেন কোথায়? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ওই বৈমাত্রেয় ভাইয়েরও বুঝি এ লাইনে মন ছিল?

ভাঁড়ে একটা বড় চুমুক দিয়ে মুখে দু'চারটে ছোলা ফেলে চিবুতে চিবুতে অবধূত জবাব দিলেন, তখন এক কল্যাণীর দিকে ছাড়া ভাইয়ের আব কোনো দিকে মন ছিল না, কল্যাণীর দিক থেকে ওর মন ফেরানোব চেষ্টাতেই এক রাতের জন্য এই ডেরায় তাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম খানিক। তারপর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম। প্রশ্নটা আপনিই বেরিয়ে এলো, বলেন কি...বাষট্টি সালে মানে তখনকার কত বয়েস?

—আমার চুয়াল্লিশ, ভাইয়ের আটতিরিশ আর কল্যাণীর পঁয়তিরিশ—ভাই অবশ্য সেটা কখনো বিশ্বাস করে নি, কল্যাণীর বয়েস ও কখনো কুড়ির বেশি ভাবে নি—বিয়ের সাত বছর বাদে প্রথম ও কল্যাণীকে দেখেছিল, তখনই নিজের মাকে বলেছিল, দাদা এত বড় তন্ত্রসাধক হয়েছে যে তার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে—পঁয়তিরিশেও একই রকম দেখে অবশ্য ওর ভুল কিছুটা ভেঙেছিল, কিন্তু মাথাটা সেই জন্যেই আরো বেশি বিগড়েছিল।

আবার ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে শরীরে ছোট একটু ঝংকার তুললেন। সেটা তরল পদার্থের কারণে হতে পারে, আবার অপ্রিয় স্মৃতির আলোড়নেও হতে পারে। গলার স্বরে খেদও স্পষ্ট একটু, যেমন কপাল, হতভাগা চোখ দিতে গেল কিনা কল্যাণীর দিকে, চেষ্টা করেও ফেরানো গেল না...যাবে কি করে তাকে পাবার অন্ধ আক্রোশে তখন যে কাঁধে শনি চেপে বসেছে ওর।

...প্রসঙ্গের শুরু এখান থেকে হতে পারে আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। খুব ঢিমে তালে অতীতের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে যেতে লাগল। একদিনে নয়, দূরের সেই চিত্র আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরো তিন রাত কেটে গেল। তার কারণ রাত না হলে অবধূতকে ঠিক বলার মুডে পাওয়া যায় না। আবার রাত এগারোটা না বাজতে একলা তিনি শ্মশানে চলে যান। রাত এগারোটা অবশ্য এই পরিবেশে গভীর রাত্রি। কখন ফেরেন টের পাই না।...সকাল থেকে আমি রাতের এই দুই আড়াই ঘন্টার অপেক্ষায় থাকি। নিজেই দুটো দিশি বোতল কিনে রাখি। যশোদাকান্ত আনুষঙ্গিক সব দিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর সব নিয়ে পাটি

পেতে প্রস্তুত হয়ে দাওয়ায় বসি। অবধূত তাঁর খুশি মতো শুরু করেন আবার খুশি মতোই চুপ মেরে যান। তখন আর তাগিদ দিয়ে লাভ হয় না। আবার পরের সন্ধ্যার প্রতীক্ষা।

...এবারে আমি অবধূতের-জীবনের আর একটি অধ্যায় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারি। সেই সঙ্গে দিব্যাঙ্গনা স্থির যৌবনা অধ্যাত্ম তেজের ঘরের মেয়ে কল্যাণীর শান্ত জীবনের আর একটি অনাবৃত দিকও। এঁদের একজনকে ছেড়ে আর একজন কত যে অসম্পূর্ণ সেটা এই মহাশ্মশানে কংকালমালী ভৈরবের ডেরার দাওয়ায় বসে যত অনুভব করেছি, ততো আর কখনো করিনি।

৬

...সেটা সাতচল্লিশ সালের শেষের দিক। এই বাংলার মানুষ স্বাধীনতার মাশুল গুণছে। পৃথিবীর অনেক দেশকেই রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা পেতে হয়। কিন্তু এই বাংলার মাটি লাল চোরাগোপ্তার অন্তর্ঘাতী রক্তে, সাম্প্রদায়িক হানাহানির রক্তে। এই সময়ে কোন্নগরে গঙ্গা আর শ্মশানের কাছাকাছি কল্যাণীকে নিয়ে নির্জনে বাসা বেঁধেছেন অবধূত। সঙ্গে লোক বলতে তখন একমাত্র হারু।

এই নব-দম্পতীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো লোকালয় নয় তখন এটা। আশপাশে তখনো কোনো বাড়িই হয় নি। সামনেব দিকে দূরে ছাড়া ছাড়া দুই একটা বাড়ি। পড়শী বলতে বেশ কিছু উদ্বাস্তুর চালাঘর। কলকাতার থেকে পুব-বাংলার ঘর ছাড়া মানুষ এই উপকণ্ঠেও উপছে পড়েছে।

কালীকিংকর অবধূত এখানে এসেই বেশ-বাস বদলেছেন। রক্তাম্বর ধরেছেন। রক্তবর্ণ ধুতি, রক্তবর্ণ পাঞ্জাবি বা ফতুয়া। ম্যাড়মেড়ে নয়, দস্তুর মতো সৌখিন কাপড়ের অথবা সিল্কের। এ-ব্যাপারে কল্যাণীর নির্দেশ মেনেছেন। তিনি হেসে বলেছেন, যা খুশি পরো কিন্তু ভালো জিনিস এনো বাপু।

অবধূতের এই পোশাক আর তাঁর নিঃশব্দ আচরণ অনেকটাই পাবলিসিটির কাজ করেছে। উদ্বাস্তুরা আব কিছু দূরের মানুষেরাও লক্ষ্য ·রেছে, তাদের চোখে লালের ধাক্কা লাগে। দেখে, মানুষটা কারো সঙ্গে মেশে না, প্রায়ই শ্মশানে যায় আসে, শ্মশানের শব-বাহকরা এক-একদিন তাঁকে রাতেও ধ্যানস্থের মতো বসে থাকতে দেখে। অনেকে বিশেষ করে উদ্বাস্তুরা সাগ্রহে আলাপ করতে আসে। তান্ত্রিক যে এটা সকলেই বুঝেছে, কিন্তু মানুষটা কখনো তন্ত্রীয় আচার বিচার বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি কথাও বলেন না। বরং কারো অসুখ করলে দেখতে আসেন, ওষুধ দেন। আর আশ্চর্য, তাঁর ওষুধ যেন কথা বলে। দেখতে দেখতে এটাই প্রচারের বড় জিনিস হয়ে উঠতে লাগল। শহর ছাড়িয়ে এই দূরের নির্জনে আস্তানা নিলেও হারুকে নিয়ে অবধূতের দোকান-পাটে হাটে-বাজারে যাওয়া তো আছেই। লোকে সসম্ভ্রমে ঝক-ঝকে লাল-বসন পরা প্রসন্নমুখ তান্ত্রিককে দেখে। কোথা থেকে এলো তা নিয়ে গবেষণা করে।

আর একটা প্রচারও একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠল। লাল বসন তান্ত্রিকের

ঘরে একটি অনন্য রূপসী বউ আছে। কখনো তাঁকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কোনোদিন বা গঙ্গা স্নান সেবে ফিরতে দেখা যায়। তান্ত্রিকের ভৈরবী-টৈরবী মনে হয় না, দেখে বিয়ে করা বউই মনে হয়। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চুড়ি শাঁখা। কিন্তু রোগের ওষুধ বিসুদ জানে একজন তান্ত্রিক এমন এক দিব্যাঙ্গনা বউ যোগাড় করলেন কি করে? মানুষটার উপার্জন কিছু আছে বলেও তো মনে হয় না, ওষুধ-টসুধ যা দেন তারও দাম পর্যন্ত নেন না। চলে কি করে?

এ-প্রসঙ্গে হেসে অবধূত মানবাচরণের একটু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সাধকরা যদি সাধনা নিয়ে কচকচি না করেন, আর কিছু আধি-ব্যাধি তাক্-লাগানোর মতো করে সরিয়ে দিতে পারেন—লোকের তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা থাকে না, আর তাঁর প্রতি এক ধরনের ভয়-মেশানো শ্রদ্ধাও উপছে ওঠে। কোন্নগরের মানুষেরা এই রীতির ব্যাতিক্রম নয়। এই দুটো কারণেই কাছের দূরের আর আরো দূরের লোকের আনাগোনা বাড়তে থাকল। অনেকেরই কর্মক্ষেত্র কলকাতায়। এমন লোক সম্পর্কে প্রচার সর্বত্রই মুখে মুখে ছড়ায়। কলকাতার মানুষদেরও আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটা বছর গেছে। ততদিন বহু-রোগের ধন্বন্তরী চিকিৎসক হিসেবে তিনি অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। হারুর কাজ দিনে দিনে বাড়ছিল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো লালবসন তান্ত্রিকের সাধনার কিছু অলৌকিক যোগ লোকে নিজেরাই কল্পনা করে নিয়েছে। তা যদি না হবে, লোকটা শ্মশানে যান কেন, কোনো কোনো রাত সেখানে কাটান কেন?

শুধু শরণার্থী নয়, উপদ্রবও এসে জুটত গোড়ার দিকে। এই প্রজন্মে মাস্তানের আবির্ভাব কোথায় না ঘটেছে। ঘরে ওই বয়সের রূপসী বউ থাকলে উপদ্রব এড়ানো খুব সহজ নয়। আর চোখে দেখার থেকে না-দেখা সুন্দরীর আকর্ষণ ঢের বেশী। রমণীর যে রূপ দেখে অনেক মুনিঋষির ধ্যান ছুটেছে, যে রূপ দেখে পৃথিবীর অনেক রাজা-বাদশার মাথা বিগড়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক আগুন জ্বলেছে —তেমনি তিলে-তিলে গড়া এক তিলোত্তমা আছে তান্ত্রিকের ঘরে, তাকে একবার চোখে না দেখলে চলে? অনেকেই সকাল বিকেলে এ-দিকে ঘুরঘুর করত, যাদের ভাগ্যে দর্শন মিলত তাদের প্রচারে কল্যাণীর রূপ এক-আধগুণ বেড়ে যেত। অসুখের ভান করেও এইসব মাস্তানদের কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছে। এঁদের মুখ দেখলেই অবধূত রোগ বুঝতে পারতেন, আর অন্দর মহলের দিকে চোরা-চাউনি দেখলে চিনতে তো পারতেনই। অবধূত বলতেন, আপনাদের সহজ আর স্বাভাবিক রোগ ভাই, এক্ষুণি সেরে যাবে। বলেই হাঁক দিতেন, কল্যাণী।

তিনি সামনে এসে দাঁড়ালে বলতেন, এঁদের অসুখ করেছে তাই তোমাকে ডাকা, তারপর রোগী দুজন বা তিনজনকে বলতেন (একা কেউ আসত না), দেখুন ভাইয়েরা, খুব ভালো করে দেখে নিন, বার বার তো ওঁকে বিরক্ত করা যাবে না—কিন্তু ভাই একটা কথা রাত-বিরেতে যেন খাঁড়া হাতে মা-কালীকে স্বপ্নে-টপ্নে দেখে আঁতকে উঠবেন না।

মান বাঁচাতে কেউ কেউ চোখ লালও করছেন, স্ত্রীকে ডেকে এ-কি রকম

যাচ্ছেতাই রসিকতা মশাই আপনার।

কল্যাণীরও চোখে মুখে হাসি উছলে উঠত। বলতেন, ওঁর ওই-রকমই বিচ্ছিরি কথাবার্তা, আপনারা বসুন, মায়ের প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হারু প্রসাদ নিয়ে আসত। তাই খেয়ে তারা খাবি খেতে খেতে চলে যেত।

...কাকতালীয় কিছু কি ঘটে না? তা-ও একবার ঘটেছিল। এদেরই একজনের চোখের কি খারাপ ব্যামো হয়েছিল। ওমনি রটে গেছল, এটা পাপের শাস্তি। শ্মশানচারী তান্ত্রিকের ঘরে গিয়ে তাঁর বউয়ের রূপ গিলতে চাওয়ার শাস্তি। এমনকি যার ব্যাধি তারও পর্যন্ত এই ধারণা হয়েছিল। আবার এসে অবধূতের পা জড়িয়ে ধরেছে। অবধূত নিজে টাকা খরচ করে তাকে কলকাতার ভালো চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছেন, চিকিৎসা করিয়ে রোগ সারিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে সেই মাস্তান মাতাজীর মহা ভক্ত শিষ্যদের একজন।

একে একে সাত বছর কেটে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে কালীকিংকর অবধূতের নিজের সমাচার সুস্থিব নয় খুব। অস্থিরতার সবটুকুই মানসিক। হঠাৎ-হঠাৎ রোগের মতো সেটা চাড়িয়ে ওঠে। কল্যাণীর লক্ষ লক্ষ টাকা। এ-জন্য অবশ্য নিজের প্রতি ভদ্রলোকের কোনোরকম হীনমন্যতা বোধ নেই। এই সম্বলের ব্যবস্থা বক্রেশ্বরের ভৈরবী মা অন্যথায় শাশুড়ী শুধু মেয়ের জন্য কবেন নি। আর কংকালমালী ভৈরবের অনুমোদন ছাড়া এ বিয়ে কখনোই হতে পারত না। তিনি কি আর কতটুকু তা জেনেই এবং তাঁব কাছ থেকে বিষয়-গত কোনো প্রত্যাশা না রেখেই এই বিয়ে হয়েছে। আর ঠাণ্ডা মাথায় আর একটা সত্যও তিনি অনুভব করতে পারেন। কল্যাণী যে-রকম স্থির মেজাজের মেয়ে, তাঁর অপছন্দেও এই বিয়ে কখনোই হতো না। হয়তো বা তার মায়ের চেষ্টায় এ-পছন্দটা কিছুটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে এই মেয়ের আচরণের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেও অবধূতের মনে হয়েছিল তাঁরও নিজস্ব পছন্দ কিছু আছেই।

মুখেও জানতে বুঝতে কসুর করেন নি।—আচ্ছা, তুমি শুধু তোমার মায়ের ইচ্ছেয় আর ভৈরবগুরু মত দিলেন বলেই আমাকে বিয়ে করলে, তাই না?

কল্যাণীর সাদা-সিধে জবাব, তা কেন, তাঁদের জন্য মনে একটু বেশি জোর পেয়েছিলাম অবশ্যই—কিন্তু প্রথম দিন দেখেই আমার কেমন মনে হয়েছিল বিয়েটা তোমার সঙ্গে হতে পাবে।

—নাঃ, আমি বিশ্বাস করি না—কেন মনে হয়েছিল?

—তা কি করে বলব, তার আগে অবশ্য মেসোমশাইয়ের মুখে শুনেছিলাম, এম. এ. পড়া একটি ঘর-ছাড়া ছেলেকে মা নিজের ছেলের আদরে শিবঠাকুরের আশ্রয়ে রেখেছেন—তখন অবশ্য একটু খটকা লেগেছিল, বরাবরই জানি আমার মা অনেক দূরের চিন্তা করতে পারেন...। তবে আমার পছন্দ ভিন্ন এ বিয়ে হতো না এটা জেনে রেখো, শিবঠাকুর আগে আমার মত জেনে তারপর নিজের মত জারি করেছিলেন।

অবধূতের শোনার লোভ।—তোমার পছন্দ হতে গেল কেন?

কল্যাণীর সোজা জবাব, হলে কি করব।

না, টাকার জোর নয়, টাকা রোজগারের বরাত অবধূতের নিজেরই শুরু হতে খুব সময় লাগে নি। কল্যাণীর চালচলন আচরণে আর একটা সহজ অথচ অব্যর্থ জোরের আভাস তিনি পান যা তাঁর নিজের নেই মনে হয়। এটা বলিষ্ঠ আর স্বতঃস্ফূর্ত সত্তার জোর কিনা তিনি ভেবে পান না। সবকিছু সহজে আর অনায়াসে গ্রহণ করার যেন একটা অদ্ভুত শক্তি আছে তাঁর মধ্যে। অবধূত সেটাই পরখ করতে চান, ধাক্কা দিয়ে দেখতে চান—সময় সময় এই চেষ্টাটা আঘাতের মতোও হয়ে ওঠে —কিন্তু কল্যাণী সব বুজে সব-কিছু মেনে নিয়েই তাঁকে আরো বেশি জব্দ করেন। ফলে থেকে থেকে মনে হয়, তিনি যেন কল্যাণীর জীবনে অপরিহার্য একজন হয়ে উঠতে পারছেন না এমনি তাঁর সত্তার জোর। এই শক্তি কল্যাণী তাঁর শিবঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন ভাবেন, তবু চ্যালেঞ্জ করার ঝোঁক। পরখ কবার ঝোঁক। ভৈরবী মা হঠাৎ চলে যেতে অবধূতের চোখে জল এসেছিল, ভৈরব-গুরুব জন্যও মনটা বিষাদে ভরে গেছল, কিন্তু আশ্চর্য সহজ নির্বিকার দেখেছেন নিজের এই স্ত্রীটিকে। এ-রকম হবে এ-যেন তাঁর জানাই ছিল। উল্টে বলেছেন, আমার দুঃখ হবে কেন, শিবঠাকুরকে তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ডাকলে তো পাই-ই।

প্রায় আড়াই বছর বাদে অবধূতের হঠাৎ মনে হলো, কল্যাণীর ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন? না হবার তো কোনো কারণ নেই, ভোগের সময় কোনোরকম সাবধানতারও ধার ধারেন না তিনি। তাহলে কি ব্যাপার?

কথাটা কল্যাণীকে বলতেই তিনি খুব সহজে একেবারে অবাক-করা কথা বলেছেন।—ছেলেপুলে তো হবে না, শিবঠাকুর তো বলেই ছিলেন, শুধু তোমাকে নিয়েই আমার এ-জন্ম শেষ, প্রারব্ধও শেষ, সন্তান-সন্ততি হবে না।

শুনে অবধূত রেগেই গেছলেন।—আলবত হবে! ছেলেপুলে হওয়াটা তাঁর হাত না আমার হাত?

কল্যাণী হেসে ফেলেছিলন, তোমার হাতেই তো আড়াই বছর ধরে আছি চেষ্টার কসুর করেছ? হলে হতো না?

অবুঝের মতো গোঁ-ধরে অবধূত বলেছেন, সে-রকম সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করি নি—একটা ছেলে বা মেয়ে অন্তত চাই আমার। বলতে বলতে বসে আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিলেন।—চেষ্টাটা প্রায় অত্যাচারের মতোই হয়ে উঠেছিল...বুঝলেন, তবু অন্যজনের সহিষ্ণুতার অপবাদ দিতে পারব না।

আবার বছর ঘুরে গেল। ছেলেপুলে হবার কোনো লক্ষণ না দেখেও অবধূত কংকালমালী ভৈরবের উক্তি মেনে নিতে রাজি হন। বলেছেন, দুজনের কারো কিছু গণ্ডগোল আছে, কলকাতায় গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে। কল্যাণীর কাছে এ-ও যেন এক কৌতুকের ব্যাপার। একবারও আপত্তি করেন নি। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনো রকম দেহগত ত্রুটি খুঁজে পান নি কারো। অবধূত নিজের বা কল্যাণীর ঠিকুজি খোঁজ রাখেন না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর বা স্ত্রীর হাতে দুই একটি করে সন্তানের স্বাভাবিক রেখা আছে।

তাঁর মন্তব্য কানে লেগে আছে। বলেছিলেন, ঘটনা কোন্ পর্যায়ে গেলে সেটা

অলৌকিক বলব আমি ঠিক জানি না। অভ্যাস বা অনুশীলনে অনেক কিছুই পারা যায় যা সাধারণ লোকের বিচার-বুদ্ধির অগোচরে। কিন্তু আমার কাছে শুধু এ-সব ধরনের ব্যাপারগুলোই অলৌকিক।

...ক্রমশ অবধূত একটু বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। নিজের ভিতর দেখেন, প্রবৃত্তি দেখেন, বিশ্লেষণ করেন। নিজের তুলনায় কল্যাণীর সত্তার জোরের পাল্লাটা অনেক বেশি ভারী মনে হয়। অসহিষ্ণুতা বাড়ে। তাঁরও ভিতরে বিবাগী সুপ্ত মন একটা আছেই। সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় তাঁর মনের একটা দিক স্ত্রীব ক্রীতদাস হয়ে আছে। অবধূত মাঝে মাঝে ঘর ছাডতে শুরু কবলেন, মাঝে মাঝে পালাতে শুরু কবলেন। নিজের কাছ থেকে নিজেকে উদ্ধার করা বড কঠিন ব্যাপাব।

ঘটনার সাজ দেখা শুরু হলো তখন থেকে। পুরী বেনারস গেছেন, লক্ষ্ণৌ হরিদ্বাব দেরাদুন মুসৌরি করেছেন। সর্বত্র কিছু না কিছু ঘটেছে। কারো না কারো সঙ্গে আশ্চর্য রকম যোগাযোগ হয়েছে। পরে মনে হয়েছে কেউ যেন তাঁকে নাকে দড়ি পবিযে টেনে নিযে গেছল। তাঁর পার্টটুকু তাঁকে দিয়ে করিযে ছেড়ে দিয়েছে। এক-দিক দিয়ে তাঁব লাভ হয়েছে বইকি। মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর কাছে থেকে এসেছে।

কিছুদিন বাদে ফিরে এসে কিছুটা সুস্থির হয়ে বসেন। তাবপর আবার ছটফটানি শুরু হয। ক্রীতদাসের বন্ধন ছেঁডাব তাগিদে সময় সময় নিষ্ঠুব হযে ওঠেন। কিন্তু কল্যাণী নির্লিপ্ত, তার মনে যেন কোনো আঁচড়ই পড়ে না। কিছু বললে হেসে জবাব দেন শিবঠাকুর তো বলেই রেখেছিলেন কারণে অকারণে তুমি জ্বালাবে আমাকে।

ঘটনাব সাজ একটা বড বকমের বাঁক নিল কোন্নগবে আসার সাত বছর বাদে। পাটনা যাবেন বলে কলকাতায এসেছিলেন। বয়েস তখন সাঁইতিরিশ। রক্তাম্বর বেশ-ভূষা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লম্বা সিঁদুর চিহ্ন, মাথার চুলে কদম-ছাঁট —সব মিলিয়ে চেহারাব মধ্যে বলিষ্ঠ গোছের তন্ত্র-সাধকের ছাপ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। জিনিস-পত্রেব মধ্যে কাঁধে কেবল একটা ভারী ঝোলা। বাইরে বেরুনোর সময় প্রয়োজনীয় যা-কিছু সব ওই ঝোলাতে।

পাটনাব গাড়ি রাতে। একজন ভক্তের সঙ্গে কথা হয়েছিল সকালের দিকে তাঁব বাড়িতে এসে রাতে রওনা হবেন। পাটনার টিকিটও তাঁর কেটে রাখার কথা। তাঁর ছেলের রোগ নিরামযেব বিনিময়ে অবধূত কিছু গ্রহণ করেন নি বলে সাগ্রহে এটুকু তিনি করতে চেয়েছিলেন।

বসে আছেন। ভিড় এড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে বছর তিরিশ একত্রিশের একটি লোক বসে আছে, পাশে ছোট একটা সুটকেশ। পরনে প্যান্ট শার্ট, কিন্তু তেমন দামী কিছু নয়। আপাতদৃষ্টিতে স্মার্ট। তাঁকে দেখে অবধূত দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখতে লাগলেন। খুব মনে হলো এই লোকের সঙ্গে তাঁর কিছু নাড়ির যোগ আছে।

লোকটি বিমনা ছিল। গোড়ায় খেয়াল করে নি। কিন্তু লাল বেশ-বাসের এমনি

মজা, চোখে পড়তেও খুব সময় লাগে না। লোকটি দেখল। তারপর অমন বেশের একজনকে ও-ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাক। ঝক-ঝকে দু'চোখ যেন তাঁর মুখের ওপর বিঁধে আছে।

অবধূত পায়ে পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি মুখের ওপর তেমনি অপলক। লোকটি যেন একটু অস্বস্তি নিয়ে নিজের অগোচরে উঠে দাঁড়ালো।

—বলবেন কিছু?

—সুবু...?

জবাব দেবে কি, ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলো। অবধূত আবার জিজ্ঞেস করলেন, সুবীর চ্যাটার্জী?

এবার তেমনি অবাক মুখেই মাথা নাড়ল। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনি...?

—চাঁদু নামে তোর কোনো দাদা ছিল কখনো?

—দাদা...চাঁদুদা তুমি!

এই বেশ না হলেও চিনতে পারা আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য তিনি ভাইকে চিনেছেন। ষোল বছর হয়ে গেল ঘর ছেড়েছিলেন। এই ভাইয়ের বয়েস তখন বছর পনেরো। পনেরো বছরের ছেলেকে একতিরিশে চেনা খুব সাধারণ চোখের কাজ নয়। বিশেষ করে যে ভাই বা বাড়ির কথা এত বছরের মধ্যে কখনো মনেও আসে নি।

অবধূত হৃষ্ট মুখে বসলেন, তাকেও বললেন বোস। এই যোগাযোগ বড় অদ্ভুত লাগছে তাঁর। আজ সাত বছর হয়ে গেল কলকাতার এত কাছে আছেন। নিজেব ভিতরেই বিবেকের খোঁচা খেলেন একটু। কর্তব্য বোধেও বাবা বৈমাত্রেয মা ভাই বোঁনদের কথা একবার মনে পড়ে নি। ভাইয়ের মুখের দিকে একবাব চোখ দুটো হোঁচট খেল কেন বুঝলেন না। ভিতবেব ঈষৎ আবেগে ফেব ভালো কবে দেখাব কথা মনে হলো না। বললেন, ঠিক ঠিক চিনেছিস না এখনো সন্দেহ আছে?...বাড়ির খবর কি?

ছ'বছরের বড় ভাইকে এতকাল পরে দেখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার কথা। কিন্তু ভাই তা করল না খেয়াল করেও অবধূত ভাবলেন, বেশি রকম হকচকিয়ে গেছে বলেই ভুলে গেছে।

সুবীর চ্যাটার্জী পাশে থেকে আর একদফা নিরীক্ষণ কবল।—এমন আদল আসছে...কিন্তু চেহারা অনেক বদলে গেছে তোমার।...বাড়ির খবর বলতে সাত বছর হলো বাবা নেই, তারও বছর দুই আগে আবু গেছে, বাবা সেই শোকই মৃত্যু পর্যন্ত সামলাতে পারেন নি।

আবু...আবির, সব থেকে ছোট ভাই, তারও নিচে অবশ্য বোন সুলু—সুলতা। ...বেঁচে থাকলে আবুর বয়েস এখন উনত্রিশ হতো, আট বছর আগে মারা গেছে মানে একুশ বছরে গেছে। জিজ্ঞেস করলেন, আবুর কি হয়েছিল?

—পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, সমুদ্রে ডুবে শেষ।

অবধূত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন একটু। নিজেকে স্বার্থপরই মনে হচ্ছে এখন। —সুলুর বিয়ে হয়ে গেছে তো? কোথায়?

—ধানবাদে। ওর হাসব্যাণ্ড সেখানে এক কলিয়ারির অ্যাকাউনটেন্ট।

—আর মা...?

—মা এখনো চাকরি করছে, ওই পুরনো স্কুলেরই অ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমিসট্রেস এখন, ষাটে রিটায়ারমেণ্ট, আরো একবছর চাকরি আছে...তার পরেই ভাবনা।

অবধূতের দু'চোখ আবার ভাইয়ের মুখের ওপর থমকালো একটু।

—ভাবনা কার...কেন ভাবনা?

এড়ানো গোছের জবাব শুনলেন, নানারকমের ঝামেলা, ভাবনা চিন্তা। ভুগছেও খুব।

তক্ষুণি বুঝলেন সবল জবাব পেলেন না। চেয়ে রইলেন একটু। চাউনিটা মুখের ওপব হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে সুবীর চ্যাটার্জী থতমত খেল একটু।

অবধূত বললেন, তোরও তো দিন খুব সুবিধের যাচ্ছে মনে হচ্ছে না...মদ-টদ বেশি মাত্রায় খাস নাকি?

শুনে প্রথমে সচকিত একটু। তারপর হেসে সহজ হবার চেষ্টা।—বেশি মাত্রায় আব জোটে কোথায়, তুমি মুখ দেখেই বুঝে ফেললে?

—মুখ দেখে আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি।

বেশ-বাস, গলায় রুদ্রাক্ষ, আঙুলে রূপোর ওপর মস্ত পলার আংটি সুবীর চ্যাটার্জী আব এক প্রস্থ ভালো করে দেখে নিল।—তান্ত্রিক সাধু-টাধু হয়ে গেছ নাকি?

প্রশ্নের মধ্যে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই স্টেশনে যে, চলেছিস কোথায?

—বাউরকেল্লা।

—সেখানে কেন?

—একটা চাকবিব ইণ্টাবভিউ দিতে। হঠাৎ উৎসুক একটু।—মুখ দেখে কিছু-কিছু বুঝতে পারো...মুখ দেখে বলে দিতে পারো চাকরিটা হবে কি না?

অবধূতেব তখনো ধারণা ভাই যে চাকরি করছে তাব থেকে কোনো ভালো চাকরির ইণ্টাবভিউ হবে। স্থির দুটো চোখ আবার তার মুখের ওপর বিদ্ধ হলো। ছোট ভাই দুটো আব বোনকে ভালোই বাসতেন তিনি। কিন্তু এতকাল বাদেও ভিতরে একটা অপ্রসন্ন অনুভূতি কেন জানেন না। জবাব দিলেন, পারি। হবে না।

আধফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। ক্রোধেব স্পষ্ট অভিব্যক্তি। একটা হতাশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো যেন। সুবীর চ্যাটার্জীও ভুলে গেল দীর্ঘ ষোল বছর বাদে বড আকস্মিক ভাবে এই দাদাটির সঙ্গে তার দেখা। বিদ্রুপেব সুরে বলে উঠল, আর যদি হয়...তোমার দেখা পাব কোথায়?

—কোন্নগরে। গঙ্গার ধারে শ্মশানের দিকে যেতে যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলে বাড়ি দেখিযে দেবে।

...বাড়ি না তোমার আশ্রম?

—বাড়ি। তোর গাড়ি ক'টায়?

আটটা পঞ্চাশ, এখন কটা বেজেছে

অবধূত লক্ষ্য করলেন, ইণ্টারভিউ দিতে চলেছে, কিন্তু হাতে একটা ঘড়িও নেই।—সাড়ে আটটা।...মা সেই আগের বাড়িতেই আছেন তো?

—না। একটু ইতস্তত করে সুবীর চ্যাটার্জী জবাব দিল, বাবা জীবিত থাকতেই দুজনে মিলে ধার দেনা করে ছোট একটু বাড়ি করেছিল, বেশির ভাগই মায়ের টাকায় হয়েছে, এখনো ধার শোধ হয় নি বলে মায়ের মাইনে থেকে টাকা কাটান যায়, তার জন্য মা-কে টিউশনিও করতে হয়—

অবধূত থমকে চেয়ে আছেন। হেসে ফেললেন, তোর অত ফিরিস্তি দেবার কোনো দরকার নেই, তোদের বাড়িতে আমি কোনো ভাগ বসাতে যাব না—কোথায় বাড়ি? নম্বরটা কি?

বাড়ি ফার্ন রোডের কাছে। নম্বরও বলল। অবধূতের মনে হলো চাকরি হবে না বলায় এখনো তার ভিতরের উষ্মা যায় নি।...আশা নিয়ে যাচ্ছে এ-রকম না বলাই উচিত ছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কেন যে একটা বিরূপতা তাঁকে পেয়ে বসল কে জানে।

—এখন গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে? স্কুলের জন্য ক'টা থেকে তৈরি হন?

ভাইয়ের চাউনি দেখে মনে হলো এক্ষুণি বলবে যাওয়ার দরকার কি তোমার? মোলায়েম না হলেও অন্য জবাবই পেলেন।—দুদিন ধরে মা হাঁপের টানে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, স্কুলে যাচ্ছে না।

আর কিছু না বলে অবধূত উঠে পড়লেন। যাবার আগে বলে গেলেন, ফিরে এসে পারলে কোন্নগরে যাস একবার, আমি আজই দিন পাঁচ-সাতের জন্য পুরী যাচ্ছি।

ট্রামে বাসে এ-সময় প্রচণ্ড ভিড়। অবধূত একটা ট্যাক্সি নিলেন। মন থেকে ভক্তের চিন্তা বা পুরীর চিন্তা সরে গেছে। ড্রাইভারকে বললেন বালীগঞ্জের দিকে যেতে।...ভিতরটা টানছে খুব। কেন? জানেন না। ভাই সুবুকে দেখে একটুও ভালো লাগল না। এত কালের সমাচার জানেন না, কিন্তু মনে হলো তার ভিতরে অনেক রাগ ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা জমে আছে। আর মনে হলো সে-রকম সহজ সরল রাস্তায় চলে নি।...স্কুলমাস্টার মায়ের কড়া শাসনে থেকেও ভাইটা এ-রকম হলো কি করে? বাড়ি ছাড়ার সময় তো ক্লাস নাইনে পড়ত, স্কুলে তো বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হতো, এই ছেলের জন্য মায়ের মনে মনে বেশ গর্ব ছিল। বাবাকে শোনাতেন, শাসনে রাখতে পারলে ছেলে-মেয়ে আবার বিগড়য় কি করে?...এই বয়সে সুবু নতুন চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছে রাউরকেল্লা, তার মানে যে কাজে আছে তাতে আদৌ খুশি নয়।

রাস্তাটা সরু হলেও ট্যাক্সি ঢোকে। বন্ধ দরজার গায়ে বাড়ির নম্বর আঁটা। যাঁর কাছে আসা দোতলার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তিনিই তাঁকে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে দেখলেন। তারপর তারই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আরো অবাক। নমিতা দেবী ভিতরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নিচে কর্মব্যস্ত ঠিকে ঝি দরজা খুলে দিতে চোখে আবার লালের ধাক্কা।

ভারী গলার প্রশ্ন শুনলেন, মা কোথায়?

ঝিয়ের জবাব, ওপরে...ডেকে দিচ্ছি। এই বেশের মানুষ দেখে সে-ও সন্ত্রস্ত।

—তিনি অসুস্থ শুনেছি, ডাকতে হবে না, আমাকে ওপরে নিয়ে চলো।

নমিতা দেবী ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে দেখছেন। তাঁর কথা শুনছেন। পরিচিত জনের মতোই ওপরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব। তাড়াতাড়ি তিনিই নিচে চলে যাবেন না অপেক্ষা করবেন ভেবে পেলেন না। ততক্ষণে ঝিয়ের পিছনে রক্তাম্বর বেশ-বাসের আগন্তুক দোতলায় হাজির।

অবধূত থমকে দাঁড়ালেন। স্থির চোখে কয়েক পলক চেয়ে রইলেন। সাদাটে চামড়ায় মোড়া কংকাল-সার রমণী দেহ।...মা কোনোদিনই স্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু তা বলে এই চেহারা কল্পনা করা যায় না। অবধূত পায়ে পায়ে এগোলেন।...মায়ের বিভ্রান্ত ফ্যালফেলে চাউনি।

অবধূত বারান্দাতেই জানু মুড়ে হাঁটুর ওপর বসলেন, উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন।

নমিদা দেবী শশব্যস্তে দু'পা পিছিয়ে গেছেন, নিজের অগোচরে দু'হাত জোড় কবে ফেলেছেন। আব তেমনি বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছেন। রক্তাম্বর বেশ-বাসের দরুন নয়, অনায়াসে ওপরে উঠে আসা, এগিয়ে আসার মধ্যে এক-ধরনের স্নিগ্ধ সৌম্য ব্যক্তিত্ব দেখেও হঠাৎ অভিভূত তেমনি। তাঁরই উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে দেখলে। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

অবধূত মুখ তুলে সোজা হলেন। চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি চাঁদু। রক্তশূন্য কোনো শীর্ণ মুখে বিস্ময়ের এমন রেখাপাত অবধূত কমই দেখেছেন।

...চাঁদু! গলার স্বরেও বিস্ময় ঝরল। চাঁদু কে এ-ও ভালো করে মাথায় বসছে না যেন। এবাব দু'তিন পা এগিয়ে এলেন।—তুমি...তুই চাঁদু! সেই চাঁদু...।

অবধূত উঠে দাঁড়ালেন। সহজ ভারী গলায় বললেন, আমি বছর কয়েক হলো কোন্নগবে আছি, পুরী যাব বলে সকালেই কলকাতায় চলে এসেছিলাম, স্টেশনে সুবুব সঙ্গে দেখা, শুনলাম ইন্টারভিউ দেবার জন্য রাউরকেল্লা যাচ্ছে, তার কাছ থেকে তোমাদের ঠিকানা নিয়ে চলে এলাম।

কোটবাগত দু'চোখে এখনো যেন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।—সুবু তোকে দেখে চিনতে পারল...?

—তা পারে নি, আমি ওকে দেখে চিনেছি।...কিন্তু এ-কি তোমার চেহারা হয়েছে মা! সুবুর মুখে শুনলাম হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছ খুব, ডাক্তাব কি বলে কার্ডিয়াক কিছু নয় তো?

নিজের স্বাস্থ্য সমাচার বলবেন কি, বিমাতাটির এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। কোনোরকমে জবব দিলেন, না, আজ ছ'সাত বছর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিক থেকে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে এলেন, বোস—তুই সেই চাঁদু...আমার কথা শুনে আমাকে দেখতে এসেছিস, তোকে এত কষ্ট দেবার পরেও আমাদের মনে রেখেছিস।

শুনে দুঃখই হলো অবধূতের। বিমাতা বলে ইচ্ছাকৃত ভাবে কখনো কোনো কষ্ট তাঁকে দেন নি। সর্ব ব্যাপারে নীতির দিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল, তাই রেগে যেতেন আর বাবার কাছে নালিশ করা কর্তব্য ভাবতেন। অবধূত কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে দেওয়ালের কাছে রাখলেন। নিঃসংকোচে বিমাতার দুই কাঁধে নিজের দু হাত রেখে

তাঁকে ওই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।—আগে তুমি স্থির হয়ে বোসো মা, উত্তেজনাতে আবার হাঁপাচ্ছ দেখছি—

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি বসলেন। ...মায়ের দু'চোখ ও-রকম হয়ে উঠল কেন। সন্তানের হাতের দরদরে স্পর্শ কতকাল পান নি? এই ব্যাপারগুলো অনুভব করতে অবধূতের সময় লাগে না।

—এবার সব খবর বলো, বাবা নেই আর আবুটাও নেই শুনেছি—

নমিতা দেবীর শীর্ণ মুখের পাতলা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর বললেন, সবই আমার অদৃষ্ট আর কর্মের ফল বাবা, নিজের ছেলেদের নিয়ে বড় গর্ব ছিল...সব থেঁতলে দিয়ে গেল। তুই অমানুষ হয়ে যাচ্ছিস ভেবে তোকে কত যন্ত্রণা দিয়েছি, নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবলে এখনো মনে হয় আমার জ্বালাতেই তুই ঘব ছেড়েছিস।

—ও-কথা তুমি আর একবারও বলবে না মা, কেউ আমার উপকার বই অপকার করে নি, জীবনে যা পেয়েছি তার জন্য আমি সক্কলের কাছে ঋণী।...যাক, সুলুর কেমন বিয়ে হলো, ধানবাদে থাকে শুনলাম, ছেলেপুলে কি?

—মোটামুটি পব পব তিনটেই মেয়ে, এ হয়েছে আমার আর এক চিন্তা। মেয়েগুলোর অসুখ লেগেই আছে, খরচে টান পড়লে চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই টাকা পাঠাতে লেখে...ভাই-বোন দু'জনেই ভাবে আমি টাকার গাছ—ঝাঁকালেই পড়বে। উৎসুক হঠাৎ, ও-কথা যাক, আগে তোর কথা বল, তোর এই বেশভূষা কেন?

অবধূত ফিবে প্রশ্ন করলেন, খারাপ লাগছে?

—খারাপ লাগছে না, হঠাৎ তোকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে আমার মনে হচ্ছিল কোন মহাপুরুষ এলো!...সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেচিস?

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, লোকে আমাকে তান্ত্রিক কালীকিংকব অবধূত বলে জানে...কিন্তু সাধু হয়েছি কি ভণ্ড হয়েছি সেটা এরপর তুমি কোন্নগরের বাড়ি এসে নিজে বিচার করবে—কবে তোমাকে নিয়ে যাব বলো—আমার ইচ্ছে করছে আজই নিয়ে যাই।

মায়ের পাতলা ঠোঁট আবার একটু থরথর করে কেঁপে উঠল কেন বুঝলেন না। অস্ফুট স্বরে বললেন, যাওযা অদৃষ্টে থাকলে যাব, কবে হবে কে জানে। পরের প্রশ্নটা সুবুর মতোই, কিন্তু আদৌ তির্যক নয়।—কোন্নগরে তোর আশ্রম।

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, গার্হস্থ্য আশ্রম বলতে পারো, সেখানে তোমার বৌ-মা আছেন, তাঁর তদারকে খেয়েদেয়ে বহাল তবিয়তে আছি।

—কতদিন বিয়ে করেছিস?

—তা প্রায় আট বছর হতে চলল।

—ছেলেপুলে কি?

—নেই।

এম. এ. বি. টি. পাস অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস মা বলে উঠলেন, এত দিনেও নেই কেন রে?

অবধূত হাসতে লাগলেন। তাবপব জবাব দিলেন, তোমাব বউমাকে জিজ্ঞেস কবলে তিনি বলবেন, তাঁব শিবঠাকুব মানে বক্রেশ্বব থানেব কংকালমালী মহা-ভৈববেব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁব প্রাবব্ধ এ-জন্মেই শেষ—তাই কোনো পিছুটান নেই, সন্তানও নেই।

নমিতা দেবীব কোটবেব দু'চোখ উৎসুক।—সেখানকাব মস্ত সাধক বুঝি তিনি?

—মস্ত সাধকই বলতে পাবো, কিন্তু সেখানে আব নেই—আদৌ কোথাও আছেন কিনা তাও জানি না।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস কবলেন, তুই তাঁকে দেখেছিস?

আগে হলে এই এম. এ. বি. টি. মা সাধুসন্তদেব প্রসঙ্গে নাক সিঁটকোতেন। অবধূত জবাব দিলেন, তিনি আমাব সাক্ষাৎ গুরুদেব, পাঁচ বছব ধবে দেখেছি।

নমিতা দেবী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন। কেন বোধগম্য হলো না। একটু বাদে জিজ্ঞেস কবলেন, তোব পুবীব গাড়ি কখন?

—বাতে।...কিন্তু পুবী আব যাব কিনা ভাবছি।

—কেন?

—এখনো তোমাব বেশ হাঁপেব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পাবছি।...নাঃ, পুবী আব যাবই না, শোন মা, তোমাব এই ছেলেকে লোকে মস্ত উঠতি তান্ত্রিক সাধু ভাবে, কিন্তু সত্যিই সে-বকম কিছু না—আসলে যেটা কিছু জানি সে হলো চিকিৎসা বিদ্যা—তাব ফল পেয়েই লোকে অলৌকিক শক্তি ভাবে—যেতে দাও, এতক্ষণ তোমাকে দেখে আমি আঁচ কবতে পাবছি কি ওষুধ তোমাব দবকাব, আব কয়েকটা কথা কেবল জেনে নেব, সে হবে'খন, পুবী যাওয়া থেকে আগে তোমাকে সাবিয়ে তোলা বেশি দবকাব—তুমি তোমাব অসুখেব ভাবনা এবাব আমাব হাতে ছেড়ে দাও মা।

বিমাতাব দুই পাতলা ঠোঁট আবাব থবথব কবে কেঁপে উঠতে দেখলেন অবধূত। কোটবেব চোখও ঝাপসা হয়ে উঠল। বিড়বিড় কবে বললেন, মা...মা..মা বলে এখন কেউ আব ডাকেও না।

অবধূত নির্বাক। চেয়ে আছেন।

সামলে নিলেন, বললেন, খাওয়া-দাওয়াব ব্যাপাবে তোব কোনো অসুবিধে নেই তো? এখানে খেয়ে যেতে পাবিস না?

—পাবি। কে বাঁধে?

—কে আবাব। আমিই।

—কি খাও?

—আমি তো সেদ্ধ আব সুক্তো-ভাত খাই, তা বলে তোকেও তাই খাওয়াব নাকি। কি খাস জেনে এক্ষুণি ঝি'টাকে বাজাবে পাঠাব—ও-ই আমাব বাজাব-টাজাব কবে।

—ওকে বাজাবে পাঠালে আমি খাব না। আজ আমি মায়েব প্রসাদ পাব—মায়ে-ছেলেতে সেদ্ধভাত খাব।

বিমাতাব দুচোখ আবাবও ঝাপসা হয়ে আসছে। উঠে চলে যেতে বললেন, বোস, আসছি—। একটু এগিয়ে আবাব ঘুবে দাঁড়ালেন।—তোব আমিষ চলে কি চলে না বল—

—আমার সব চলে, কিন্তু কিছু দরকার নেই বললাম তো।

চলে গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যে একটা ডবল ডিমের ওমলেট আর দু'পিস টোস্ট ডিশে নিয়ে এলেন।—পাশেই দোকান, কিছু অসুবিধে হয় নি, খেতে তো একটু দেরি হবে, পরে আমার সঙ্গে খাবি। অবধূত খুশি হয়েই ডিশ হাতে নিলেন।

মা-কে বলে পনেরো বিশ মিনিটের জন্য বেরুলেন। কিন্তু ধারে কাছে কোনো দোকানে ফোন পেলেন না। খোঁজ করতে করতে একেবারে পোস্ট অফিসে এসে তবে পেলেন। কলকাতার ভক্তকে জানালেন তাঁর ওখানে যাওয়া হচ্ছে না, পুরীও না। ট্রেনের টিকিট বিক্রী করে দিতে বলে ফিরতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লেগে গেল।

এসে দেখেন বিমাতা রান্নায় ব্যস্ত। সেদ্ধ আর সুক্তো ছেড়ে বাসনে দু'রকমের তরকারিও কোটা রয়েছে। পাশে দুটো ভাঁড় দেখেই বুঝলেন, দই আর মিষ্টি আনানো হয়েছে। মায়ের রান্নার ব্যবস্থা দোতলাতেই। এক তলার পর পর দুটো ঘরেই দোকান, তার মানে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। খুশিমুখে বলে উঠলেন, এ-যে মস্ত ব্যবস্থা দেখছি!

মা হাসলেন একটু। বললেন, রান্নার আনন্দ ভুলেই গেছি, আজ তুই খাবি বলে আমার উৎসাহ বেড়ে গেছে।

অবধূত বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার এনে কাছে বসলেন। দুই এক কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মা, সুবুর বউ ছেলে মেয়ে কাউকেই এখানে দেখছি না, কি ব্যাপার বলো তো?

শীর্ণ মুখে টান ধরতে দেখলেন। একটু বাদে জবাব দিলেন, ও হতভাগার কথা থাক এখন বাবা—

অবধূত স্তব্ধ একটু। ও-প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে একটু বাদে বললেন, তুমি কষ্ট পেলে থাক মা...মুখ দেখে আমারও মনে হয়েছিল ও খুব ভালো নেই। আমার সত্যি সে-রকম কোনো ক্ষমতা আছে কিনা বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল, যে ইন্টারভিউ দিতে রাউরকেল্লা যাচ্ছে সেই চাকরিটা হবে কি না। আমি হবে না বলতে ও রেগেই গেল—

মা ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, তুই না বললি... সত্যি হবে না তাহলে? হতভাগার দূরে কোথাও চাকরি হলে যে আমি বেঁচে যেতাম...তুই এরকম বলতে পারিস?

—মুখ দেখে ভাগ্যের লক্ষণ কিছু কিছু চিনতে পারি, দ্যাখো, আমার ভুল হতেও পারে। ভাইকে ও-রকম বলার জন্য অবধূত মনে মনে আর এক দফা পস্তালেন। একটু চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন, তারপর তোমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে দিতে চায় না মনে হলো, ওর ভয় পাছে আমি বাড়ির অংশ দাবি করি—

রাঁধতে রাঁধতে মা রূঢ় মন্তব্য করলেন, যেমন স্বভাব, দুনিয়ায় ও ভালো কিছু দেখে না—

—যাক, শেষে দিল অবশ্য, কিন্তু এ-ও জানিয়ে দিল, এ-বাড়ির বেশিরভাগই তোমার টাকায় হয়েছে, তুমি এখনো দেনা টানছ আর অসুস্থ শরীর নিয়ে এ-জন্য

তোমাকে টিউশানিও করতে হচ্ছে...সত্যি নাকি?

মা জবাব দিলেন না। তাইতেই বোঝা গেল সত্যি। অবধূতের জানার আগ্রহ কত দেনা। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘন্টা দুই বিশ্রাম করে কোন্নগরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর আগে মায়ের অসুখ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। নাড়ি দেখার অছিলায় হাতের রেখাও দেখে নিলেন। হিজিবিজি রেখাগুলো সব টানা অশান্তির চিহ্ন, শারীরিক এবং মানসিক। কিন্তু ঋণের চিহ্ন তেমন স্পষ্ট নয়, ফিকে হয়ে এসেছে। সে-রকম বড় অবস্থার কারো হাতে ঠিক এটুকু চিহ্ন থাকলে ঋণের পরিমাণ বেশি হতো। কিন্তু মায়ের অবস্থা যতটুকু আঁচ করতে পেরেছেন তাতে ঋণের পরিমাণ চার-পাঁচ হাজার টাকার বেশি হতে পারে না মনে হলো। বলে গেলেন, পরশু সকালের মধ্যে আমি তোমার ওষুধ নিয়ে আসছি—সেদিনও আমি তোমার হাতের ঠিক এই বান্নাই খেয়ে যাব কিন্তু।

...অনেকদিন বাদে অবধূত একটা আত্মতৃপ্তির কাজ হাতে নিয়েছে যেন। একদিন বাদ দিয়ে তার পরদিন সকালেই এলেন। মা-কে দেখে আজ আগেরদিনের থেকে একটু প্রফুল্ল মনে হলো। বললেন, আমি ভাবছিলাম তুই কতক্ষণে আসবি।

জলখাবারের আয়োজনও করে রেখেছিলেন। মুখ হাত ধোয়া হতে নিয়ে এসে সামনে বসলেন। বললেন, তুই পবশু চলে যাবার পর থেকে আমার সমস্তক্ষণই মনে হয়েছে তুই আর এক মানুষ হয়ে ফিরেছিস, তোর এখন মস্ত শক্তি—

অবধূত হেসে উঠলেন। বললেন, শক্তি বলতে গুরুর দয়ায় আর আমার শাশুড়ী মায়ের দয়ায় রোগের চিকিৎসা কিছু শিখেছি, এ-ছাড়া মোটামুটি এক-রকমই আছি। আসলে তোমার নিজের মন বড দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই এতকাল পরে দেখা ছেলের অনেক শক্তি ভাবতে ভালো লাগছে। জলখাবারের দিকে তাকালেন, অনেক আয়োজন করেছ দেখছি, ভালোই হয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু তার আগে তুমি একটা কাজ করো—

থলে থেকে একটা প্যাকেট বার করে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এটা ধরো দেখি—

কিছু না বুঝেই হাতে নিলেন, ওযুধেব মোড়ক এ-বকম হয কি করে ভেবে পেলেন না।—এতে কি?

—তোমার বউমার সামান্য কিছু প্রণামী, আগে তুলে রেখে এসো।

শোনা-মাত্র আঁতকে উঠলেন, এত টাকা, না না না -

অবধূত বসা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।—খিদের মুখে চলে যাব তুমি চাও? আমার রাগ আর অভিমান কিন্তু এখনো সেই রকমই আছে—

মা ধড়ফড় করে উঠলেন, পাগলেব মতো এ তুই কি কাণ্ড করছিস, এখানে তো অনেক টাকা! তোকে আবার পেলা‌ম এই ঢের—

—আমাকে আবার পেতে হলে এ ক'টা টাকা তোমাকে নিতে হবে। শোনো মা, আমার মা চাকরির পর এই শরীর নিয়ে টিউশনি করবে এ আর আমি হতে

দেব না। খুব বেশি নয়, এখানে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আছে এ-দিয়ে তোমার সব ধার শোধ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ কি না বলো?

অস্ফুট জবাব দিলেন, হয়েও বেশি হবে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর লাইফ ইনসিওরেন্স লোন মিলিয়ে আর চার হাজার দু'শ টাকা বাকি...কিন্তু এতকাল পরে এসে আমাকে তুই এ-ভাবে—

—বললাম তো আমাকে যদি ছেলে ভাব, এ নিয়ে আর একটি কথাও বলবে না। হাসলেন।—তাছাড়া আমি পরের ধনে পোদ্দারি করি না, নিশ্চিন্ত থাকো, এ-টাকা আমারও না, তোমার বউয়ের।

—ছি ছি, যাকে চোখেও দেখি নি, তার থেকে তুই টাকা নিয়ে এলি! কি ভাবল আমাকে...

—সে কিছু ভাবার মেয়ে কিনা একবার চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য ছাড়া আর কিছু ভাববে না, যাও, চট করে রেখে এসো-—আমার খিদে পেয়েছে বললাম না?

...চেয়ে আছেন। পাতলা দুই ঠোঁট থরথর করে এবারে বেশ কাঁপল। চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা। বিড়বিড় করে বললেন, তোর কিছুই খিদে পায় নি, আমাকে টাকা নেওয়াবার জন্য খিদে-খিদে করছিস। টাকার প্যাকেট শাড়ির আঁচল টেনে বড় করে জায়গা করে বেঁধে গলায় জড়ালেন।—ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে বাখব, তুই খা।

অবধূত আনন্দ করে খেতে শুরু করলেন। মা অপলক চেয়ে আছেন। একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন, বেশি না হলেও এই দেনাটুকু শোধ হবার আগে যদি মরে যাই এ-জন্য আমার মনে খুব দুশ্চিন্তা ছিল...তুই সেটা আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলি?

—কিছু পেরেছিলাম, তাছাড়া সুবুও বলেছিল। কি মনে হতে তাড়াতাড়ি বললেন, তুমি কিন্তু টাকার কথা সুবুকে একদম বলবে না মা—ও শুনলেই ধরে নেবে আমার কোনো মতলব আছে।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে মা বললেন, ওর মতলবের আর আমি ধার ধারি না, দিনে দিনে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে আমাকে...তবে তোর টাকা আছে জানলে তুই মুশকিলে পড়তে পারিস—

অবধূত উতলা।—কেন, ও চাকরি বাকরি করছে না?

—সব গেছে! বলব, খেয়ে নে...ওই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আর আমি কিছুই চাই না।

...মাকে ওষুধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে ঘড়ি ধরে তা খাবার তাগিদ দিয়ে অবধূত বিকেলের দিকে কোন্নগর রওনা হয়েছেন। পনেরো দিন ওষুধ চলার পর আবার এসে খবর নেবেন বলে গেছেন।

মনটা বড় বিষণ্ণ। কড়া নিয়ম-নীতির এই মাটির কপালে সুবুকে নিয়ে এত দুঃখ আছে ভাবতে পারেন নি। এত ভালো ছেলে এমন পরিণামের দিকে গড়ায়

কি করে, কে এই ভাবে সুখের বিপরীত দিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়, কেন দেয়, ভেবে গেলেন না।

...সুবু ম্যাট্রিকে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিল। ছোট-খাট স্কলারশিপও একটা পেয়েছিল। বি. এ. আব এম. এ.-তে খুব অল্পের জন্য ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পায় নি। চব্বিশ বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। গেজেটেড অফিসারের পোস্ট। মা দেখে শুনে একটি পছন্দের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন চাকরিব এক বছবের মধ্যে। মেয়েও বি. এ. পাশ, এমনিতে বেশ ভালো, কিন্তু একটু মেজাজী।

...স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে সুবুর চাকরির কপাল আরো খুলে গেল। আর সেটাই কাল হলো। রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশনের পদস্থ অফিসার হয়ে বসেছে। উদবাস্তুদের নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছেন। সুবু তাঁরও নেক-নজরে পড়েছিল। ফলে ওর হাতে তখন অনেক ক্ষমতা, তার তদারকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে।

এর কিছুকাল পর থেকেই মা লক্ষ্য করলেন, বউয়ের সঙ্গে সুবুর প্রায়ই খিটির-মিটির ঝগড়াঝাঁটি বাঁধছে। তিনি জানেন কাজের চাপে সুবুর বাড়ি ফিরতে রাত হয়। পরে ওই বউয়ের কাছ থেকে জেনেছেন সুবু মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। মা কঠিন হাতে শাসনের চেষ্টা কবেছেন। স্পষ্ট বলে দিলেন, এ-ভাবে চললে এ-বাড়িতে ঠাঁই হবে না। এরপর থেকে সুবু কিছুটা গোপনতার আশ্রয় নিল। তার প্রায়ই ট্যুর থাকে, ক্যাম্প ইন্সপেকশন থাকে। তখনকাব খবর আর তিনি পাবেন কি করে।

কিন্তু অনেক খবর রাখত সুবুর বউয়ের এক মামাতো দাদা। সে ওই বিভাগের না হলেও অন্য বিভাগের ছোট-খাটো অফিসার। সে এই ভগ্নিপতির সম্পর্কে অনেক খবর রাখত। ফোনে সাবধানও কবত। কাগজে মাঝে মাঝে উদ্বাস্তু মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগও থাকত। নাম না করলেও কোনো কোনো অফিসার এ-সব কেলেংকারির সঙ্গে যুক্ত এমন ইঙ্গিত বা কটাক্ষও থাকে। মা বউয়ের সঙ্গে সুবুর তুমুল ঝগড়ার আভাস পান। এক-এক রাতে সুবুর চাপা গর্জনও কানে আসে, মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে। কাগজের লোকের চোখ টাটায় ...ই এ-রকম লেখে।

...এরপর দেখা গেল কটাক্ষ এক-এক সময় এমন স্পষ্ট যে, এই অফিসার কে বা কারা স্পষ্টই ধারণা করা যায়। গণ্ডগোলের সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু এত ক্ষমতা যাদের, যাদের হাত দিয়ে স্রোতের মতো টাকা খরচ হচ্ছে, তাদের ধামা-চাপা দেবার শক্তিও খুব কম নয়। কিন্তু সুবুর বউ তো কাগজের খবরের ধার ধারে না, নিজস্ব কোনো ধারণা নিয়েও বসে নেই, সে তার মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে সঠিক খবরই পায়। ওদের ঝগড়ায় মায়ের ওই বাড়ি দিনে দিনে নরক হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এক উদ্‌বাস্তু ক্যাম্প থেকে বাইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কাগজে তোলপাড় কাণ্ড। প... জানা গেছে এটা একই মেয়ে নিয়ে দুই অফিসারের মধ্যে ঈর্ষা আর রেষারেষির ফল। কিন্তু ওই গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠেছে মেয়েটি নিখোঁজ হবার মাস তিনেক পরে। তার আগে পর্যন্ত ধামা-চাপা

দিয়ে চলছিল। ওই দুজনের মধ্যে ব্যর্থ অফিসারটি একজন পরিচিত সাংবাদিককে গোপনে খবর সরবরাহ করেছে, মেয়েটিকে উধাও করে কোথায় রাখা হয়েছে, কোথায় তাকে ছোট-খাটো একটি শেলাইয়ের দোকান করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি সেই মেয়ের ছবি পর্যন্ত এক কাগজে ছাপা হয়ে গেছে।

মেয়েটি ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত অফিসার সুবীর চ্যাটার্জী। মেয়েটির নাম বকুল মিত্র। পূর্ববঙ্গের ভালো ঘরের উদবাস্তু। একটু কালোর ওপর যেমন স্বাস্থ্য তেমনি পটে আঁকা সুন্দর চেহারা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বকুল মিত্র সন্তান-সম্ভবা। জেরায় সে বাধ্য হয়ে কবুল করেছে, সুবীর চ্যাটার্জী বিবাহিত সে জানত না, এবং সে বিশ্বাস করেছিল সুবীর চ্যাটার্জীর মহৎ অন্তঃকরণ বলেই তার মতো অনাথা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাকে সময়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। সে জেনেছিল, বর্তমানে বিয়ে করার ব্যাপারে নানা-রকম অসুবিধে আছে। মোট কথা, বিশ্বাসের ভুলে হোক বা যে কারণেই হোক স্বেচ্ছাতেই সে ক্যাম্প থেকে উধাও হয়েছিল।...হ্যাঁ, শেলাইয়ের ওই ছোট দোকান সুবীর চ্যাটার্জীই তাকে করে দিয়েছেন, সে-জন্য তাঁর প্রতি সে কৃতজ্ঞ। সে কার সন্তান ধারণ করছে এই জেরার কোনো উত্তর দেয় নি, মুখ শেলাই করে ছিল।

বিচার সাপেক্ষে সুবু চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়ে গেল। এর কয়েক দিনের মধ্যে কাগজে আবার হৈ-চৈ ব্যাপার। সুবীর চ্যাটার্জীর স্ত্রী অঞ্জলি চ্যাটার্জী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। লিখে গেছে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কিন্তু দায়ী নয় লিখে গেলেই সুবুর পক্ষে দায় থেকে খালাস পাওয়া সহজ নয়।...তার বিরুদ্ধে অমন একটা কেলেংকারির মামলা ঝুলছে। পুলিশের টানা-হেঁচড়া আর দুই বিচার পর্বে সে আধ-মরা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জেল খাটা থেকে মুক্তি অবশ্য পেল। বকুল বিচারে একই কথা বলে গেছে, সে স্বেচ্ছায় ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর অন্যজন লিখে গেছে তার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়। অতএব জেল খাটা থেকে অব্যাহতি।

কিন্তু চাকরিটা গেলই।

...এর পর এই বাংলায় এ-বকম ছেলেকে আর চাকবি কে দেবে? কলকাতাব বাইরে কলেজে চাকরি পেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুবীর চ্যাটার্জী নামটা তখন স্ট্যাম্প-মারা হয়ে গেছে।

...এর পরেও সুবু বকুলকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। মা তাকেসুদ্ধ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বকুলও আর তাকে বিয়ে করে নি, কিন্তু আশ্রয় দিয়েছে। ওর ছেলে হয়েছে একটি। সেই ছেলের এখন তিন বছর বয়েস। ওইটুকু শেলাইয়ের দোকান থেকে কি-বা আয়। কে কাকে আশ্রয় দেয়। নাম ভাঁড়িয়ে টিউশানির রোজগারই সুবুর এখন একমাত্র সম্বল। কলকাতার শহরে ইকনমিক্সে এম. এ. পাস ছেলে গোঁ ধরলে টিউশানিতেও খুব কম রোজগারই হবার কথা নয়। কলেজের ছাত্র পর্যন্ত পড়াতে পারে। কিন্তু টিউশানি বেশিদিন টেঁকে না। মাস্টার মদ খায় জানলে কোন গার্ডিয়ান বা ছাত্র তাকে রাখবে? ওর মদ খাওয়াটা একদিন না একদিন ধরা পড়েই যায়। এখন এমন হয়েছে যে দূরের এলাকায় টিউশানি

খুঁজে নিতে হয়। তারও কোনোটা রাখতে পারে কোনোটা বা পারে না।

প্রায়ই এসে মায়ের কাছে হাত পাতে, ছেলের ওই হয়েছে, এই হয়েছে-–টাকা দাও। না দিলে চিৎকার চেঁচামিচি। এই ভয়েই মা যা পারেন দ্যান। কিন্তু ছেলের মদের খরচ যোগানোর মতো টাকার সম্বল তাঁর কোথায়?

বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, মা-কে টাকা দিতে পেরেছ?

অবধূত ছোট্ট জবাব দিলেন, অনেক কষ্টে।

৭

মাস আড়াই বাদে সকালের দিকে একদিন সুবীর চ্যাটার্জী কোন্নগরে এসে হাজির। মা-কে দেখে আর মায়ের মুখে দাদার অজস্র প্রশংসা শুনে তার একটু কৌতূহল হয় নি এমন নয়। মায়ের এতদিনের হাঁপানির রোগ প্রায় সেরে এসেছে। তাঁর মুখের বং ফিরেছে। সুবীর চ্যাটার্জীর কাছে এটাই একটু আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁর কোন্নগরে আসার কারণ আদৌ এই নয়।

...দেখা হলেই নমিতা দেবী এই ছেলেকে কোন্নগরে যাবার তাগিদ দ্যান। ধারণা শুধু নয়, তাঁর বিশ্বাস চাঁদুর এখন অনেক ক্ষমতা, অনেক শক্তি। হাজার হোক পেটের সন্তান, তাঁর আশা দাদার সাহচর্যে এসে এই ছেলের মনে যদি কিছু পরিবর্তন আসে।

সুবীর চ্যাটার্জীর কোন্নগরে আসা দাদার ক্ষমতা আর শক্তির কথা শুনে শুনে। লেখা-পড়া জানা মানুষ, এই জীবনের প্রতি ঘেন্না সময়-সময় কি তারও ধরে না? অদৃষ্ট বলে কিছু আছেই, নইলে তার এই দশা হলো কি করে? ওই অদৃষ্ট ফেরানোর ক্ষমতা যে তাঁর নেই, দেখতেই পাচ্ছে।...কারো যদি থাকে একবার দেখে আসতে ক্ষতি কি? দেখতেই এসেছিলো। এই দেখতে আসা থেকেই ঘটনার সাজে রং-বদল শুরু।

অবধূতের ঘরে তখন বেশ কয়েকজন লোক। বাঁশের গেটের সামনে তিন-তিনখানা চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকগুলোকে দেখেও রীতিমতো অবস্থাপন্ন মনে হলো সুবীর চ্যাটার্জীর। কিন্তু দাদাব সামনে বশংবদের মতো বসে আছে। ভাইকে দেখে অবধূত খুশিই হলেন। ডাকলেন, আয়, কলকাতা থেকে কোন্নগরে আসতে তোর তিন মাস লেগে গেল? মা বলেছিলেন তুই রাউরকেল্লা থেকে ফিরলেই এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

তাঁকে নিয়ে ভিতরে এলেন।—কই গো, কে এলো দ্যাখো—

কল্যাণী ভিতরের দাওয়ায় ছোট পিঁড়ি পেতে বসে চাল বাছছিলেন। প্রায় শুকনো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। পরনে চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়ি, গায়ে লাল রঙের ব্লাউজ। মাথায় সিঁদুর টিপ সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর রেখা। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

প্রথম দেখার মুহূর্তটুকু শুভ ছিল কি? সুবীর চ্যাটার্জী স্থান-কাল ভুলে চেয়ে রইলো।...দাদার ঘরে এমন এক দিব্যাঙ্গনার অবস্থান যেন পৃথিবীর বহু আশ্চর্য ব্যাপারের সেরা কিছু। তার চোখে পলক পড়ে না। দৃষ্টির এমন বিমূঢ় তন্ময়তার ধাক্কায় কল্যাণীর

সুন্দর দুই ভুরুর মাঝে একটু ভাঁজ পড়ো-পড়ো হলো। এক হাতে আঁচলটা চুলের ওপর পিঠ বেড়িয়ে মাথায় তুললেন।...অবধূত সকৌতুকে লক্ষ্য করছেন। এই ভাইয়ের চরিত্রের আদ্যোপান্ত তিনি জানেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখার ব্যাপার মনে হলো না একবারও। কল্যাণীকে দেখে কেউ অবাক হলে এমনকি অভিভূত হলেও মজাই পান। আর কত শক্ত ঘাঁটি সেটা অনুভব করতে পারেন বলেই স্ত্রীকে নিয়ে মনে কোনোরকম দুশ্চিন্তা কখনো রেখাপাতও করে না।

—কি রে একেবারে হাঁ হয়ে গেলি যে।...প্রথম দেখে একটা প্রণামও করলি না! শেষের খোঁচাটুকু ইচ্ছে করেই দিলেন, নইলে হাওড়া স্টেশনে ষোল বছর বাদে যোগাযোগ সত্ত্বেও সেদিন প্রণাম এই ভাই তাঁকে করে নি বা আজও করে নি এটা মনে আছে।

সুবীরের বিমূঢ় দৃষ্টি এবারে তাঁর দিকে ঘুরল।—এ কে? তোমার বউ নাকি?

—কেন, তোর সন্দেহ হচ্ছে?...আমার বউ হলে তোর কে হয়?

কল্যাণী চালসুদ্ধ কুলোটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। ঈষৎ গম্ভীর। ঘবের দিকে এগোলেন। বাধা পড়ল, অবধূত বললেন, কি হলো, আমাব ছোট ভাই সুবু বুঝতে পারছ না?

—বুঝেছি। সোজা ছোট ভাইয়ের দিকেই তাকালেন। আয়ত দু'চোখে চোখ পড়তে সুবীর আবার বিহ্বল। আঙুল তুলে সামনের ঘরটা দেখিযে কল্যাণী বললেন, আপনি ও-ঘরে গিযে বসুন, আমি আসছি। স্বামীব দিকে তাকালেন, তোমার ঘরে কত লোক, দেরি হবে?

—তা আরো আধ-ঘণ্টা খানেক তো বটেই, তুমি ওকে চা-টা দাও, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।

চলে গেলেন। কল্যাণী পুজোর ঘরে ঢুকতে গিয়েও আবাব ঘুবে দাঁড়ালেন। সোজা আবার চোখে চোখ। বিহ্বল, স্থান-কাল বিস্মৃত এখনো। কল্যাণীর ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ভিতরে ঢুকে গেলেন। অবধূত এই ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁকে কিছুই বলেননি। কিন্তু মানুষটাকে দেখে তিনি খুশি হতে পারেন নি।

মিনিট কুড়ির মধ্যে ট্রে-তে পেয়ালা চায়ের পট আর ডিশে জল-খাবার সাজিয়ে নিজেই নিয়ে এলেন। সুবীর চ্যাটার্জী বসে নি। বসতে পারে নি। ঘরে পায়চারি করেছে, আর এক-একবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে ব্যস্ত হয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

টেবিলে জল-খাবার রাখতে রাখতে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, মা কেমন আছেন?

—ভালো। চোখ ফেরানো সম্ভব হচ্ছে না। হেসে আত্মস্থ বা সহজ হবার চেষ্টা। —দাদার হাতে যশ আছে, এতদিনের পুরনো অসুখ অনেকটাই সেরে গেছে।

—দেখবেন, ওষুধ যেন বন্ধ না হয়। দেওরটি যে তার মায়ের কাছে থাকেও না, কল্যাণীর এ-খবরও জানা নেই। এম. এ. পাশ ভালো চাকরিটা অদৃষ্টের দোষে গেছে—কেবল এটুকুই শুনেছিলেন।

সুবীর চ্যাটার্জী খেতে শুরু করেছে। ভালো খাওয়াই তেমন জোটে না, মুখ-রোচক জল-খাবার কাকে বলে তা প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে চোখের জরিপের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ফাঁকে ফাঁকে সহজ এবং অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা। মুখে কৃত্রিম হাসি।—তোমাকে দেখে আমার তাক লেগে গেছে, দাদার ঘরে এমন একটি বউ আছে জানলে আমি ঢের আগেই আসতাম।

তুমি বলাটা কানে লাগল। যদিও দু'দিক থেকেই তাই বলাটা স্বাভাবিক। কল্যাণী আলতো চোখে তাকালেন।—এমন বলতে?

হাসি। চায়ের কাপে চুমুক দেবার ফাঁকে দু'চোখ আবার বুক হয়ে মুখের ওপর। —এমন বলতে কি তুমি জানো না—আয়নায় নিজেকে দেখো না?

নির্লিপ্ত জবাব।—আমার আয়না তো আপনার দাদা...।

...সুঠাম স্বাস্থ্য নিটোল যৌবনেব অনন্যরূপা হলেও ছেলেমানুষ তো বটেই, কিন্তু কথাবার্তা হাব-ভাব চাউনি বেশ পাকা মনে হলো সুবীরের আর সেই জন্যেই আরো ভালো লাগছে। কি মনে হতে প্রশ্নটা মনে এসেই গেল, আচ্ছা দাদা তো চিকিৎসা কবে জানি, কিন্তু সে কি তন্ত্র-সাধক?

কল্যাণী লক্ষ্য করেছেন, অতবড় দাদাও এই লোকের কাছে সে-রকম সম্মানেব পাত্র নয়—চিকিৎসা কবেন না বলে 'কবে' বলা হলো, আব তিনি বা উনিব বদলে 'সে'। জবাব দিলেন, লোকে তো তাই বলে।

—লোকে বলে মানে...তুমি জানো না?

—আমাদেব জানা-জানিটা কেবল আমাদেব মধ্যেই।

কেন...?

হ্যাঁ, বেশ পাকা, আব সেই কারণে আরো লোভনীয়—এই জন্যে যে আমি জানতাম তান্ত্রিকদেব সাধারণত ভৈরবী থাকে...তুমি দাদাব বউ না আসলে ভৈরবী?

ফিরে আলতো প্রশ্ন।—কোনটা হলে আপনার পছন্দ হয?

নাঃ, এই মেয়ের কথাবার্তা রূপের থেকে কম কিছু নয়। শোনার জন্য কান দুটোও মাতোযাবা হতে চায। জোরে হেসে আরো সহজ আর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা। —আমার পছন্দ অনুযায়ী তো কিছু হয় নি, জবাবটাই দাও না?

—মা অগ্নিসাক্ষী বেখে আর সাতপাক ঘুরিয়ে সম্প্রদান করেছেন, তার নাম বিযে কিনা আপনাব দাদাকেই জিজ্ঞেস করবেন। একটু বসিকতাও করে বললেন, আমাকে ভৈরবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন কি বউ হিসেবে তিনিই জানেন।

—ও...বিয়েই তাহলে। কতদিন আগে তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

—বছর আষ্টেক।

এবারে সত্যিই অবাক।—আট বছর! তাহলে এখন তোমার বয়েস কত?

—কত মনে হয়?

—বড়জোর কুড়ি...

কল্যাণীর বিনীত চাউনি।—আর একটু কমানো যায় না?

সুবীর চ্যাটার্জীর দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকে রইলো খানিক। তারপর

গলার স্বরে উষ্মাই ঝরল।—দাদা তান্ত্রিক হোক বা যা-ই হোক পাষণ্ডের কাজ করেছে বলতে হবে—আট বছর আগে সে তোমার মতো একটি না-বালিকাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে! আর তোমার মা সেই বিয়ে দিয়ে নিজের মেয়ের এমন সর্বনাশ করলেন?

কল্যাণীর দু'চোখ বড় বড়।—সর্বনাশ বলতে?

সর্বনাশ নয়! দাদার বয়েস কত এখন জানো?

...কল্যাণীর মুখ দেখে মনে হবে দাদার বয়েস আঁচ করতে চেষ্টা করছেন। না পেরে বললেন, তান্ত্রিকদের বয়েস আন্দাজ করা শক্ত শুনেছি...কত, সাতচল্লিশ আটচল্লিশ? অত না হোক আটত্রিশ তো হবেই—আমার থেকেও কম করে—

থমকাতে হলো আবার।—আমার সঙ্গে তুমি কি সেই থেকে ঠাট্টা করে যাচ্ছ?

কল্যাণী থতমত খেলেন যেন।—ছি, ছি, আপনি কি ঠাট্টার পাত্র।

অবধূত ঘরে ঢুকলেন।—কি রে চা-টা খাওয়া হয়েছে? স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই ভ্রূ কোঁচকালেন একটু। এই মুখ তিনি খুব ভালোই চেনেন। হাসি চাপার চেষ্টায় মুখে রক্ত উঠছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা হচ্ছিল?

—উনি বলছিলেন তুমি একটি পাষণ্ড, আট বছর আগে একটি না-বালিকাকে বিয়ে করে এনে তার সর্বনাশ করেছ।

ছদ্ম-বিরক্তি আর গাম্ভীর্যে অবধূতের মুখখানা ভরাট। স্ত্রীকেই বললেন, এ-সব আলোচনার মধ্যে তোমাকে থাকতে বারণ করেছি না? এখনো যদি কেউ চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্টে ফেলে কোর্টে কেস ঠুকে দেয়—পার পাবো? যাক, সুবু এলো, মাছ মাংস তো কিছু ঘরে নেই বোধহয়—বাজারে যেতে হবে না?

কল্যাণী জবাব দিলেন, ওঁর আর খাওয়ার মেজাজ আছে কিনা কে জানে--বাজারে যেতে হলে এক্ষুণি চলে যাও, এরপর কখন রান্না হবে কখন খাওয়া হবে—একটা রিক্সা ধরতে পারো কিনা দ্যাখো—

অবধূত লাল জামার পকেটে হাত দিয়ে টাকা বার করলেন। ছ'খানা একশ টাকার নোট। একটা নোট আবার পকেটে রেখে বাকি ক'টা কল্যাণীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এগুলো রাখো—

ভাইকে বললেন, যাবি নাকি আমার সঙ্গে?

দাদার রোজগার কত, ভাইয়ের পক্ষে তা-ও আঁচ করা শক্ত হলো।—তুমিই যাও, আমি বসে এর সঙ্গে একটু গল্প করি।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী বলে উঠলেন, আমার এখন গল্প করার সময় নেই, সব কাজ পড়ে আছে—তার থেকে সঙ্গে গিয়ে পছন্দ মতো বাজার করে আসুন—মেঘলা দিন আছে, মাথাও ঠাণ্ডা হবে।

দু'ভাই বেরুলেন। বেশ খানিকটা হাঁটলে তবে রিক্সা পাওয়া যেতে পারে। সুবীর চ্যাটার্জী একটু ধাঁধার মধ্যে পড়েছে। মানুষটা আর যা-ই হোক বোকা নয়।...যত রূপসীই হোক, ওই বয়সের মেয়ের কথাবার্তা অমন পাকা-পোক্ত আর সরস ইঙ্গিতবহ হয় কি করে ভেবে পাচ্ছে না। ভাবার ধৈর্য কম। ঝপ করে জিজ্ঞেস্ করলো, আচ্ছা দাদা, ওর বয়েস ঠিক-ঠিক কত বলো তো?

—ওর মানে কার?

—তোমার বউয়ের?

—বয়েস যা-ই হোক, আমার বউকে তোর বউদি বলতে অসুবিধে হচ্ছে?

—হচ্ছে। পুরনো দিন আর নেই, বয়সে ছোট বা সমান-সমান হলেও আজকাল যে যার নাম ধরেই ডাকে—

—ও...তাই ডাকিস।

—বয়েস কত বললে না?

—যদি বলি প্রায় আঠাশ...বিশ্বাস হবে?

—একেবারে না।

—তাহলে তোর যা খুশি তাই ভেবে নে, আরো বছর দশেক বাদে যদি একই রকম দেখিস তখন হয়তো বিশ্বাস হবে।

রিক্সায় যেতে যেতে অবধূত ভাইয়ের মুখ চোখ কপাল ভালো করে লক্ষ্য করেছেন। ভাগ্যের ছিটে ফোঁটাও দেখছেন না। বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ যেমন এক বগগা ছোটে, এও তেমনি দ্রুত অধোপথে ধেয়ে চলেছে। ভাই না হয়ে আর কেউ হলে বিরক্তই হতেন।...মা বলেছিলেন, এই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না। অনেক দুঃখে কোনো মা নিজের ছেলের সম্পর্কে এ-রকম বলে।

জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে যদি চাকরি বাকরি ঠিক করতে পারি যাবি তো?

—বাইবে মানে কত বাইরে?

—এই ধর ইউ. পি-তে?

—নাঃ, অত দূরে পোষাবে না।

—চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে তো রাউরকেল্লা ছুটেছিলি?

—তখন মাথায একটা ঝোঁক চেপেছিল, পরে মনে হয়েছে হয নি ভালোই হয়েছে।

অবধূত ব্যাপারটা অন্য ভাবে বিবেচনা কবলে।...ষোল বছর বাদে দেখা হওয়ার যোগ ছিল, এর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে। তাই ভাই ছুটেছিল রাউরকেল্লা ইণ্টারভিউ দিতে আর তিনি পুরী যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন। দেখা হওয়ার যোগটাই শুধু কার্য কারণ সম্পর্ক। এই যোগের ওপর দুজনের কাবোরই কোনো হাত ছিল না। অবধূতের কেন যেন মনে হলো এই যোগটা শুভ নয়।

...এক দিনের জায়গায বিনা অনুরোধে সুবীর চ্যাটার্জী তিন দিন থেকে গেল। খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা ভালো। আরো ভালো দাদার মদের বোতল। আলমারিতে ওই বোতল দেখেই দুচোখ চকচক করে উঠেছিল। আর অবধূত ভেবেছেন, সময়ে কাচের আলমারি থেকে বোতল ক'টা সরিয়ে রাখা উচিত ছিল। অনুমতি দিতে হয় নি, সন্ধ্যা পার হতেই বোতল নামিয়ে বসতে দেখেছেন।...চাকরি যাবার পর থেকে এত ভালো জিনিস সুবীর চ্যাটার্জী আর চোখেও দেখে নি। গেলাস এনে কাঁচাই শুরু করেছে। অবধূত কল্যাণীকে ডেকে বলেছেন একটা জলের জাগ আর কিছু খাবার এনে দাও, লিভার পচে মরবে দেখছি।

—হাতের কাছে একটা গেলাসই পেলাম, আর একটা গেলাসও আনতে বলো...তোমারও চলবে তো? ভাইয়ের সদয় মুখ।

—নাঃ, তোর সঙ্গে চলবে না। অবধূতের ঠাণ্ডা জবাব এবং প্রস্থান।

...সব থেকে ভালো দাদার এই বউ। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। দেখার তৃষ্ণা আরো বাড়ে। এটা ওটা চাওয়ার হলে বার বার তাকে ঘরে আনার চেষ্টা। প্রথম সন্ধ্যায় জলের জাগ রেখে যাবার খানিক বাদে ডিশে গরম মাংসের বড়া দেখে দারুণ খুশি।—বাঃ, দাদাকে তো রসেবশে রেখেছ দেখছি—এ জিনিস (হাতের গেলাস দেখিয়ে) তোমারও চলে?

—এখন পর্যন্ত চলে না।

—তন্ত্র পথে সুরা তো সাধনার অঙ্গ, তাহলে আমার সঙ্গেই হাতেখড়ি হোক না?

—হাতে খড়ির সাধ থাকলে আপনার সঙ্গে কেন, তান্ত্রিকের সঙ্গেই হবে। তিন দিনে দাদার কাজ-কর্মের ধারা যতটা সম্ভব লক্ষ্য করেছে। তাঁব চিকিৎসাব দিকটা মানতে রাজি কিন্তু আর যে কারণে লোকের আনাগোনা দেখছে তাব সবটাই ভাঁওতাবাজী মনে হযেছে। এই ভাঁওতাবাজীর জোরেই হযতো এমন বউ ঘবে আনা সম্ভব হয়েছে। ভাগ্য বটে লোকটার। হিংসেয় বুকের ভিতবটা চিনচিন কবে জ্বলে। লুব্ধ দুচোখ বার বার অন্দর মহলে চক্কর দেয়। বেশিক্ষণ না দেখলে কোনো দরকাবেব অছিলায় সামনে এসে দাঁড়াতেই হয়।

—এক কাপ চা হবে?

কল্যাণী উল্টো-মুখে বসে কুটনো কুটছেন। হবে, ঘবে গিযে বসুন, হারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—হারু কে?

—কাজের লোক। সংক্ষিপ্ত জবাব।

ওদিক ফিরে বসা বলেই লুব্ধ চোখেব অবাধ্য হতে আরো সুবিধে। কিন্তু তারও তো মেয়াদ আছে।—তুমি নিজেই নিয়ে এসো না, সেই থেকে মুখ বুজে বসে আছি...এত কি কাজ, কারো তো আর অফিসের তাডা নেই!

কল্যাণী আস্তে আস্তে ঘুরে তাকিয়েছেন।—আচ্ছা, নিয়ে আসছি...

চায়ের পেয়ালা হাতে মিনিট দশেক বাদে ঘবে ঢুকেছেন। খুশি মুখে সেটা নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকেছে।

—থ্যাংক ইউ, বসো...

বাধ্য মেয়ের মতো কল্যাণী বসেছেন।

পেয়ালায় চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বাস।—বাঃ, ওয়াণ্ডার ফুল। সকালের থেকেও ভালো হয়েছে।

—সকালে পাশে আপনার দাদা ছিলেন তো, তাই অত ভালো লাগেনি।

হেসে উঠতে গিয়ে বিষম খেতে হয়েছে, পেয়ালার চা-ও একটু চলকে পড়েছে।—দেওরের সঙ্গে এ-রকম করেই তো কথা বলা দরকার, বুঝলে?

...আচ্ছা, কাল এসেই আমি দিব্বি 'তুমি' চালিয়ে দিলাম, কিন্তু তুমি সেই

থেকে আমাকে আপনি-আপনি করে পর করে রাখছ কেন?

নিরীহ গোছের আয়ত দুচোখ সোজা মুখের ওপর।—আপনার বিবেচনায় আমি তো একেবারে ছেলেমানুষ।

চেহারায় না হোক, হাব-ভাব কথাবার্তায় অন্তত ছেলেমানুষ ভাবা যাচ্ছে না। ইঙ্গিতটা রমণীর মতোই সুপরিণত সুডৌল লাগছে। সরল গোছের হাসি-ছোঁয়া চাউনির গভীরেও সরস কিছু চিকচিক করে উঠছে। সুবীর চ্যাটার্জীর শরবিদ্ধ দশা। হঠাৎই কিছু মনে পড়ল যেন।—ভালো কথা, দাদাকে কাল তোমার বয়েস জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল, প্রায় আঠাশ, আমার তো বিশ্বাসই হয় না—সত্যি নাকি?

—বললেন বুঝি? উঠে দাঁড়ালেন, সত্যি কিনা আপনি তাই নিয়ে গবেষণা করুন, আমি হাতের কাজ সারি।

—শোনো শোনো! সম্ভব হলে হাত ধরে আটকানোর তাগিদ।—গবেষণা করতে হলে তোমাকেও তো সামনে বসে থাকতে হয়—

দু'পা গিয়েও আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। ঠোঁটে হাসি, চোখেও, কিন্তু কথাগুলো তির্যক-গম্ভীর।—বড ভাইয়েব বউয়ের বয়েস দিয়ে কি হবে? আশীর্বাদ করি লক্ষ্মণের মতো পায়ের দিকে চেয়ে থাকার মতি হোক।

সুবীর চ্যাটার্জী আরো শরাহত। আরো পরিতুষ্ট। তিন রাত বাদে চলে যাবার পর অবদূত ঘুরে ফিরে বার কয়েক কল্যাণীর নির্লিপ্ত মুখখানা লক্ষ্য করেছেন আর মিটিমিটি হেসেছেন। শেষে জিজ্ঞেস করেছেন, কি-রকম বুঝলে? ভায়ার তোমাকে খুব মনে ধরেছে?

কল্যাণী তেমনি জবাব দিলেন, মনে হয়।

অবধূত তখন এই ভাই সম্বন্ধে যা জানতেন সবই বললেন। বিমাতার আকৃতির কথাও জানালেন, বলেছিলেন এই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আমি আর কিছুই চাই না। একটু থেমে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায় বলো তো?

—কিছু করার আছে মনে হয় না, মাথা একটু বেশিই বিগড়ে গেছে, সহজেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন—যাবার আগে বলে গেছেন কয়েক দিন আনন্দে কাটানোর মতো তাঁর একটা জায়গা হলো।

—তার মানে আবার আসবে?

—মানে তো তাই দাঁড়ায়।

অবধূত সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু।—তুমি যেন একটু ঘাবড়েছ মনে হয়?

—হুঁঃ। এক শব্দে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে গেলেন।

স্ত্রীর এমন জোরের উৎসের হদিস আজও পান নি। কতবার তো তাঁকে একলা ফেলে রেখে এ-দিক ও-দিকে চলে গেছেন, অনেক সময় নিজেই একটু-আধটু উতলা হয়েছেন, দিনকাল ভালো নয়...রূপের তৃষ্ণায় মানুষ যত পাগল হয় ততো বোধহয় আর কিছুতে নয়। কিন্তু ফিরে এসে মনে হয়েছে তিনি নিরর্থক ভেবেছেন। তিনি থাকুন বা না থাকুন স্ত্রীটি যে সর্বদাই এক নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে বসে আছেন।

বিমাতা নমিতা দেবীও একবার কোন্নগরে এলেন। অবধূতই নিজে কলকাতা গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছেন। চাঁদুর বউ দেখে তিনি আনন্দে আটখানা। বউয়ের বয়স নিয়ে তিনিও ধাঁধায় পড়েছিলেন। কল্যাণী সানন্দে তাঁর সেবাযত্ন করেছেন। এখানে দিন-কতক থেকে তাঁর আশা বেড়েছে আর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে, এই শক্তিমান তান্ত্রিক ছেলে মন করলে তাঁর নিজের ওই অপদার্থ ছেলের মতি ফেরাতে পারে। অবধূতের হাত ধরে আবার তাঁকে সেই একই অনুরোধ করেছেন।

...কিন্তু এই মা-ই যখন শুনলেন সুবু এখানে এসে তিন রাত থেকে গেছে, তাঁর ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা ত্রস্ত আঁচড় পড়েছে। তক্ষুণি মনে হয়েছে ওই ছেলের তিন দিন থেকে যাওয়ার মতো আকর্ষণ এখানে আছে। মুখ কালো করে বলেছেন, পেটের ছেলে, কি আর বলব অত প্রশ্রয় দিবি না, কিছু যদি করতে পারিস আসা-যাওয়া করুক—এখানে থাকার দরকার কি।

অবধূত হেসে বলেছেন, ছোট ভাই থাকতে চাইলে না বলব কি করে, বাড়ি তো আমার খুব ছোট কিছু নয়, থাকলে অসুবিধের কি আছে।

অসুবিধে কি সেটা নমিতা দেবী আর মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

এক এক করে আরো চারটে বছর পার হয়েছে। বৈমাত্রেয় ছোট ভাই সুবু মূর্তিমান উপদ্রবের মতোই হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসেই একবার করে আসে। দুদিন তিনদিন পাঁচদিনও থেকে যায়। দিনে দুপুরেও মদের বোতল নামিয়ে বসে। আলমারিতে চাবি লাগানো থাকলে সোজা এসে দাদার কাছে চেয়ে নেয়। অবধূত একবার কাচের আলমারি থেকে বোতল সরিয়ে স্টিলের আলমারিতে রাখতে চেয়েছিলেন। কল্যাণী আপত্তি করেছেন, সরাবে কেন, ভাইকে মুখের ওপর বলে দাও এখানে ও-সব চলবে না।

—আমার চলে যখন ওকে ও-কথা বলি কি করে?

—তাহলে ওগুলো ওখানেই থাকবে।

ভাইকে কবিরাজি চিকিৎসা শেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বছরচারেক মন ঢেলে শিখলে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবি, চাকরির ধান্দায় কারো কাছে ঘুরতে হবে না। এত লেখাপড়া শিখেছিস পারবি না কেন? প্রস্তাব সরাসরি নাকচ। ভাইয়ের সাদা-সাপটা জবাব, অত লেখা-পড়া শিখেছি বলেই পারব না। কবিরাজি শিখে শেষে আমি কবিরাজ হয়ে বসব তুমি এটা ভাবলে কি করে? তাছাড়া টিউশানিগুলো গেলে চার বছর আমার চলবে কি করে?

—চলার ব্যবস্থা আমি করতে পারতাম, কিন্তু তোর আঁতে লাগছে যখন সে আলোচনায় গিয়ে আর লাভ কি...।

একবার দেখা গেল ভাইয়ের অন্য ব্যাপারে বরং আগ্রহ একটু বেশি। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দাদা, তান্ত্রিকরা সত্যি খুব শক্তিশালী হয়?

—সত্যিকারের তান্ত্রিক মানেই শক্তিশালী।

—তুমি সত্যিকারের তান্ত্রিক নও?

—আমি তন্ত্রের ত-ও জানি না।

—সে-রকম শক্তিশালী তান্ত্রিক তুমি দেখেছ?

—দেখেছি।

—আমাকে দেখাতে পারো?

—তোর ভাগ্যে থাকলে দেখবি, ইচ্ছে করলেই তাঁদের দেখা মেলে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা সম্মোহন, বশীকরণ-—এ-সব ব্যাপারগুলো কি?

নিজের অগোচরে চোখ তার মুখের ওপর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।—আমি জানি না।

—এ-সব তন্ত্রসাধনার মধ্যে পড়ে না?

—কোনো সাধকই এ-সব নিচুস্তরের জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না।...কেন, তোর এ-সব শেখার ইচ্ছে হয়েছে?

হাসতে লাগল।—তুমি তন্ত্রের কিছু জানো না বলছ কিন্তু তোমারই যা দাপট দেখছি, ও-সব ছোট-খাটো ব্যাপারগুলো জানলে তো আরো ঢের বেশি মওকা পেতে।

কল্যাণীর কাছ থেকেও কিছু জ্ঞান-লাভের বাসনা হয়েছিল। যেমন বীরাচার সাধনাব ব্যাপারখানা কি, তান্ত্রিকেরা ভৈরবী নিয়ে উপাসনা করে কেন, এদের সঙ্গে যারা বৈষ্ণবী নিয়ে উপাসনা করে তাদের তফাৎ কি। কল্যাণীর স্পষ্ট জবাবে উৎসাহ জল।—ও-সব জানতে হলে আপনার দাদার কাছে যান, আমি ভাত ডাল সুক্তো মাছ মাংস পোলাও পর্যন্ত জানি...।

অবধূত বিবক্ত হন, আবার কল্যাণীর মুখে দিকে চেয়ে বেশ মজাও পান। প্রশ্রয় পেযে পেয়ে এ ভাই ক্রমে স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে এটুকু প্রকাশ করতেও আপত্তি। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।...ওই ভাই জেনেছে দাদা শনি মঙ্গলবারে শ্মশানে কাটায়। যখন আসে এবং থাকে শনি বা মঙ্গলবার একটা পড়েই। এমনি এক শনিবারে অবধূত নিজেই প্রস্তাব করেছিলেন, আজ আর শ্মশানে না গেলাম, থাক—

কল্যাণী প্রায় ঝলসে উঠলেন, কেন যাবে না? ওর সাধ্য কি—কি করবে?

আরো মাস তিনেক বাদে সকালে শ্মশান থেকে ফিরে দেখেন স্ত্রীটি খুব গম্ভীর। আগের বিকেলে ভাই এসেছে। অবধূত নিজে থেকে কিছু বললেন না। কল্যাণীও দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হবার আগে পর্যন্ত নির্বাক। দুপুরে ঘরে এসেই বললেন, দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা না বললেই নয়, তোমার ভাইকে এখনো যদি ভালো মতো সমঝে না দাও মুশকিলে পড়বে, দিনে-দিনে সে মাত্রা-ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবধূত উদ্‌গ্রীব, কেন কাল রাতে সে কিছু করেছে নাকি? তুমি ভয় পেয়েছ।

কল্যাণী ফুঁসেই উঠলেন, কি? ভয়? আমি? ওকে?...হ্যাঁ, ভয় আমি পাচ্ছি সেটা ওর জন্যে—ও তোমার ভাই বলে—বুঝলে? সময় থাকতে ওকে দূরে সরতে বলো।

না, কল্যাণীর এই মূর্তি অবধূত বিয়ের বারো বছরের মধ্যে দেখেন নি। পরে জেরা করেও তাঁর মুখ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না।

...এরপর কে তাঁকে যন্ত্রণা দিল, কার ইঙ্গিতে এমন এক অস্বাভাবিক পদক্ষেপ, নিজেই জানেন না। কল্যাণীর এমন শক্তির উৎস যে তাঁকেই বার বার মনে পড়তে

লাগল। গুরু কংকালমালী ভৈরবকে। একটা আশ্চর্য রকম আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন তিনি। জীবনে এই গোছের অনুভূতিগুলোই বোধহয় অলৌকিক ব্যাপার, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই যুক্তি নেই।

তক্ষুণি ঠিক করলেন কালই তিনি বক্রেশ্বর যাবেন, মহা-ভৈরব গুরুর থানে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হলো, তিনি গেলে কি হবে? সুবু শোধরাবে কি করে? ভাবতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর ভাই মদ নিয়ে বসেছে। কল্যাণীর আজও আতিথেয়তায় ত্রুটি নেই। ভাজা ভুজি নিজে রেখে গেছেন কি হারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন জানেন না। দাদাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাই দরাজ অভ্যর্থনা জানালো। —এসো, চলবে নাকি?

অবধূত এগিয়ে এসে বসলেন। এই প্রথম বললেন, চলতে পারে—তুই তো এরই মধ্যে ছ'আনা ফাঁক করে এনেছিস দেখছি...

শব্দ করে হাসল একটু, তারপর জোর হাঁক দিল, কল্যাণী! দাদার জন্য একটা গেলাস—!

অবধূত বললেন, বউদিকে তুই নাম ধরে ডাকা শুরু করে দিয়েছিস?

—হোয়াট নট? সি ইজ থ্রি ইয়ারস ইয়ংগার দ্যান মি, আই অ্যাম থার্টি ফাইভ সি ইজ থারটি ট্যু...দ্যো স্টিল লুকস্ টুয়েন্টি—উই ওয়ান্ট টু বি গুড ফ্রেণ্ডস—আমি তাকে আমার নাম ধরে ডাকার পারমিশান দিয়ে দিয়েছি। দরাজ হাসি। ইউ আর এ লাকি ওল্ড ম্যান দাদা, ইউ আর দি ট্রেজারার অফ এ জেম অফ এ ওয়াইফ।

গেলাস হাতে কল্যাণী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শেষটুকু শুনলেন। ভিতরে এসে গেলাস টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওরের জোরালো বাধা, ও-কি চলে যাচ্ছে কেন? সামনেই দাদা বসে আজ আর লজ্জা কি?

কল্যাণী ঘুরে দাঁড়ালেন।

—প্লীজ, একটু বসে যাও।

চলে গেলেন। অবধূত দেখছেন। ভাইয়ের দুচোখে মত্ত বাসনা গলগল করে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

নিঃশব্দে নিজের গেলাস তুলে নিলেন তিনি। কল্যাণী এলো না সেই খেদেই যেন প্রায় আধ-গেলাস তরল পদার্থ এক চুমুকে জঠরে চালান করে বড় মাপের আর একটা ঢেলে নিল। এরও আধা-আধি শেষ হতে অবধূত বললেন কাল ভোরে আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, তুইও যাবি?

—হেল! এ জায়গা ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে চাই না...বাট হোয়্যার?

—বক্রেশ্বরে।

—সেট্য়া আবার কোথায়—সেখানে কি?

—তুই একবার একজন শক্তিমান তান্ত্রিকের খোঁজ করছিলি—সেখানে তিনি।

এ-কথায় সুবুকে নড়েচড়ে বসতে দেখলেন। মনোযোগ দেবার জন্য নিজের মাথাটা বার দুই জোরে ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেখানে তিনি আছেন?

—আছেন।

—খুব শক্তিমান?

—খুব।

—যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন?

—ইচ্ছে করলে পারেন।

—লোক ভালো?

—দয়ার অবতার।

—যাব, নিশ্চয়ই যাব—কিন্তু তোমার সামনে আমি তাঁকে কিছু বলতে পারব না। আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে তুমি সরে যাবে।

—তাই যাব।

আবার সংশয়।—কিন্তু তিনি যে শক্তিমান তার প্রমাণ তুমি নিজে পেয়েছ?

—পেয়েছি।

—কি প্রমাণ?

—কল্যাণীকে সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম। মনে-প্রাণে তাঁকে চেয়েছিলাম। তাঁর দয়াতেই পেয়েছি।

ভাইয়ের চোখে আবার লোভের ফোয়ারা দেখলেন অবধূত।

পরদিন সকালের গাড়িতে দুজনে রামপুরহাট এলেন। সেখান থেকে সোজা বক্রেশ্বরে। যশোদাকান্তকে ধরে অবধূত যা বলার বলে রাখলেন। আর ভাইকে আগেই জানিয়েছেন রাতের আগে তান্ত্রিক বাবার দেখা মেলে না। হোটেল-ঘরে বসে সন্ধ্যার মুখে দুজনে মিলে খানিকটা মদও খেয়েছেন। ভাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তান্ত্রিক বাবার কাছে মদ খেয়েও যাওয়া চলে?

—সব চলে।

রাতের খাওয়া সারা হতে বললেন, চল্ এবারে।

অনেকটা পথ গিয়ে ভাই থমকে দাঁড়ালো। অনেকদূরে একটা চিতা জ্বলছে। এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?'

—শ্মশানে। কোনো ভয় নেই, চল্।

সুবু দাদার গা ঘেঁষে এগোতে লাগল। তার গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে।

যশোদাকান্ত ঘরের প্রদীপ জ্বেলে ধুপ ধুনো দিয়ে অপেক্ষা করছিল। অবধূতের আদেশ পেয়ে চলে গেল।

ভাইকে নিয়ে কংকালমালী ভৈরবের ঘরে ঢুকলেন। কংকালমালী ভৈরবের ছবির মূর্তি দেখেই সুবু সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। পাশের ভৈরবীর ছবি অবশ্য সুন্দর মিষ্টি। কিন্তু তাঁদের মাথার ওপর মা-কালীর ছবিখানা আবার ভয়াবহ মনে হলো তার। যেন সদ্য টাটকা রক্ত খাওয়া মুখ।

অবধূত প্রণাম সেরে ভৈরবগুরুকে দেখিয়ে বললে, ইনিই সেই শক্তিমান মহাতান্ত্রিক।

—কিন্তু এ তো ছবি।

—তাহলেও জাগ্রত। রাতে তুই ওই পাটিটা পেতে এ-ঘরে থাকবি। যা চাস একমনে প্রার্থনা করবি।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় ইনি প্রচণ্ড রাগী।

—প্রচণ্ড। আবার তুষ্ট হলে তেমনি দয়ালু।

ভাইয়ের কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে।—আমরা দুজনেই এ-ঘরে থাকি না দাদা।

—না। কঠিন গলায় অবধূত বললেন, তাতে কোনো ফল হবে না, বরং ক্ষতি হবে।

এ কি করছেন, কেন করছেন অবধূত নিজেও জানেন না। যা মনে হচ্ছে করে চলেছেন, বলে চলেছেন।

তিনি বাইরে শুয়ে। সুবু ভিতরে। ওর ছটফটানি বাইরে অনুভব করতে পারছেন। এক-একবার গলা পাচ্ছেন, দাদা ঘুমোলে...?

—কথা নয়, একমনে প্রার্থনা কর।

স্তব্ধ পরিবেশ। থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে।

—দাদা ঘুমোলে-

অবধূত আর সাড়া দ্যান নি।

রাত একটা। এই শ্মশানের রাত একটার চেহারা অন্যরকম। আর ছটফটানি টের পাচ্ছেন না। ডাকছেও না। অবধূত উঠে বসে ঝুঁকে দেখলেন। ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনিও বাইরের পাটিতে গা এলিয়ে দিলেন। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। তাঁর ধারণা কিছু ঘটবে বলেই কেউ তাঁকে এখানে টেনে এনেছে।

ঘটল। রাত মাত্র দুটো তখন।

ঘরের মধ্যে আচমকা একটা আর্তনাদ শুনে ছিটকে উঠে বসলেন।

—দাদা। বাঁচাও-বাঁচাও! মেরে ফেলল—বাঁচাও!

অবধূত উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন সুবু টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে। তাঁকে দেখে দুহাতে আঁকড়ে ধরল।—দাদা বাঁচাও, ওই তান্ত্রিক আমাকে ত্রিশূল হাতে তাড়া করে কালীর মুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, থামলেই ত্রিশূল দিয়ে বুকে পিঠে খোঁচা দিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছে!

অবধূত তাকে ধরে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, কি পাগলের মতো বকছিস তুই?

সুবুর ভয়ার্ত মুখ, কাগজের মতো সাদা, ঘাড় ফিরিয়ে একবার ঘরের দিকে চেয়েই সন্ত্রাসে বলে উঠল, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না—ও তান্ত্রিক না পিশাচ!

বজ্র-কঠিন গলায় অবধূত বললেন, ফের ও-কথা বলবি তো তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব।

সুবু সভয়ে এবার দাদার দিকে তাকালো। একটা হাত সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে অবধূত আবার তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। একটা আঙুল সোজা তুলে গুরুর ফটো দেখালেন।—ওই মহাতান্ত্রিক কংকালমালী ভৈরব...দশ বছর বয়সে কল্যাণীকে নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন...নিজের প্রাণের থেকে তাকে বেশি ভালোবাসেন...তাকে নিয়ে তোর মনের কু-চিন্তা এখানে জমা দিয়ে যা, নইলে কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না। আবার তাকে বাইরে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন।

থর থর করে কাঁপছে। ঘামছে। কুঁজো থেকে জল এনে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলেন। বললেন, এখন সবে রাত দুটো, কোথাও যাওয়া যাবে না—সকাল হোক।

আশ্চর্য, এরপর অবধূতই ঘুমিয়ে পড়লেন। শান্তির ঘুম। ভোরে জেগে দেখেন সুবু পাশে নেই। কোথাও নেই।

...এই পর্যন্ত বলে অবধূত খানিক ঝিম মেরে বসেছিলেন। তখনো মধ্য রাত। থেকে থেকে শেয়াল ডাকছে। কংকালমালী মহাভৈরবের দাওয়ায় আমি আর উনি মুখোমুখি বসে। মুখ তুলতেই আমার উদগ্রীব প্রশ্ন, তারপর?

ভারী গলায় জবাব দিলেন, অলৌকিক বিশ্বাস করি না বলি, কিন্তু তারপব যা ঘটে তার কোনো ব্যাখ্যা আমি নিজেব ভিতর থেকে আজও পাই নি।...শুনে আপনি হয়তো বলবেন, এ-ও তো সাইকোলজিকাল বা অটোসাজেশনের ব্যাপার--কিন্তু আমার প্রশ্ন ঠিক মুহূর্তটিতে এমন ব্যাপার কেন ঘটে, কে ঘটায়? তাছাডা নিছক সাইকোলজিকাল বা ইমোশনাল ক্রাইসিস হলে কল্যাণী তার ওপর এমন নির্ভর করতে পারে কি করে? এত জোর পায় কোথায়?

অধীর আগ্রহে তাগিদ দিয়েছি, তারপর সুবুর কি হলো আপনি আগে বলুন—

শোনার পর আমারও মুখে কথা সরে নি।

...টানা ছমাসের মধ্যে সুবুর আর দেখা পান নি অবধূত। ভেবেছিলেন তার রোগ সেরে গেছে।...সকাল থেকেই আকাশেব অবস্থা ভালো ছিল না সেদিন। আকাশ কালিবর্ণ। তারই মধ্যে অবধূতকে কলকাতা বওনা হতে হয়েছিল। এক ভক্তর কঠিন অসুখ, তারা এসে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে গেছে। এও ঘটনার সাজ ছাড়া আর কি।...দুপুর না গড়াতে, আকাশটা মাথার ওপর ভেঙে পড়ার পাঁচ সাত মিনিট আগে সুবু এসে হাজির। এসে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ করে দাদাকে পেল না। কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করল, অবধূতজী কোথায়?

দাদা নয়, অবধূতজী। গলার স্বরে ব্যঙ্গ। কুটিল গম্ভীর চাউনি। এতদিন বাদে দেখে দুচোখে পিচ্ছিল লোভ।

—কলকাতায়।

—কখন ফিববে?

—জানি না, কেন?

—তার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া ছিল, এর মধ্যে আমিও কিছুদিন দুই একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করলাম...বুঝলে?

কল্যাণী ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, আমার বুঝে কি লাভ!

প্রবল বৃষ্টি নামতে দেখে ঘর-দোর সামলাতে চলে গেলেন। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড়ও। অনেকক্ষণ বাদে ঝড় থামল, কিন্তু বৃষ্টির তোড় বাড়তেই থাকল। ডুবিয়ে ভাসিয়ে সব একাকার না হওয়া পর্যন্ত এ বৃষ্টি থামবে না...সেই বৃষ্টিতেও আকাশের এক-দিকে লাল আভা। তাতে পৃথিবী ডোবানোর সংকেত বুঝি।...সন্ধ্যের আগেই সুবু মদ নিয়ে বসেছে। কল্যাণী নিজে ঘরে না এসে হারুকে দিয়ে এটা-ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাত আটটা বাজল। ন'টাও বেজে গেল। চারিদিক জলে ভাসছে। অবধূতের

এর মধ্যে ফেরার কোনো প্রশ্নই নেই।

রাত দশটা নাগাদ কল্যাণী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খাবারটা এখানে দিয়ে যাব?

সুবু ঘোলাটে চোখে তাকালো। কল্যাণীর হঠাৎ মনে হলো সে যেন তার খাবারটাই সামনে দেখেছে। কথাও কানে এলো, সেই থেকে ঘরে আসছ না কেন, ভয় পাচ্ছ?

কল্যাণী ধীর পায়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন।—ভয় কাকে পাব?

সুবু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।—তুমি কাউকেই ভয় করো না—না?

—না।

চোখের পলকে এগিয়ে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। বৃষ্টি আর বজ্রপাতের শব্দে সেই শব্দও ঢেকে গেল। এত মদ খাওয়া সত্ত্বেও সুবু একটুও টলছে না। বলল, খুব ভালো কথা, এমন বীরাঙ্গনাই আমাব পছন্দ, দাদা আমাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মানসিক বিকৃতি ঘটিয়ে আর ভয় পাইয়ে হত্যা করার মতলবে ছিল, আমি তার চরম শোধ নেব না? আজ তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি—

বলতে বলতে ক্ষিপ্ত আক্রোশে দু'হাতে জাপটে ধরে বুকে টেনে নিতে গেল। কল্যাণী একটু বাধা দেবার চেষ্টা করতেই ঠাস করে গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত ঘষে আবার তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, আজ খুন করে পেতে হলেও তোমাকে আমি পাব।

পরের মুহূর্তে যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে দাঁড়ালো। দুই চোখে দিশাহারা আতঙ্ক, গলায আর্তনাদ।—এ কি! এ-কি এ-কি! বাঁচাও বাঁচাও! মেরে ফেলল—খেয়ে ফেলল—বাঁচাও!

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল। সেই অন্ধকাব, দুর্যোগেব ঘন-ঘটার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কল্যাণী নির্বাক দাঁড়িয়ে চার-দিক দেখছেন। ওই লোকের এমন ত্রাস আর আতংক দেখে কিছু ঘটে গেল অনুভব করেছেন, কি ঘটল তাই বোঝার চেষ্টা। ফর্সা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ দগদগে লাল হয়ে আছে।

অবধূত ফিরলেন পরদিন বিকেলের দিকে। গত দিনের দুর্যোগে ট্রেন চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণী তক্ষুণি কিছু বললেন না। একটু জিরিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জল-টল খাবার পর কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতার বোগী কেমন?

অবধূত জবাব দিলেন, বয়সটাই রোগ, কিছু করার আছে মনে হয় না।...তুমি আমার জন্য ভাবছিলে তো?

—এই ঝড় জলে রওনা হতে পারবে না বুঝেছিলাম।...তাছাড়া ভাবার সময়ও খুব পাই নি, তোমার ভাই এসেছিল...তার মুখ দেখেই মনে হয়েছিল মতলব ভালো না—

—অবধূত হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন। কল্যামী এরপর ঠাণ্ডা মুখে সবই বললেন। একটি কথাও গোপন করলেন না।

অবধূত স্তম্ভিতের মতো বসে। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন ও দরজা বন্ধ করে এই কাণ্ড করার সময়েও তোমার ভয় করল না?

—একটুও না। সন্ধ্যার দিকে একটু অশান্তি হচ্ছিল।...মাকে খানিক ডেকে শিবঠাকুরের দিকে মন দিলাম। মনে হলো ঠিক আমার চোখের সামনে সেই রকম দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ফিক-ফিক করে হাসছেন। ব্যাস, আমার সব অস্বস্তি অশান্তির শেষ।...কিন্তু ভীষণ কিছু দেখেই তোমার ভাই উন্মাদের মতো ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

মাসখানেক পরে। সকাল তখন ন'টা হবে। অবধূত বাইরের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। বছর আট সাড়ে আটের একটি ছেলের হাত ধরে এক মহিলা বাঁশের ছোট গেট সরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। অবধূত খেয়াল করেন নি কিন্তু কল্যাণী তখুনি কি বলার জন্য বাইরে এসেছেন, দেখে অস্ফুট স্বরে বললেন, কেউ এলো...

অবধূত মুখ তুলে দেখলেন সিঁড়ির কাছে ছেলের হাত ধরে দ্বিধান্বিত মুখে মহিলা দাঁড়িয়ে। কালোর ওপর ভারী সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অবধূত থমকালেন। মনে হলো বাচ্চা বয়সের সুবু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

ডাকলেন, এসো, তোমার নাম কি বকুল তো?

মহিলা ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে রইল একটু। তারপর মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তাই।

—এসো।

ঈষৎ বিস্ময়ে কল্যাণীও দেখছে তাঁকে। এই নাম কখনো শোনে নি। তাঁর থেকে দুই এক বছরের ছোট অর্থাৎ বছর একত্রিশ বত্রিশ হবে বয়েস। কপালে ছোট সিঁদুর টিপ, সিঁথিতেও সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড়। উঠে এসে উপুড় হয়ে প্রথমে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অবধূতকে প্রণাম করল, পরে কল্যাণীকেও।

দ্বিধান্বিত গলায় বকুল জিজ্ঞেস করল, সুধীর চট্টোপাধ্যায় আপনার ছোট ভাই?

—হ্যাঁ...কেন? বোস—

বসল না। উদ্গত আবেগ সংযত করে বলল, তিনি খুব অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন, অবস্থা খারাপ, কাল থেকে অক্সিজেন চলছে, ফিরে গিয়ে দেখতে পাব কি না জানি না...তবু আপনাদের এক্ষণি একবার যেতে হবে, তিনি পাগলের মতো আপনাদের খুঁজছেন।

কল্যাণী নির্বাক। অবধূত স্তব্ধ।—জিজ্ঞেস করলেন তার কি হয়েছে?

শুনলেন কি হয়েছে।...মাসখানেক হলো হঠাৎ মাথার গণ্ডগোল। ঘুমের মধ্যে এমন কি জেগে থেকেও ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে আর্তনাদ করতে থাকে, পাগলের মতো পালাতে চেষ্টা করে। কি দেখে বকুল জেনেছে।...একজন তান্ত্রিক ভৈরব বিকট মূর্তিতে তাকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করে, ত্রিশূলের খোঁচা মেরে মোর রক্তে-ভেজা জীবন্ত কালীর মুখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মাথার গণ্ডগোল ভেবে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কিন্তু রোগ বাড়ছেই। ভয়ে ত্রাসে উন্মাদের মতো ছোটে। রাত দশটার পরে এ-রকম বেশি হয়।—সেদিন ঘুমের মধ্যেও তিনি ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে আর পালাতে গিয়ে দাওয়া থেকে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। হাসপাতালের ডাক্তার বলল, ব্রেন-কংকাশন। অপারেশনের পর থেকেই দিনে দিনে অবস্থা খারাপ হচ্ছে। জ্ঞান হলে বকুলকে চিনতে পারে, চিৎকার করে বকাবকি করে কেন এখনো

কোন্নগর থেকে দাদাকে আর বউদিকে ধরে নিয়ে আসছে না। অজ্ঞান অবস্থায়ও তাদের ডাকে। গতকাল যা গেছে থাকতে না পেরে বকুল তার মায়ের কাছে লোক পাঠিয়ে দাদার কোন্নগরের বাড়ির হদিস জেনেছে। আজ এসেছে।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে অবধূত জিজ্ঞেস করেছেন মা ওর খবর কিছু জেনেছেন?

...না আমি অসুখের কথা কিছু বলি নি।

—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিচ্ছি। কল্যাণীকে বললেন, কিছু টাকা বার করো।

প্রস্তুত হয়ে দেখেন কল্যাণীও যাবার জন্য তৈরি।—তুমিও আসছ তাহলে?

--এ-সময়ও আমি যাব না, বলো কি।

দেড়গুণ ভাড়া গুণে সোজা ট্যাক্সিতে এলেন। হাসপাতাল। সাধারণ কেবিনে সুবুর প্রায়-নিশ্চল দেহ পড়ে আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। অক্সিজেন চলছে। ড্রিপ নার্স জানালো যে কোনো মুহূর্তে কিছু হয়ে যেতে পারে, ব্লাডপ্রেসাব একেবারে নেমে গেছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা বাদে সুবু বড় বড় করে তাকালো হঠাৎ। দাদাকে দেখল। স্পষ্ট টনটনে গলায় বলল, এসেছ!...বউদি এলো না?

কল্যাণী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দৃষ্টি ঠিক চলছে না, তবু তন্ময় হয়ে দেখার চেষ্টা।—আমাকে দযা কবো, আমাব মাথায় তোমার হাত রাখো।

কল্যাণী আরো এগিয়ে গেলেন। মাথায় হাত বাখলেন। হাত রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আ-আ—ঃ, শান্তি...শান্তি।

বিকেল চারটে নাগাদ সব শেষ।

৮

অবধূত নিজের ভাগ্য কখনো দেখেন নি, কখনো যাচাই করেন নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো ভালো করে নিজের কপাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন নি। দুর্ভাগ্য মানুষকে তাড়া করে ফেরে এমন একটা কথা শোনা ছিল। কিন্তু নিজের বেলায় দেখছেন এর বিপরীতটাও তার থেকে কম সত্যি নয়। একে তিনি সৌভাগ্য বলবেন কিনা জানেন না। কারণ এর সঙ্গে আত্ম-তৃপ্তির যোগ স্বাভাবিক, তা তাঁর নেই। কিন্তু কোথায় ছিলেন, আজ ভাগ্য তাঁকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। নাম যশ খ্যাতি অর্থ ধাওয়া করে আসছে। কাছের লোক দূরের লোক তাঁকে দুঃখ জমা দেবার মতো একটা মানুষ ভাবছে। শক্তির আধার ভাবছে। নিজের ভাগ্য গণনা না করেও তিনি বুঝতে পারছেন কর্মের আরো প্রবল স্রোতের মুখে তিনি ভেসে চলেছেন, ভেসে যাবেন।

কিন্তু এর সঙ্গে তার নিজস্ব শক্তির যোগ কোথায়? অনেক রোগের তিনি হদিস

পান, ওষুধ সম্পর্কে বিচার বিবেচনাও প্রখর, মানুষের দিকে চেয়ে কিছু লক্ষণ ধরতে পারেন, তাপ পরিতাপ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব শক্তির যোগ কোথায়? অথচ কল্যাণীর দিকে চেয়ে মনে হয় শক্তি বলে কোথাও কিছু আছে। যা তার নেই।

সুবুর মৃত্যুর পর তিনি বড় রকমের একটা নাড়াচাড়া খেলেন। স্ত্রীর পাশে নিজেকে এমন শক্তিশূন্য আর কখনো মনে হয় নি। তাঁর এই অস্তিত্বও যেন স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। বক্রেশ্বরের ভৈরবী মা মহামায়া তাঁকে যেটুকু দিয়েছেন সেটা এই মেয়ের মুখ চেয়ে। কংকালমালী ভৈরব তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তা বড় আদরের এই মেয়ের জন্য। আজ তাঁর যা কিছু তার সবই কল্যাণীর জন্য। শক্তি কি জানেন না, কিন্তু এই শক্তির বন্ধনে আটকে আছেন।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর একটা নীরব আক্রোশ তাঁকে যেন পেয়ে বসল। শক্তির দৌড় দেখার আক্রোশ। কল্যাণীর দোষ নেই, কিন্তু ভাইয়ের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপলক্ষ তো বটে। কল্যাণী যা বলেন তিনি তাঁর বিপরীত করেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য ডেকে ওষুধ বানাতে বসলে বিকেল গড়ায়। এরই ফাঁকে-ফাঁকে কল্যাণী যা এনে দেন, বিরক্তি দেখিয়ে দিব্বি খেয়ে নেন, স্ত্রীর নিরম্বু উপোস চলছে তা যেন খেয়ালই নেই। লোক আসার বিরাম নেই। হঠাৎ তাদের সেবার নেশায় পেয়ে বসল। তাদের জন্য হারুকে নিয়ে তিন মাইল দূরের বাজার যাও, রাঁধো-বাড়ো খাওয়াও। অসময়ে লোক আসার জন্য কল্যাণীর নিজের অন্নও কতদিন তুলে ধরে দিতে হয়েছে। সব থেকে নিঃশব্দে নিষ্ঠুর তিনি রাতের নিভৃতে। যে বাসনা সুবুকে পাগল করেছিল সেই গোছেরই একটা লোভের বাসনা নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন, চোখে মুখে স্থূল আচরণে পরস্ত্রীকে ভোগের দখলে টেনে আনার উল্লাস প্রকট করে তুলতে চান। তিনি চান স্ত্রীর এই ধৈর্যের শক্তিতে ভাঙন ধরুক, সে বিদ্রোহ করে হার মানুক।

...শেষে কল্যাণী একদিন শুধু বললেন, তোমার হলো কি বলো তো? তুমি হঠাৎ এ-রকম হয়ে গেলে কেন?

—পছন্দ হচ্ছে না? অবধূত হেসে উঠেছেন।—তাহলে তোমার শক্তির অস্ত্র হাতে নাও, তোমার শিবঠাকুরকে ডেকে বলো তিনি বিহিত করুন, পারেন তো সুবুর মতো শাস্তি দিন আমাকে।

কল্যাণী হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েছিলেন খানিক। তারপর বললেন, তুমি একটা পাগল, লোকের চিকিৎসা না করে নিজের চিকিৎসা করাও।

...যে মানুষকে দেখে এখন শত শত মানুষ রোজ মাথা নত করে, হাত জোড় করে—তাঁকে কল্যাণী অনায়াসে বলে বসল, তুমি একটা পাগল...। কিন্তু এই এক কথায় অবধূতের কাঁধ থেকে যেন এক অপদেবতা বিদায় নিল। চিত্ত বিষণ্ণ তবু। নিজের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ক্রীতদাস মূর্তি। রমণীর ক্রীতদাস। সেই রমণী নিজের স্ত্রী।

শিকল ছেঁড়ার তাগিদে আবার দূরে পালানোর মন। এখানকার পসারের পরোয়া একটুও করেন না। লোকসানের হিসেব করেন না। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম আবেগের

তাড়নায় চট করে নড়তেও পারলেন না। সুবু বকুলকে বিয়ে করেছিল কিনা জানেন না। ও চলে যাবার আগে বকুলের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছিলেন। অবধূত বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামান না। বকুলকে অসহায় ভ্রাতৃ-বধূই ভাবেন। তার প্রতি দরদ আর কর্তব্য তাঁকে সাময়িকভাবে আটকে ফেলল। সুবুর এক মাসের চিকিৎসায় আর অপারেশনে বকুল একেবারে নিঃস্ব। শেলাইয়ের দোকান থেকে কি-ই বা রোজগার ছিল। বকুল নিজে মুখ ফুটে কিছু বলে নি, অবধূত খোলাখুলি জিজ্ঞেস করে জেনেছেন।

তার জন্য আরো বিশেষ করে ওই সাড়ে আট বছরের মিষ্টি দুষ্টু ছেলেটার জন্য মন চিন্তাচ্ছন্ন। ওদের সম্পর্কে বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছলেন। কিন্তু ওই মহিলা কঠিন, নিস্পৃহ। স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তাঁর ওখানে ঠাঁই হবে না, বাড়ি তিনি মেয়ের নামে উইল করে দিয়েছেন।

কল্যাণীর পরামর্শ মতো অবধূত ওদের কোন্নগরে নিজের কাছে এনে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বকুল রাজি হয় নি। সবিনয়ে বলেছে আমার জন্য ভাববেন না দাদা, ধার দেনা মিটিয়ে এই দোকান দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে খেয়ে থাকতে পারব...কিন্তু ছেলেটার জন্য আমার এখন থেকে অন্য ভাবনা, নবছরও বয়স হয় নি এখনো, কি দুরন্ত আর অবাধ্য ভাবতে পারবেন না, আপনি আর দিদি সব অপরাধ ক্ষমা করে ওর ওপর একটু আশীর্বাদ রাখুন, আপনাদেব আশীর্বাদই আমার সব থেকে সম্বল।

অবধূতের ধারণা, কেন সুবুর এত বড় অঘটন ঘটল বকুল সেটা আঁচ করতে পেরেছে, ছেলেটার নাম তপন, তপু। একটু বেশি মাত্রায় দুরন্ত যে, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। চঞ্চল দুচোখ যেন সারাক্ষণ হাসে, আর কিছু করার মতলব ভাঁজে। ওকে নিজের কাছে এনে রাখার কথা বলতে পারতেন, কিন্তু ছেলেটাকে ছেড়ে ওর মা থাকে কি করে। তাছাড়া ছেলে কোল-ছাড়া হলে এই বয়সের সুশ্রী গরিব মা-ও কলকাতা শহরে খুব নিরাপদ নয়। বকুল কালো বটে কিন্তু ভারী সুশ্রী। জোর করেই অবধূত তার ধার দেনা মিটিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন ছুটি-ছাটা হলেই তপুকে নিয়ে সে যেন কোন্নগরে তাঁর ওখানে কাটিয়ে আসে।

ঈষৎ আগ্রহ-ভরা দুচোখ তুলে বকুল জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি বিরক্ত হবেন না...?

অবধূত হেসে জবাব দিয়েছেন, তোমাদের বরাবরকার মতো কোন্নগরে রাখার এ প্রস্তাবটা তাঁরই ছিল। বকুল বলেছে, সামনের ছুটিতে ছেলেকে নিয়ে সে কোন্নগরে গিয়ে দিদির কাছে থাকবে।

...তবে সপ্তাহে দু-তিন দিন অন্তত দোকান দেখার জন্য তাকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে।

অবধূত এই কারণেই বেরিয়ে পড়তে পারেন নি।

কিন্তু ওরা আসার পর অবধূত যেন আর এক মায়ার বন্ধনে পড়ে গেলেন। ...হ্যাঁ, যেমন মিষ্টি আর তেমনি দুরন্ত বটে ছেলেটা। আর দুঃসাহসও বটে। অবধূতের অনেকবার ইচ্ছে হয় ওর কপালটা ভালো করে দেখেন। চোখে পড়ে না এমন

অনেক সূক্ষ্ম আঁচড়ের কারিকুরি। তাঁর বিবেচনায় এটা ভালো লক্ষণ নয়। হাতের দিকে আপনা থেকে যেটুকু নজর গেছে তাতেও খটকা লেগেছে। না, সাহস করে তিনি সজাগ চক্ষু নিয়ে ওর কপাল বা হাত দেখেন নি। দুখিনী মায়ের ছেলে, কি দেখতে কি দেখবেন ঠিক কি! এ-ক্ষেত্রে তাঁর কর্তা না সাজাই ভালো।

জেঠুর সঙ্গে তপুর খুব ভাব। জেঠু হেসে হেসে সম-বয়সীর মতো ওর সঙ্গে গল্প করে, ওর মনের কথা শোনে। জেঠুর টক-টকে লাল জামা-কাপড় ওর দারুণ ভালো লাগে। জেঠু এ-রকম জামা-কাপড় পরে কেন এ নিয়ে কৌতূহল আর প্রশ্নের অন্ত নেই। বড় মা-কেও ওর দারুণ পছন্দ। কল্যাণীকেই জিজ্ঞেস করে, তুমি এমন আগুনপানা সুন্দর হলে কি করে?

একটা ধাক্কা নীরবে সকলকেই সামলাতে হয়। এই রূপের আগুনে ওর বাপ পুড়ে মরেছে। কল্যাণী হাসি মুখেই বলেছেন, আগুন আবার সুন্দর হয় কি করে রে?

—বাঃ, আগুনের থেকে সুন্দর আর কোন রং আছে!

অবধূতের গম্ভীর মন্তব্য, রং সুন্দর হলে কি হবে, পোড়ায় যে...?

—সেই জন্যই তো আগুন আমার আরো ভালো লাগে।

এই ছেলেকে নিয়ে এরই মধ্যে অবধূত দু দুটো অঘটন থেকে বেঁচেছে। এখানে আসার দিন কতকের মধ্যে বাড়ির কাছেব পুকুর দেখে তপুর সাঁতার শেখার সাধ হয়েছে। হারু সাঁতার শেখাবে কথা দিয়েও দেরি করছে দেখে তার আর ধৈর্য থাকল না। দুপুবে সকলেব অলক্ষ্যে বেরিয়ে গিয়ে হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই পুকুরে নেমেছে। সাঁতার মানেই হাত-পা ছোঁড়া জানে। তাই করে গভীর জলে গিয়ে হাবুডুবু। উদ্বাস্তুদের কারো কারো চোখে পড়েছিল বলে রক্ষা। তাকে যখন তুলে আনা হয় আধ-মবা দশা। ছদিন লেগেছে সুস্থ হতে। তার পরেই ঘোষণা করেছে, অনেকটা নাকি শেখা হয়ে গেছে, হারু কাকা জলদি সাঁতার শিখিয়ে না দিলে আবার একলাই পুকুরে নামবে।

অবধূত নিজে নিয়ে গিয়ে ওকে সাতদিন ধরে সাঁতারে পোক্ত করে তবে নিশ্চিন্ত।

আর একদিন তার মনে হয়েছে জেঠুর বাড়ির এক-তলা ছাদ থেকে নিচে লাফ দিতে পারাটা সহজ ব্যাপার। তক্ষুণি সেই বীরত্ব দেখানোর ঝোঁক।

শব্দ শুনেই অবধূত কল্যাণী আর বকুলের ত্রাস। তপু মাটিতে শুয়ে পড়েছে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। অবধূত ওকে শ্রীরামপুরে এনে এক্সরে করে তবে হাঁপ ফেলেন। ফ্র্যাকচার হয় নি, তবে সাংঘাতিক ভাবে মচকে গেছে।

অবধূত নিজেই চিকিৎসা করেছেন। পায়ের গোড়ালির দিক কদিন পর্যন্ত ফুলে ঢোল। সাত দিনের মধ্যে দাঁড়াতেও পারে নি। অবধূত রক্তাক্ত মুখ করে বলেছেন, তুই এরপর আমার হাতে মার খাবি।

মিষ্টি হাসি, দুষ্টু চাউনি। তারপর জবাব।—মার খেলে আমার কিছুই হয় না, মা তো এক-একসময় মেরে মেরে শুইয়ে ফেলে।

ভিতরটা মোচর দিয়ে উঠেছিল অবধূতের। কপালটা আত্মিক মনোযোগে লক্ষ্য

করবেন?...হাতটা একবার দেখবেন? না, থাক।

—বলিস কি, এত দুষ্টুমি কেন করিস?

—দুষ্টুমি হয়ে যায় কি করব।...দু-তিন মাস আগে মা এমন মার মারল যে রাতে একেবারে তিন ডিগ্রী জ্বর।

—কেন, তুই কি করেছিলি?

—পাথর ছুঁড়ে একটা লোকের মাথা দু ফাঁক করে দিয়েছিলাম। মাকে সে গালাগাল কচ্ছিল আর শেলাইউলি বলেছিল।

অবধূত শুনে থ।

ওরা চলে যেতে বাড়ি যেন একেবারে ফাঁকা। কল্যাণীও ঘুরেফিরে অনেক বার বলেছেন, ছেলেটা যেন বাড়িটাকে একেবারে ভরাট করে রেখেছিল।

মাস দেড়েক পরের এক শনিবার। অবধূত জানলা দিয়ে দেখেন, লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তপু বাঁশের গেট সরিয়ে ঢুকছে। কিন্তু পিছনে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তখনো ভাবলেন, ও ছুটে এসেছে, মা ওর পিছনে আসছে।

কিন্তু বাইরের বারান্দায় এসেও দেখেন ওর সঙ্গে আর কেউ নেই।

—কি রে, কার সঙ্গে এলি?

—একলাই।

গলা শুনে কল্যাণীও এসে দাঁড়িয়েছেন। বলে উঠলেন, তোর মা তোকে একলা ছাড়ল?

ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, মা জানেই না।

দুজনেরই চক্ষুস্থির। তপুর জোরালো কৈফিয়ৎ, রবিবারের পর সোম মঙ্গল বারেও তার স্কুল ছুটি। জেঠুর বাড়ি যাবার জন্য মাকে এতবার করে বলল কিন্তু মা কানেই নিল না—এদিকে সে সাঁতার ভুলে যাচ্ছে, তাই চুপিচুপি একলাই চলে এসেছে।

অবধূত হাসবেন না ওর মায়ের চিন্তায় উতলা হবেন!—তুই কলকাতা থেকে এ-পর্যন্ত চিনে একলা চলে এলি!

—সহজ তো। বাসের পয়সা আগেই যোগাড় করে রেখেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে এসে লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম কোন গাড়ি কোন্নগরে যাবে। গাড়ি ছাড়ার আগে ট্রেনে উঠে পড়লাম। টিকিট তো নেই, এক-একটা স্টেশন এলেই নেমে পড়ি, আবার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি। হাওড়া থেকে কটা বা স্টেশন!

অবধূত তক্ষুণি এক ভক্তকে ডাকিয়ে এনে বকুলের কাছে চিঠি লিখে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মঙ্গলবার বিকেলে তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বকুলকে বললেন, ওকে মার-ধোর করবে না, ও আর এ-রকম করবে না বলেছে।

ছেলের তক্ষুণি প্রতিবাদ।—আমি বলেছি কয়েকটা দিন স্কুলে ছুটি পেলে মা যদি তোমার আর বড় মার কাছে নিয়ে আসে, তাহলে আর এ-রকম করব না।

রাগের মুখে ওর মা পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল।

এরপর একদিন দু দিন না হোক, একসঙ্গে চার পাঁচদিনের ছুটি পেলেই ছেলে

নিয়ে বকুলকে কোন্নগর আসতে হয়। চলে গেলে অবধূত প্রত্যেকবারই কল্যাণীকে বলেন, এ আবার কি মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি আমরা।

জবাব না দিয়ে কল্যাণী শুধু হাসেন। অবধূত নিজের ভিতরে চোখ চালান। এই দুরন্ত মিষ্টি ছেলেকে একমাত্র বংশধর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। অনেকটাই তাঁর ভিতর জুড়ে বসে আছে। দিন যায়। একে একে বছর গড়ায়। দিনে দিনে ছেলেকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা আর নালিশ বাড়ছেই। এ ছেলেকে নিয়ে তার এক মুহূর্ত শান্তি নেই। পাড়ার যত দুষ্টু ছেলেরাও মোড়ল। দল বেঁধে মারামারি করে। কোনো কথা শোনে না। এই ছেলে এখানে রাখা আর ঠিক নয়, তাকে বাইরের খুব কড়া কোনো হস্টেলে পাঠানো দরকার।

প্রস্তাবটা অবধূত উড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু একটু খটকা লাগে অন্য কারণে। বলেন, কিন্তু স্কুলে তো বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হচ্ছে শুনি?

বকুল বলে, সেই জন্যেই আমার আশা দাদা, বাইরে গেলে ও হয়তো মানুষ হবে, কিন্তু এখানে থাকলে ও বয়ে যাবে।

তপুব পনেরো বছর মাত্র বয়েস তখন। অবধূতের ভিতরে আবার ওর কপাল আর হাত দেখার তাড়না। কিন্তু থাক। এখনো সাবালক হয় নি, সমস্ত চিহ্নই বদলাতে পারে। তপুকেই বলেন, তোকে আর কলকাতায় রাখব না ভাবছি, বাইরের কোনো ভালো হোস্টেলে পাঠিয়ে দেব। ওর মা আর কল্যাণীর সামনেই জ্যাঠা-ভাইপোতে আলাপ।

—দাও। ভালোই হবে, একটু স্বাধীনতার মুখ দেখব।

—স্বাধীনতার মুখ দেখবি মানে, রীতিমতো কড়া হস্টেলে রাখব।

হাসি।—এমন হোস্টেল কোথায় আছে? মা-কে তো বলেই দিয়েছি, বাইরে পাঠালে সাত দিনের মধ্যে আমি হাওয়া হয়ে যাব...আর আমার কোনো পাত্তাই পাবে না তোমরা, একবার পাঠিয়ে দেখুক না—

বকুল বলে উঠেছে, তুই কি কখনো আমার দুঃখ দুশ্চিন্তা বুঝবি না?

—নাকে কেঁদো না তো, হস্টেলে থাকব না বলা সত্ত্বেও এক-কথা তুমি বার বার বলো কেন? আমি কখনো অন্যায় করি?

অবধূত হঠাৎ গর্জনই কবে উঠেছেন, এই বেয়াদপ। মায়ের সঙ্গে ফের ও-রকম করে কথা বলবি তো কান ছিঁড়ে নেব!

তপু গুম।

পরে ভেবে-চিন্তে অবধূত বকুলকে বলেছেন, পাঠাবার চেষ্টা কোরো না, যে ছেলে, সত্যি মুশকিল হতে পারে।

আরো দু'টো বছর কেটে গেল। অবধূত কখনো বেরোন, কখনো বা ঘরে স্থিতি হন।

তপুর বয়েস সতেরো। ফার্স্ট ডিভিশনে বেশ ভালো নম্বর পেয়েই পাশ করেছে। অংক আর সায়েন্সের পেপারে লেটার পেয়েছে। এবারে ফিজিক্স অনার্সে বি. এস-সি পড়বে। অবধূতের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছে, ওর বাপটাও রীতিমতো ভালো ছাত্র ছিল। আবার আনন্দে সেই রাতে ফিস্টও লাগিয়ে দিয়েছেন। কল্যাণীকে বলেছেন

তপুকে খুব ভালো করে খাওয়াও।

কিন্তু মুখ শুকিয়ে বকুল এক ফাঁকে যা বলল, শুনে অবধূত বেশ উতলা। সেটা সত্তর সালের সবে শুরু। নক্সালরা তৎপর হয়ে উঠেছে। বকুলের ধারণা, তপু তাদের খপ্পরে পড়ছে। পুলিশ এর মধ্যে দু'বার তাকে থানায় নিয়ে গেছে। অবশ্য জেরার পর ছেড়েও দিয়েছে। বকুল বলল, ওর কথা ভাবলে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায় দাদা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তপুকে নিয়ে তিনি জেরায় বসেছেন।—এ-সব কি শুনছি?

—ছাড়ো তো, মায়ের বেশি-বেশি ভাবনা। আমি অন্যায় কিছু করছি না।

—থাপ্পড় খাবি তুই আমার হাতে—এক পডাশুনা ছাডা তোর অন্য কিছু করার দরকার কি? তুই এ-সব মুভমেন্টের কি বুঝিস?

সতেরো বছরের ছেলের মুখে অদ্ভুত হাসি।—বোঝার কি আছে বলো জেঠু-—স্বাধীনতার নামে যে ভাঁওতাবাজী চলছে তা-ই বিশ্বাস করব!

—তা বলে এ-সব মারামারি কাটাকাটিতে বিশ্বাস করবি?

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো জেঠু, ও-সবের মধ্যে আমি নেই। নক্সাল নাম নিয়ে অনেক মুখ্যু লোকও ঢুকে গেছে। দরকার ছাড়া মারামারি কাটাকাটির মধ্যে যাব কেন?

—দরকার পডলে যাবি?

জবাবে হাসি। অবধূত অনেক কথাই এরপর বলেছেন। কিন্তু ফল হযেছে মনে হয় নি।

তপু কলকাতায় গিয়ে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পডা শুরু কবল। তার পরের তিন-সাডে তিন বছরের খবর অবধূত আর রাখেন না। কাবণ ঘরেব বন্ধন ছেঁড়ার তাড়নায় এবারে তিনি যাকে বলে নিরুদ্দিষ্টই হযেছেন। তিন বছবেব ওপর দ্বার-ভাঙার কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে কাটিয়েছেন। ফলে অনুভব করেছেন, ঘটনার সাজে ডাক পড়েছিল বলেই তিনি সেখানে গিযে হাজিব হয়েছিলেন, আর মেয়াদ ফুরোতে ফিরে আসতেও বাধ্য হয়েছেন। ঘরের বন্ধন ছেঁডার মানসিক তাগিদ এরপরে আর কখনো অনুভব করেন নি।

কোন্নগরে ফিরে তপুর খবর শুনে তিনি ভীষণ বিচলিত। শুধু তপুর নয়, বকুলেরও। তারও নাকি শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে আধখানা হয়ে গেছে। জীবন যুদ্ধে এবারে সে হারই মেনেছে। জীবন্মৃত দশা।...বেশি নয়, মাস তিন-চার মাত্র আগের কথা। বি. এস-সি ফাইন্যাল পরীক্ষার পরেই তপু কোথায় ডুব দিয়েছে কেউ জানে না। পুলিশ দল-বলসহ তাকে খুঁজছে। তাদের নামে শুট-অ্যাট-ফাইট অর্থাৎ ধরতে না পারলে দেখামাত্র গুলি করার অর্ডার বেরিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অপরাধের অভিযোগ। পুলিশ বকুলের ডেরায় এসে তছনছ করেছে, সব ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে। তাকে অনেকবার করে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গেছে, জেরার নামে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে রেখে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।...না বকুল বিশ্বাস করে না তার ছেলে জঘন্য কোনো অপরাধ করেছে, দলের সঙ্গে ছিল বলেই অন্যদের

সঙ্গে তার নামেও হুলিয়া বেরিয়েছে।

তপু ফেরার হবার তিন-চারদিন বাদে কল্যাণী ওর লেখা ছোট্ট একটা চিঠি পেয়েছিলেন। লিখেছে, বড়-মা, বাধ্য হয়েই আমাকে সরে যেতে হচ্ছে, কপালে কি আছে জানি না, মা-কে দেখো। কল্যাণী ফাঁপরে পড়েছেন। তখন পর্যন্ত তাঁর কেবল হারু ভরসা। অবশ্য পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভরসা। বাবা নেই বলে তারাও সর্বদা মাতাজীর খোঁজ খবর নেয়।...কল্যাণী ততদিনে মাতাজী হয়ে বসেছে। হারুকে নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁর চক্ষুস্থির। বকুল শয্যাশায়ী। তাঁকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তারপর সব বলেছে। কল্যাণী তাকে নিজের কাছে এনে বাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই সে আসে নি। বলেছে, পুলিশ তপুর খোঁজে জাল ফেলে বসে আছে। আত্মীয়-পবিজন কোথায় কে আছে খোঁজ করছে। বকুল বলেছে কেউ কোথাও নেই, কোন্নগরে গেলে সেখানেও পুলিশের উৎপাত শুরু হবে।...তপু হঠাৎ কখনো বড় মাযেব কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে কিনা জানে না। তাই কোন্নগরে গিয়ে তার ওখানকাব আশ্রয় সে বিপন্ন করতে চায় না।

কল্যাণী আর যায নি। বকুলও আসে নি। খুব নিঃশব্দে কল্যাণী ব্যবস্থা যা করাব করেছেন। এখান থেকে লোক পাঠিয়ে আগের থেকেও ভালো করে বকুলের দোকান সাজিয়ে দিয়েছেন।...কিছুদিন আগে তপুর বি. এস-সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেবিয়েছে। কল্যাণী কাগজে খবর পড়ে অবাক হয়েছেন। এত কাণ্ডের মধ্যে থেকেও ওই দস্যি ছেলে কিনা ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে!

অবধূতও এরপব কলকাতায গিয়ে খুব সাবধানে বকুলের সঙ্গে দেখা করেছেন। এমনকি চোখে পডাব ভযে বক্তাম্বব ছেড়ে সাদা পোশাকে গেছেন। বকুল তাতেও মিনতি করে বলেছে, আপনি আব নিজে আসবেন না—জানাজানি হলে সকলেরই ক্ষতি।

দিন বসে থাকে না। একে একে আরো চারটে বছর কেটে গেল। ছিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাস সেটা। শ্মশানেব ধারে বাত এগারোটা অনেক রাত্রি। অবধূত আর কল্যাণী জেগেই ছিলেন। কার্তিককে কি দরকারে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল। বাবার সে পাকাপোক্ত চেলা এখন। দবজায় খুট খুট কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভাবলেন সে-ই ফিবে এসেছে। অথচ এই রাতে তার ফেরার কথা নয়।

দবজা খুলেই অবধূত চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। অবছা অন্ধকারে কে একজন রিভলবার তাক করে আছে, তার পিছনে আরো একজন কেউ। সামনের লোকের চাপা হিস হিস গলা, টুঁ-শব্দটি নয়! তারপরেই হি-হি হাসি।—এই রে, জেঠু তুমি! আমি ভেবেছিলাম বড়-মা দরজা খুলবে। ঘুরে তাকিয়ে বলল, এসো রিনা চটপট ঢুকে পড়ো। এগিয়েও থমকালো।—বাড়িতে বাইরের কেউ নেই তো জেঠু?

তপন...তপু! তার সঙ্গে একটি মেয়ে। হাতে ছোট সুটকেশ। নীরবে বিস্ময়ে মাথা নেড়ে অবধূত দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। রিনা নামে মেয়েটি ভিতরে পা দিতে তপুই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল।

ঘরে এসে দুজনেই ওরা তাঁকে আর কল্যাণীকে প্রণাম করল। কল্যাণীও

অবধূতের মতোই হাঁ। তপুর চেহারা খুব বদলায় নি। তবে চুল একেবারে ছোট করে ছেঁটে ফেলার দরুন মুখের মিষ্টি ভাব একটু কমেছে। আর বেশ রোগা হয়েছে। মেয়েটির বয়েস একুশ-বাইশ, মোটামুটি সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী। এক-নজর তাকালেই বোঝা যায় অন্তঃসত্ত্বা। এই অচেনা বাড়িতে এ-রকম দুজনের সামনে পড়ে বেশ বিব্রত কুণ্ঠিত মুখ।

কিন্তু তপুর কোনো সংকোচের বালাই নেই। মুখে সেই আগের মতোই মিটি মিটি হাসি।—একেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে দুজনেই! এই হলো রিনা, আমাব বিয়ে করা বউ। আবাব হাসি।—বিয়েটা অবশ্য সিঁদুর পরিয়ে আর মালা-বদল করে যে-যার ইচ্ছে মতো করেছি, তার জন্য রিনার মনে একটু খুঁতখুঁতুনি আছে, আমি ওকে বলেছি জেঠুর কাছে গেলে উনি তন্ত্র-মতে আমাদের দারুণ বিয়ে দিয়ে দেবেন'খন। যাক কথা পরে, সকাল থেকে এ-পর্যন্ত আমাদের পেটে দানা পড়ে নি, কি দেবে দাও, যা-হোক কিছু পেলেই হলো—

কল্যাণী ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রিনাকে শুইয়ে দিয়ে এ-দিকের ঘরে এলেন। অবধূত রিভলবার আর চামড়ার পাতের কেসের মতো জিনিসটা তাঁর হাতে দিয়ে গম্ভীব মুখে বললেন, এগুলো খুব সাবধানে বেখে দিও।

কল্যাণী দেখলেন কেসের মতো জিনিসটায় গুলি। তাঁব কপালে ঘাম দেখা দেবার দাখিল। ওগুলো শাড়ির আড়াল করে বসলেন।

অবধূত বললেন, মাকে ও-ভাবে কষ্ট দিয়ে কি পেলি—মায়ের খবর বাখিস হতভাগা?

—আমি সব খববই রাখি জেঠু, তোমার খবরও রাখি...তুমি তিন বছবের ওপব নিপাত্তা হয়ে ছিলে, এটা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

—যাক, এখন কি ব্যাপার কি অবস্থা বল। এখনো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?

তপু হাসল।—অন্য সব অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে এখন তো আমি আরো বড আসামী। খুন আর অ্যাবডাকশন দুই কেসই ঝুলছে।

কল্যাণী বলে উঠলেন, তুই এ-সব করেছিস?

—নিজেকে আর রিনাকে বাঁচানোর জন্য খুন করেছি বড়মা, বিনাকে অ্যাবডাক্ট করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যে...।

এর পরের ঘটনা শুনে দুজনেই স্তব্ধ।...বাড়ি ছাড়ার পর তপু তার দলবল নিয়ে শেয়াল কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়িয়েছে। একদিন দুদিন নয়, তিন বছর। শেষের একটা বছর সঙ্গে রিনা।...লোক বুঝে ছোট-খাটো হামলা তারা করেছে, বিপাকে পড়ে কাউকে কাউকে জখম করেও পালাতে হয়েছে, কিন্তু খুন কাউকে করে নি তখন পর্যন্ত। খুন কাউকে সত্যিই করতে হয় না, ভয় দেখিয়েই অনেক কাজ হাসিল করা যায়। কিন্তু শেষের দিকে যা করত সেটা কোনো রাজনীতির ব্যাপার নয়, নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই ওটুকু করতে হতো। ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পুলিশের গুলি খেয়ে অনেক মরেছে, অনেকে ধরা পড়ে জেলে পচছে।

...বিনা কলকাতায তাদেব পাড়াব মেয়ে। ওর বাবা ছা-পোষা কেরানি। দুটো ছেলে আব এই মেয়ে। ছেলে দুটো তেমন লেখা-পড়াব সুযোগ না পেয়ে ফ্যাক্টবিব কাজে ঢুকেছিল। বাপ তখন অসুস্থ, বিটায়াব কবেছে। তপু যে-বছবে বি. এস-সি পবীক্ষা দেয সে-বছবই বিনা হায়াবসেকেণ্ডাবি পবীক্ষায় পাশ কবেছিল। তপুব সঙ্গে আলাপ ছিল না, কিন্তু মুখ-চেনা ছিল। সেই তখন থেকেই পাড়াব জনাকযেক আব বেপাড়াব একজন পয়সাঅলা গুণ্ডা গোছের ছেলে বিনাব পিছনে লেগেছিল। তপু তাদেব একবাব আচ্ছা কবে সামলে দিতে আব বেপাড়ায ওই পযসাঅলা বড়লোকেব গুণ্ডা ছেলেকে আচ্ছা কবে ঠেঙিযে দিতে ওবা কিছুদিন চুপ মেবে ছিল। বিনা বাড়িতে কিছু বলে নি। বলে কি লাভ। কিন্তু তপুব প্রতি ভাবী কৃতজ্ঞ ছিল। তখন একটু-একটু আলাপ ছিল।

কিন্তু তাব পবেই তো তপুকে গা-ঢাকা দিতে হয।

হাযাবসেকেণ্ডাবি পাশ কবাব পব বিনা প্রায বছব তিনেক ছোট ছোট ছেলেমেযে পড়িযে সামান্য কিছু বোজগাব কবত। এই সময একজন তাকে টাইপ শিখতে পবামর্শ দিল। কিন্তু বাত আটটাব আগে বিনাব ফুবসত ছিল না। প্রাইভেট টিউশনি আব বাড়িতে বান্না কবে সময পেত না। আটটা থেকে ন'টা বাড়িব আধ মাইলেব মধ্যে টাইপিং স্কুলে ভর্তি হযেছিল। কিন্তু ওই বড়লোকেব গুণ্ডা ছেলে যে এ-ভাবে ওঁত পেতে ছিল জানত না। আবাব ওকে তাবা উত্যক্ত কবতে শুরু কবেছিল। চিঠিতে হুমকি দিত। কিন্তু বিনাব এ-সব গাযে মাখলে চলবে কেন?

টাইপ-স্কুল থেকে এক বৃষ্টিব বাতে ফেবাব সময ওবা তাকে জোব কবেই গাড়িতে তুলে নিল। চোখেব পলকেই ঘটে গেল ব্যাপাবটা। বিভলবাব পিঠে ঠেকিযে সেই বড়লোকেব গুণ্ডা ছেলেব দল ওকে গাড়িতে তুলে নিল। একটু-আধটু দূবে যাবা ছিল ভালো কবে তাবা কেউ কিছু বুঝতেই পাবল না। পবে জেনেছে ওই ছেলে আগে আবো দুটো মেযে তুলে নিযে পালিযেছে। বুকে বিভলবাব ঠেকিযে নিজেই নিজেব কেবামতিব কথা শুনিযে বিনাকে শাসিযেছে, মুখ বুজে থাকলে প্রাণে বাঁচবে—দু-দশ দিন পবে হযতো বাড়িতেও ফিবতে পাববে, নইলে খতম হতে হবে?

একটু হেসে বলল, ওদেবও কি ববাত দ্যাখো জেঠু, ওই যমশু হাববাবেব যে জঙ্গলে আমাব ঘাঁটি তাব কাছাকাছি একটা ছোট বাংলোয বিনাকে এনে তোলা হযেছে। আবো তো কত জাযগা আছে, বিনাব ববাত ভালো না হলে ওবা ওখানেই আনবে কেন? আমাদেব তখন সতর্ক প্রহবা, কে আসছে যাচ্ছে সর্ব-দিকে নজব বাখতে হয। আমি দেখি নি, আমাব দলেব একজনেব সন্দেহ হলো ফূর্তি কবাব জন্য মোটবে কবে একটা মেযেকে তুলে আনা হযেছে, কাবণ যতদূব মনে হয বাতেব অন্ধকাবে জোব কবেই তাকে গাড়ি থেকে নামিযে ওই বাংলোয ঢোকানো হযেছে।

...খবব পেযে দলেব পাঁচজনকে নিয়ে নিঃশব্দে তপু বাংলোয হানা দিল। ওই ছেলেব দল তখন একটা ঘবে মদেব বোতল খুলে বসেছে, আব ওই বড়লোকেব গুণ্ডা ছেলে অন্য একটা ঘবেব দবজায বিনাকে বশে আনতে চেষ্টা কবছে আব হুমকি দিচ্ছে, টুঁ-শব্দ কবলে বা কোনো বকম বাধা দিলে ওই ছেলেবা এসে তাকে

ধরবে এবং সে যা করার ওদের সামনে করবে।

তপুর দলের ছেলেরা নিঃশব্দে গিয়ে তার সঙ্গীদের ওপর চড়াও হলো। রিভলবার তুলে ইশারায় একেবারে বোবা হয়ে থাকতে হুকুম করল। তারা যমদূত দেখে হকচকিয়ে গিয়ে নির্বাক।

রিভলবার হাতে তপু সশব্দে দরজা খুলল, রিনার পরনে তখন কেবল শায়া, ছেঁড়াখোঁড়া শাড়িটা মাটিতে পড়ে আছে। সেই অবস্থাতেই ধস্তাধস্তি চলছে। রিনা মরিয়া হয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। চমকে সেই গুণ্ডা ছেলে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো, দু'হাত দূরে রিভলবার হাতে শমন দেখে স্থির।

...কিন্তু গণ্ডগোল করে ফেলল বিনা। আবার তাকে দেখে তপুও কয়েক মুহূর্তেব জন্য হত-চকিত। তারই মধ্যে রিনা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বাঁচাও বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেই কয়েক পলকেব সুযোগে ওই গুণ্ডা ছেলে পকেট থেকে রিভলবার বার করে তাক করল। রিনাকে ভয় দেখাবার জন্যেই ওটা সঙ্গে রেখেছিল বোধহয়। কিন্তু এতদিনে তপুর পিছনেও চোখ গজিয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। ওই বদমায়েশেব ভোগেব সাধ চিরদিনের জন্য মিটে গেল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে কে কাকে মারল ভেবে না পেয়ে সবাই ছুটে এলো। সেই ফাঁকে ওখানকার ফূর্তিবাজরা অন্ধকারে প্রাণের দায়ে দিশেহাবার মতো ছুটে পালালো। এবপব বাধ্য হয়ে রিনাকে নিয়ে তাদেবও গা-ঢাকা দিতে হয়েছে। মাঝের একদিন বাদ দিয়ে তার পরের দিন সমস্ত কাগজের প্রথম পাতায় খবর বেরুলো, চার বছর আগের নকশালপন্থী সমাজ বিরোধী আসামী তপন চ্যাটার্জী সদলে অতর্কিতে কলকাতার ওমুক জায়গা হানা দিয়ে রিনা নামে একটি অবিবাহিতা তরুণীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। জানা গেল সেখানেই তার ঘাঁটি ছিল। ওই পাড়ারই একটি তরুণ দল তাদের অন্য পাড়ার এক বন্ধুর গাড়িতে সেদিকে পিকনিকের উদ্দেশে গিয়েছিল। বিপদের আঁচ পেয়ে তারা ওই গাড়িব পিছু নেয় এবং ঘাঁটির সন্ধান পায়। মেয়েটিকে জঙ্গলে একটি পরিত্যক্ত পোড়ো বাংলোয় তোলা হয়েছিল। পিকনিকের দলটি হানা দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। তপন চ্যাটার্জী গুলি চালিয়ে গাড়ির মালিক বন্ধুটিকে হত্যা করার ফলে অন্যরা পালাতে বাধ্য হয় ইত্যাদি। মৃত ছেলেটির নাম সুধীর দত্ত, বয়েস আঠাশ। এক অবস্থাপন্ন পরিবারের দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ সন্তান।

...তপু রিনাকে তার বাপের কাছে যে ভাবে হোক পাঠাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রিনা একেবারে বেঁকে বসেছিল। সে আত্মহত্যা করবে তবু আর বাড়ি ফিরবে না। তপুকে বলেছে আমাকে বিয়ে কর, যে ভাবে রাখ আমি সেভাবেই থাকব। বাবার কাছে ফিরে গেলে ওই হায়নার দল আবার আমাকে ছিঁড়ে খাবে।

তপু হাসি মুখেই জেঠুকে বলেছে কলকাতায় থাকতেই রিনাকে তার ভালো লাগত। দূর থেকে দেখত। সামান্য আলাপ হবার পর আরো ভালো লেগেছিল। ওই গুণ্ডার দলকে কলকাতায় একবার টিট করার পর থেকে রিনাও তাকে শ্রদ্ধা করত।

প্রায় একটা বছর যে কি ভাবে কেটেছে ওরাই জানে। দল তো ভেঙেই

গেছে। কিন্তু গোপনে সাহায্য করার মতো অবস্থাপন্ন লোক ছিল। রিনাকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে ঠিক নেই। ফলে অনেক সময়েই সাহায্য পেতে দেরি হয়েছে। তখন এক বেলা খাওয়া জোটে নি এমন সমন দিনও গেছে। নাম ভাঁড়িয়ে প্রাইভেট টিউশানি যোগাড় করে ক'দিন না যেতে ভাঁওতা দিয়ে আগাম টাকা নিয়ে সরে পড়তে হয়েছে। তপু হেসে উঠল, কিন্তু বিয়ে করলে যে আবার সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ছেলে-পুলে আসার ঝামেলা পোহাতে হবে এ-কি আর হিসেবের মধ্যে ছিল! তাই বিস্ক নিয়ে তোমার কাছে না এসে কবি কি। মাযের কাছে রাখা যাবে না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের নজরে পড়বে। রিনাব বাবার তো এই অবস্থা, তার ওপর হারানো মেয়ে ফিরেছে জানাজানি হলে সেখানেও একই বিপদ। আপাতত সব দায় তোমাব ওপব চাপিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়ব...কিন্তু আমি বড ক্লান্ত জেঠু, অন্তত পাঁচ সাত দিনেব বিশ্রাম দরকার, ক'টা দিন সকলের চোখ থেকে আমাকে আগলে রাখতে পারবে না?

সমস্ত বাত অবধূত ছটফট কবেছেন আর পাযচাবি কবেছেন। বিছানায় গা পর্যন্ত দিতে পাবেন নি। পবদিন সকালে চা খেতে খেতে তপুকে বলেছেন, এখানে তোব লুকিয়ে থাকাব কোনোরকম চেষ্টা কবাবই দবকাব নেই। এখানে তোকে চেনে একমাত্র হারু তাকে সমঝে দিলে সে মুখ সেলাই করে থাকবে। আর কার্তিক নামে একটি ছেলে থাকে, সে জানবে তুই আমার নিকট আত্মীয, মধ্যপ্রদেশে থাকিস, দবকাবী কাজে বিদেশে চলে যেতে হচ্ছে বলে এখানে বউ রেখে যাচ্ছিস।

...বাড়িব মধ্যে লুকিয়ে চুবিযে থাকলেই বরং লোকেব সন্দেহ হবে। এটাই ভালো পরামর্শ মনে হলো তপুবও। কিন্তু ও ভেবে পাচ্ছিল না, জেঠু কথা যখন বলছিল, ওর মুখেব ওপর তার দৃষ্টিটা এমন স্থির ও তীক্ষ্ণ কেন? মুখ কপাল সব যেন ফালা-ফালা করে দেখার চেষ্টা। জিজ্ঞেস কবেছিল, কি হলো...?

—বোস আসছি। উঠে হাত-দেখাব বড ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে এলেন। কিন্তু হাত নয়, একাগ্র মনোযোগে ওটা কপালের কাছে এনে আগে কপাল দেখতে লাগলেন। দেখছেন তো দেখছেনই। শুধু কপাল কেন, নাক, কান, কানেব পিছন এমন কি গলা পর্যন্ত। সামনে বসে রিনাও হাঁ কবে দেখছে...৮ শ্বশুরের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে, দু'চোখ অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কপাল-মুখ দেখার পব তেমনি মনোযোগ দিয়ে হাত দেখতে লাগলেন। এক বাব জিজ্ঞেস করলেন, তোর ঠিক বয়েস এখন কত?

—একেবারে ঠিক তো বলতে পাবব না, চব্বিশ চলছে। হেসে উঠল, কিন্তু জেঠু রাগ কোব না—এসব আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।

অবধূতের পাথর মূর্তি।—তোর বিশ্বাসের দরকার নেই, আমি নিজের বিশ্বাসের কিছু খুঁজছি। এই দেখাব ঝোঁকে এক ঘণ্টারও বেশি কেটে গেল। অবধূত তাব পরেও গম্ভীর। কেবল পায়চারি করছেন। কপালে ঘাম। মাঝে মাঝে আরো দুই একবার তপুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চা নি তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র। তপু ধবেই নিল, শিগগীব তার ফাঁড়া-টাড়া অর্থাৎ ধবা পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা জেঠু তাই দেখছে। হয়তো তার বিবেচনায় ভালো দেখছে না বলেই এত উতলা এমন গম্ভীর।

কিন্তু তপু বেপরোয়া, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানেই তো কবে থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

কেবল কল্যাণী বুঝছেন। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন দেখছ?

—পরিষ্কার। আগে সাহস করে সেভাবে দেখি নি কখনো, কিন্তু এখন মনে হয় আগের থেকেও ঢের বেশি পরিষ্কার। কিছু সময়ের জন্য ঝামেলা তারপর সব পরিষ্কার, দীর্ঘ আয়ু...কেবল একটু শোকের চিহ্ন আছে, সেও ওর নিজের বা রিনার শরীরগত কিছু নয়। কোনো নিকট জনের কিছু হতে পারে।

...ইতি মধ্যে এক ফাঁকে তিনি রিনার হাত আর কপালও যত্ন করে দেখেছেন।

কল্যাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার নিজের দেখা আর বিশ্বাস নিশ্চয় ঠিক, শিবঠাকুর নিশ্চয় আর আমাদের বা বকুলকে কোনো বড় দুঃখের মধ্যে ফেলবেন না।

পেটো কার্তিক এসে দেখল এবং জানলো বাবার বাড়িতে আত্মীয় অতিথি এসেছে, তাকে ক'দিন রাতে বোসেদের বাড়িতে থাকতে হবে। স্ত্রী নিযে বাইবের ভক্তরা কেউ দু'পাঁচ দিন বাবার কাছে গেলেও তাকে রাতে বোসেদের বাড়িতে আস্তানা নিতে হয়। কিন্তু সে-জন্য নয় কার্তিক হতভম্ব আর উতলা বাবার মধ্যে একটা চাপা অস্থিরতা আর উত্তেজনা দেখে। আধফর্সা মুখ সর্বদা লাল, কোনো কাজে মন দিচ্ছেন না, কেবল ভাবছেন আর পায়চারি করছেন।

শনি মঙ্গলবার নয়, পর পর তিন রাত তিনি শ্মশানে কাটিয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে জীবনে তিনি এমন সমস্যার মধ্যে কখনো পড়েন নি। কেবল পায়চারি করেন আর ভাবেন! সন্ধ্যার পরেই শ্মশানে চলে যান। ঘাবড়ে গিয়ে কার্তিক মাতাজীকেই জিজ্ঞেস করেছে, মা বাবার হঠাৎ হলো কি—অসুখে পড়ে যাবেন যে!

মাতাজীও ভীষণ গম্ভীর। দু'কথায় জবাব দিয়েছেন, জানি না।

তপুও একটু অবাক হয়ে বলেছে, জেঠু যে আজকাল দেখি প্রায় শ্মশানচারী হয়ে পড়েছে—তিন বছরের ওপর বাইরে কাটিয়ে আসার পর থেকেই এ-রকম হয়েছে বুঝি?

কল্যাণী জবাব দেন নি।

সেই রাতে অবধূত রিনাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। সে আসতে হাসি মুখেই বললেন, বোস—।

রিনা কাছে বসে জিজ্ঞেস করল, আজ আপনার শ্মশান যাওয়া নেই?

—না, আজ আর না।...আমার শ্মশান যাওয়া নিয়ে তপু কিছু বলে-টলে নাকি?

—বলে এ-রকম করলে শরীর ভেঙে যাবে, বড়মা'র বাধা দেওয়া উচিত। ...আপনাকে যত ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে পৃথিবীতে এমন আর কাউকে না।

অবধূতের গলার স্বরে কৌতুক।—কি রকম?

রিনা হেসে জবাব দিল, বলে দেবতা-টেবতা জানিও না বিশ্বাসও করি না, নরদেবতায় বিশ্বাস করি—আমার কাছে জেঠু সেই দেবতা।

অবধূত হেসে উঠলেন, শুনে তোমার কি মনে হলো?

—আমারও তাই বিশ্বাস করতে ভালো লাগল।

সেই রাতেই অবধূত বেশ একটা মজার অনুষ্ঠান করলেন। নিজে বসে তপু

আব বিনাব আনুষ্ঠানিক বিযে দিলেন। বললেন, বিযেব খাওয়া কাল দুপুবে।

এক কল্যাণী ছাড়া আব কেউ জানেন না, শেষ বাতে উঠে অবধূত নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরুলেন। যাতাযাতেব ট্যাক্সি ভাড়া কবাই ছিল, ট্যাক্সি যেখানে অপেক্ষা কবাব কথা সেখানেই অপেক্ষা কবছে। সকাল পাঁচটাব মধ্যে তিনি এসে দবজাব কড়া নেড়ে বকুলেব ঘুম ভাঙালেন।—এই সময়ে বকুল তাঁকে দেখে বিষম চমকে উঠেছিল। অবধূত ভিতবে এসে বসলেন না, কেবল বললেন কোনো ভয নেই, তপু এসেছে, আমার কাছে আছে আজই চলে যাবে, তুমি খেয়ে দেয়ে বেলা একটা দেডটাব মধ্যে চুপচাপ কোন্নগবে আমাব বাড়ি চলে যাবে—এখন আব কোনো কথা নয, আমাকে একটা দবকাবে কাজে এক্ষুনি এক জাযগায যেতে হবে।

বকুল বিমূঢেব মতো দাঁড়িযে। অবধূত বেবিযে এসে আবাব ট্যাক্সিতে উঠলেন। সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রীটে তাঁব এক জাঁদবেল পুলিশ অফিসাবেব কোযার্টার্স-এ। তাব বদ্ধ পাগল মেযেকে তিনি ভালো কবেছিলেন। সেই থেকে ওই পবিবাবটি তাঁব বিশেষ ভক্ত এবং অনুগত।

তাঁকেও ঘুম ভাঙিযে তোলা হলো। অবধূত তাঁব সঙ্গে প্রায এক ঘণ্টা কথা বলে ভোব সাড়ে ছ'টাব মধ্যে আবাব ট্যাক্সিতে।

সাড়ে আটটাব মধ্যে একবাশ বাজাব কবে আবাব কোন্নগবে নিজেব বাড়িতে। তপু আব বিনা ভাবল জেঠু এই বাজাব কবতেই সকালসকাল বেবিযেছিল। পেটো কার্তিকও তাই ভেবেছে।

খুব ফূর্তিব মধ্যেই দুপুবেব খাওযা-দাওযা শেষ হলো। খানিক বাদেই তপু আব বিনা—হতবাক। কলকাতা থেকে বকুল-মা এসে হাজিব। তপু আকাশ থেকে পড়ল, মা তুমি এখানে, এ কি কাণ্ড। বকুলও তেমনি অবাক। হকচকিযে গিযে বলল, কেন, দাদা যে সকালে নিজে গিযে তুই এসেছিস বলে আমাকে আসাব কথা বলে এলেন।

অবধূত হেসে তাদেব নিবস্ত কবলেন, এ-সব নিযে পোস্টমর্টেমেব দবকাব নেই--বকু, এই তোমাব ছেলেব বউ বিনা, দ্যাখ কি মিষ্টি মেযে?

বকুল আবাবও বিমূঢ়।

বিকেল চাবটেব মধ্যে শুধু বাড়িব লোক কেন, পাড়াশুদ্ধু হতচকিত। অবধূতের বাড়ি পুলিশে ঘেবাও কবেছে। বিভলবাব উঁচিযে পাঁচজন পদস্থ কর্মচাবী এসে তপুকে হাত-কড়া পবিযে গ্রেপ্তাব কবল। আব সকলেই হতভম্বেব মতো দেখল, তাদেবও যে ওপবওলা তিনি অবধূতেব পাযে মাথা ঠেকিযে প্রণাম কবলেন।

নির্বাক নিস্পন্দ সকলে। বকুল আব বিনা থব-থব কবে কাঁপছে। তাবা বিবর্ণ পাংশু। তপুই সকলেব আগে ব্যাপাব বুঝেছে। দুচোখে গলগল কবে ঘৃণা ঠিকবোচ্ছে। পৃথিবীব আব যে-কেউ এমন বিশ্বাসঘাতকতা কবলে এত বজ্রাহত হতো না, এত ঘৃণা কবত না। সেই ঘৃণাব আগুন শুধু চোখে নয, গলা দিযেও ঠিকবোচ্ছে। —তুমি? তুমি? তুমি এ-কাজ কবেছ তাহলে? এই জন্যেই ভোব না হতে তোমাব কলকাতায ছোটা দবকাব হযেছিল? আমাব মা-কেও এমন দৃশ্য দেখাবাব লোভ সামলাতে পাব নি?

তাকে তুলে নিয়ে যাবার আগে আরো বলেছে। বলেছে, কাউকে হত্যা করার জন্য আমি কখনো অস্ত্র হাতে তুলি নি, কেবল দুজনের প্রাণ বাঁচাতে একটা খুন করেছি—কিন্তু জেনে রেখে দাও যদি আমার ফাঁসি না হয় আর যদি আমি কখনো ফিরি আর তোমার ঈশ্বর যদি ততদিন বাঁচিয়ে রাখে—খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমি আর একটা হত্যা করব...সেদিন কোন্ ইষ্ট তোমাকে রক্ষা করতে পারে আমি দেখব।

তপুকে নিয়ে ওরা চলে গেল।

থুপ করে একটা শব্দ হতে সকলে সচকিত হয়ে দেখে রিনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অবধূতই আগে ছুটে এসে তাকে তুলে ধরতে গিযে বাধা পেলেন। বিকৃত গলায় বকুল বলে উঠল, ও যেমন আছে থাক, আপনি আগে বলুন তপ এ কি বলে গেল—যা বলে গেল তা ঠিক কিনা?

বজ্র-গম্ভীর ধমকের সুরে অবধূত বলে উঠলেন, সেটা জানতে বুঝতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে—আমি কেন কি করেছি এই স্নায়ু নিযে বোঝা তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়। পেটো কার্তিকের দিকে তাকিয়ে হুংকাব ছাড়লেন, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, জল নিয়ে আয়!

ওই মুখের দিকে চেয়ে বুকল বিহ্বল বিভ্রান্ত। বাবার এই মূর্তি কার্তিকও কখনো দেখে নি। সে উর্ধ্বশ্বাসে জল আনতে ছুটল।

রিনা ঠাকুরঘরে শুয়ে আছে, কল্যাণীর কোলে তাব মাথা। জলেব ঝাপটায় জ্ঞান ফিরতে অবধূতের ইশারায় কল্যাণী তাকে এ-ঘরে নিযে এসেছে। তার বিমূঢ় দৃষ্টি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে কেবল ভযংকর বকমেব দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছে একটা।

অবধূত শোবার ঘরে গেছলেন, একটু বাদে ফিবে এলেন। থমথমে মুখ, ঘরে পাড়ার দু'একজন মহিলা ছিল। তাঁদেব বললেন, আপনাবা এখন বাইবে যান মা, আমার এ-ঘরে একটু কাজ আছে। তাঁরা তক্ষুনি চলে গেলেন। অবধূত পেটো কার্তিক আর হারুকেও চলে যেতে বললেন। তাবপর দু'হাত কোমবে তুলে ঝুঁকে বিনাব দিকে তাকালেন। খুব কোমল গলায বললেন, একটু ভালো বোধ কবছিস তো মা...? তোর বড় মায়ের ঠাকুর ঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি কি এমন কিছু কবতে পারি যাতে তপুর—আমাদের একমাত্র বংশধরের এতটুকু ক্ষতি হয়—এর পরের ম্যাজিক তোকে আর তোর শাশুড়িকে যদি আমি না দেখাতে পারি, তাহলে এই দ্যাখ, এটা চিনিস?

রিনার মুখে কথা নেই। চিনেছে। তপুর সেই রিভলবার। বকুল বিস্ফাবিত নেত্রে চেয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে অবধূত বললেন, এটা তোমার ছেলের, তপু আমাকে রাখতে দিয়েছিল, গুলিও আছে।...শোনো বকুল, রিনা শোন্—আমি যা করেছি সেটাই যদি তপুর বাঁচার একমাত্র পথ না হয়, খুব শিগগীরই সমস্ত অপরাধের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলে সুস্থ জীবনের পথ ধরে তোমাদের কাছে ফিরে না আসে—তাহলে এই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার মহাগুরুর নাম নিয়ে শপথ করছি—আমার জীবনের সমস্ত শিক্ষা ভুল জেনে তপুর দেওয়া এই জিনিস দিয়েই আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

কবব। তীব্র চোখে কল্যাণীব দিকে তাকালেন, তুমি কি বলো? ওদের শুনিয়ে দাও--আমাব এ শপথ তুমিও মেনে নেবে কি নেবে না?

কল্যাণী স্থিব চোখে তাঁব দিকে তাকালেন। বললেন, মেনে না নিতে বাধা কোথায, তুমিও জানো আমিও জানি এ-শপথ বক্ষা কবাব দবকাব হবে না। গুরুব আদেশ যা পেয়েছ তা মিথ্যা হতে পাবে না।

বিনা আস্তে আস্তে উঠে বসল। সে বা বকুল কেউ কিছু বুঝছে না। এই দু'জনেব মুখেব দিকে চেযে বুকেব তলায কি যেন একটু আশাব মতো উঁকিঝুকি দিচ্ছে।

অবধূত নিজেও আস্তে আস্তে তাদেব সামনে মেঝেতে বসলেন। বললেন, আমি যা কবেছি তা না কবলে শেযাল কুকুবেব মতো তপুকে যাবা তাড়া কবে বেড়াচ্ছে, তাদেব কাবো গুলিতে খুব শিগগীবই তাব মৃত মুখ আমাদেব দেখতে হতো, মা হযে তোমাকে বা জ্যাঠা হযে আমাকে তাব মুখাগ্নি কবতে হতো।

গলা দিযে অস্ফুট একটা আর্ত শব্দ বাব কবে বকুল শিউবে উঠল।

অবধূত বলে গেলেন, ওই বিনাকে জিজ্ঞেস কবো কি যন্ত্রণা আব উদবেগ নিযে আমি তপুব আব ওব কপাল দেখেছি আব হাত দেখেছি। কেউ যেন তপুব সমূহ একটা ফাঁড়া আমাকে চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিযেছে। প্রাণঘাতী ফাঁড়া, কিন্তু আবাব সেটা পবিষ্কাব হযে যাবাব লক্ষণও স্পষ্ট। তাবপব সুস্থ সুন্দব লম্বা স্বাভাবিক জীবন। বিনাব হাত বা কপালেও কোনোবকম বৈধ্যব্যেব বা দীর্ঘদিন স্বামীব কাবণে দুর্ভোগেব চিহ্ন নেই। যা আছে সেটা সামযিক, বড জোব পাঁচ ছ'ছবেব। ...একটু বাদেই বুঝলাম, কি হলে বা কি কবলে এমন একটা ফাঁড়া কেটে যেতে পাবে। ও ধবা দিলে পুলিশেব হাতে গুলি খেযে মবাব ভয নেই। আব যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডও ওব হতে পাবে না, তাহলে সুস্থ সুন্দব লম্বা স্বাভাবিক জীবন যাপনেব এমনসব স্পষ্ট চিহ্ন থাকত না।

...ক'টা দিন আমাব কি যে সংকট গেছে তোমবা জানো না। যদি আমাব বিচাবে ভুল হয তাহলে সর্বনাশ, আব ভুলেব ভযে যদি চুপ কবে বসে থাকি তাহলে আবো সর্বনাশ। তপু বিনা দুজনেই জানে তিন-তিনটে বাত এবপব আমি শ্মশানে কাটিযেছি। আমাব মহাভৈববগুরুব কাছে ভৈববী মাযেব কাছে আকুল হযে প্রার্থনা কবেছি, আমাব মন স্থিব কবে দাও, আমাব দৃষ্টি আবো মুক্ত কবে দাও--আমাব সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিযে আমাকে শুধু সত্য দেখাব শক্তি দাও। তাই তাঁবা দিযেছেন। নিজেব ভিতবে থেকেই গুরুব গলা কানে এসেছে, হতভাগা দেবি কবছিস কেন—আযু আছে তবু ছেলেটা বেঘোবে মববে। ও ছেলে নিষ্পাপ ওব ক্ষতি কে কববে—কেবল কল্যাণীকে সব বলেছি। সে-ও আমাব সঙ্গে একমত। বলেছে ভুল হতে পাবে না, তুমি যা কবাব কবো।

...কাল বাতে ওদেব আমি নিজেব মনেব মতো কবে বিযে দিযেছি। বাত থাকতে উঠে ট্যাক্সি নিযে তোমাব কাছে চলে গেছি। সেখান থেকে আমার ভক্ত এই মস্ত পুলিশ অফিসাবেব কাছে গেছি। তাঁকে কেবল একটু অনুবোধ কবেছি; লক-আপে তপুব ওপব যাতে কোনো বকম অত্যাচাব না হয সে দাযিত্ব তাঁকে

নিতে হবে। সব শোনার পর তাঁরও মনে আশঙ্কা। জিজ্ঞেস করেছেন, ফাঁসী না হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে না আপনি ঠিক জানেন?

বলেছি ঠিক জানি।

এর পরের অধ্যায় কিছুটা গতানুগতিক। অবধূত একদিনের জন্যও কোর্টে যান নি। আসামী তপন চ্যাটার্জীকে বুঝতেও দ্যান নি, তার হয়ে সওয়াল করার জন্য এমন একজন নামজাদা উকিল কে দিলে—কে এমন জলের মতো টাকা খরচ করছে। নিজের উকিলকেই সে এ-কথা জিজ্ঞেস করেছিল। উনি বলেছেন, তপুরই একজন মস্ত বড়লোক বন্ধুর বাবা—নাম বলতে বাধা আছে। তপু অবিশ্বাস করে নি, আঁচও করেছে কে হতে পারে, এ-রকম একজন বিরাট অবস্থাপন্ন বন্ধু তার আছে—মা তাকে জানে—মাযের চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে খুনের কোনো অভিযোগই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। বাপের বাড়ির পাড়ার যে ছেলেরা মৃত গুণ্ডা সুধীর দত্তর দল থেকে রিনাকে অপহরণ করেছিল, পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়ে কোর্টে টেনে এনেছে। রিনা তাদের সনাক্ত করেছে। অবধূতের পুলিশ অফিসারের দাপটে তাদের হৃৎকম্প। কোর্টে তাবা অপরাধ স্বীকার করেছে। জেরায় পড়ে সুধীর দত্ত আরো কিছু কুকার্য ফাঁস করে দিয়েছে। তপুব উকিল এটাও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন যে আত্মরক্ষা আর রিনাকে বক্ষা করার জন্যই তপন চ্যাটার্জি সুধীর দত্তকে গুলি কবতে বাধ্য হয়েছিল। রিনা শান্ত মুখে সুন্দর সাক্ষী দি.যছে।

তপন চ্যাটার্জী শেষ পর্যন্ত খুনের দায় থেকে বক্ষা পেল বটে। আর পুলিশেব ভক্ত অফিসারটিব চেষ্টায় নক্সালের ছাপটাও উবে গেল। সমাজবিরোধীর কার্যকলাপ আর লুঠতবাজের অভিযোগ খণ্ডন করা গেল না। বিচাবের দায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হলো।

তাকে ভ্যানে তোলার সময় ব্যাকুল মুখে যতটা সম্ভব ভিড ঠেলে সামনে গেছল। তপু চেঁচিয়ে বলেছে, মা জেঠুকে এবাব তৈরি থাকতে বোলো। মা আর রিনার প্রতিক্রিয়া বোঝার আগেই পুলিশ তাকে ভ্যানে টেনে তুলেছে।

বকুল এরপর অনেকবার অনুনয় করে বলেছে, দাদা, তপুর সঙ্গে আমার একবার দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন, সব বলে তো ওব ভুল ভাঙাতে হবে।

অবধূত হাসি মুখে তাকে নিরস্ত করেছেন।—কিচ্ছু দবকার নেই, সময়ে সব হবে। পাঁচ বছরের জন্য আমার ওপর তোমরা ওকে জ্বলতে দাও, আখেবে তাতে দু'তরফেরই লাভ বই লোকসান হবে না।

বকুল আর রিনা তাঁর এ-কথা আদেশ বলেই মেনে নিয়েছে।

অবধূত শাশুড়ী-বউযের থাকার জন্য সেই বড় পুলিশ অফিসার ভক্তর মারফৎ ভালো একটা ফ্ল্যাটও যোগাড় করেছেন। রিনার সন্তান কোন্ নার্সিং হোমে হবে, কোন্ ডাক্তার দেখবে সে-সব ব্যবস্থাও তিনি নিজে কবেছেন। তাঁর কথায় বকুল জলের দরে তার শেলাইয়ের দোকান বিক্রি করে দিয়েছে। অবিশ্বাসের আর ঠাঁই কোথায়? দাদা বলেছেন, জেল থেকে বেরুলেই তপুকে হরিদ্বার আর দেরাদুনে

গিয়ে সকলকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকতে হবে—তপুর জন্য সেখানে একটা ভালো কাজ তিনি ঠিক করেই রেখেছেন। না কলকাতায় বা কোথাও কোনো রকম রাজনীতির হাওয়ার মধ্যে তপুকে তিনি আর রাখবেন না। আপাতত সব খরচ তাঁর।

...তপুর জন্য উনি হরিদ্বার আর দেরাদুনে ভালো কাজ ঠিক করে রেখেছেন তা-ও বক্রেশ্বরে মহাভৈরব বাবার ডেরায় বসেই শুনেছি। আজ নয়, বহু বছর আগেই, তপুর যখন মাত্র ষোলো সতেরো বছর বয়েস—তখন থেকেই এ সংকল্প তাঁর মাথায় ছিল। তপু ওই বয়সে নকশালদের সঙ্গে আর আরো কাদের সঙ্গে মিশছে শোনার পব থেকেই তাঁর দুশ্চিন্তা। তখনই ঠিক করেছিলেন ওকে কলকাতায় রাখবেন না। কিন্তু তখনো প্ল্যান কিছু ঠিক হয়নি। সেই সময় হরিদ্বারের ভক্ত পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী—বাবার দয়ায় যার সেখানে এখন তিন-তিনটে হোটেল—সে দেখা কবতে এসেছিল। কথায় কথায় ভাইপোব কথা শুনে সেই সোৎসাহে প্রস্তাব দিয়েছিল, তার হাতে ছেড়ে দিলে ওই ভাইপোর দায়িত্ব সে নেবে। পাঁচ-সাত বছর শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে সব কটা হোটেলেব জন্য একজন জেনারেল ম্যানেজার পোস্ট করে তাকে বসিয়ে দেবে। বাবার ভাইপোকে পেলে সে বর্তে যাবে।..

তপুর বিচারেব রায় বেরুবার পর পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে অবধূত তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠি পেয়েই সে সানন্দে জবাব দিয়েছে, আগের ব্যবস্থা তো ঠিক আগেই। এখন সে দেরাদুনেও একটা আধুনিক হোটেল করার কথা ভাবছে। বাবার ভাইপোকে পেলে যে নির্দ্বিধায় সেটা করবে আর সব কটা হোটেলের জেনারেল ম্যানেজারের পদে তাকে বসিয়ে দেওয়া ছাড়াও দেরাদুন হোটেলের চার আনার লাভের অংশও লিখে দেবে। বাবা সত্বব ভাইপোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, বিশ্বস্ত আপনারজনের তাব বড অভাব। ফলে ভাইপোর সম্পর্কে অবধূত তাকে আবার বিস্তারিত লিখেছেন। তার উত্তবে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী জানিয়েছে, বাবার ইচ্ছেই তাঁর কাছে আদেশ—সে অপেক্ষা করবে।

একটু হেসে অবধূত বলেছিলেন, মানুষের মন কোথায় নামে আবার কত ওপবেও ওঠে দেখুন।...মাস ছয় আগে পুরুষোত্তম হরিদ্বার থেকে কোন্নগরে এসে হাজিব। ভাইপোকে নেবার তাগিদ আমার থেকে তাব বে[illegible]। তার সব ব্যবস্থা পাকা, দেরাদুনে জমি কিনে আধুনিক হোটেলেব বাড়ির কাজও শুরু হয়ে গেছে—আমার ভাইপোর অপেক্ষায় এখন সে উন্মুখ হয়ে আছে....আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত মাইনে দেবে? তাইতেই ঘাবড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে চলেছে, ভেবেছিলাম শুরুতে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেব, আর বছরে নতুন হোটেলের চার আনা অংশ...তবে বাবা যদি আরো বাড়াতে বলেন, আমি সেটাই ঠিক ধরে নেব। আমিই উল্টে লজ্জা পেয়েছি, তুমি যা ভেবেছ সেটা ঠিকের থেকেও অনেক বেশি।

...রিনার একটি মেয়ে হয়েছে। এখন সাড়ে চার বছর বয়েস। বেশ ফুটফুটে মেয়ে শুনলাম।

এরপর কেবল সেই দিনটির প্রতীক্ষা সকলের। তপুর জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতীক্ষা।

মনের তলায় আর কোনো রকম উৎকণ্ঠা বা উদবেগ ছিল না। কেবল এমন এক জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক দেখার জন্য ভিতরটা উন্মুখ হয়ে ছিল।

বক্রেশ্বর থেকে দুদিন আগেই ফিরেছি আমরা। যদিও অবধূত জানতেন তপু নির্দিষ্ট দিনের আগে ছাড়া পাবার কোনো তদ্‌বিরই করবে না। তাঁর দিক থেকে আরো দুটো দিন থেকে যাবার সদয় আমন্ত্রণ আসবেই জানতাম। বলেছেন, আরো দুটো দিন থেকে শেষ দেখে যান, তপুটার জন্য আপনাকেও কটা দিন কাছে পেলাম।

কাছে পাওয়ার আনন্দ তাঁর বেশি কি আমার সে-কথা আর তুললাম না। আমি সানন্দে রাজি।

সেই দিন এলো। আমি আর অবধূত সামনের বারান্দায় বসে। কল্যাণী মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন আবার কাজে চলে যাচ্ছেন। পেটো কার্তিক ঘন ঘন ঘব বার করছে, আর চাপা উত্তেজনায় এক-একবার আমাদের দিকে থমকে থমকে তাকাচ্ছে। সকালে এখানে এসেই বলেছে, দোকানে বলে এসেছি আমি আজ যাচ্ছি না—

অবধূত জিজ্ঞেস করেছেন, কেন আজ কি?

—আজ আপনার জামার পকেটে ওই বিভলবার কেন?

—আমার পকেটে রিভলবার বলে তুই দোকান কামাই কববি?

—হুঁঃ, আপনার পকেটে রিভলবার জানলে তামাম কোন্নগবেব লোক দোকান-পাট বন্ধ করে এখানে ছুটে আসবে।

অবধূত বলে উঠেছেন, ও বাবা অত দরকার নেই, আমাকে রক্ষা করার জন্য তুই একলা থাকলেই যথেষ্ট।

আমাদের হাব-ভাব দেখেই হয়তো কার্তিকের মনে এখন খুব একটা দুর্ভাবনা নেই।...কিন্তু পুলিশে ধরিয়ে দেবার ফলে যে আত্মীয় বলে গেছে জেল থেকে বেঁচে বেরুতে পারলে তার প্রথম কাজ হবে বাবাকে খুন কবা—সেই লোক আজ জেল-ফেরত এখানে আসছে—কার্তিক উত্তেজনা চেপে রাখে কি করে? তাছাড়া বাবাব কাণ্ডর কি কোনো কিছু বোঝার উপায় আছে—এই দিনে তাঁর পকেটেব ভাবী জিনিসটা যে রিভলবার সে কি ও জানে না।

পৌনে দশটায় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। নিজের অগোচরে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। পেটো কার্তিক গেটের সামনে। গাড়ি থামার আওয়াজ পেয়ে কল্যাণীও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। অবধূত চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছেন।

প্রথমে নাতনীর হাত ধরে বকুল নামল। তারপর রিনা। শেষে তপন—তপু।

আমি দেখছি। দোহারা লম্বা মিষ্টি চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধিব ছাপ। দূর থেকে তার দৃষ্টি চেয়ারে বসা জেঠুর দিকে।

পেটো কার্তিক তাড়াতাড়ি বাঁশের গেটটা খুলে দিল।

ওরা এলো। একে একে দাওয়ায় উঠল। অবধূত এইবার উঠে দাঁড়ালেন। নাতনীর হাত ছেড়ে প্রথম বকুল অবধূতের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তারপর রিনা।

তপু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে অবধূত তার দিকে এগিয়ে দিলেন। গম্ভীর।
—নে, লোড করা আছে।

তপু থমকে দাঁড়ালো। অপলক চেয়ে রইল খানিক। অবধূতও। একটা উদ্গত অনুভূতি দমন করতে না পেরে তপু তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। দু পা জড়িয়ে ধরে কপাল ঘষতে লাগল।

অবধূত মিটি মিটি হাসছেন।—দিনেবেলায় সকলের চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চলে আসতে তাহলে ভালোই লাগছে বলছিস?

...এমন এক দৃশ্য দেখার ভাগ্য কি জীবনে বেশি আসে? বকুলের চোখে জল। রিনার চোখে জল। পেটো কার্তিকের চোখের কোণও চিকচিক করছে। কেবল কল্যাণী অল্প অল্প হাসছেন আব তপুর দিকে চেয়ে আছেন। আর অবধূত হাসছেন আর তপুকে দেখছেন।

তপু তখনো অবধূতেব পায়ে কপাল ঘষছে।

আরো একটা বছর ঘুবেছে। তাব মধ্যে প্রথম ছমাসে অবধূতের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয নি, ফোনে দু চারবার কথা হযেছে। কয়েক ঘণ্টার জন্য পেটো কার্তিক একবার এসেছিল। কলকাতায় কি কাজ পড়েছিল সময় করে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেছল। তখন খুবই বিমর্ষ দেখেছি ওকে। বলেছে, বাবা আর মাতাজী কিছু একটা মতলবে আছেন সার...আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কোন্নগরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কোথাকার সাধুরা আসছে—কোনো সন্তব-টন্তের হবে কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বাবার ধমক, তোর সবই জানতে হবে তার কি মানে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ মাতাজী তাঁব ব্যাঙ্ক থেকে আমার আর সুষমার নামে চল্লিশ হাজাব টাকা ট্রান্সফাব করে বসলেন, আর হারুর নামে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেন—এ-সব কি ব্যাপার বলুন তো, আমার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে—

বলেছি, সুখবর তো, অস্বস্তির কি আছে। তাছাড়া টাকা থাকলে সময়ে বিলি ব্যবস্থা করাই তো উচিত।

কিন্তু এ-কথায় পেটো কার্তিকের দুশ্চিন্তা লাঘব হয় নি।

...আমারই কি হয়েছে?

গেলবারেব কালীপুজোর রাতে কথায কথায় ভদ্রলোক বলেছিলেন, তাঁর একটি কর্মের গাছে কোন ফল ধরে—বিষফল না অমৃত, তাই দেখার প্রতীক্ষাতে বসে আছেন। যে-ভাবে বলেছিলেন মনে হয়েছে তারপরেই তাঁর কাজ শেষ—ছুটি। অমৃতফলই যে ধরেছে, এক দুখিনী মা তার ছেলে পেয়েছে, জীবন-যুদ্ধে জর্জরিত এক মেয়ে নির্ভর হবার মতো স্বামী পেয়েছে।...তারপর থেকেই আমার মনের তলায় একটা অনাগত শংকা থিতিয়ে ছিল। যাঁকে অনেক ভাগ্যে হঠাৎ পেয়েছি তাঁকে হঠাৎই হারানোর শংকা।

এবারে অবধূতের বাড়িতে আর কালীপুজো হয় নি। কর্ত্রী নেই, কর্তা নেই,

কে কববে কালীপুজো? বছবেব পবেব ছমাস ধবেই তাঁদেব বাড়ি তালাবন্ধ।...তাঁবা নিরুদ্দেশেব পথে যাত্রী হযেছেন এ-রকম চিন্তা অবশ্য তখন ছিল না। আমাব বা পেটো কার্তিক কাবোবই না। কাবণ তাব বাবা-মা দুজনেই দেবাদুন ছুটেছিলেন তপুব মেযেটাব মাবাত্মক অসুখেব খবব পেযে। বকুল আব বিনা কাকুতি-মিনতি কবে ওঁদেব লিখেছিলেন পত্র পাঠ চলে আসতে—তাঁবা না এলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁদেব দুজনকেই ছুটতে হযেছে। মাস তিনেক পর্যন্ত তিনখানা কবে চিঠি লিখে কার্তিক হযতো একখানা চিঠিব জবাব পেযেছে—তপুব মেযেব খবব ভালো নয, এখন নডতে পাবছে না, কবে পাববে তা-ও জানেন না। পেটো কার্তিক এসে অভিমান ভবে আমাকে খববটা জানিযে গেছে। বলেছে, আত্মীয এমনই জিনিস সাব, যে-মাতাজী কোথাও নডেন না তিনিও আত্মীযেব টানে তিন মাস ধবে ঘব-বাড়ি ছেড়ে বসে আছেন।...না, তপুব মেযেব কি অসুখ কি বৃত্তান্ত বাবা সে সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি।

..আবো তিন মাস বাদে পেটো কার্তিক একদিন আমাব কাছে এসে হাউমাউ কবে কেঁদেছে। বাবাব কাছে চিঠি লিখে-লিখে জবাব না পেযে ও পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীকে লিখেছিল। তাব জবাব এসেছে। বাবা আব মাতাজী তিন মাস যাবৎ দেবাদুন বা হবিদ্বাবে নেই। তাব ধাবণা ছিল তপুবাবুব মেযেটি মাবা যাবাব পবে তাঁবা কোন্নগবেই ফিবে গেছেন।

শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম। কাবণ কি একটা শোনা কথা যেন কানে বাজছে। ...হ্যাঁ কংকালমালী মহাভৈববেব ডেবাব দাওযায় বসে অবধূতই বলেছিলেন। তপুব প্রসঙ্গে অমন সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত নেবাব আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওব কপাল আব হাত দেখাব কথা।...মনে হযেছিল, আগেব থেকেও ঢেব বেশি পবিষ্কাব। কিছু সমযেব জন্য ঝামেলা তাবপব সব পবিষ্কাব—সুস্থ জীবন, দীর্ঘ আয়ু কেবল একটু শোকেব চিহ্ন আছে...কোনো নিকটজনেব কিছু হতে পাবে। হ্যাঁ এ-কথাই অবধূত বলেছেন, তখনকাব উত্তেজনা আব দুশ্চিন্তায সেই নিকটজন কে হতে পাবে তা নিযে অবধূত মাথা ঘামান নি।

উত্তবকাশী
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৯১

প্রীতিভাজনেষু,

এখানে একটি বাগদেবীব পুজো অনুষ্ঠান শুরু হযেছে। জনাকতক নবীন-প্রবীণ সাধু আর জনাকতক বাঙালী অবাঙালীব আড়ম্ববশূন্য ছোট ব্যাপাব দাঁড়িযে দেখছিলাম। বড ভালো লাগছিল। হঠাৎ এই দিনে আপনাকেই কেন মনে পডল জানি না। আমাব সাময়িক আবাস অর্থাৎ চালা-ঘবে ফিবে এসে লিখতে বসলাম। এখনো এখানে বেশ শীত, আমাব বসনা ভালো জিনিস পেলে এখনো সিক্ত হয় জেনেই বোধহয কল্যাণী সুগন্ধ আতপ, মুগেব ডাল আব নানাবিধ আনাজ সেদ্ধ সহযোগে কাঁচা উনুনে কিছু চাপিয়েছে। লিখতে বসে বেশ সুঘ্রাণ নাকে আসছে। হঠাৎ একটু টিপ্পনীব

সুর শুনলাম। এখনো আবার পিছু টান কেন...কাকে?

কলম থামিয়ে তাকালাম। আমি তো মশাই লেখক বা কবি-টবি নই, তার ওপর কল্যাণীর এখন আমাকে মনের ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প—তাই আপনাদের সংসার সর্বস্ব মানুষের মতো ভালো লাগাটা আমার উচিত নয়। কিন্তু কি করব, কল্যাণীর স্নান-সাবা, পিঠে খোলা চুল ছড়ানো স্নিগ্ধ মূর্তিটি বড় ভালো লাগল—হাতে আবাব খিচুড়ি নাড়ার খুন্তি গোছের একটা কি। শিশির-ছোঁয়া তাজা যুঁই ফুলের মতো লাগছিল ওকে। আপনি হলে আবো ভালো উপমা দিতে পারতেন। বললাম, কাকে লিখছি!

শুনে আক্ষেপসূচক মিষ্টি বাক্য—আ-হা, ভদ্রলোক হয়তো খুব ভাবছেন আমাদের জন্য—লেখো।

বুঝুন, পিছু-টান নাকি কেবল আমাব।

ওপরেব ঠিকানা দেখে হয়তো অবাক হচ্ছেন। কিন্তু এই বাতেব পর থেকে এ-টুকুর হদিস দেবার সুযোগও হয়তো আর থাকবে না। কাবণ কাল সকাল থেকেই আমবা গর-ঠিকানাব পথ-যাত্রী। কল্যাণীর বিবেচনায যে-পথের শেষ মনেব ঘরে। লোকে বলে কর্তাব ইচ্ছেয কর্ম। আমাব হয়েছে কর্ত্রীব ইচ্ছেয কর্ম।

কয়েক জাযগায ঘুরে মাস দেড়েক হলো এখানে এসেছি। কল্যাণীব পিছু-টান নেই, কিন্তু শীতেব ভযে আমাব শবীবেব জন্য চিন্তা আছে। হঠাৎ বেশি শীত এখন আর তেমন বরদাস্ত কবতে পাবি না। তাই এখানে এসে সাময়িক বিরতি। কল্যাণীব দৃঢ় বিশ্বাস, আস্তে আস্তে সইযে নিতে পারলে আমাব এই দেহটাকেই সে আবাব পঞ্চতপ অথবা তাপ সহনযোগ্য কবে তুলতে পাববে।

তপুব অমন ফুটফুটে সুন্দব মেযেটা বাঁচল না। লিউকিমিযা হয়েছিল। বকুল আব বিনা ভেবেছিল আমবা গিযে অসাধ্য-সাধন কবতে পারব! কিন্তু ঘটনার সাজ তো আমবা সাজাই না আব যা কবাব করেও অন্য কেউ—আমাদেব ক্ষমতা কতটুকু বলুন তো? তবু প্রাণ-পণ চেষ্টা আমি করেছিলাম, কল্যাণীর চেষ্টার বীতি জানি না—কিন্তু এ-টুকু জানি চেষ্টা সে-ও কবেছিল। কিন্তু যা হবার যই গেল। মাঝখান থেকে যে-টুকু জানি বলে গর্ব সেটাই বেদনার কাবণ হয়ে উঠল। আপনাব মনে আছে, তপুব কপাল দেখে দেখে আমাব মনে হযেছিল, শুধু কাবো বিয়োগজনিত একটা শোকেব চিহ্ন ছাড়া ভবিষ্যত জীবনে ওর আর দুর্দৈব কিছু নেই।...তখন ভাবি নি, কিন্তু মুনিযাব অসুখেব খবব পেযে এখানে এসে স্পষ্ট বুঝলাম তপুব কপালে আর হাতে কোন শোকেব চিহ্ন। তখন কেবলই মনে হলো, আমাদের আগে থেকে এই জানাব শক্তিটা অভিশাপ ছাড়া আব কিছু নয়। যে সাজায যে ঘটায় আগে ভাগে এই জানাটা যে তাব অভিপ্রেত নয়, এ নিজের বুকের তলার যন্ত্রণা দিয়ে যেমন বুঝেছি তেমন আব কখনো বুঝি নি। যাক, মন খারাপ করবেন না, আমার বিদ্যার এটুকুই সান্ত্বনা যে আমি ে ও জানি, আবারও ওদের ছেলেমেয়ে হবে—ওরা সুখে থাকবে।

...আচ্ছা মনের ঘরটা কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? কোন্নগরে থাকতেও কল্যাণী প্রায়ই তাগিদ দিত, এবারে মনের ঘরের দিকে পা-বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হও, আর

বেশিদিন না কিন্তু। আমি ভেবে পাই নি সেটা কোন্ দিকে কোন্ পথে। এই পৃথিবী তার আকাশ বাতাস ফুল ফল জল মাটি—আমার তো খুব ভালো লাগে। এখান থেকে আরো ভালো মনের ঘর আর কোথায় পাব? কল্যাণী হাসে, বলে, ওই যে সব-সময় তোমার এক খোঁজ—কে ঘটায় কে সাজায় কে করে—তাঁর হদিস পেতে হলে তোমাকে সব-দিক ছেড়ে ওই মনের ঘরের দিকে পা বাড়াতে হবে। ওই মনের ঘরই শক্তির ঘর। সব-কিছুর কলকাঠি ওখান থেকেই নড়ে। হয়তো হবে। আমি জানি না বুঝি না এমন ব্যাপারের কি লেখাজোখা আছে? ভাবি, আমার মহাভৈরব গুরু কংকালমালী কি সেই ঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছেন? ভৈরবী বা মহামায়া কি সেই ঘরের দিকেই পা বাড়িযেছেন? হবে বা। শক্তিব টান শক্তি বোঝে। ভৈরবগুরুর মধ্যে এক-বকমেব দুর্বোধ্য শক্তি। ভৈববী মাযের মধ্যেও দেখেছি। কল্যাণীর মধ্যেও যে দেখেছি আমাব ঈর্ষাকাতর সত্তা অনেক—অনেক দিন পর্যন্ত তা স্বীকার করতে চায়নি। আব অস্বীকার করি না। ওব কাছে নিজেকে সমর্পণ কবেছি। তাইতেই ভারী শান্তি। ও যদি আরো বড় শক্তির হদিস আমাকে দিতে পারে, দোসর হয়ে সেই মনের ঘরের দিকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাবে, আমার পা বাড়াতে আপত্তি কি? আবো লেখা কল্যাণীর ভাষায পিছু-টানেব মতো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এখানেই থামলাম। ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আপনাদের—

কালীকিংকব অবধূত।

পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি

সকলের চোখের সামনে একটা বিশাল কঙ্কাল একটু একটু করে ভরাট হয়ে এল।

গোটা কাঠামোটা এবার একটা নির্দিষ্ট আকারে এসে পৌঁছেছে।

কালোবাজারের দ্বিগুণ মাশুল গুনে সিমেন্ট কিনে বড়সড় একটা বাড়ি তোলা বেশ পয়সাওলা লোকেরও সাধ্যের বাইরে। এর মধ্যে একের পর এক লরি বোঝাই হয়ে সিমেন্টের বস্তা ওই টিনের শেডের নীচে চালান হতে দেখেছে প্রতিবেশীরা। দুষ্প্রাপ্য পারমিটের সাদা রাস্তা ধরেই এসেছে ওগুলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যথায় সরকারেব নীতির থাবা এড়ানো সম্ভব হত না। এই দিনে এত অঢেল সিমেন্ট আমদানিব জাদুকাঠি অর্থাৎ পারমিট যার হাতের মুঠোয়, সেই লোক কোন বিশেষ ক্ষমতা অথবা প্রভাবের অধিকার তাতেই বা সন্দেহ কি। শুধু সিমেন্ট নয়, ইঁট বালি লোহা চুন সুরকিরও আগুন দাম এখন। যে-কোন দিকে হাত বাড়ালে হাতে ছ্যাঁকা লাগে—এমন। কিন্তু লরি বোঝাই হয়ে সে-সবও আসছে তো আসছেই। আসছে .আব দেখতে দেখতে উবে যাচ্ছে। নিঃশেষ হবার আগেই আবার আসছে।

অতএব এই দোতলা বাড়িটা অনায়াসে সম্পূর্ণ করে আনছে যে লোক তার সম্পর্কে আশপাশের বযস্কজনদের কিছু কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। অর্থ আর প্রতিপত্তি দুইয়েরই জোব না থাকলে এই দুর্দিনে একটা বাড়ি শেষ করে তোলাব আশা চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর সামিল।...আড়াআড়ি প্রায় শ'খানেক গজ পিছনে ছোট একটা দোতলা বাড়ি বছর খানেক হল চার ভাগের তিন ভাগ শেষ হয়ে অমনি পড়ে আছে। একতলায় কোনবকমে কিছু দবজা-জানলা বসিয়ে তাইতেই লোক বাস করছে এখন। সেই দরজা-জানলাতেও রঙের ছোঁয়া পড়েনি। কিন্তু দোতলাটা যেন হাঁ করে পড়ে আছে। কোন ঘবের দরজা-জানালা বসানো হয়নি। দোতলার দিকে তাকালে ওগুলোব ভিতর দিয়ে ওদিকের আকাশ দেখা যায়। দোতলার ইঁটের ঘর বা বারান্দায় সিমেন্ট-বালিব পলেস্তারাও পড়েনি এখনো পর্যন্ত।

কিন্তু কাব জন্যে কে সহানুভূতি দেখাবে? আশপাশের আরো অনেক বাড়ির জীর্ণ দশা। তিন বছরে ছেড়ে সাত-আট বছরেও একবার সংস্কারের সঙ্গতি বেশির ভাগ বাড়ির মালিকের নেই। ভাড়াটেরা ভাড়া কেটে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নেয বলে অনেক বাড়িওলার সঙ্গে তাদের খটাখটি লেগেই আছে। বসতবাড়ির ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে নোনা ধরে, বস্তা কয়েক সিমেন্ট এনে দুটো-একটা ঘর মেরামত কবে নেবে এমন চিন্তাও আছে কোন কোন প্রতিবেশীর মাথায়। কিন্তু ডবল দাম দিলেও সিমেন্ট মেলে না। যাও মেলে তাতে অর্ধেক গঙ্গামাটির মিশেল। এর মধ্যে নামী আড়তের রাশি-রাশি বস্তা নির্ভেজাল সিমেন্ট লরি-বোঝাই হয়ে আসতে দেখে অনেকেরই চোখের তারা সজাগ। বাড়িটা যে তুলছে তার সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপের বাসনা অনেকরই। প্রতিবেশী হতে চলেছে যখন আলাপের আগ্রহ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আসল মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে এসে ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ করেছে অনেকে।

রোজ দু'জনকে বাড়ির তদারকে আসতে দেখা যায় এখানে। একজনের অল্প বয়েস। কুড়ি-বাইশের মধ্যে। মিষ্টি চেহারা। বেলা এগারোটা নাগাদ আসে সে। তার সঙ্গেই আলাপের চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। শুনেছে বাড়ি তার দাদার। সে এমনি

দেখতে আসে। ছেলেটার নাম সমীর চ্যাটার্জী। কাছে না পাওয়ার দরুন তার দাদাকে 'সমু' বলে হাঁক দিতে শোনা যায় এক-আধ সময়। মিষ্টি মুখ হলে কি হবে ছেলেটা ভিতরে ভিতরে ত্যাঁদড়। এই দুর্দিনে বস্তা বস্তা ভাল সিমেন্ট সংগ্রহ হচ্ছে কেমন করে এ কৌতূহলের জবাব তার কাছ থেকে মেলেনি। ক'কাঠা জমি, কত দামে কেনা হয়েছে সে কিছুই জানে না বলে। বাড়ি দাদার। দাদা জানে।

গোড়ায় গোড়ায় ছেলেটা ঘন্টা দুই তিন থেকে চলে যেত। ইদানীং ছোকরার এখানে অবস্থানের মেয়াদ বেড়ে গেছে তাও কেউ কেউ লক্ষ্য করেছে। বাড়ার মত আকর্ষণ এ-পাড়ার একটু আছে। আকর্ষণ পিছনের ওই অসমাপ্ত বাড়িটাই, যার ঘব-কাটা দোতলাটা এখনো হাড়-পাঁজর বার করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'বছর আগে ওই বাড়িটা জোর কদমে মাথা উঁচিয়ে উঠছিল। একতলাটা কোনরকমে শেষ হতে না হতে এক ভদ্রলোক তিন-তিনটে সুশ্রী মেয়ে আর তার অন্ধ বুড়ো বাপকে নিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। তা সে-ভদ্রলোক সদালাপী ছিল। রিটায়ারমেন্টের পর যথাসর্বস্ব ঢেলে আর কিছু ধার-দেনা করে বাড়িটা তুলছিল। দোতলায় নিজেরা থাকবে আর একতলাটা ভাড়া দেবে এই সংকল্প। কিন্তু ছ'মাস না যেতে ভদ্রলোকেব সব সাধ শেষ। করোনারি অ্যাটাকে চোখ বুজেছে। সেই বিয়োগান্ত নাটক আর সুশ্রী মেয়ে তিনটের আকুলি-বিকুলি কান্না প্রতিবেশীরা দেখেছে। সকলেই ভেবেছিল অসমাপ্ত বাড়িটা এরপর জলের দরে বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু তাও হয়নি। বড় মেয়ে দুটো শুধু সুশ্রী নয়, চৌকসও। একজন এয়ার অফিসে আর একজন কোন বড় হোটেল রিসেপশনিস্টের চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। ছোটটা এবারে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিল। ওই মেয়ে তিনটের জন্যেই পাড়ার নানা বয়সের ছেলেদের হাঁ-করা বাড়িটার সামনে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়।

বাড়ির তদ্মরকে এসে ছোকরার ওই ছোট মেয়েটার সঙ্গে এরই মধ্যে একটু ভাব-সাব হয়েছে তাও অনেকেই লক্ষ্য করেছে। এই কারণেই তার এখানে অবস্থানের মেয়াদ বেড়েছে এটা বোঝা শক্ত নয়। আর এই কারণেই হয়তো বাড়ি সম্পর্কে কেউ কোন কৌতূহল নিয়ে সামনে এগোলে এক-কথায় দূরে সরিয়ে দিতে চায়—সে কিছু জানে না, বাড়ি তার নয়, দাদার—দাদা জানে সব।

বাড়ির আসল মালিক ওই দাদাটিকেও ইতিমধ্যে ভাল করেই লক্ষ্য করেছে প্রতিবেশীরা। বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। লম্বা, সুঠাম স্বাস্থ্য। কিন্তু চেহাবা বা বেশবাস সম্পর্কে উদাসীন। পরনে খাকী অথবা নীলাভ ট্রাউজার, আর গায়ে মোটা কাপড়ের সাদামাটা ছিটের হাফশার্ট। কখনো বা কলার-তোলা মোটা গেঞ্জি। গায়ের রং ফর্সা, কিন্তু নিয়মিত শেভিংয়ের অভাবে আর রোদের তাতে বাদামী দেখায়। সপ্তাহে দুই-একদিন শেভ করে এলে মুখখানা সুন্দরই মনে হয়। সুন্দর, কিন্তু অতিরিক্ত গম্ভীর। যে-রকম গাম্ভীর্য লোককে দূরে ঠেলে সরায়, সেই রকম। লোকটার বেশভূষা হাবভাব আচরণ সব মেহনতী মানুষের মত। পয়সা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে মনে হয় না। কথাবার্তাও রুক্ষ।

রোজ দু'বার আসে। সকালের দিকে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য টহল দিয়ে যায়। তখন শুধু কণ্ট্রাক্টর ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তার। ফের দুপুরে আসে আড়াইটে

তিনটে নাগাদ। ঘণ্টা দুই থাকে তখন। নিরীক্ষণ করে মিস্ত্রীদের কাজ দেখে। মুখ দেখে কখনো সন্তুষ্ট মনে হয় না মালিকটিকে। কণ্ট্রাক্টর আর মিস্ত্রীদের সঙ্গে ঝকাঝকির আভাস পায় আশপাশের মানুষরা। আর ওই নিরীহ-মুখো ভাইটার ওপরেও বীতশ্রদ্ধ মনে হয়।

কৌতূহলী প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তার সঙ্গেও আলাপ কবতে এসেছে।

—নমস্কার, আপনারই বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিরুত্তাপ জবাব।

—খাসা ছড়ানো প্ল্যানটি কবেছেন!...ক'খানা ঘর হবে?

—দশখানা।

—বাঃ। এই দিনে বিশাল ব্যাপাবই বলতে হবে।...ক'দিনই ভাবছিলাম আলাপ করে আসি...মশাযেব নাম?

—শঙ্কর চাটুজ্যে।

—বেশ। এই দুর্দিনে এমন একখানা বাড়ি তুলছেন...আপনাব ব্যবসা নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোন মিস্ত্রীর কাজে অসন্তুষ্ট বোধ হয়, ভুরু কুঁচকে সেই দিকে এগিযে গেছে লোকটা। আর এদিকে ফিবেও তাকায়নি। আলাপে ইচ্ছুক প্রতিবেশী খানিক বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেছে।

কেউ আলাপ কবতে এসেছে কিছু সিমেন্ট সংগ্রহেব বাসনা নিযে, আর অনেকেই এসেছে ফ্ল্যাট বা ঘব ভাড়া দেওয়া হবে কিনা খবর নিতে। কিন্তু লোকটার মুখে সদালাপের মিষ্টি আভাস কেউ দেখেনি—আশাপ্রদ জবাবও কেউ পায়নি। পাড়ায় বসবাস করতে আসাব আগে থেকেই এই বয়সের লোকের ওই গোছের আচরণ কোন বয়স্ক মানুষই ভাল চোখে দেখেনি।

ছেলে-ছোকরাদের বেপবোয়া দল সব পাড়াতেই আছে আজকাল। বয়স্কজনেরা তাদের খুব যে ভাল চোখে দেখে এমন নয়। অনেকে ভয়ে কিছু বলে না তাদের, অনেকের বা বলার মুখ নেই—কারণ ছেলে ভাইপো ভাগ্নে কেউ না কেউ দলে আছেই। ওই উঠতি বাড়ির মালিকেব বিচ্ছিন্ন গম্ভীর হাবভাব দুরন্ত ছেলেগুলোও লক্ষ্য করেছে গোড়ায় গোড়ায়। আবো বেশি লক্ষ্য করেছে তাব ছোট ভাই সমু চ্যাটার্জীকে। দু'মাসের মধ্যে পিছনেব ওই আধা-তৈরি বাড়ির ছোট মেয়েটার সঙ্গে ভাবসাবের আভাস ওরাই সবার আগে পেয়েছে। এতে ওদের মানে লেগেছে। লাগছে। ওই সমু বা সমীর চ্যাটার্জীকে এই ধৃষ্টতার ফলটা যখন খুশি বুঝিয়ে দিতে পারে। পারছে না ন্যাড়াদার জন্যে। নারাযণ শর্মা বা ন্যাড়াদার পরিচয় পরের প্রসঙ্গ। ও-বাড়ির দ্বিতীয় অর্থাৎ রিসেপশনিস্ট মেয়েটার দিকে চোখ ন্যাড়াদার। ওই ছোট মেয়েটার সঙ্গেই খাতির করে বাড়ির অন্দর-মহলে মাথা গলাতে পেরেছে ন্যাড়াদা। আর তারপর থেকেই অবুঝপনা শুরু হয়েছে ন্যাড়াদার। তার চোখ-রাঙানিতে ছোট মেয়েটার পিছনে লাগা, শিস দেওয়া বা টিকা-টিপ্পনী কাটা বন্ধ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই সমীর বা সমু চ্যাটার্জীকে একটু উল্টে-পাল্টে দেখার প্রস্তাবেও ন্যাড়াদাই বাধা দিয়েছে। বলেছে, ওটা তো তোদের কাছে ছারপোকা রে একটা,

এক্ষুণি ওটার পিছনে লাগার কি হল কাপুরুষের দল। তার থেকে তার ওই দাদাটাকে একটু বাজিয়ে দেখা দরকার হবে বোধহয়।

আসলে ছোট মেয়েটাকে এক্ষুণি বিরূপ করে তুলতে চায় না ন্যাড়াদা। দাদাটাকে অর্থাৎ উঠতি বাড়ির মালিক শঙ্কর চ্যাটার্জীকে বাজিয়ে দেখার মতলব শুনে ওরা একটু উৎসাহ বোধ করেছে। তিন-চারজনের এক-একটা জোট এসে সিগারেট টানতে টানতে বাড়ি তোলা নিরীক্ষণ করেছে। আসলে মালিকটাকেই নিরীক্ষণ করেছে তারা। লোকটা তাদের উপেক্ষা করছে, অমায়িক হেসে কথাবার্তা কইছে এগোচ্ছে না—এটা তারাও পছন্দ করেনি। পরে যখন শুনেছে পাড়ার বয়স্কজনদেরও অবজ্ঞা দেখিয়েছে ওই লোক—তখন দস্তুরমত মানহানির ব্যাপারই ঘটেছে তাদের মতে। দল বেঁধে শলা-পরামর্শ করেছে তারাও। এই গোছের দাম্ভিক লোককে বশে আনার মধ্যেই আসল রোমাঞ্চ। এতে করে ওই ছোট ভাইটারও একটু শিক্ষা হতে পারে। ওই দাদাটির ধারেকাছে ঘেঁষতে দেখে না তাকে—খুব মস্ত মানুষ ভাবে বোধহয় দাদাকে অতএব মজাটা মস্ত মানুষকে দিয়েই শুরু হলে ডবল উত্তেজনা।

এ নিয়ে ন্যাড়াদার সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ওরা কতখানি যোগ্য হয়ে উঠেছে সেও দেখুক। কত ধানে কত চাল টের পাইয়ে দিতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় ওদের।

—পাড়ায় নতুন আসছে, একটু অভ্যর্থনা মানে 'র‍্যাগিং'-এর ব্যবস্থা না করলে আর যে মান থাকে না গুরু!

তরুণ দলের মাস্তান হাসিমুখে সায় দিয়েছে।—শনৈঃ শনৈঃ—কাল ও-দিকটাতেই ক্রিকেট খেলা শুরু করা যাক—

পরদিন দুপুরে দস্তুরমত টিম করে লাগোয়া ফাঁকা জমিতে জোর তালে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে গেছে। এখানকার ইঁটের পাঁজা থেকে পাঁচ-পাঁচ দশখানা বাছাই করা ইঁট নিয়ে দুদিকের স্ট্যাম্প করা হয়েছে। আর লিনটালের কাঠ চিরে দুটো ব্যাট বানানো হয়েছে। কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখেছে শুধু, প্রতিবাদের সাহস হয়নি।

দুপুরে বাড়ির মালিক অর্থাৎ শংকর চাটুজ্যে আসতে তাকে বলেছে। পাঁচ-পাঁচ দশখানা ইঁট বা দু-টুকরো কাঠ নেওয়া বড় কথা নয়। পাশেই এ-রকম ক্রিকেটের আসর বসলে কাজের অসুবিধে। মুহুর্মুহু এদিকে বল আসছে—মিস্ত্রীদের গায়ে এসে লাগছে, বল ধরতে এসে হুটোপুটি করে ওরা সিমেন্ট-বালির মাখা-মশলার মধ্যে এসে পড়ছে, বালি সুরকি তছনছ করছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শংকর চাটুজ্যে খেলার নামে ওদের উপদ্রবের কারণটা বুঝতে চেষ্টা করেছে। ঠাণ্ডা মেজাজের ধাত নয় তার। প্রথম রাগটা গিয়ে পড়েছে সমুর ওপর। তার টিকির দেখা নেই। অদূরের ছাল-ওঠা অসম্পূর্ণ বাড়িটার দিকে তাকালো। ওখানে গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে হয়তো। সমুর মতিগতি ঠিকই লক্ষ্য করে যাচ্ছে সে।...পাজীটা নিজেকে খুব চালাক ভাবছে আজকাল।

...এই বাড়ি শংকর চাটুজ্যের সমস্ত জীবনের সফল পরিণাম। শান্তির আশ্রয়। চৌদ্দ বছর আগে বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার অবচেতন মনে যে উত্তরণের

প্রতিক্রিয়া চলেছে তারই সংহত রূপ এই বাড়িটা। তার চাউনি এরই মধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে, হাত দুটো নিশপিশ করেছে—অত দূর থেকে ওদের শুধু মনে হল ওষুধ ধরেছে। ওদের খেলার উল্লাস বেড়েছে।

একটু বাদে চাটুজ্যে সাহেবকে চলে যেতে দেখল তারা। অতএব ধরেই নিল কিছুটা টিট হয়েছে। এটুকু সূচনা মাত্র। খেলার আগ্রহে ভাঁটা পড়ল। একজন ঠাস করে তার কাঠের ব্যাট দিয়ে সাজানো ইঁটের স্ট্যাম্পের ওপর এক ঘা বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঁট তুলে তাকে আর একজন তাড়া করল। তারপর শুরু হয়ে গেল ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে দশখানা থানইঁট আর কাঠের টুকরো দুটোর বহু ভগ্নাংশ চারদিকে ছড়িয়ে থাকল। ওরা বিজয়ীর মত চলে গেল।

পরদিন সকালেই আবার নতুন উদ্যমে শুরু। বাছাই করা দশখানা থানইঁট দিয়ে আবার দুদিকের স্ট্যাম্প বানানো হয়েছে, আর কাঠ চিরে দুটো ব্যাট। আর সকালে যথাসময়ে এসে শংকর চাটুজ্যে কন্ট্রাক্টরের মুখে গতকালের অপচয়ের সমাচার শুনেছে, খেলার নতুন উল্লাসটুকুও পর্যবেক্ষণ করেছে।

সেদিন তার গায়ে জামার বদলে কলার-ওলা মোটা গেঞ্জি একটা। ফলে বুকের চওড়া ছাতি আর পরিপুষ্ট দুই বাহু ওই খেলোয়াড়দেরও চোখে পড়েছে। কিন্তু দলবদ্ধ অতগুলো ছেলে পরোয়া করার পাত্র নয়। ববং সংঘাতের আশাটুকু আরো লোভনীয় মনে হয়েছে।

শংকর চাটুজ্যে কন্ট্রাক্টরকে একটি কথাও না বলে তাদের দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। দু'হাত কোমরে। চত্বরের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদিকের খেলার গতিও মন্থর।

হাত তুলে আঙুলের ইশারায় ওদের কাছে ডাকল শংকর চাটুজ্যে।

চোখে চোখে নীরব ইশারা সেরে ওদের দলপতি কাঠের ব্যাট ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে এল। পিছনে গুটি গুটি অন্য সকলে।

কাছে এসে কিন্তু সকলেই থমকালো একটু। চওড়া ছাতি বা দুই বাহুর উঁচিয়ে ওঠা পেশী দেখে নয়। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছাওয়া মুখে আর চোখে এমন একটা কঠিন অভিব্যক্তি আছে যা দূর থেকে বোঝা যায় না। তাই হঠাৎ সামনে এলে দৃষ্টি হোঁচট খায় একটু।

শংকর চাটুজ্যে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—আমার ওই ইঁট-কাঠ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তোমরা এগুলো কালও নষ্ট করেছ, আজও করছ...কি ব্যাপার?

যা-হোক একটু উত্তেজনা কাম্য ছেলেগুলোব। সেই রসদই পাচ্ছে। গাম্ভীর্যের আড়ালে চাপা হাসি। মুখখানা যথাসম্ভব নিরীহ গোছের করে তুলে ওদের দলপতি জবাব দিল, ব্যাপার তো কিছু না, আমরা খেলছি একটু...

শংকর চাটুজ্যে সোজা তাকাল তার দিকে। এই চোখে চোখ রাখাটা যে খুব স্বস্তির ব্যাপার নয়, দুর্দান্ত ছেলেটাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটুকু অনুভব করতে হল।

—তোমাদের এই খেলায় আমার ক্ষতি হচ্ছে, কাজেরও অসুবিধে হচ্ছে।

ওদিক থেকে আর একটা ছেলে মেকী-বিনয়ের সুরে বলল, তাহলে আমরা খেলব না বলছেন?

শংকর চাটুজ্যের চোখ তার দিকে ঘুরল।—যে-ভাবে খেললে আমার ক্ষতি বা অসুবিধে না হয় সে-ভাবে খেলো—ইঁট-কাঠ দিয়ে কেন?

এবারে দলপতি হাল ধরল আবার।—সেভাবে খেলতে হলে তো অনেক খরচ সার্...একখানা যেমন-তেমন ব্যাট আর ধরুন তিন-একে চারটে স্ট্যাম্পের দাম কম করে পঞ্চাশ টাকা...একবার চেষ্টা করে পঞ্চাশটা সিকিও তুলতে পারিনি।

আবার একপ্রস্থ চোখের মিলন। এবারের চাউনিটা অত পাথরপানা নয় শংকর চাটুজ্যের। তার ট্রাউজারের পকেট থেকে বড়সড় ব্যাগ বেরুলো একটা। তার মধ্যে অনেকগুলো একশো টাকার নোটের সঙ্গে কিছু দশ টাকার নোট মেশানো। পাঁচখানা দশ টাকার নোট হালকা হয়ে ব্যাগ আবার পকেটে ঢুকল। নোট পাঁচখানা ওই দলপতির দিকেই বাড়িয়ে দিল।

বোঝাপড়ায় নেমে এ রকম একটা প্রাপ্তি-যোগ কল্পনা করেনি ছেলের দল।

শংকর চাটুজ্যে বলল, দূরে খেলবে, বল যেন এদিকে না পড়ে।...তোমাদের খেলা দেখলাম, আমার খেলা দেখার ইচ্ছে তোমাদের না হওয়াই ভাল—

ঘুরে কাজের দিকে চলে গেল।

ফালতু টাকার বাতাস গায়ে লাগলে চরিত্র ভোঁতা একটু হয়েই থাকে।

কথাটা গায়ে না মেখে ছেলেরা তখনকার মত খুশিমুখেই বিদেয় হল।

এবারে নারায়ণ শর্মা অন্যথায় ন্যাড়াদা প্রসঙ্গ।

পাড়ার এ-সব উঠতি বয়সের ছেলের দলেরও নায়ক গোছের মুরুব্বী থাকে দু-একজন। এ পাড়ায়ও আছে, সে ন্যাড়াদা। বয়সে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড় হলেও তার প্রতাপ এই ছোট পরিসরে গণ্ডীবদ্ধ নয়। সে-রকম দরকার পড়লে এই সব ছেলে-ছোকরাদের পরামর্শ দেয় বা তাদের পিছনে দাঁড়ায়।

বাড়ির মালিক বড় ভাই শংকর চাটুজ্যেকে সে একটু বাজিয়ে দেখার কথা বলেছিল একেবারে ব্যক্তিগত কারণে। ওই অসম্পূর্ণ বাড়ির তিন মেয়ের অন্ধ দাদুর সঙ্গে তার একটু ভাব হয়েছে। সেই বুড়ো একদিন দুঃখ করে বলেছিল, ন্যায্য দামে দশ-বারো বস্তা ভাল সিমেন্ট পেলেও নীচের তলার কিছু কিছু বাকি কাজ শেষ করা যেত। তাও সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, নিজে অথর্ব অন্ধ, কে-ই বা সংগ্রহ করে দেয়।

নারায়ণ শর্মা বুড়োকে আশ্বাস দিয়েছিল সে চেষ্টা করবে। চেষ্টায় সফল হলে ওই রায়-বাড়ির দ্বিতীয় মেয়ে শোভনার কাছে তার একটু খাতির বাড়তে পারে। বড় মেয়ে অঞ্জনা আর ছোট মেয়ে রিণা তাকে একটু-আধটু খাতির করে, কিন্তু শোভনা পাত্তা দিতে চায় না।

শংকর চাটুজ্যের কন্ট্রাক্টরের কাছে দশ-বারো ব্যাগ সিমেন্ট সরানোর টোপ ফেলেছিল। কন্ট্রাক্টর তাকে চেনে, খাতিরও করে। কিন্তু প্রস্তাব শুনে সে আঁতকে উঠেছে। বলেছে, এক ব্যাগ সরালেও টের পাবেই, আর একেবারে খুন করে ফেলবে, তাকে চেনেন না মশাই।

ন্যায্য দামে সিমেন্ট কেনার প্রস্তাবও কন্ট্রাক্টর সভয়ে বাতিল করেছে। তাই শংকর চাটুজ্যেকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে নারায়ণ শর্মার।

ওই লোক টাকা দিয়ে ছেলেদের ওইভাবে শাসিয়েছে শোনামাত্র সে রেগে আগুন—এই কথা বলেছে তোদের? খেলা দেখাবে! ঝেড়ে অপমান করল আর তোরা রাসকেল-মার্কা অপদার্থগুলো তাই হজম করে টাকা নিয়ে নাচতে নাচতে চলে এলি!

কথার চাবুকে ছেলেগুলো হকচকিয়ে গেল। ন্যাড়াদা যখন বলছে, অপমানটা যে ছোটখাটো কিছু নয় তাতে আর সন্দেহ কি! একজন সাহসে ভর করে প্রস্তাব করল, এবারে পাঁজা-পাঁজা ইট-কাঠ সরাব?

—থাম থাম। ন্যাড়াদা খেঁকিয়ে উঠল। যা করবি না স্বীকার করে এসেছিস তা করা অভদ্রতা। পাড়ার মুখে চুনকালি দিয়েছিস তোরা—টাকা কোথায়?

দলপতি ছোকবা ভয়ে ভয়ে পকেট থেকে নোট পাঁচখানা বার করল। বাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ন্যাডাদা নোট ক'টা তাব হাত থেকে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের অন্য হাতে ঘা বসাতে লাগল। চিন্তামগ্ন।—অপমানেব জবাব দিতে হবে...সরস্বতী পুজো কবে?

সেই তারিখ ওদেব মুখে মুখে।—দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, আর সতেরো দিন বাকি।

—ঠিক আছে, কি করতে হবে বলব'খন। পাঁচখানা নোট থেকে দু'খানা নিজের পকেটে বাখল, বাকি টাকা ওই দলপতিব দিকে বাড়িযে দিযে বলল, যা সহ্য করে এসেছিস, তিরিশ টাকার বদলে তিন ঘা কবে চাঁটি পাওনা তোদের—পালা—দিন তিনেক চুপচাপ থেকে পুজোব বিসিট বইটা নিয়ে আমার কাছে আসিস।

বিশটা টাকা খসাব দরুন ছেলের দল মন-মরা বটে একটু—ভবিষ্যতে আবার একটা জোরালো বোঝাপড়ার আশা আছে এটুকুই যা সান্ত্বনা।

তিনদিন বাদে সকালেব আধ ঘণ্টাব তদারকে এসে শংকর চাটুজ্যে দেখল ছেলের দল আবার এদিকেই আসছে। তাদেব সামনে অপেক্ষাকৃত একজন বয়স্ক মানুষ। ছিপছিপে লম্বাটে গোছেব।

এলো। ছোকরাদের দলপতি হাসিমুখে এগিয়ে এসে নতুন মানুষের পরিচয় দিল, ইনি নারায়ণবাবু, এ তল্লাটে সকলে চেনে এঁকে...আমাদেরও বড স্নেহ করেন... আপনাব কাছে আসছিলাম, ওঁকেও আলাপ কবিয়ে দেবাব জন্য ধবে নিয়ে এলাম—

তাচ্ছিল্যেব সুবে নারায়ণবাবু তাকেই থামাল আগে। তোরা ন্যাড়াদাই বল্ না, আবার পোশাকী নাম ধরে টানাটানি কেন! দু'হাত কপালে তুলে শংকর চাটুজ্যের উদ্দেশ্যে নমস্কাব ঠুকল একটা।—আমি চাল-চুলোহীন ন্যাডা মশাই, তবে বেলতলায় কম যাই—

ন্যাড়াদার নমস্কারের জবাবে লোকটার হাত না তোলার ধৃষ্টতা লক্ষ্য করল অনুগতবৃন্দ। মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু মাথা নাড়াতে দেখল। তাদের গরম হযে ওঠার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু ধৃষ্টতাব জবাব ন্যাড়াদাই দিতে জানে এ বিশ্বাসে তারা চুপ। সেয়ানা বলেই তার স্বভাবে ব্যতিক্রম দেখছে না।

ন্যাড়াদা ভিতের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসিহাসি মুখে আবার শিকারের দিকে তাকাল।—বেশ প্রকাণ্ড ব্যাপারই তো হচ্ছে দেখি, খুব আনন্দ হল,

আপনাদের মত মানুষ যত আসেন পাড়ার তত উন্নতি। কই রে, সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর সময় নষ্ট করছিস কেন, রিসিটটা দে—

শেষের ভর্ৎসনা মেশানো নির্দেশ অন্যদের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে ছাপা বই থেকে একটা নাম আর টাকার অঙ্ক বসানো রিসিট ছিঁড়ে একজন সামনে ধরল।

শংকর চাটুজ্যে সেটা হাতে নিল না। ছেলেটার হাত থেকেই নাম আর টাকার অঙ্ক পড়ে নিল। নামটা ঠিক-ঠিকই জেনেছে। টাকার অঙ্ক আড়াইশো।

—কিসের চাঁদা? মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই, গলার স্বরেরও তারতম্য নেই। এটুকুই অপ্রত্যাশিত সকলের কাছে। প্রশ্ন খোদ মুরুব্বীকে।

—সরস্বতী পুজোর। আগে. আমরা করতাম, এখন এই ছেলেরা করে...আমরা পিছনে থাকি। এবারের পুজোটা ওদের একটু ঘটা করে করার ইচ্ছে। ন্যাড়াদা .মোলায়েম করেই জানান দিল।

—সকলে এ-রকম হারে চাঁদা দিচ্ছে?

—না...যার যেমন সঙ্গতি, আপনি লাখ দুই খরচ করে বাড়ি তুলছেন, আড়াইশোটা টাকা তো নস্যি আপনার কাছে...আমি পুরো তিনশোই নিতে বলেছিলাম এদের, বোকাগুলো ভরসা পেল না।

এবারেও মুখে কোনরকম অভিব্যক্তি নেই, শুধু চোখের সাদা ভাগ আর একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে চোখে-চোখে অপলক তাকিয়ে থাকার হিম্মত ন্যাড়াদারও আছে।

—তুমিই তাহলে এদের ভরসার যোগানদার?

তুমি! শব্দটা যেন কানে বিতিকিচ্ছিরি রকমের কড় কড় করে উঠল সকলের। আর যাকে বলা হল তার মুখ লাল।—একটু হিসেব করে কথা বলবেন মশাই। পাড়ায় একবার টহল দিয়ে এলেই জানতে পারবেন কোন্ জাতের মানুষের সঙ্গে কথা কইছেন। বুঝলেন?

ছেলের দল সবিস্ময়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়িভরা মুখে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখল এই প্রথম। লোকটা চেয়ে আছে ন্যাড়াদার দিকে, না চোখ দিয়ে চাখছে যেন। সেই সঙ্গে হাতের মোটা-মোটা আঙুলগুলো দিয়ে নিজের অন্য বাহুর পেশীবহুল মাংস চটকাচ্ছে, তারপর কথা শুনে আরো হতভম্ব।

—বয়েস কত? তিরিশ না চল্লিশ?

ন্যাড়াদার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে।—যাই-হোক, তাতে আপনার কি? ভদ্রলোকের মত কথা বলুন।

শংকর চাটুজ্যে চোখে-চোখে দেখছে তেমনি।—এত বড় একটা বাড়ি করছি দেখে ভদ্রলোক ভাবছ, আসলে তোমার সঙ্গে আমার খুব একটা তফাত নেই—

—শাট আপ। আপনি তাহলে গায়ের জোর ফলাতে চান?

মাথা নড়ল।—না। চাইলেই বা লাভ কি, তুমি একলা আসবে?

গলার দু'দিকের দুটো নীল শিরা ফুটে উঠেছে নারায়ণ শর্মার। সে-ও দুই চোখে মেপে নিচ্ছে লোকটাকে। জিভ উপচে ব্যঙ্গ ঝরল, আজকের দিনে একলার জোরটা কতটুকু জোর জানা আছে?

গলার সুর নরম করে শংকর চাটুজ্যে জবাব দিল, জানা আছে, সব সময় মনে থাকে না। যাক, আমার ভুল হয়ে গেছে ন্যাড়াবাবু, কাল এসে চাঁদা নিয়ে যাবেন—

টাকা দেবে বলল বটে, কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটু বিদ্রুপের হুল ফুটে থাকল। ন্যাড়াদার মানের গোড়ায় নাড়া পড়েছে, শুধু এটুকুতে তুষ্ট হবার মানুষ সে নয়। ছেলেদের বলল, এই, কাল এসে টাকা নিয়ে যাবি, আড়াইশো টাকার এক পয়সাও কম নয়—

শংকর চাটুজ্যে কথার মাঝেই বাধা দিল আবার।—না ন্যাড়াবাবু, কাল ওদের সঙ্গে আপনি এসে টাকা নিয়ে যাবেন—আর ওদের ব্যাট কেনার পঞ্চাশ টাকার মত এ টাকাটাও উবে না যায় দেখবেন।

এখনো যেন লোকটাকে ঠিক মত আন্দাজ করে উঠতে পারছে না ন্যাড়াদা, মুখের ওপর আর একপ্রস্থ চোখ বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমিই আসব।...আশা করছি তার পরেও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে—

মাথা নেড়ে সায় দিল শংকর চাটুজ্যে, এক পাড়ায় বাস করব, তা তো হবেই।

খবরটা রাষ্ট্র হতে বড়রাও ভিতরে ভিতরে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বোধ করেছে। বড়রা বলতে শান্তিপ্রিয় প্রবীণ প্রতিবেশীরা। ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে নারায়ণ শর্মা ওই উঠতি বাড়ির মালিকের নামে আড়াইশো টাকা চাঁদা ধার্য করেছে এ-খবর যেমন শুনেছে, আবার তার সঙ্গে বাদানুবাদের প্রসঙ্গও তাদের কানে গেছে। পাড়ার একটি বুদ্ধিমান মানুষও নারায়ণ শর্মাকে ঘাঁটায় না। সামনা-সামনি পড়ে গেলে হাসিমুখে তার কুশল শুধায়। সে যে-কথা শংকর চাটুজ্যেকে বলে এসেছে তার মিথ্যে বড়াই নয়—এ-দিনে একলার জোবের ওপর কেউ নির্ভর করে না, ওরও পিছনে জোর যোগানোর মানুষ আছে। এখন ওই লোকটা না জেনেই বোকার মত দাপট দেখিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তাকেও কেন যেন সে-রকম বোকা মানুষ ভাবা যাচ্ছে না। লোকটা সত্যিই আজ আড়াইশো টাকা এনে দেবে কিনা, নাকি অন্য কোন মতলব ফেঁদেছে এ সংশয় বড়দেব ছেড়ে ওই ছোকরার দলেরও আছে।

ফলে সকাল থেকে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল এলাকাটাতে। শংকর চাটুজ্যের আসার সময়ের আগে থেকেই আশপাশের বাড়ির বয়স্কজনেরা বারান্দায় পায়চারি শুরু করেছে। তরুণেব দল সামনের মোড়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। লোকটাকে দেখা গেলেই ন্যাড়াদাকে খবর দেবার কথা। ওরা আশা করেছিল ন্যাড়াদা তার নিজের ওজনের দুই-একজন বন্ধুকে খবর দেবে। তারা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ন্যাড়াদা তেমন ব্যবস্থার ধার দিয়েও গেল না। গণ্ডগোল যদি জমে ওঠে তখন দেখা যাবে। ন্যাড়াদা আশা করছে লোকটা ভবিষ্যতে সুড়সুড় করে সুমতির পথ ধরে চলবে।

লোকটা এলো।

তার একটু বাদে নারায়ণ শর্মা প্রস্তুত হয়ে ছোকরাদের জটলার পুরোভাগে এসে দাঁড়াল।

আশপাশের প্রায় সমস্ত বাড়ির শান্তিপ্রিয় মানুষেরা এমন কি মহিলারাও বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

আরো মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ছেলেদের দল নিয়ে ন্যাড়াদা চাঁদা আদায় করতে চলল। অদূরে ওই লোকটা মানে শংকর চাটুজ্যে আজ পোশাক বদলেছে। গাঢ় নীল ট্রাউজারের ওপর সাদা হাফশার্ট। দাড়ি কামানোর ফলে মুখখানাও বেশি পরিষ্কার লাগছে।

কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা কইছিল, পিছনের সমাবেশ আঁচ করে ঘুরে তাকাল একবার। তারপর আবার কণ্ট্রাক্টরের হাতেব খোলা প্ল্যানেব দিকে আঙুল দেখিযে বাড়ির কথাই বলতে লাগল।

এও উপেক্ষারই নামান্তব। বিশেষ কবে ন্যাডাদা যেখানে সঙ্গে আছে। তার গম্ভীর মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে সকলে।

অদূরে একটা মোটর-বাইকের ভট ভট শব্দে ছোট বাহিনীটি সচকিত একটু। একটা লোক মোটর-বাইকে চেপে এদিকেই আসছে। এক শংকর চাটুজ্যে ছাডা সকলেরই চোখ সেদিকে।

মোটর-বাইকের মানুষ এই দলটির একেবারে সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অতর্কিত নির্বাক প্রহসন শুরু হয়ে গেল। নিমেষে ন্যাডাদার সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুব একেবারে। ছেলেদের মধ্যেও অনেকেরই সেই অবস্থা। যে দু'পাঁচজন চেনে না মানুষটাকে তারা হাঁ করে সকলেব মুখেব দিকে তাকাতে লাগল। না চিনলেও বুকেব তলায় তাদেরও একটা ষষ্ঠ অনুভূতির চমক লেগেছে সবুজ মোটর-বাইকটা দেখে। এই দশ মাইল এলাকা জুড়ে একটা নাম সকলেবই সোনা আছে যে তাব মার্কা-মারা সবুজ মোটর-বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা জিপ আব একটা হাল-আমলেব মোটরগাড়িও আছে তার দখলে—সে-দুটো বড় কাজে লাগে না। এমনি টহল দিয়ে বেড়াতে হলে সবুজ মোটর-বাইক সর্বক্ষণের বাহন তার।

...তার নাম জগু; জগুদা—জগা, জগাদা—জগা পাঠক।

ন্যাড়াদার মতই ছিপছিপে লম্বা গডন। কিন্তু তাব থেকে অনেক সুশ্রী আব ঢের বেশি শৌখিন। পরনে টেরিকটেব প্যান্ট, গায়ে ঝকমকে টেবিলিনেব শার্ট। বাঁ-হাতে দামী ঘড়ি, আর দু-হাতের দু'আঙুলে ঝকঝকে পাথব বসানো দুটো সোনাব আংটি।

কাজের কথা শুনে শংকর চাটুজ্যে এদিকে ফিরল।—কি রে জগা, কি খবব?

জবাব এল, সমু বলল তুমি একবার দেখা করতে বলেছ...কেন?

ভুরু কুঁচকে অনুচ্চ কিন্তু ঝাঁঝালো গলায় শংকব চাটুজ্যে বলল, কেন মানে? আমার আট লরি পাণ্ডুয়ার মোটা বালির কি হল?

—হবে, কটা দিন কি যে ব্যস্ত ছিলাম না শংকুদা...

—ব্যস্ত ছিলাম! আরো ঝাঁজালো অনুশাসনের গলা।—এর পর যদি চড়া দামে অন্য বালি কিনতে হয় আমায়, তোকে আমি সেই বালিতে পুঁতে ফেলব বলে দিলাম—

হ্যাঁ, অবাক প্রহসনই দেখছে নারায়ণ শর্মা আর ছেলের দল। দু'হাত জোর করে মিনতির সুরে জগা পাঠক বলল, আর তিনটি দিন অপেক্ষা করো শংকুদা,

তার মধ্যে না এলে যা খুশি কোর, আমি আজই ব্যবস্থা করছি।

—ঠিক আছে, দাঁড়া—এদের সঙ্গে কাজটা সেরে নিই—এদের চিনিস?

হাসি-মাখা চোখে জগা পাঠক দলটিকে এক নজর দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল। চেনে না।

—এ পাড়াবই ছেলে সব, বড় ভাল ছেলে...সেদিন ব্যাট কেনার জন্য পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেছল, এখনো কেনা হয়নি—এখন সরস্বতী পুজোর চাঁদা।...আর ইনি ন্যাডাবাবু, এঁদেব মুরুব্বী—এই দিনে একলার জোরের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই—

সবিনয়ে দু'হাত জুড়ে আধখানা পিঠ নুইয়ে জগা পাঠককে অভিবাদন জানাল নাবায়ণ শর্মা। গুরুর প্রতি ভক্তের বিনম্র স্তব যেন। তারপব সোজা হয়ে হাসতে চেষ্টা করে বলল, কি যে বলেন শংকুদা, জগাদাব কাছে আমার আবার পরিচয়—

দাড়ি-কামানো ফর্সা মুখে হাসির লেশমাত্র নেই শংকর চাটুজ্যেব। সে কাজের মানুষ। এক্ষুণি ছুটতে হবে আবাব। পকেট থেকে মোটা ব্যাগ বেরুল।—হ্যাঁ, কত চাঁদা যেন দিতে হবে আমাকে?

প্রশ্নটা সকলেব উদ্দেশ্যে। তাবা মুখ চাওয়া-চাওযি করতে লাগল। একটি গলা দিয়েও শব্দ বেরুল না।

ঝাঁজালো বিবক্তিতে শংকব চাটুজ্যে এবার নারায়ণ শর্মাব দিকে তাকাল।—আমার সময় নেই, কত চাঁদা?

শুকনো জিভ ঠোঁটে ঘষে নাবায়ণ শর্মা গলা দিযে ফ্যাসফেসে আওয়াজ বার করল এবার, ওবা বলছিল...

—এক চড়ে দাঁতেব পাটি ভেঙে দেব একেবারে। আচমকা চাপা গর্জনের সঙ্গে একখানা লম্বা হাতও কাঁধের ওপব উঁচিয়ে উঠেছে শংকব চাটুজ্যের।—ওবা বলছিল? কত চাঁদা তুমি জান না?

ছেলেব দলেব জোড়া জোড়া চক্ষু বিস্ফারিত: তাদেব ন্যাডাদা আডষ্ট একেবাবে।

চডটা গালে পডল না। হাত নেমে এল। তাবই উদ্দেশে আবাব চাপা হুঙ্কার। —কত চাঁদা?

—আড়াইশো...

ব্যাগে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে শংকর চাটুজ্যে ঘাড ফিবিয়ে মোটর-বাইকে বসা জগা পাঠকের দিকে তাকালো।

ওই লোকটা হাসছে মিটিমিটি। চোখাচোখি হতে সে বলল, বাডি তুলছ, তোমার দরাজ হাত এখন...। ছেলেদের দিকে ফিবল, আড়াইশো ছেড়ে তোমরা পাঁচশো আদায় করলে না কেন?

এই হাসি আর এই পরিহাস কতটা মারাত্মক ছেলের দল বা তাদের ন্যাড়াদা ঠাওর করে উঠতে পারল না। কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ধাক্কায় জগা পাঠকের মোটর-বাইক গর্জে উঠেছে।

—চললাম শংকরদা, তোমার বালি ঠিক সময়ে এসে যাবে।

ভট্ ভট্ শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে। সকলের চোখ সেই দিকে। ব্যাগ থেকে দু'খানা একশো টাকা আর পাঁচখানা দশটাকার নোট যে ন্যাড়াদার দিকে প্রসারিত

হয়েছে সে খেয়ালও নেই কারো। কাঁধে হাতের রূঢ় খোঁচা পড়তে সে সচকিত।

টাকা তার হাতে দিয়ে শংকর চাটুজ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তার দিকে চলল। পাঁচ-ছ মিনিটের হাঁটা পথ পেরিয়ে ট্রাম ধরবে।

সে জানে তার বাড়ি এবারে নির্বিঘ্নে উঠবে; ছেলের দঙ্গল বা তাদের ন্যাড়াদা আর কোনদিন হামলা করতে আসবে না।

কারণ, শুধু এই দক্ষিণে নয়, উত্তর কলকাতার অনেকের কাছেও জগা পাঠক একটা নাম।

তার শক্তির সঠিক হিসেব কেউ বাখে না, কেউ অভিজ্ঞতা দিয়ে কেউ বা পাঁচজনের শোনা কথা থেকে আঁচ করে নেয়।

জগা পাঠক চাকরি করে না, ব্যবসাও করে না। কিন্তু একটা ঝকমকে মোটবগাড়ি আর একটা জিপ তার দখলে থাকে কি করে সে-কৌতূহলও কেউ সরবে প্রকাশ করে না।

পুলিসের খাতায় জগা পাঠকেব নাম দাগ কেটে বসে আছে। কিন্তু সকলে জানে আগে যা হত, বছর কয়েক ধবে আর তা হয় না, হবে না। পুলিস আব তাকে ধরতে ছুঁতে আসে না, আসবে না।

জগা পাঠকের চাকবি নেই ব্যবসা নেই—কিন্তু তাব ফুরসতও নেই। শহব কলকাতায় সমস্যা যত, সমাবেশও তত। অতএব জগা পাঠকের মত ব্যস্ত আর কে?

অনেক হোমরা-চোমরা জনকে জগা পাঠকের শরণাপন্ন হতে দেখেছে অনেকে। এলাকার একজন শক্তিধর এম-এল-এ আর একজন মন্ত্রীর গাড়িতে তো হামেশাই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

এই জগা পাঠক বশংবদ শংকর চাটুজ্যেব এটা ওবা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যখন, বাড়িটা এবার নির্বিঘ্নেই উঠবে।

২

সুবর্ণার এক হাতে জল-নিংড়নো ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ আর গামছা, অন্য হাতের মুঠোয বেড় দিয়ে জড়ানো শাড়ির পেটের দিকের বাঁধনের কাছে ধরা। আঁচলের দিকটাও অবশ্য আলতো করে গায়ে জড়ানো। ওই স্যাঁতসেতে খুপরি বাথরুমে শুকনো শাড়ি ভাল করে পরে বেরিয়ে আসা তার দ্বারা হয় না। সে বউদি পারে, শাড়ির আধখানা ভিজল কি ভিজল না তার ভ্রূক্ষেপ করার কারণ নেই। কিন্তু সুবর্ণা পারে না। সে স্নান সেরে শুকনো শাড়ি এইভাবেই গায়ে কোমরে জড়িয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ঘরের দিকে ছুট লাগায়। আজও তাই করেছে। তার ওপর আজ আবার এই সকালেব দিকে হঠাৎ চেপে ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতে ধরার দরুনও ভেজা চুলে আর ভেজা মুখে আগে ঘরে ঢোকার তাড়া।

দরজার এধারে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। কপালের মধ্যিখানে ভাঁজ পড়ল একটা দুটো। তারপর সেই অবস্থাতেই আবার বাইরে ছুট। কিন্তু তার আগেই ও-ঘরের একজন বাইরের মানুষ ঘাড় ফিরিয়েছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখিও হয়েছে।

জগুদা—জগা পাঠক।

সুবর্ণার ভেজা মুখ লাল একটু। বেরিয়ে আসার পর বিরক্তির ছাপ আরো স্পষ্ট। পাশে ছোড়দার ঘরটার দরজায় শিকল তোলা। সুবর্ণার এক হাত জোড়া, অন্য হাতে আলগা বেড় দেওয়া কাপড় ধরা—শিকল খুলতে গেলে পরনের শাড়ি খুলে পড়ে যাবে। সোজা দাদার ঘরে গিয়েই ঢুকল সে। তার আগে বাঁ হাতের ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ-গামছা দোরগোড়ায় টুলটার ওপর ফেলে হাত খালাস করে নিল। শুকনো শাড়িটা কোমরে আর বুকে পিঠে একফেরতা জড়ানো হলেও সায়ার আধখানা দেখা যাচ্ছে, বুকের ব্লাউজেরও কম করে সিকি-ভাগ অনাবৃত।...ওই কালামুখো চোখে ঠুলি পরে থাকেনা কোন সময়, চোখে যেটুকু পড়ার পড়েইছে।

দাদা বাড়ি নেই জানে। বউদি থাকতে পারে। না তাও নেই। রান্নার দিকে বা তার সেফ ডিপোজিট ভল্টে থাকতে পারে। বাইরে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাজির পা-ঝাড়া হয়ে উঠেছে সমুটা—বছর কয়েক আগে সে-ই সেফ ডিপোজিট ভল্ট নামটা দিয়েছিল। ঘরের লাগোয়া সেই ভিতরের খুপরি ঘরে বউদির হরেক রকমের জিম্মার জিনিস থাকে।

দুমদাম পা ফেলে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে এগোল সুবর্ণা। ঘরের মেঝেয় বই-খাতা নিয়ে বসে কিছু বোধহয় একটা কুকর্ম করছিল আট বছরের বাচ্চু, ঈষৎ ত্রাসে মুখ তুলে সে পিসীর দিকে তাকাল। কিন্তু পিসীর ওর দিকে চোখ নেই দেখে নিশ্চিন্ত।

পরনে সায়া-ব্লাউজ। অতএব শাড়িটা একেবারে খুলে নিয়ে ভাল করে পরায় মন দিল। ভিতরটা বিরক্তিতে ছেয়ে আছে। ঘরের সমস্যা তার আর মিটল না। বাড়ি একটা হচ্ছে বটে, কিন্তু সবে শুরু—কোন যুগে শেষ হবে ভগবান জানে। আজ ক'বছর ধরেই তো বড় একটা বাড়ি ভাড়া নেবার জন্য দাদাকে তাগিদ দিচ্ছে। কিন্তু কারো তাগিদে কিছু করার মানুষ নয় দাদা। নিজের যা মতলব হবে তাই করবে। বেশি বললে রেগে যাবে। নিজের স্বার্থ ভিন্ন দাদা আর কোন দিন কারো স্বার্থের দিকে তাকিয়েছে বলে মনে হয়না সুবর্ণার। এই স্বার্থপরতার কথা ভাবতে গিয়েই রাগে মুখ লাল আবার। দাদা তার স্বার্থ দেখেছে বলেই আজ এই হাল ওর। নিজস্ব ঘরের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। কতজনে ওকে দাদার আশ্রিতা ভাবে এখন কে জানে। সুবর্ণা অনেক সময় নিজের মনেই ভাবে এ-সব আর গজরায়। দাদাকে কোনদিন কিছু বলেনি। দাদাকে কেন যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছুই বলা যায় না। খুব বেশি রাগ হলে বড়জোর বউদিকে ঠেস দিয়ে কথা শোনায়। কিন্তু বউদিও সেয়ানা কম নয়, সে আর যাই হোক কক্ষনো দাদার কানে কিছু তুলবে না। সুবর্ণার মতে বউদি যাকে বলে দজ্জাল মেয়েছেলে একটি। শুধু ও কেন, মেজদা আর সমুও তাই ভাবে, সাহস করে কেউ বলে না এই যা। পাড়ার চারভাগের তিনভাগ গরিব আর মাঝারি-গরিব গেরস্ত-বাড়ির ওপর একচ্ছত্র প্রভাব তার। দিনকে দিন মধ্যবিত্তরা গরিবের দিকে গড়াচ্ছে আর বউদির আয়পয় বাড়ছে। কত লোকের কত কিছু গচ্ছিত আছে ওই সেফ ডিপোজিট ভল্টে সে হিসেব একমাত্র সে-ই রাখে। দাদার সঙ্গেও বউদির অবনিবনা লেগেই আছে। কিন্তু দাদার তেমন পাথরপানা

মূর্তি দেখলে এই মহিলাও থমকে যায়। ভিতরে ভিতরে একটু ভয় একমাত্র দাদাকেই যা একটু করে সেটা ওরা ভাইবোনেরা বেশ আঁচ করতে পারে।

শাড়িটা পরা হতে আয়নার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুবর্ণা। ঘুরে ফিরে দেখল একবার। মোটামুটি হয়েছে। কি মনে হতে এই মেজাজের মুখেই হাসল একটু। চানে যাবার সময় ওর ঘরে কেউ ছিল না। সমুও না। এর মধ্যে লোক ঢুকে বসে আছে কি করে জানবে। থাকলে সমুর থাকার কথা। সমুর থাকা না-থাকা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না সুর্বণা। সমুর বয়স এখন বাইশ, বয়সের থেকে ঢের বেশি কচি দেখায়। বছর তিনেক আগে ও ঘরে থাকলেও শাড়িটাড়ি বদলাতে অসুবিধে হত না। আজও মুখ দেখলে মনে হয় ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না, কিন্তু চাউনি-টাউনিগুলো কেমন যেন বদলাচ্ছে। সর্ব ব্যাপারে আগের মতই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটু বিশ্লেষণের উঁকি-ঝুঁকি আছে। এখন স্নান সেরে ওই অবস্থায় ঘরে ঢুকে পড়ে ওকে দেখলে সুবর্ণা অপ্রস্তুত হয় না বটে, কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে ঘর থেকে তাড়ায় ওকে।—এই, ভাগ!

সেই তিন বছর আগে গোড়ায় গোড়ায় দুই একদিন লেখা-পড়ায় ব্যস্ত থাকলে সমু আপত্তি করেছে। সানুটা বেঁচে তখনো, সে ঘরে থাকলে নিজে থেকেই সরে যেত। কিন্তু সমুর আপত্তি। আমি তো এ-দিক ফিবে ঘাড গুঁজে লিখছি, তুই কাপড পর না—

সে-চেষ্টা করতে গিয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে একদিন দুটো ডাগর চোখের ধাক্কা পেয়ে হাতের শাড়ি দিয়ে বুক ঢাকতে হযেছে সুবর্ণাকে।—দেব এক থাপ্পড়ে তোব মুণ্ডু ঘুরিয়ে। যা, বেরো ঘর থেকে।

তখনো প্রতিবাদের চেষ্টা সমুর।—আমি কি করেছি?

—কি করেছি? এই তোর পড়া হচ্ছে?

—তা তো হচ্ছে না।

—তাহলে কি হচ্ছে?

—তোকে দেখছিলাম।

কম করে পাঁচ-ছ' বছরের ছোট ভাইয়ের সাদা-সাপটা অথচ অদ্ভুত নিরীহ স্বীকৃতি। সুবর্ণা হঠাৎ থতমত খেয়েছে প্রথম, তাবপর হাত তুলে তেড়ে মারতে গেছে।—বেরো বলছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তেমনি নিরীহ মুখে প্রস্থান করেছে সমু।

তিন বছর আগের ব্যাপার। সমুর বয়েস তখন উনিশ আর সুবর্ণার চব্বিশের ওপর। এখন ওর বাইশ আর সুবর্ণার সাতাশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু এই তিন বছরে সমুটা বাইরে একটুও বদলায়নি বটে, চেহারাখানা এখনো তেমনি নিরীহ আর কাঁচা—কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর যেন বেশ একটা ছাঁচবদল হয়ে গেছে। দু-বছর আগে সানুটা মরে যাওয়ার পর থেকে সমুর এই পরিবর্তন সকলের চোখে পড়ছে। বাড়ির এই একটা ছেলেকেই কেউ কোনদিন ভালো করে লক্ষ্যও করেনি। উঠতে বসতে সকলের দাবড়ানি খেয়েছে, সকলের হাতে কম-বেশী মার-ধোর খেয়েছে। একমাত্র সানুই

যা ওর সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা কইত, গল্প-টল্প করত, কেউ শাসন করতে এলে ওকে আগলে রাখতে চেষ্টা করত। ও মরে যেতে সমু যে সব থেকে বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে সকলেই খেয়াল করেছে বোধহয়। কিন্তু আট বছরের বাপ-মরা ছেলেটার বড় হওয়াটা যেন রাতারাতি ব্যাপার। সকলের চোখে ও যেন সেই আট-দশ বছরের ছেলেটাই ছিল—ওর বয়সটা বুঝি সকলের অগোচরে বেড়েছে। তারপর হঠাৎই একদিন চোখে পড়েছে সকলের। দাদা মেজদা বউদি মেজবউদি সুবর্ণা—সক্কলেব। মুখে অবশ্য কেউ কিছু বলে না, এই বড় হওয়াটাকেও কেউ আমল দিতে চায় না। কিন্তু সুবর্ণার ধারণা,' ওর এই ব্যতিক্রমটা সকলেই অনুভব করে। এমন কি ওদের বাঘ-মার্কা দাদাটিও। কারণ ইদানীং সুবর্ণা দাদাকেও সমুর অগোচরে অনেক সময় চুপচাপ চেয়ে থাকতে দেখে। সমু ঘাড় ফেরালে দাদাও অবশ্য চোখ ফিরিয়ে নেয়।

সানু মরে যাওয়ার পর থেকে সমু কথা আরো কম বলে। চুপ-চাপ শোনে বেশি। দেখে আরো বেশি। ওর যত গাল-গল্প সব বাচ্চুর সঙ্গে। কিন্তু বড়দের সঙ্গে কথা কইতে হলে হঠাৎ এমন কিছু বলে বসে বা এমন কিছু মন্তব্য করে ফেলে যা শুনলে হকচকিয়ে যেতে হয়। কানের ভিতর দিয়ে সেই কথা বা মন্তব্য যেন অনেক ভেতর পর্যন্ত নড়েচড়ে বেড়ায়। অথচ পরের মুহূর্তে নিরীহ কাঁচা মুখের দিকে তাকালে মনেও হবে না ও বলেছে বা ও মন্তব্য করেছে। এমন কি মুখে একটি কথা না বলেও শুধু সামান্য হাব-ভাব-আচরণে বা চাউনির একটুখানি রকমফের করেও ও যেন অন্যকে একটু ধাক্কা দিতে পারে, সজাগ করে তুলতে পারে।

ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয় এও কেমন এক অস্বস্তির কারণ সুবর্ণার। একতলায় তিন ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। এই জগাব কল্যাণে এখানে উঠে আসার পর থেকে পযসার মুখ দেখেছে দাদা। তাই নিজেদের বাড়ি হওয়ার আগে এ ফ্ল্যাট ছাড়া চিন্তাও নেই তাব মাথায়। বউদিব মাথায় তো নেই-ই। এই এলাকা আব এই পাড়াপড়শীদের ছেড়ে গেলে তার লোকসান। কিন্তু রাতে স্বস্তি নিয়ে ঘুমোতে না পারলে কাঁহাতক ভালো লাগে? বউদির বিবেচনায় ওদের ঘরের চৌকি দুটো বিদেয় হয়ে দু'জনের জন্য দুটো শৌখিন খাট এসেছে অনেক দিন। তাতে পুরু গদী। গবমে মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘোরে। তবু ঘুম যেন সহজে আসতে চায় না। কেন অস্বস্তি সুবর্ণা ঠাওর করে উঠতে পারে না। আগে তো ওই এক চৌকিতে সমু আর সানু ঘুমতো—আর এ-ধারের চৌকিতে ও। কিন্তু তখন তো কোনরকম অস্বস্তির বালাই ছিল না। এখন কেবলই মনে হয় সমুটার আলাদা কোথাও শোবার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। কিন্তু কোথায়ই বা ঠেলে দেওয়া যাবে ওকে। তিন ঘরের এই বড় ঘরটা দাদার। পাশের মাঝারিটা মেজদার। গড় হিসেবে বছরের মধ্যে ছ'মাস মেজবউদি বাপের বাড়িতে কাটায়। তারও বেশি বোধহয়। তার হিস্টিরিয়া ব্যামো। মেজবউদির বাপের বাড়ির মানুষদের ধারণা অমানুষের হাতে পড়ে তাদের মেয়ের এই দুর্দশা। সুবর্ণার নিজস্ব মতে ধারণাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সাতদিন একত্র থাকলে দুজনের চুলোচুলি বেধে যায়। তারপর মেজবউদির কাঁপুনি-ঝাঁপুনি শুরু হয়। বড়বউদি আর সুবর্ণা জল-বাতাস করতে বসে। দাদা বাড়ি থাকলে অতবড় মেজদাকেও

তেড়ে মারতে আসে। তারপর সুস্থ হয়ে মেজবউদি সেই দিনই বা পরদিন বাপের বাড়ি রওনা হয়। আর কখনো এমন স্বামীর মুখ দেখবে না বা এ-বাড়িতে পা দেবে না প্রতিজ্ঞা করে যায়। বেশ কিছুদিন বাপের বাড়ি কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা ভুলে আবার আসে—তারপর আবার যায়। আজ চার বছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে। তার মধ্যে শেষের আড়াই বছর ধরে এ-রকমই চলছে। মেজবউদি এ-বাড়ির বউ হলেও এ-পরিবারের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। সকলের মন থেকেও।

কিন্তু এখানে থাকুক না-থাকুক তার জন্য আলাদা একখানা ঘর নির্দিষ্ট থাকা চাই-ই। ওই মাঝারি ঘরটা তার। রাত ন'টা-দশটার সময় মেজদা ফ্যাক্টরী থেকে এসে শেকল নামিয়ে ঘরে ঢোকে। তার আগে ঠিকে ঝি এসে শুধু দু'বেলা ঝাঁট-পাট দেয় আর বিকেলে ঘর মোছে। বাড়ির আর কেউ ও-ঘরে ঢোকে না বড় একটা।

আর বাকি থাকল শেষের ওই ছোট ঘরটা। তিনজনের জায়গায় এখন দুজনে শোয় সেখানে। সব স্বার্থপব, সুবর্ণার অসুবিধে হয় সেটা কারো চোখেই পড়ে না। বড়বউদির কাছে অনেকদিন প্রস্তাব দিয়েছে, মেজবউদি যখন থাকে না, সমু তখন মেজদার ঘরে গিয়ে শুলেই তো পাবে—আমার অসুবিধে হয়।

বড়বউদি আগে বলেছে, সমু একটা মানুষ, তার জন্যে আবার অসুবিধে।

সুবর্ণা ফোঁস করে উঠেছে, তাহলে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াও না-—আমার অসুবিধে হয় বলেই বলা হচ্ছে।

কিন্তু এখন বড়বউদি কেন যেন আর সে-কথা বলে না। বলে, শম্ভু এলে তাকে বলে দ্যাখ, আর সমুকেও বল—

—আমি কেন বলতে যাব, তুমি বলতে পার না?

বড়বউদির সাফ জবাব, না, আমি বলতে পারি না।

ক্ষোভের মুখে সুবর্ণা সমুকেও বলেছে, এই ছেলে, তুই মেজদাব ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নে না। মেজবউদি এলে তখন আবার দেখা যাবে—

ওর সেই সাদা-সাপটা চেয়ে থাকাটাই অস্বস্তিকর। জিজ্ঞাসা করেছে, কেন, তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, হচ্ছে।

—কি অসুবিধে হচ্ছে?

সুবর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে চেয়েছে।—সে খোঁজে তোর দরকার কি, হাঁদারাম?

—আমার জানতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, ঠিক আছে...

এত সহজে স্বীকার হতে দেখে সুবর্ণাও অবাক হয়েছিল। কারণ নিজের স্বভাবে আর কিছুটা মেজবউদির কারণে মেজদাও মনের দিক থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। হুকুম করলেই তার ঘরে গিয়ে শোওয়াটা সহজ নয়।

কিন্তু রাতে শোবার আগে পর্যন্ত সমু এ-ঘরের নিজের বিছানাতেই গড়িয়েছে। মেজদাকেও একটি কথাও বলেনি। তারপর ওর কাণ্ড দেখে সুবর্ণা রাগে জ্বলেছে। চুপচাপ শতরঞ্চিসুদ্ধ বিছানা-বালিশ তুলে এনে অন্দরের দিকে ঢাকা বারান্দায়

পেতেছে। মাথায় ছাদ থাকলেও অন্য সব দিক খোলা। তাছাড়া একতলার স্যাঁতসেতে বারান্দা।

উগ্রমূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণা।—তোর এখানে শোওয়ার মানে?

—মানে আবার কি। শুলাম...। আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আরামেই শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

ওদিক থেকে বড়বউদিও বারান্দার শয্যা দেখে এগিয়ে এসেছে। ফলে সুবর্ণার আরো বেশি রাগ।—তোকে আমি এখানে শুতে বলেছি?

—বলিসনি, আমি শুচ্ছি।

দু'হাতে চুলের মুঠি খাবলা দিয়ে ধরে সুবর্ণা। টেনে তুলে বসাল সমুকে। তারপর ধাক্কা মেরে ওকে বিছানা থেকে সরাতে চেষ্টা করে ফুঁসে উঠেছে, ওঠ বলছি, পাজী কোথাকার—খুব বেশি বাড় বেড়েছে তোর, কেমন?

চেঁচামেচি শুনলেও মেজদা দবজা খুলে বেরোয় না। দাদা তার ঘরের দরজার বাইরে এসেছে। মুখ লাল। বেশি টানলে যেমন হয়—মদের মাত্রা তার বেড়েই চলেছে দিনকে দিন সেটা সকলেই অনুভব করতে পারে। সমু ঘাড় ফিরিয়ে দাদাকে দেখল একবার। তারপর নিজে থেকেই উঠে বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল। মদ খেয়ে দাদা কোনদিন এতটুকু চেঁচামেচি করে না, জোরে একটা কথাও বলে না। ও যদি এরপরেও বসে থাকত, দাদা এগিয়ে এসে কান ধরে ওকে তুলত, তারপর ঠাস করে গালে একটা চড বসিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেত। মদ খেলে দাদা অনেক সংক্ষেপে তার করণীয় কার্য সমাধা করে ফেলতে পারে।

বিছানা-বালিশ তুলে নিয়ে সুবর্ণা সমুর চৌকিতে আছড়ে ফেলেছে আবার। পিছনে সমুও এসে দাঁড়িয়েছে। ওব মুখখানাই যেন তার দেখার বস্তু।

...নিজের অস্বস্তির কারণ সুবর্ণা এখন কিছুটা যেন অনুমান করতে পারে। সানুটা চলে যাবার পব থেকে ওকে দেখে-দেখে একটাই ধারণা পুষ্ট হয়ে উঠছে সুবর্ণার। মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকাটা বোকার লক্ষণ ভাবত আগে। এখন আর সে-রকম ভাবতে পারে না।

...মনে হয়, মুখের দিকে চেয়ে থেকে সমু অনেক ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়। সেটাই অস্বস্তি।

বেশ-বিন্যাস সেরে এ-ঘরে এল। দোকানে সাড়ে দশটায় হাজিরা তার। সকালে দাদা বাড়ির তদারক সেরে কোনদিন এখানে আসে, কোনদিন বা সোজা দোকানে চলে যায়। ঘড়ি কাঁটায় দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার দোকান খোলা চাই-ই। সুবর্ণা সাড়ে দশটায় পৌঁছলে তার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে সে অর্ডার সংগ্রহে অথবা অর্ডার সরবরাহের ব্যবস্থায় বেরুবে। ব্যবসার দরকারী কথা ভিন্ন দোকানে দাদার সঙ্গে একটি কথাও হয় না সুবর্ণার। দাদা বেরিয়ে গেলে যথাসম্ভব মন দিয়েই কাজ করে। আর মিস্ত্রীগুলোও তখন যে হাঁফ ফেলে বাঁচে—কাঠের আর বার্নিশের দুটো মিস্ত্রীকে এই ফার্নিচার শো-রুমে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। বাকি মিস্ত্রীরা সব কারখানায় কাজ করে। ও-দিকটা দেখাশুনা বা তত্ত্বাবধানের ভারও দাদার। সেখানে হেড মিস্ত্রী আছে একজন। বিশ্বস্ত পুরনো মানুষ। কিন্তু নতুন পুরনো সব ক'টা

লোকই দাদাকে বাঘের মত ডরায়। এত কাজের চাপ এ-তল্লাটের আর কোন ফার্নিচার-ব্যবসায়ীর নেই। তাই এখানকার মেহনতী মানুষদের ওভারটাইম আর প্রাপ্তিযোগ অন্যত্র থেকে দ্বিগুণ বলা যেতে পারে। শুধু এই লোভেই দাদার অমন বিতিকিচ্ছিরি মেজাজ সত্ত্বেও তারা টিকে আছে—টিকে থাকে। ওরা কেন, ভুল-ত্রুটি হলে সুবর্ণা পর্যন্ত সকলের সামনে ধমক-ধামক খায়। আজ সকালে দাদার মেজাজ আরো খারাপ দেখেছে কেন জানে না। সুবর্ণার ঘড়ির দিকে কড়া চোখ রাখতে হবে, এই মূর্তি অর্থাৎ জগা পাঠকের পাল্লায় পড়লে দেরি হবার সম্ভাবনা যোলআনা।

—এই যে, ছোড়দি এস, জগা পাঠক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল তাকে, এরই মধ্যে স্নান-ড্রেস কমপ্লিট, দোকানের সময় হয়ে গেল নাকি?

জগুদা মেজদার প্রাণেব বন্ধু ছিল একসময়। কম করে পাঁচ-ছ' বছরের বড় হবে ওর থেকে। তবু সামনা-সামনি বেশির ভাগ সময় সানু-সমুর মত ছোড়দি বলেই ডাকে ওকে। এটা তার আদবের ডাক সকলেই জানে। সুবর্ণা লক্ষ্য করেছে, দাদার সামনে আরো বেশি ছোড়দি-ছোড়দি করে। ভিতরে ভিতরে সুবর্ণা অনেক সময় বিরক্ত হয়। স্বভাব-চরিত্র জানতে বড় বাকি নেই কারো। তাই দাদার সামনে অকৃত্রিম স্নেহ দেখানোর ভড়ং। সমু ছোড়দি ডাকে আর সানুও তাই ডাকত তার কারণ দাদার পরে আর একটি বোন ছিল তাদের। খুব ছোটবেলায় সেই বোন মারা যায়। তবু তার কারণেই সুবর্ণা ছোড়দি।

হাসিমুখে সুবর্ণা মাথা নেড়ে নিজের শয্যায় গিযে বসল। বলল, না, মিনিট কুড়ি সময় আছে এখনো হাতে, দশটায বেরুবো।

আসলে রোজ সোয়া দশটায় বেবোয়। হেঁটে যেতে বড় জোর দশ মিনিট লাগে। তবু হাতে সময় রেখেই বলল। তারপরেই চাপা বিরক্তি। সমুটা ঘাড় বাঁকিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। যেন ওব মুখে দেখার মত আছে কিছু।

টেবিলের লাগোয়া চেয়ারটায় সমীর বসে ছিল। এবারে খানিকটা চেয়ারে আর খানিকটা টেবিলে ঠেস দিয়ে আরো একটু ভালো করে ঘুরে বসল। দু'জনেরই মুখ চোখের আওতায় রাখতে চায়। জগুদা ওব সঙ্গেই গল্প করছিল এতক্ষণ, কিন্তু সে-রকম জমছিল না। সেটা জগুদার দোষ নয়, নিজে কেমন গপ্পি ছেলে নিজেরই ভালো জানা আছে। অথচ জগুদা আজ একটা রসালো খবরই দিয়েছে বলতে হবে—দাদার মত মানুষের পকেট থেকে আড়াইশো আর পঞ্চাশ—মোট তিনশো টাকা ওই বোসপাড়ার ছেলেদের পেটে গেছে শুনে দস্তুরমত অবাকই হয়েছে সে। জগুদার মুখে মোটামুটি যতটুকু শুনেছে তাই থেকেই ঘটনা বুঝে নিয়েছে সে। ওই ত্যাঁদড় ছেলেগুলোর সব ক'টার মুখ চেনে, আর ন্যাড়াদাকে তো ভালো করেই চেনে। জগুদাকে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজ আড়াইশো টাকা দিয়ে ফেলার দরুন মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছে না...জগুদাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে, আবার টাকা দিয়ে নিজেকে একটা ভয়াল শ্রদ্ধার আসনে ঠেলে তুলেছে। সত্যিকাবের গণ্ডগোল কিছু পাকিয়ে বসুক দাদা সেটা চায় না। না, যত গোঁয়ারই হোক, দাদা যে মাঝে মাঝে বুদ্ধির খেলা দেখায় সমীর সেটা অস্বীকার করতে পারে না।

যেখানে নতুন বাড়ি উঠছে সে-জায়গাটার নাম বোসপাড়া। বড়জোর মাইল দুই হবে এখান থেকে। জগুদার সঙ্গে কথার ফাঁকে সেখানকার কৌতুককর পরিস্থিতিটাই ভাবছিল সমু। এখন ছোড়দি ঘরে ঢুকতে তার থেকেও কৌতুককর যেন কিছু, চোখে পড়ার সম্ভাবনা।...ছোড়দি হালকা নীল রঙের শাড়ি পরেছে, সাদা সিল্কের ব্লাউজ, আর্দ্র চুল পিঠের ওপর ছড়ানো।

সুন্দরই লাগছে। আগে খুব ঝকমকে রঙচঙা পোশাক-আশাক পরত, আর দু'হাতে গলায় কানে হাতের আঙুলে একরাশ গয়নার বোঝা বয়ে বেড়াত। ...গাঙ্গুলীমশাই বোধহয় নিজের পরমায়ুর আঁচ পেয়েছিল, তাই যতটা পেরেছে ঢেলে দিয়েছে। এখন গয়না বলতে ওর দু'হাতে দুটো বালা, আঙুলে একটা সরু আংটি, দু'কানে দুটো ছোট ফুল দুল আর গলায় সাদামাটা হালকা চেনহার। দামী গয়না আর দামী পোশাক-আশাক সব বাক্সে তোলা। মাঝে মাঝে খুলে দেখে আর গোছগাছ করে রাখে। আগে বলত, ও-সব সানু-সমুর বউকে দিয়ে দেব। ছোড়দা মারা যাবাব পর এখন আর কিছুই বলে না। সমুর বিবেচনায ওই হালকা রঙেব শাড়ি আর হালকা গয়নায় ছোড়দিকে আগের থেকেও ঢের ভাল দেখায়। ও যে বিধবা, এ যারা জানে না তারা ভাবতেও পারবে না।

সমুকে উপেক্ষা করে সুবর্ণা জগুদার দিকে চোখ ফেবাল।—তুমি এ-সময়ে কোত্থেকে?

—তোমাদের বাড়ি দেখে এলাম...শংকুদা ডেকে পাঠিয়েছিল, তার মেজাজপত্র আজ দুর্যোগপূর্ণ। হাসছে। তোমাদেব আগে থাকতেই আবহাওযার নোটিস দিয়ে রাখলাম।

সুবর্ণার মনে হল, সকালে বেরুবার আগে দাদার মেজাজ তিরিক্ষি দেখেছিল বটে। সেটা নতুন কিছু নয় বলেই তেমন কৌতূহল ছিল না। এখন শোনার আগ্রহ।

কিন্তু তার আগেই ট্রে হাতে বউদি ঘরে ঢুকল। ডিশে ডিশে গরম হালুয়া আর একটা প্লেটে, পাঁজা করা হাতে-গড়া রুটি। তারও মুখখান ব বিরক্তিশূন্য নয়। সর্বক্ষণের মাঝবয়সী ঝি'টা চা তৈবি করছে। আর একটা ঠিকে ঝি আছে, তাকে দিয়ে এ-সব কাজ হয় না। অতএব জুড়োবার আগে খাবারটা নিজেই নিয়ে এসেছে। বেরুবার আগে সুবর্ণা আর তার দাদা একটু ভারী খেয়ে যায়। সুবর্ণা ঠিক একটায় আসে, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে আবার আড়াইটে-তিনটে নাগাদ ফেরে। তার দাদার খেতে আসার কোন বাঁধা-ধরা টাইম নেই। সে রকম ব্যস্ত থাকলে হয়তো এলোই না খেতে। নিজের হাতে খাবার বয়ে আনার ব্যাপারে বউদির আলস্য নেই, মানও খোয়া যায় না। কিন্তু ও-মেয়ে সংসারের কুটোটি নাড়ার জন্য এগিয়ে আসবে না এটাই বিরক্তির কারণ। ঘরে যতক্ষণ থাকবে নাটক-নভেল নিয়ে গড়াবে।

ঠক্ করে ট্রে-টা সামনের টেবিলে নামিযে রেখে বউদি ওকেই বলল, রান্নাঘর থেকে এগুলো এনে তারপর আড্ডায় বসলে হত না?

বাইরের এই লোকের সামনে বউদির সঙ্কোচ নেই। বাড়ির মধ্যে জগা পাঠক বউদিরই সব থেকে বেশি স্নেহভাজন। কারণ বহু ব্যাপারে এই লোকের জোরটাই

খাঁটি জোর ভাবে সে। বউদির বিরক্তি বা গজগজানি সুবর্ণা গায়ে মাখে না। অহরহ দেখছে।

টুক করে ওধার থেকে জবাবটা দিল সমু। বলল, তোমারই একটু নড়াচড়া বাড়ানো দরকার, মুটিয়ে যাচ্ছ—

বড় বউদির নাম গায়ত্রী। এই তেত্রিশেও পেটানো স্বাস্থ্য। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইদানীং সত্যি যে একটু মোটার দিকে ঘেঁষছে সে কেবল নিজেই অনুভব করত, আর কারো চোখে পড়েছে ভাবেনি। অতএব রাগ স্বাভাবিক।

—বড় বেশি ফাজিল হয়ে উঠছিস দিনকে দিন, কেমন?

—সত্যি কথা বললেই তোমাদের রাগ। সমুর ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।—আর একটা ভাল খবর দিচ্ছি তোমাকে, এই ক'টি দিনের মধ্যে দাদা তোমাদেব নতুন বাডিব এলাকার ছেলেদের করকরে তিনশোটি টাকা দান করে ফেলেছে—

তিনশো টাকা দানের নামে বউদির মুখে প্রত্যাশিত বিস্ময়েরই আঁচড পড়তে দেখা গেল। সমুর চোখে চোখ রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল প্রথম। তাবপর জগার দিকে ফিরল। হাসি চেপে সুবর্ণা হালুয়ার ডিশ এগিয়ে দিচ্ছে।

—তিনশো টাকা দান করেছে মানে?

জগা পাঠক জবাব দিল, ছেলেগুলো জ্বালাচ্ছিল বোধহয়, দিয়ে দিল...

—তুমি থাকতে দিয়ে দিল। একেবারে তিনশো টাকা?

বিশ্বাস হয় না যেন।

হালুয়া সদ্গতির ফাঁকে হাসছে জগা পাঠকও।—না দিলেও হত, দিয়ে দিলে আমি কি বলব বলুন।

ঝি এসে চায়ের পেয়ালা রেখে গেল। গায়ত্রীর আরো শোনার ইচ্ছে। এমন অবুঝপনা তার স্বামীটি করতে পারে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনশো টাকা খসাব ধাক্কা তার কাছে ছোটখাটো কিছু নয়।

কিন্তু কিছু শোনার আগে বাইরে অপ্রত্যাশিত চেনা পায়েব শব্দ। জুতোর অমন ঠক-ঠক শব্দ তুলে বাড়ির কর্তা ছাড়া আর কেউ ঢোকে না।

সকলেই ঘুরে তাকাল। দরজার কাছে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শংকর চাটুজ্জো স্ত্রীর মুখের ওপরেই রুষ্ট ঝাপটা বসালো একটা।—বেরুবার আগে দোকানেব চাবিটাও পকেটে দিয়ে রাখতে পারোনি?

বলতে বলতে জুতোর ঠক ঠক শব্দ তুলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল আর পরক্ষণেই ফিরে এল। এ ঘরেই এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমু বুঝে নিল এবারের বর্ষণের লক্ষ্য সে। তাই।

—তুই রোজ বাড়ি দেখতে যাস না ইয়ার্কি করতে যাস?

দুই চোখে নীরব নিরীহ প্রশ্ন সমুর। অর্থাৎ আমি আবার কি করলাম?

ফলে দাদার রাগ আরো চড়ল।—তোর ওই হাঁ করে চেয়ে থাকার রোগ আমি ভাল রকম সারাব একদিন—বুঝলি? ও-পাড়ার শয়তান ছেলেরা আমার ইঁট-কাঠ তছনছ করছে সে-খবর আমাকে কণ্ট্রাক্টরের মুখ থেকে শুনতে হবে?

ওদিক, থেকে বউদির সবুর সইল না, আর, তার ফলেই সমুর অব্যাহতি।

ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, তুমি নাকি ওদের তিনশো টাকা দান করেছ?

শংকর চাটুজ্যে থমকে স্ত্রীর দিকে ফিরল। তার পরেই দাঁত কড়মড় করে উঠল—হ্যাঁ দিয়েছি তো, তোমার ভিতরটা ছুবলে যাচ্ছে?

—দেওয়ার দরকার হল কেন? জগু তো বলছিল না দিলেও হত।

সমবয়সী হলেও নিজের দেওর শম্ভু আর জগুকে বরাবর নাম ধরেই ডাকে গায়ত্রী।

—তাহলে আর কি, রাগ ডবল চড়ল, ওই জগুর গলা জড়িয়ে ধরে যন্ত্রণা দূর করোগে যাও—তোমার পাওয়ার হিসেবের সঙ্গে আমার দেওয়ার হিসেব কোনদিন মিলবে না—বুঝলে?

ঘরের বাইরে পা বাড়াল। এই গোছের বচন শুনতেও অভ্যস্ত নয় কেউ। হঠাৎ আত্মস্থ যেন বড়বউদি।—ওকি, সকালেও খেয়ে যাওনি, খেয়ে গেলে না?

—থাক! অসহিষ্ণু ব্যঙ্গ ঝরল গলা দিয়ে।—তিনশো টাকার শোক জুড়োক, তারপর খাবার কথা মনে কোর।

চলে গেল। দুপদাপ পা ফেলে বড়বউদিরও প্রস্থান।

সমুর মতে সকালের শুরুটা ভালই আজ। চোখের খোরাক পাচ্ছে। ভাবার অবকাশ পেলে মনের খোরাকও জুটত। কথাবার্তার ফাঁকে সকলের অগোচরে জগুদার হাসি-মাখা চোরা চাউনি বার কযেক ছোড়দির শরীবটার আনাচে কানাচে ঘুরে আসতে দেখেছে। ওর চোখেই কেবল এড়ায় না কিছু।

বউদিও চলে যেতে জগুদা বড একটা নিশ্বাস ছাডল। হালকা মন্তব্য, ভালই হয়ে গেল একপ্রস্থ—

ছোড়দির চোখে-মুখে সুচারু বিরক্তি।—আর বলো কেন, লেগেই আছে।

টেবিলের ওপর থেকে সমু আধ-পড়া বইটা টেনে নিল। একটা কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারলে সুবিধে। ছোড়দির দিকে চোখ রেখে জগুদা এবার ওর উদ্দেশেই টিপ্পনী কাটল, সমু আজকাল অনেক কিছু পরে আর অনেক মজার মজার কথা বলে—

—হ্যাঁ, পড়াশোনায় জলাঞ্জলি দিয়ে এখন ওইসব ছাইপাঁশ গেলা হচ্ছে, দাদা কোন্ দিন একটা বই নিয়ে উনুনে গুঁজবে তখন শিক্ষা হবে। ছোডদির তিক্ত জবাব।

—না, জগুদার গলায় প্রশ্রযের সুব, একটু আগেই বেশ মজার কথা বলছিল। সমুর দিকে ফিরল, হাসিমাখা চাউনি, বিদেশের মত এ-দেশেও কারা যেন গজাচ্ছে বলছিলি তখন—দেশের সমস্ত আইন-কানুনের ওপর টেক্কা দিয়ে চলে—যেমন অঢেল টাকা তেমনি শক্তি তাদের?

শোনা জিনিসটাই আবার শোনার ইচ্ছে জগুদার, অর্থাৎ ছোড়দিকে শোনানোর ইচ্ছে। সমু জবাব দিল, মাফিয়া—

—হ্যাঁ, সুন্দর নামটা কিন্তু, আচ্ছা খুশিমত অত টাকা কি করে রোজগার করে ওরা? ওসব দেশে তো এখানকার মত ভেজালের ব্যবসা নেই শুনি।

সমু একটু অনুপ্রাস যুক্ত করে জবাবটা দিল, তা না থাকলেও তোমাদের মত ব্ল্যাকমার্কেট আর পারমিট বাগানোর ব্যাপারটা অনেক বড় স্কেলে আছে। তবে

এও সাইড বিজনেস। মাফিয়াদের আসল ব্যবসা মদ আর নেশার ওষুধ আমদানি-রপ্তানি, আর বড় বড় নাইট ক্লাব ফেঁদে মেয়ে যোগানদারী।

সুবর্ণার মুখ লাল একটু। জগুদা না থাকলে ওই শেষের কথাটা বলার জন্য মাথায় একটা গাঁট্টা বসাত।

কিন্তু জগুদার সকৌতুক জ্ঞানের স্পৃহা বাড়ছেই।—কিন্তু মাফিয়াদের কাজটা কি?

—ক্ষমতা বাড়ানো, অনুগতদের রক্ষা করা, তাদের শত্রু নিপাত করা, আর কে কত বড় মাফিয়া সর্দার সেটা জাহির করার জন্য ফাঁক পেলেই অন্য মাফিয়াকে খতম করা।

জগুদা হাসছে। ছোড়দির দিকে ফিরল।—শুনলে কথা?

তার অন্তরতুষ্টি সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। নিজেকে সে ওই গোছেরই অপ্রতিহত শক্তির আধার ভাবে। আর আশা করে, আলোচনার ইঙ্গিত থেকে সুবর্ণার মনেও সেই সম্ভ্রমবোধই জাগবে।

কিন্তু এ আলোচনা সুবর্ণার একটুও ভাল লাগছিল না। ঘড়ি দেখল। সময় হয়ে এসেছে।

পরমুহূর্তে একটা কচি ছেলের গলা-ফাটানো আর্তনাদে সচকিত হয়ে তিনজনেই দরজার দিকে তাকাল। সমুর হাতের বই টেবিলে ফিরে গেছে। আট বছরের বাচ্চু তীরের মত এ-ঘরে ছুটে এসে কাকুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যন্ত্রণার এক হাত দিয়ে আর এক হাত চেপে ধরেছে আর যন্ত্রণায় টাকরা ধরে আছে।

পিছনে তার মা অর্থাৎ বউদি বেলুন-চাকা হাতে আরো ঘা-কতক বসাবার জন্য তাড়া করে এল। যাকে বলে চণ্ডীমূর্তি। আর এক পাজী তাকে বুকে আগলেছে দেখে আরো রাগ হল।—তোকে খুনই করে ফেলব আজ, কতদিন বলেছি ও ঘরের জিনিস ছুঁবি না। বেলুন-চাকার আঘাতটা এবারে ছেলেটার কোমরের নীচের দিকে নেমে আসছে। কিন্তু তার আগে সমু হাতটা ধরে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা মেরে উঠে দাঁড়াল। বড়বউদি গর্জে উঠল, ছাড় বলছি, নইলে তোকেই শেষ করব আমি!

এক হাতে সম্ভব হল না, সমু দু হাতে সামাল দিয়ে বেলুন-চাকাটা কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাড়াকাড়ির ফলে বউদির কাঁধের কাপড় খসেছে, ওর বুকের সঙ্গে নিজের বুকের ক'বার ধাক্কাও লেগেছে।

অত উগ্র রাগের মুখেও হঠাৎই থমকাতে হল তাকে। সমুর হাতের মুঠো যেন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে গেছে। চোখ দুটো শুধু ব্লাউজ-আঁটা বুকের ওপর। আচমকা ধাক্কা খাবার মতই ওই নির্বাক চাউনি।

এক ঝটকায় ওকে ঠেলে দিয়ে মেঝেয় লুটানো শাড়ির আঁচলটা গলায় বুকে জড়িয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে সমুর দিকে তাকাল।

সমু তেমনি চেয়ে আছে। শূন্যদৃষ্টি।

চকিত ব্যাপারটা পিছন থেকে সুবর্ণা বা জগা পাঠকের সঠিক বোধগম্য হল না। কাড়াকাড়ির ফলে শাড়ির আঁচল খসে বড়বউদিকে একটু বে-সামাল হতে দেখেছে, এই যা।

আর এক পশলা চোখের আগুন ছড়িয়ে বউদি হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের বেলুন-চাকাটা তুলে নিয়ে ও-দিকে চলে গেল।

নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না গায়ত্রী। ওর ন'-দশ বছর বয়সে এ সংসারে এসেছে। ও-বয়সের একটা মা-বাপ-মরা ছেলের জন্য যতটুকু করা দরকার, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক করেছে। রেগে গেলে বছর তিন-চার আগে পর্যন্ত বসিয়েও দিয়েছে দু'চার ঘা। এখনো হম্বি-তম্বি-গর্জন ওর ওপরেই সব থেকে বেশি চলে। সেই ছেলে তলায় তলায় কোন পর্যায়ের শয়তান হয়ে উঠেছে ভেবে পায় না। এখন মনে পড়ছে প্রায়ই আজকাল চুপচাপ ও-রকম মুখের দিকে চেয়ে থাকে বটে। ও যেন তখন ঠিক নিজের মধ্যে থাকে না। ছোঁড়াটা বদলে যাচ্ছে কি-বকম এই শুধু মনে হয়েছে।...বাইশ বছরের একটা ছেলের এই তেত্রিশ বছরের দেহটাই যে লক্ষ্য এ-চিন্তা মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয় নি। বাচ্চুকে মারধোর করলে ও-ছেলে বরাবরই ওরকম আগলাতে আসে। মেজাজ আজ এমনিতেই উষ্ণ ছিল গায়ত্রীর, তার ওপরে দরজা খোলা পেয়ে ছেলে ওই খুপরি ঘর থেকে দুটো রূপোর তোড়া বার করে পায়ে পরার চেষ্টায় আছে দেখে মাথা সত্যিই গরম হয়ে গেছল। হাতের ওপর বেলুন-চাকার ঘা বেশ জোরেই পড়েছিল। আরো দুই-এক ঘা বসিয়ে ওকে ভালোরকম শিক্ষা দেবার জন্যই ও-ভাবে তাড়া করেছিল তাও ঠিক। সমুর তিরিক্ষি মেজাজে হাত থেকে জোর করে বেলুন-চাকা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। কিন্তু তার পরের মুহূর্তের ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য গায়ত্রীর কাছে।...কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচলটা খসে পড়তে বুক-ঘেঁষা একটা পুরুষের সজাগ দৃষ্টি দেখেছে যেন। মুহূর্তের সেই বিভ্রম আর তন্ময়তাও চক্ষু এড়ায়নি গায়ত্রীর।

দু'বছর আগে পর্যন্ত ওর ওপরের ভাই সুনন্দ অর্থাৎ সানুটার জন্য ভিতরে ভিতরে একটা চাপা ভয় ছিল তার। কিন্তু এ ছেলেটার জন্য কোন উদ্বেগ ছিল না কোনদিন। ওর অস্তিত্বটাই প্রায় অগোচর ছিল সকলের। আজ হঠাৎই যেন একটা নাড়াচাড়া খেল গায়ত্রী। এ ছেলের মতিগতি আবার কোন দিকে গড়াচ্ছে কে জানে। রাগ যত না হচ্ছে তার থেকে অবাকই লাগছে বেশি।

ছোড়দি দোকানে চলে গেছে। মিনিট তিন-চারের মধ্যে জগুদাও উঠেছে। তার মোটর-বাইকের ভট্ ভট্ শব্দও কানে এসেছে। ছোড়দিকে আবার রাস্তায়ই ধরবে জানা কথা। মোটর-বাইক থেকে নেমে প্রায় দোকান পর্যন্ত সঙ্গ নেবে। একেবারে দোকান পর্যন্ত যাবে না, কারণ সেখানে দাদা আছে। দোকানে পৌঁছবার আগেই আবার মোটর-বাইকের শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাবে। চাইলে আরো খানিকটা ভাবতে পারে সমু। ছোড়দির দিকটা ভাবতে পারে। জগুদাকে ছোড়দি ভিতরে ভিতরে খুব একটা পছন্দও করে না, বিশ্বাসও করে না। এক-ধরনের বিতৃষ্ণাও আছে হয়তো। জগুদার যা চরিত্র, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওই অপছন্দ অবিশ্বাস আর বিতৃষ্ণাটুকুই শেষ কথা কিনা সমুর সেই সংশয়। চেষ্টা করলে ও অনেক দূরের চিত্র, দূরের সম্ভাবনা দেখতে পায়। এ এক অদ্ভুত অনুভূতিপ্রবণ মন তার।

কিন্তু এখন আর ওদের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। বাচ্চুর দিকে ফিরল। এমন একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে যেতে হাতের ব্যথা ভুলে ছেলেটা এখনো হাঁ হয়ে আছে। কাকুর এত প্রতাপ ছেলেটা কল্পনা করতে পারে না, খুন করতে এসে মা যেন উল্টে পালিয়েই গেল ঘর ছেড়ে।

সমু ওর হাতটা উল্টে দেখল। বাঁ-হাতের কব্জির ওপর কালসিটে পড়ে গেছে। হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। জলের ধারা দিল। তারপর হাত ধরেই রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

বউদি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। উনুন থেকে কড়াই নামানো। রাঁধুনী রাখার সঙ্গতি অনায়াসেই আছে এখন। কিন্তু গতর খাটাতে আপত্তি নেই বউদির। একটা রাঁধুনী রাখা মানেই কতগুলো টাকার অপচয়, তাকে খেতে-পরতে দেওয়ার দায়। সেই কারণেই রাঁধুনী নেই। সমু সাত-সকালে বাজার সেরে আসে আর বউদি ধীরে-সুস্থে রান্না করে।

বাচ্চুর ধরা হাতটা উল্টে কালসিটে দেখাল সমু। বলল, একটা কচি ছেলেকে এ-ভাবে মার কেন? ও তো তোমার মত সুদের হিসেব কষতে শেখেনি এখনো—

কথা কানে ঢুকল কি ঢুকল না, গায়ত্রীর শাণিত দুই চোখ ওর মুখে বিঁধে আছে।

বাচ্চুর হাত ছেড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল সমু। বউদির দিকে চেয়ে হাসিই পাচ্ছিল। ওই মূর্তি কেন, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। বউদির কাছে আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে সমু সেটা নিজেই জানে। এই ধরা পড়ার মধ্যে কতটা ফাঁক, বউদির সেটা আঁচ করতে পারাব কথা নয়।

দাদার ঘরের ওধারে আরো একটা খুপরি ঘর। খুবই ছোট। ভিতরে ভিতরে বউদি আবার কালীভক্ত একটু। দেয়ালে ঠেকানো জলচৌকির ওপর বেশ বড় একটা কালীর পট বসানো। কালীর পূর্ণাঙ্গ বাঁধানো মূর্তি। দিনের বেলা তার সামনে কিছু ফল-টল আর রাতে জল-বাতাসা পড়ে। বউদির পুজোর কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই। ফাঁক মত দু'দশ মিনিটে পুজো সারে। কোন বিশেষ উপলক্ষ্য উপস্থিত হলে একটু হয়তো বা বেশি সময় দেয়। কালীর এই পট বাবার ছিল। বাবার সেই পূজারত মূর্তি সমুর এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখন বাবার সঙ্গে হামেশাই সে-ও এই ঘরে বসে থাকত। বাবার কথাও মনে আছে।—এই হল আসল মা। তোর আমার সক্কলের মা। মাকে খুব করে ডাকবি, বুঝলি?

সে-ভাবে ডাকার মতি সমুর কোনদিনও হয়নি। বাবা মরে যাবার পরে ও-ঘরে ঢুকতই না বড় একটা। বছর দেড়েক বাদে বউদি এসে ও-মূর্তি বিদেয় না করে উল্টে জল-বাতাসা ফুল-টুল দিচ্ছে এটুকুই লক্ষ্য করেছে। এটা দাদার নির্দেশ ভাবে না, কারণ দাদাকে কোনদিন ভুলেও এ-ঘর মাড়াতে দেখেনি।

বছর দুই আগে ছোড়দা অর্থাৎ সুনন্দ মারা যাবার পরে ভিতরে ভিতরে বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে ওর। একটা অপরিসীম যন্ত্রণায় আর শূন্যতার চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। আপনা থেকেই তখন আবার এ-ঘরে যাতায়াত শুরু হয়েছিল। কোনরকম ধর্মভাব বা সমর্পণের টানে নয়। নিজের মনে ক'খানা ঘরের সর্বত্র ঘুর ঘুর করত। এ ঘরেও আসত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখত। ছবির মূর্তির

চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকত।

বাবার কথা মনে পড়ত।—এই আসল মা, বুঝলি?

মা কে, মা কেমন, সমু জানে না। শুনেছে ওর ছ'মাস বয়সে মা চোখ বুজেছে। তারপর নয় সাড়ে নয় বছর বয়সে বড়বউদি এ বাড়ি এসেছে। সে তখন একুশ বছরের মেয়ে। কেউ যদি তখন ওকে বলত, এ-ই মা—সমুর পক্ষে সেটা ভাবা সহজ হত। কত সময় বড়বউদি ওকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে, জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে, মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছে—আবার তেমন মেজাজ বিগড়োলে নির্দয় শাসনও করেছে। কিন্তু মারুক ধরুক যা-ই করুক, ভিতরটা ওর বড়বউদির সঙ্গে লেপটে থাকতে চাইত। তখনো তার ওপর দাদার দখল-দারির তাৎপর্য বুঝত না। রাতে বা কোন-কোন দুপুরে ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলে ভিতরে ভিতরে দাদার ওপর রেগে আগুন হত ও। দাদার ওপর এই গোছের একটা চাপা রাগ অনেক দিন পর্যন্ত ছিল।

...দু'বছর আগে ওই কালীর মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক-একদিন একটা মজার অনুভূতির তরঙ্গ বয়ে যেত ভিতরে ভিতরে।...বাবা বলত এ-ই মা। মা জাগ্রত। কিন্তু এমন এক বীভৎস মূর্তি মা হবে কি করে? মা মানে তো এক রমণী। রক্তমাংসের রমণী। এই মূর্তি থেকে কি তাকে কল্পনা করা যায়? চেয়ে থাকে—চেয়েই থাকে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে।

...তীব্র-রূপা তনুশ্যামা পয়োধরা।

আশ্চর্য, বাবার মুখে সেই বারো বছর আগে শোনা স্তব-পাঠের একটা অসমাপ্ত পংক্তিও হঠাৎ মনে পড়ে গেছল তার। খুঁটিয়ে দেখেছে। মায়ের চোখ থেকে ওর দৃষ্টিটা তার স্ফীত বক্ষের দিকে নেমে এসেছে। তাও খুঁটিয়ে দেখেছে। তারপর আবার মূর্তির চোখে চোখ রেখেছে।

আসলে ওই ছবির মূর্তি জাগ্রত-টাগ্রত কিছু নয়। নিজের কল্পনায় জাগ্রত মনে হয়। নিজের সন্নিবদ্ধ চোখের আলোয় ওই কালো চোখে আলোর আভাস ফুটেছে মনে হয়। কিন্তু এই কল্পনার কসরতটাই এক-একসময় মজাদার ঠেকেছে তার। নির্নিমেষে খানিক চেয়ে থাকার পর চোখ বুজে কল্পনা বাড়িয়ে চলেছে। তারপর হঠাৎ মনে হয়েছে ওই পটের মূর্তি থেকে এক রমণীমূর্তি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন। সত্যিকারের একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছে ও, তবু চোখ খোলেনি। মনে হয়েছে কবে কোন্ যুগে যেন ওই রমণীমূর্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল সে, অবিচ্ছেদ্য ছিল। তারপর সেই কবে কোন্ যুগে হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একদিন। সেই থেকে একটা নীরব হাহাকার আর ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে আছে ও।

রক্তমাংসের সেই মা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

দেহ নিশ্চল ওর। সমুকেই দেখছে।

দেখেছে, সমু সেই মায়ের দু'পায়ে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদছে, পায়ে চুমু খাচ্ছে, আর পা দুটো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে।...সেই মা বসল। হাসি-হাসি চেনা মুখ। দু'হাতে সমুকে কোলে টেনে নিল। শিশুর মত কোলে শুইয়ে দিল। তারপর ঈষৎ ঝুঁকে পরিপুষ্ট স্তনভার সমুর মুখে গুঁজে দিল।

কত দিন কত কাল কত যুগ ওই সমু উপবাসী ছিল? তৃষ্ণার্ত ছিল?

...আকণ্ঠ অমৃত পান করে চলেছে। ভরে উঠছে। সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। কত কালের একটা জমাটবাঁধা কঠিন বাষ্প যেন হালকা হয়ে তরল হয়ে খসে খসে পড়ছে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে চোখে শান্তির ঘুম নেমে আসছে।

তার পরেই বিষম চমক। স্বপ্নে যেমন এলোমেলো অসংলগ্ন দৃশ্য আসে, যায়--তেমনি তার সামনে দাঁড়িয়ে মা নয়, কোন জ্যোতির্ময়ী মূর্তিও নয়—বড়বউদি। সামনে দিয়ে বড়বউদি চলে যাচ্ছে।

ধড়ফড় করে চোখ তাকিয়েছে সমু। শূন্য খুপরিতে ও একলা।

এ-রকম অভিজ্ঞতা আরো একাধিকবার হয়েছে গত দু'বছরের মধ্যে। ওই ছবির মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক কল্পনার রমণীকে টেনে বার করতে পেরেছে। ও নিজে নয় যেন, ও তো নিশ্চল দাঁড়িয়ে। ওরই ভিতরের ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত একজনের তাগিদে সেই রমণীকে সামনে আসতে হয়েছে। তারপর সেই অননুভূত স্পর্শ, অমৃত পান, মহাশান্তির আশ্রয়।

কিন্তু প্রতিবারই সেই এক আশ্চর্য চমক। সব শেষে বড়বউদির মুখ। সে সামনে আসছে নয়তো সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

অদ্ভুত কোন রোগে ধরল কিনা নিজেই ভেবেছে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স গোছের হয়তো বা উদ্ভট কোন উপসর্গ এসে জুটেছে। পাঁচ ছ'মাস বয়েস পর্যন্ত বাচ্চুকে বুকের দুধ খাইয়েছে বউদি, সমুর বয়েস তখন তেরো-চৌদ্দ। কত সময় ওকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বউদি ধমকে তাড়িয়েছে। মনের তলায় সেই ছাপও পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই বিচিত্র অনুভূতির পর অনেক সময়েই অন্যমনস্কের মত বউদির দিকে চেয়ে থাকে সে। দেখে। কি-যে দেখে নিজেও ঠিক জানে না।

...কিন্তু আজ এই মোহটাই ভেঙে গেছে ওর। বাচ্চুকে নিযে ঝকাঝকির ফলে গায়ে যেন নরম একটা তপ্ত স্পর্শের ছ্যাঁকা লেগে গেছে তার। হাতের মুঠো শিথিল, দেহ অবশ। আঁচল-খসা ওই বুকের ওপরেই প্রথমে দু'চোখ আটকেছে। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সেই দৃশ্যটা সামনে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কল্পনার সেই ঘুম-নামা শান্তি আর তৃষ্ণা উপশমের অনুভূতির লেশমাত্র নেই। তার বদলে একটা স্থূল উষ্ণ তাপ যেন ঢুকছে চোখের ভিতর দিয়ে, কানের ভিতর দিয়ে।

দোরগোড়ায় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে মনে হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।...বউদি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে, ওকেই দেখছে। ঘর থেকে আবার বেলুন-চাকা নিয়ে এসে ওর আষ্টেপৃষ্ঠে ঘাকতক বসাবে কিনা সেটা যেন এই দেখার ফলের ওপর নির্ভর করছে।

হাসিই পেয়ে গেল সমুর। বলল, বেজায় ঘাবড়েছ দেখছি। আঙুল তুলে কালীর ছবিটা দেখাল, বাবা বলত এই মা জাগ্রত।...কিন্তু জাগাতে চেষ্টা করলে সব-শেষে তোমার মুখখানাই এগিয়ে আসত—আজ তার বদলে কি-রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই, দাদা সকালে না-খেয়ে গেছে, ভাল করে রান্না করো গে যাও।

গায়ত্রী থতমত খেল প্রথম। এই ছেলেটাকেই সে ছোটবেলা থেকে দেখে

এসেছে কিনা ভেবে পেল না। কথাগুলো মাথার মধ্যে নড়াচড়া শুরু করতেই ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল।

খুপরির চৌকাঠ ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল সে।

৩

বোসপাড়ায় পা দিয়ে সেখান থেকে বাড়িটা যেখানে উঠছে সেই পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মধ্যেই গায়ে যেন একটু নতুন বাতাস লাগল সমুর। পাড়ার ছেলেরা এদিক-ওদিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। বেলা এখন বারোটার কাছাকাছি। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে এখন পর্যন্ত ওদেব আলোচনার বিষয়বস্তু কি সেটা একনজর চোখ বুলিয়েই সমু আঁচ করে নিল।...ওদের আলোচনা বন্ধ হয়েছে। জোড়া-জোড়া চোখ ওর দিকেই ছুটেছে। বোজ এ-সময় এতগুলো ছেলেকে রাস্তায় দেখা যায় না। আসতে-যেতে যে দু'পাঁচজনকে দেখা যায় তাদেরও কটাক্ষ সদয মনে হয়নি কখনো। উল্টে যে কোন ছুতোয ওর ওপর হামলা করার সম্ভাবনার কথাই ভাবত।

ওদের বিরাগের হেতু বিণা। এদের সম্পর্কে রিণার মনোভাব কি তা নিয়ে ওবা মাথাই ঘামায় না। ওই মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে তারা যে যার শক্তি আর সামর্থ্য অনুযায়ী মনে মনে একটা লাইন বেঁধেছে। তুমি বাপু আসছ এ পাড়ায়, লাইনের একেবারে শেষে দাঁড়াও তাতে খুব আপত্তি নেই। তার বদলে লাইন তুচ্ছ কবে সক্কলকে উপেক্ষা করে হুডমুড় করে একেবারে গোড়ায গিয়ে দাঁড়াবে—এ কেমন কথা! রিণা অবশ্য ওকে আশ্বাস দিয়েছে, ন্যাডাদাকে বলা আছে, তাকে ওরা মান্যিগণ্যি করে, চট করে তোমাকে কিছু বলবে না।

বলা যা-ই থাক, ওদেব হাব-ভাব নরম হওয়ার কথা নয়। নরম দেখেওনি শীগগির।

কিন্তু আজ যেন সত্যিকাবেব নবম মুখ দেখছে সকলের! সমুর অনুমান, ওদের মনের তলায় একটা অনাগত আশঙ্কাও থিতিয়ে আছে। হাসিই পাচ্ছে। কিন্তু হাসলে সব মাটি। পাড়ায় পাড়ায় বুক-কাঁপানো হঠাৎ ত্রাসের তাণ্ডব ইদানীং কমে এলেও ভুলে যাবার মত পুরনো হয়নি। ছোরা লাঠি-সোঁটা অ্যাসিড বোমা নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণের প্রহসন এখনো একেবাবে বাতিল হয়ে যায় নি। দু'চারটে লাশ এখনো মাঝে-মাঝে পড়ে কোথাও না কোথাও। এর একটা পাল্টা প্রস্তুতি সম্ভব। কিন্তু জগা পাঠক আসবে নামলে আর কোন প্রস্তুতির প্রশ্ন ওঠে? সে যদি শুধু একটা হান্টার হাতে দলবল নিয়ে এখানে এসে দাঁড়ায় তো তার হুকুমে ন্যাড়াদা থেকে শুরু করে চাঁদা যারা আদায় করেছে সকলে সুড়সুড় করে লাইন বেঁধে দাঁড়াবে, আর চাবকে একে একে সবাইকে মাটিতে শুইয়ে দিলেও কার কি বলার আছে?...মোটর-বাইকে বসে জগা পাঠক হাসছিল। ওদের অনেকে শুনেছে জগা পাঠকের হাসিটাই নাকি সব থেকে মারাত্মক। ওদের মনের এত কথা সমু চাটুজ্যে জানে না, কিন্তু ভিতরের অস্বাচ্ছন্দ্য ঠিকই অনুভব করেছে।

নতুন বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়াল। কণ্ট্রাক্টর আর তার দু'জন লোক সব

দিকে কড়া নজর রেখেছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বেলা একটা পর্যন্ত কাজ চলবে। তারপর টিফিন-টাইম। এক ঘণ্টার বিরতি। দুটো থেকে আবার পাঁচটা পর্যন্ত কাজ। মিস্ত্রী বা কুলিরা কাজে ফাঁকি দেয় কিনা সেদিকে কড়া চোখ রাখার কথা সমুর। মিস্ত্রী চালানোর দায় কণ্ট্রাক্টরের। চুক্তির কাজ, সময়ে সেটা না হলে তার লোকসান, দাদার কিছু নয়। কিন্তু দাদার মাথায় একটা প্ল্যান ঘুরছে। অমুক মাসের অমুক দিনে পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই নতুন বাড়িতে এসে উঠতেই হবে তাকে। হেরফের হলে কণ্ট্রাক্টর ভদ্রলোক আস্ত থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই মিস্ত্রীদের কাজ তদারকের ব্যাপারে সমুর খুব একটা মাথাব্যথা নেই।

ভিতরে ঢুকে ভিতের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে ওদিকের রাস্তার ছেলেগুলোকে দেখা যায় না। চারদিকে বড় বড় দেয়াল আর থাম উঠছে। সামনের ওই ছোট দোতলা বাড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়িটার জন্য কষ্ট হয় সমুর। রিণার দিদিরা রোজগার মন্দ করে না মনে হয়। কিন্তু রিণা বলে এ-বাড়ি এ-রকমই থাকবে, কোনদিন আর শেষ হবে না। দোতলার দরজা-জানলাশূন্য হাঁ-করা ইঁট বসানো ঘরের আলসেতে রিণাকে দেখা গেল না। পরীক্ষার আগে ওখানে বসেই পেয়ারা চিনেবাদাম বা ডালমুট চিবতো আর পড়াশুনা করত। কি-যে পড়াশুনা করত ও-ই জানে। চোখ ফেরালেই সমু দেখত এ-বাড়িটার দিকে চোখ, নয়তো ওর দিকে।...বলে তো পাস করবে, কিন্তু সমুব সন্দেহ আছে।

আলসেটা এক-হাত সোয়া-হাতের বেশি চওড়া হবে না। পিছনের ইঁটের দেয়ালে ঠেস দিয়ে যে-ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসত আর নড়াচড়া করত, সমুর এক-এক সময় ভয়ই করত। অন্যমনস্কতার দরুন যদি কখনো পড়ে ওখান থেকে, নীচের ইঁট-পাথরে সর্বাঙ্গ থেঁতলে যাবে। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করত। ফলে মাঝে মাঝেই ঘুরে তাকাতে হত ও-দিকটায়। ঘন ঘন চোখাচোখি হত। কখনো বা ভুরু কোঁচকাতে দেখত। সমুর রাগ হত এক-একদিন। পড়াশুনার আর জায়গা পেল না, ওইখানে উঠে বসা চাই। আলাপের আগে পর্যন্ত সমুর ধারণা ছিল, ফ্রক-পরা মেয়েটা এরই মধ্যে পেকে গেছে।

ভিতরের এই জায়গাটা সমুর নিরিবিলিতে সিগারেট খাওয়ারও জায়গা বটে। দু'বছর হল এই অভ্যাসটি হয়েছে। ছোড়দা সুনন্দ মারা যাওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগত না, পাগল-পাগল করত। তখন বেশ লাগত সিগারেট খেতে। প্রথমে ছোড়দির কাছে ধরা পড়েছিল। আশ্চর্য ছোড়দি এটা খুব একটা খারাপ চোখে দেখেনি। কেবল সাবধান করেছিল, দাদা জানতে পারলে তোকে খুন করবে।

সমু বলেছিল, দাদার নেশা তো আরো তিন কাঠি ওপরে।

ছোড়দি ঝাঁঝার দিয়ে বলেছিল, দাদা দাদার পয়সায় খায়, তুই কার পয়সায় খাস?

ছোড়দি এ-কথা বলতে পারে বটে। দাদার কাছ থেকে সমু মাসে পাঁচ টাকা হাত-খরচ পায়। পকেটে পয়সা থাকলে খরচের হাত পঞ্চাশ টাকার মত। তখন ভরসা ছোড়দি। মুখ ফুটে ওর কাছেও চাইতে পারে না। কিন্তু কখন ওর টাকা-

পয়সা দরকার, ঠিক বুঝতে পারে। শার্ট-প্যান্ট ছিঁড়লে সেও ছোড়দিই কিনে দেয়।

ছোড়দির পরে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল বড় বউদির কাছে। মুখে গন্ধ-টন্ধ পেয়েছিল বোধহয়। খপ করে একদিন ওর চুলের মুঠি ধরে মুখটা প্রায় নিজের ঠোঁটের কাছে টেনে এনে গন্ধ শুঁকেছে। তার পরেই উগ্রমূর্তি।—খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস, কেমন? বলি পয়সা আসছে কোথা থেকে? বাজারের টাকা থেকে?

ভাগ্যিস ছোড়দিটা কাছে ছিল। হাজার বকা-ঝকা করলেও সমুর জবাব দেবার ধাত নয়। সেই আট বছর বয়েস থেকে সক্কলের শাসনের ঝাপটা খেতে খেতে ওর সত্তাটাই যেন কচ্ছপের খোলের মত একটা শক্ত কিছুর নীচে চাপা পড়ে আছে। খন খন করে জবাব দিয়েছিল ছোড়দি, বাজারে রোজ কত পঞ্চাশ একশো করে দাও তুমি আর হিসেব না নিয়ে ছাড়ো যে তাই থেকে চুরি করে সিগারেট খাচ্ছে?

পয়সা কে যোগায় বউদি তক্ষুণি বুঝে নিয়েছে।—আসকারা দিয়ে তুই-ই তাহলে গুণ বাড়াচ্ছিস ওর?

ছোড়দিরও তেমনি মুখ বউদির কাছে।—আসকারা দিতে হবে কেন, রোজ যা দেখছে ওর চোখ নেই? গুণ এখানেই থেমে থাকলে বাঁচি—

দাদা রাতে ঘরে বা বারান্দায় বসেই মদ গেলে, ঠেস তাই নিয়ে। রাগে গজ গজ করতে করতে বউদি চলে গেছে। রাগত মুখে ছোড়দি ওকেও বলেছে, দাদা এলে আজ হবে'খন তোর।

কিন্তু কিছুই হয়নি। অর্থাৎ বউদি দাদাকে কিছুই বলেনি। দাদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোড়দি কোনদিন কিছু বলে না। ছোড়দি কেন, কেউ বলে ন। বলত শুধু ছোড়দা সানু। কিন্তু সমুর ধারণা, দাদার ওপর ছোড়দির ভয়ানক একটা চাপা রাগ আছে। কারণও আঁচ করতে পারে, ছোড়দির বিয়েটা দাদাই জোর কবে দিয়েছিল। ছোড়দি তখন তলায় তলায় মেজদার আর এক বন্ধুকে পছন্দ করত। মোট কথা সিগারেটের বদলে সমু মদ ধরলেও ছোড়দি হয়তো দাদার দিকে চেয়ে আক্কেল দেখত।

বরাবরই সস্তা সিগারেট খায় সমু। দিনকে দিন দাম যা বাড়ছে এও ক'দিন জুটবে সন্দেহ। কিন্তু ওর মুখে সিগারেট দেখলেই দোতলার আলসের ওই মেয়েকে ভুরু কোঁচকাতে দেখত। মজা পেয়ে সমুও একটু বেশি সিগারেট খেত এখানে এসে। আলাপ হওয়ার একমাস আগে থেকে প্রত্যহ এমনি নীরব সাক্ষাৎকার চলছিল দুজনার।

পরীক্ষাটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে যেতে মেয়ের পড়াশুনায় একটু বেশি মনোযোগ দেখা গেছে। সেও ওই আলসেতে বসেই। ওখান থেকে পড়ে যাবার ভয়টা সমুর একটা অস্বস্তির মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন থেকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে থাকলে সে অনেক রকমের অঘটন দেখতে পায়। এটাই সত্যিকারের একটা রোগ সমুর। এ আজকের রোগ নয়, অনেক অনেক দিনের। আট বছর বয়সে বাবা মারা যাবার আগে থেকে। যে-সব অঘটনের ছায়া পড়ে আগে থেকে, তার কিছু কিছু বড় মর্মান্তিক রকমের সত্যের পরিণামে গিয়ে ঠেকেছে। এই অঘটন

দেখার রোগটাকেই সমু সব থেকে বেশি ভয় করে। কিছু মনে এলেও সেটা ঠেলে তাড়াতে চায়।

...ওই আলসেতে বসেই রিণা একদিন কি লিখছিল উপুড় হয়ে। সামনে খাতা, পাশে বই। লেখায় মনোযোগ সত্ত্বেও মেয়ে তো সুস্থির নয়। উপুড় হয়েই একবার এদিকে বেঁকছে, একবার ওদিকে। শরীরটা ওই সোয়া হাত আলসে থেকে বেরিয়ে আসছে এক-একবার। এখান থেকেই কতবার আঁতকে উঠেছে সমু। মনের তলায় একটা অঘটনের ছায়া পড়-পড় হয়েছে। ও-দিকে লেখায় নিবিড় মনোযোগ।

শেষে আর থাকতে না পেরে পায়ে পায়ে আলসের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—শুনছ? নামও জানে না তখন পর্যন্ত।

লেখা থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছে মেয়েটা। টানা চোখের বিস্ময়-ঘেঁষা চাউনি। তখনো জানে না, সেই মুহূর্তে ওই দুটো চোখ বড় ভালো লেগেছে তার।

—আর একটু সরে বোসো না, শরীর এক-একবার এদিকে ঝুঁকছে, পড়লে যে একবারে খুন হয়ে যাবে।

মেয়েটা থমকে চেয়ে রইল একটু।—খুন হলে তোমার কি?

—আমার আবার কি, তুমিই আলুকাবলি হয়ে যাবে।

গত পরশু এখানে দাঁড়িয়েই মটরওলাকে ডেকে ওই বস্তুটা খেতে দেখেছিল মেয়েটাকে। সেই ভাষাই মুখে এসেছে।

—আমি আলুকাবলি হলে তোমার কি?

—আমার ভয় করছে, সরেই বোস না একটু, আর ওখানে বসে লেখারই বা কি দরকার?

মেয়ে জবাব দিল, ভয় করলে দুটো বেশি সিগারেট খাওগে যাও।

সমু ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর চোখে মিনতি ছিল সেটা বোধহয় দেখেছে মেয়েটা। লেখা বন্ধ হয়েছে। পিছনের ইঁটের দেয়ালে ঠেস দিয়ে আধা-মোড়া দুই হাঁটুর ওপর বই রেখে পড়া শুরু করেছে। আলসের ধার থেকে একটু সরেও বসেছে। পড়া কেমন হচ্ছে সমু সেটা অনুভব করতে পেরেছে। থেকে থেকে ওর দিকেই তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হলে গম্ভীর মুখে বিরক্তি ফোটানোর চেষ্টা।

...পিঠের ওপর ছড়ানো চুল। পরনে ফ্রক আর ইজের। আধখানা হাঁটু মোড়া, পা দুটো সামনে ছড়ানো। ও-ভাবে বসলে ইজেরের নীচে থেকে পা পর্যন্ত দেখা যায়। মেয়েটার চোখ এদিকে না থাকলে সমু নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখে। আজও দেখা যাচ্ছে, আর অন্য দিনের থেকে ঢের বেশি ভাল লাগছে। এই দেখাটা আগেও ধরা পড়েছে, আজ আরো বেশি পড়ছে। এক মাসের নীরব সাক্ষাৎকার আর নির্বাক চোখাচোখি আজ হঠাৎ যেন একটা সুন্দর শুরুর দিকে গড়িয়েছে।

সমু পকেটে হাত ঢোকালো। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে উঠে এল। একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে ঝোলাল। চোখ দুটো দোতলার আলসের দিকে ঘুরল। মেয়েটা ঘাড় বেঁকিয়ে এবারে সোজাসুজি চেয়ে আছে ওর দিকে। চোখাচোখি হতেই পিছন ঘষটে প্রায় আধ-হাত আলসের বাইরে চলে এল সে। সমু তখনো ব্যাপারটা বোঝেনি, সভয়ে মুখ থেকে সিগারেট নামাল। ওদিকে মেয়েটাও

তক্ষুণি আবার নিরাপদ জায়গায় সরে বসল। সমু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক, তারপর আবার মুখে সিগারেট তুলতেই আবার সেই কাণ্ড। শরীরের খানিকটা আবার আলসের বাইরে। দর্পমাখা চাউনির অর্থ তুমি সিগারেট মুখে দিয়েছ কি আমি এখানে এসে বসছি। সমু ব্যাপারটা বুঝল এবার। সিগারেটটা হাতে নিয়ে ওকে দেখিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল। আর সমুকে ভালরকম নিশ্চিন্ত করার জন্যেই যেন মেয়েও ধুপ করে ওদিকে লাফিয়ে নেমে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

...সেই রাতে সমু ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। এমনিতেই চোখে ঘুম কম। কিন্তু ওই রাতের ঘুম না-হওয়াটা অন্যরকম ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ভিতরে বাইরে একটা আরামের স্পর্শ নিয়ে বার বার হাজির হচ্ছে। পরদিন মেয়েটাকে দোতলায ওই আলসেতে দেখতেই পেল না। সমস্ত দিনের অধীর প্রতীক্ষার পর তার বাগ চডছিল। ইচ্ছে করছিল সোজা বাড়ির অন্দরে গিয়ে ঢোকে। অথচ ওই আলসেতে বসে বলেই সমুর যত দুর্ভাবনা। ওর ধারণা, ইচ্ছে করেই পালিয়ে আছে।

তাব পরদিন দেখা গেছে। তাও বেশ দেরিতে, সাড়ে তিনটের কাছাকাছি তখন। মুখখানা গম্ভীর কিন্তু দুষ্টু-দুষ্টু ভাব। আলসেতে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে যেন বলতে চায় কেমন আক্কেলখানা দিলুম!

দেখা মাত্র সমুব বুকেব ভিতরটা হালকা। মাথা নেড়ে প্রশ্নের ভঙ্গি করল একটা। জিজ্ঞাসা, কি দোষ কবলাম, দেড় দিন কি হয়েছিল?

জবাবে মেয়েটা বড করে জিভ ভেংচালো।

সমু হাসছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করতেই মেয়ের শরীর নড়ে-চড়ে উঠল, অর্থাৎ সে-ও আলসের এ-ধারে আসছে। সিগারেটেব প্যাকেট তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলে সমু দু'হাত জোড কবল। অর্থাৎ অনুমতি ভিক্ষা করল।

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন ঘটল। মেয়েটা ভয়ানক চমকে উঠে ঝুপ করে নেমে অদৃশ্য। ব্যাপারটা কি হল না-বুঝেই সমু পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল। পিছনে দাদা।

এব থেকে বজ্রাঘাত হওয়াও বোধ করি ভাল ছিল। সমু ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কঠিন আরক্ত মুখ দাদার। কৈফিয়ৎ চাওয়া অভ্যাস নেই। বিধান ঘোষণা করল। —আজ বাড়ি গিয়ে জুতিয়ে তোর ছাল-চামড়া তুলব।

সমুও আত্মস্থ একটু। মুখের ওপর বোকা-বোকা চোখ রেখে বলল, তোমার অতটা করার মত কোন দোষ এখনো করা হয়নি।

পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলল। রাগবে কি, শংকর চাটুজ্যে অবাক খানিক। দু'বছর যাবৎ এই ভাইটাকে যেন নতুন করে দেখতে শুরু করেছে সে-ও। কটূক্তি করলে বা গায়ে হাত তুললেও মুখ সেলাই করে থাকে, হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু কথা যখন বলে, এই গোছেরই ফস করে বলে বসে কিছু। সমু চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে দেখছে শংকব চাটুজ্যে, তার ঠোঁটে হাসির আভাস। এই নির্লিপ্ত, নিঃশঙ্ক সত্তার অভিব্যক্তিটুকু ভালই লাগে তার।

...আশ্চর্য, এই ভাইটার অনেক কিছুই যেন ভাল লাগে ইদানীং শংকর চাটুজ্যের। আর সেই কারণে হঠাৎ-হঠাৎ ভয়ানক রাগও হয় ওর ওপর।

পরদিন বাড়ির কাঠামোর এই নির্দিষ্ট জায়গাতে আসতে আসতেই ওই মেয়েকে দোতলার আলসেতে দেখতে পেয়েছে। অপেক্ষাই করছিল যেন। আঙুলের ইশারায় সামনে ডাকল। সমু আলসের নীচে এসে দাঁড়াল।

—কাল একহাত হয়েছে তো?

বুঝেও সমু বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, কিসের একহাত?

—বকুনি? মেয়েটা উদ্‌গ্রীব একটু।

—কেন?

—ওই যে কাল পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তোমার কে হন, দাদা?

—হ্যাঁ।

—ওঁকে তুমি ভয় করো না?

—যমের মত।

মেয়েটা অবাক যেন, তাহলে তিনি কিছু বললেন না তোমাকে?

সমু হাসছে।—কেন বলবে? কি দোষ করেছি?

মেয়েটাও হঠাৎ ভেবে পেল না, সত্যিই কি দোষ করেছে। খুশি একটু। তবু বলল, আমার কিন্তু তোমার দাদাকে ভয় করে।

সমু সায় দিয়ে বলল, সকলেরই করে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

এবারে মেয়েটা চোখ ঘুবিযে দেখে নিল একটু।—পেঁচী! হেসে উঠল।—তোমাব নাম?

—প্যাঁচা।

বই-সুদ্ধ হাত তুলল। ছুঁড়ে মাববে যেন। তারপর হাসিমুখে বলল, আমাব নাম রিণা।

ও বলল, আমার নাম সমীর—সমু।

—তোমার নাম জানতে আমার বয়ে গেছে। তোমার দাদাকে বলে দেব তুমি রোজ আমার পড়ার ক্ষতি কব।

—ঠিক আছে, দাদা এলে এখানে ডেকে নিযে আসব।

তারপর তিন-চারদিন আর ডাকেনি। সমু জানে পরীক্ষা এসেই গেছে ঘাড়ের ওপরে। ওখানে এসে বসেই না। এক আধবাব এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। সমুকে চেনেই না যেন।

দিন তিনেক বাদে পরীক্ষা। সেদিন আবার ওই জায়গায় বসেছে বই নিয়ে। মনে হল পড়া মুখস্থ কবছে। একবার শুধু চোখ বেঁকিয়ে দেখল ওকে—এর বেশি মন দেবার সময় নেই।

সমু আজ পকেটে কিছু জিনিস নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। এক মিনিটের জন্যে দেখা পেলেও ডাকবে ঠিক করেছিল। ওখানে বই নিয়ে বসেছে দেখে মনে মনে খুশি। গম্ভীর মুখে এগিয়ে চলল। তখনো সত্যিই দেখছে না।

—পেঁচী!

চমকে নীচের দিকে তাকাল। তার পরেই চোখ পাকাল।

—নীচে একটু শোন।

—আমার শোনার সময় নেই। কেন?

—এক মিনিট, এলে তোমার উপকার হবে।

—কিসের উপকার?

—পড়ার।

হঠাৎ আগ্রহ দেখা গেল রিণার চোখে। ও ভাবল পরীক্ষার আগে কোন প্রশ্ন-টশ্ন সম্পর্কে হয়তো কিছু বলবে। প্রশ্ন জানাটা তো বিচিত্র ব্যাপার নয় আজকাল। তাড়াতাড়ি নেমে এল। তারপরেই ক্রুদ্ধ।

সমুর এক হাতে ছোট ডালমুটের ঠোঙা, অন্য হাতে একটা লোভনীয় বড ডাঁশা পেয়াবা।

এক থাপ্পড়ে বিণা হাতের ঠোঙাটা মাটিতে ফেলে দিল। অন্য হাতের পেয়ারাটা সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই মাটিতে পড়ে গেল। এ-রকম মেজাজ দেখার জন্য সমু একটুও প্রস্তুত ছিল না। মুখেব দিকে চেয়ে রইল খানিক।

মোড়ানো ঠোঙা থেকে পাঁচ সাত দানা ডালমুট মাত্র মাটিতে পড়েছে। বাকিটা ঠোঙাতেই আছে। সমু সেই ঠোঙাটা পায়ে করে মাড়িয়ে নিজের জায়গায় এসে সিগারেট ধরাল। একটু বাদে চোখ টেরিয়ে দেখল রিণা আবার আলসেতে এসে বসেছে, তার হাতে সেই মস্ত পেযাবাটা। খেতে খেতেই ওপরে উঠেছে। গাল ফুলিয়ে চিবুচ্ছে।

সমু গাল ফুলিযে সিগাবেটের ধোঁয়া টানল।

রিণা ফু করে মুখের একবাশ ছিবড়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারল যেন।

সমু ফু কবে মুখেব ধোঁযা ছুঁড়ল তার দিকে।

একটা মেযে একটা পুরুষেব জীবনে কতখানি, তার অস্পষ্ট কিছু স্বাদ যেন ছড়িযে পড়ছে সমুর ভিতরে ভিতরে। এটুকুরই এক আশ্চর্য অনুভূতি। মেয়েদের নিযে অনেক রকমের চাপা কৌতূহল তার। সেই কৌতূহল নিয়েই কতদিন সে বউদিব দিকে তাকিয়েছে, ছোড়দিব দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু বুকের তলায় এমন একটা অদ্ভুত শান্তিব আমেজ কখনো অনুভব করেনি।

মাথার ভিতবের সেই অনেক কালের জমাট বাঁধা বাষ্পও এক একদিন যেন একেবাবে হালকা হয়ে যেত।

পবীক্ষার ক'দিন মেয়েব আর দেখাই মেলেনি। সমু উদগ্রীব প্রতীক্ষায় থেকেছে। তার মধ্যেও যেন এক ধরনের স্বাদ আছে, আনন্দ আছে। পরীক্ষা কবে শেষ হবে সমু তাও জানে না বলে নিজেব ওপরেই বিরক্ত।

নিজের জায়গাটিতে বসে সিগারেট টানে আর অপেক্ষা করে।

হঠাৎই যেন প্রতীক্ষার শেষ একদিন। ওকে যেতে হল না। রিণা নিজেই এসে গেল। সমু বসা থেকে আনন্দে লাফিয়ে উঠল একেবারে। নিজের চোখ দুটোকেও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না—রিণা আজ বাসন্তী রঙের শাড়ি পড়ে এসেছে। এই প্রথম দেখল শাড়ি-পরা রিণাকে। ফ্রকের থেকে ঢের ঢের বেশি সুন্দর লাগে।

রিণাও চেয়ে আছে ওব দিকে, লজ্জা-লজ্জা ভাব।

—পরীক্ষা শেষ?

—হ্যাঁঃ।

—কেমন হল?

—কে জানে।

—পাস করবে তো?

ভারী বিরক্ত যেন, না করলে তোমার কি?

সমু কি কোনদিন কিছু প্রার্থনা করেছে? সেই মুহূর্তে মনে মনে চাইল ও যেন খুব ভালো পাস করে। জবাব দিল, পাস করলে আমার আনন্দ। ইঁটের পাঁজার ওপর নিজে বসল আবার, পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল, বোস না—

—হ্যাঁঃ, কেউ দেখে ফেললে চিত্তির।

-এখানে বসলে বাইরের কেউ দেখতে পাবে না, আর দেখলেই, আজই না-হয় শাড়ি পরেছ আসলে তো তুমি ছোট মেয়ে একটা।

—কি? চোখ পাকাল।—আমার বয়েস কত জানো?

—কত?

—আঠেরো পেরুতে চলল।

—তাহলে তুমি এখনো ফ্রক পরো কেন?

—শাড়ি পাব কোথায়, দিদিবা বলেছে, বি. এ. পাস করা পর্যন্ত ফ্রকই পরতে হবে—আজ ছোড়দির থেকে চেয়ে-চিন্তে একটা শাড়ি বার করেছি।

বুকের মধ্যে একটা মোচড় পড়ল যেন সমুর। তক্ষুণি মনে হল, এই মেয়েকে একগাদা সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে দিতে পারলে বেশ হত। বলল, কিন্তু ফ্রকও তো আর বিনে পয়সায় হয় না—

—শাড়ির থেকে অনেক কম, আব অনেক বেশি ঢেঁকে—একখানা শাড়ির দাম কত জান আজকাল? সাতাশ টাকার শাড়ি সাতচল্লিশ হয়েছে—

কি যে ভালো লাগছে শুনতে সমুই জানে। সায় দিল, সবকিছুর দামই হু-হু করে বাড়ছে।

রিণা হেসে উঠল।—শুধু মেয়েদের দাম হু-হু করে পড়ছে।

ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেল সমু। কেন জানে না। বলল, তোমার দাম আমার চোখে দিনে দিনে বাড়ছে।

ঠোঁট উল্টে রিণা বলল, তুমি এ-কালেব ছেলেই নও...পাড়ার ছেলেগুলোকে দেখলে বুঝতে, চোখ দিয়ে ছিঁড়ে খায় আমাকে—অসভ্যতাও করত, ন্যাড়াদার ভয়ে পারে না। হেসে উঠল, বেচারা ন্যাড়াদা—

—বেচারা কেন?

তক্ষুণি চোখ পাকাল।—তোমাকে বলতে যাব কেন, ক'দিনের চেনা তুমি?

দুষ্টুমি করে সমু বলল, আমার মনে হয় অনেক জন্মের।

রিণা উৎসুক, মুখে টিপ্পনীর হাসি।—তুমি কবিতা লেখ বুঝি?

—না, কিন্তু এখন থেকে ওই উপদ্রব না ঘাড়ে চাপে। বাড়িয়ে হাত ধরতে গেল।—বোস না একটু—

—খবরদার। ধরতে না দিয়ে পিছিয়ে গেল।—তোমার জন্যে একটা জিনিস

এনেছি, তুমি একদিন পেয়ারা খাইয়েছিলে তো—তাই।

সমু এবারে লক্ষ্য করল, ওর একখানা হাত শাড়ির আড়ালে।—কি জিনিস? হাত বার করল। হাতে বিশটা সিগারেটের সব থেকে দামী প্যাকেট একটা।

সমু অবাক।—কি কাণ্ড, এ যে ভয়ানক দামী সিগারেট—তুমি কিনলে নাকি?

—হুঁঃ, কেনার পয়সা কোথায়! বাড়িতে থাকে, দিদিরা আনে—

শুনে সমু হতভম্ব।—দিদিরা আনে! কোত্থেকে আনে?

—কত রকমের পার্টি-ফার্টি থাকে ওদের। এ-রকম কত প্যাকেটের ছড়াছড়ি হয়—কত লোক ফেলে যায়। ওরা মাঝে মাঝে নিয়ে আসে—

—কেন? তোমার দিদিরা সিগারেট খায় নাকি? জিজ্ঞাসা করে নিজেই লজ্জা পেল। অন্ধ দাদু আছে, তাঁর জন্যে আনে নিশ্চয়।

রিণা ফড় ফড় করে বলল, অত জবাবদিহি করতে পারি না, নেবে তো নাও—

প্যাকেটটা ছুঁড়ে সমুর কোলের ওপর ফেলল।

সমু সেটা তুলে নিয়ে দেখল, আস্ত প্যাকেট নয়, খোলা প্যাকেট। তিনটে সিগারেট কম আছে, অর্থাৎ সতেরোটা দামী সিগারেট আছে ওতে। ওর থেকে একটাও তুলে খেতে মায়া হচ্ছিল, এ-যেন খাবার জিনিস নয়, আগলে রেখে দেবার জিনিস। কিন্তু না খেলে নষ্ট হবে, অতএব একটা বার করে ধরাল। তারপর বড় করে একটা টান দিতে দিতে বলল, আঃ, অমৃত, এমন জিনিস বাপের জন্মে খাইনি।

রিণা সকৌতুকে দেখছিল।—কেন, তোমাদের তো টাকা আছে।

—কে বলল টাকা আছে?

—টাকা না থাকলে এতবড় একটা বাড়ি হচ্ছে কি করে?

সমু আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ঠোঁট উল্টে বলল, দাদার টাকা, দাদার বাড়ি।

—তোমাদের কিচ্ছু না?

—না।

রিণা বলল, তোমার দাদাকে দেখলেই মনে হয় রাগী মানুষ, আমি তো রোজই দেখি—দিদিরাও দেখে এক-একদিন আর তাই বলে। সত্যি রাগী মানুষ?

—খুব।

—তোমাকে বকা-ঝকা করে?

—না, ঘাড়-ধাক্কা দেয়, নয়তো হাত চালায়।

—ও বা-বা! এতবড় ছেলেকে! তুমি কিছু বল না?

—বললে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন খেতে-পরতে দেবে কে? সমু হেসে ফেলল, একটু বাড়িয়ে বলছিলাম, দাদা রাগী মানুষ বটে, তবে আজকাল খুব একটা গায়ে হাত তোলে না।

শুনে রিণা একটু স্বস্তি বোধ করল যেন। অত আরাম করে সিগারেট খেতে দেখে কি মনে পড়ল আবার।—আচ্ছা, তুমি যে ফাজিল ছেলের মত এত সিগারেট টানো, তোমার দাদাকে তো সিগারেট খেতে দেখি না কখনো।

—না। দাদা মদ খায়।

—অ্যাঁ! রোজ?

—রোজই প্রায়।

—মদ খেয়ে হামলা করে না?

—এক-আধ সময় বউদির ওপর করে।

রিণার চোখ বড় বড়।—কি করে মার-ধোর?

হাসি চেপে সমু জবাব দিল, না, অন্য-রকমের কিছু।

হঠাৎ মুখ রাঙা রিণার।—তুমি একটা অসভ্য ছেলে! বলতে বলতে পিছন ফিরে ছুট।

সমুকে আর বাড়ির তদারকে আসার জন্য তাগিদ দিতে হয় না কারো। নিজের তাগিদেই আসে। দাদার আসার আগে পর্যন্ত রিণা আসে, আর তার আসার সময় হবার আগেই পালায়। এক-একদিন সমুকে বাড়ির ভিতর ডেকে নিয়ে যায়। ওর অন্ধ দাদুর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। সে ভদ্রলোক মাটির মানুষ। শুধু অন্ধ নয়, বয়সের দরুন একটা না একটা ব্যাধি লেগেই আছে। কারো সঙ্গে আলাপ হলে নিজের অসুখের কথা, নয়তো বাড়িটা সম্পূর্ণ হল না সেই আক্ষেপের কথা।

নাতনীরা তাদের দাদুকে যতটা সম্ভব আদর-যত্নেই রেখেছে। বিণার দিদিদের সঙ্গেও সমুর আলাপ করার ইচ্ছে খুব। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা হয়নি। রিণার আগ্রহের অভাবেই হয়নি। ওর যেমন দাদার সঙ্গে সম্পর্ক, দিদিদের সঙ্গে রিণারও তাই কিনা বুঝতে পারে না। দিদিদের কোন কোন দিন দেরিতে ডিউটি থাকে। বেলায় বেরোয়। ওর ছোড়দি অর্থাৎ রিসেপশনিস্ট দিদির ডিউটির কোন ঠিক নেই। সে বেশির ভাগ দিনই বারোটায় বেরোয় আর রাত করে ফেরে। যত ওভারটাইম তত নাকি পয়সা তার। নাইট ডিউটি পড়লে ফেরেই না কত দিন। নাইট ডিউটি এয়ার অফিসের বড়দিরও পড়ে প্রায়ই। এরোপ্লেনে চেপে যখন-তখন দিল্লী-বোম্বাইও করতে হয়। কিন্তু বাড়িতে যখন থাকে তখন রিণা কখনো ওকে ভিতরে ডাকে না, বা নিজেও আসে না। একলা বসে তখন সমুর রাগ হতে থাকে, অভিমান হতে থাকে। অথচ দিদিদের যে ও খুব একটা ভয় করে এমনও মনে হয় না। তিন বোনকে একসঙ্গে ওই ন্যাড়া দোতলায় উঠে কতদিন হাসাহাসি করতে দেখেছে।

সমু একদিন বলেই ফেলল, তোমার দিদিদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছ না কেন?

রিণাও গম্ভীর।—ছোড়দিকে তো ন্যাড়াদা বুক করেছে, তোমার কোন্ দিদিকে পছন্দ—বড়দিকে?

কথায়-বার্তায় সেই গোড়া থেকেই আশ্চর্যরকমের সহজ দুজনে। এখন আরো বেশি। সমু জবাব দিল, আমার সকলের ছোটটিকেই পছন্দ।

—ছোটটির সঙ্গে তো আলাপ হয়েইছে, আবার বড়দের কি দরকার?

—একটু ফাউ পেতে ভালো লাগে...।

—অ্যাঁ, রিণা চোখ পাকিয়েছে, দেব ধরে এক চাঁটি! তারপর হেসে বলল, আলাপ করাতে গেলেই সতেরো রকমের জেরা শুরু হবে, ভাববে কত না জানি ভাব হয়ে গেছে—কি দরকার বাবা।

—বেশি ভাব হয়নি?

—ছাই হয়েছে। সুন্দর মুখ মচকে তাচ্ছিল্যের সুরে রিণা বলল, তুমি তো একটা বাউণ্ডুলে ছেলে দাদার ঘাড়ে খাও—আমাকে দিয়ে দিদিদের অনেক আশা।

আহত চোখ মেলে সমু চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপব বড একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি কথাই।

হঠাৎ রাগের কি হল সমু ঠাওর করে উঠতে পারল না। জিভ ভেংচে বলে উঠল, এ-এ-এ—সত্যি কথাই।

দুপ দাপ পা ফেলে চলে গেল। পরদিন আবার যে-কে সেই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে ডাকল ওকে। খানিক আগে ওব বডদি অঞ্জনাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। ছোড়দি শোভনা নিশ্চয় আগেই বেরিয়েছে।

কাছে এসেই সমু জিজ্ঞাসা কবল, কাল হঠাৎ অত বাগ হল কেন তোমাব?

—তোমার বড়দি-ছোডদির সঙ্গে অত আলাপেব শখ কেন?

—তাতে দোষ কি?

—ওরা যদি আমাকে তোমাব সঙ্গে মিশতে বারণ কবে দেয?

—বারণ করলে মিশবে না।

—ফেব রাগাচ্ছ?

—থাক থাক, আলাপে কাজ নেই আমাব। সেই দিনই ওর বডদি ছোড়দি সম্পর্কে আরো একটু কৌতূহল বাডল সমুব। লঙ্কাব আচার দিয়ে তেল-মুড়ি মাখার তোড়জোড় করছে রিণা। সমু ঘুরে ঘুবে বাড়ির একতলাটা দেখছিল। একতলার তিনখানা ঘবের মধ্যে ভালো আব বড দু'খানা ঘরে অঞ্জনা আর শোভনা থাকে। কোণের ঘবটায় দাদুব সঙ্গে রিণা শোয়। এ-খবব সমু আগেই সংগ্রহ করেছিল। দাদুব ঘর দেখা আছে। সে-ভদ্রলোক বোজ দুপুবে টানা ঘুম লাগায়। আজও তাই কবছে নিশ্চয়। যে-ঘরে রিণাব সঙ্গে ও এসে বসে আব গল্প করে, সেটা বসার ঘরই হওয়ার কথা ছিল। সেটাও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেখানেই মুড়ি মাখছিল বিণা।

অঞ্জনা আব শোভনার ঘর দেখে সমু অবাকই একটু। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই ওই দুটো ঘর অমন পরিপাটি কবে সাজানো। ঝকঝকে গদি-আঁটা খাট, ড্রেসিং-টেবিল, আলনা, শো-কেস--সবই আছে। ওরা ভালো চাকরি করে বলে নিজেদের ঘর দুটো শুধু এমন সুন্দর কবে সাজাবে—এটা স্বার্থপরতাব মত লাগল সমুর।

মুড়ি খেতে খেতে সমু হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, তোমার দিদিবা তো ভালো চাকরি করে, বাড়িটা শেষ করে নিতে পাবে না?

খাওয়া থামিয়ে ডাগর চোখ মেলে বিণা চেয়ে রইল একটু।—ভালো চাকরি করে তোমাকে কে বলল?

—শুনেছি। তুমিও তো বলেছিলে মোটা রোজকার করে।

—তা সময় সময় করে। কিন্তু একটা বাড়ি শেষ করতে কত লাগে জান না? নিজেরা তো করছ—

সমু স্বীকার করল, কত লাগে তার কোন ধারণা নেই বটে।

কথায় কথায় রিণা বলল, দাদুর খুব ইচ্ছে, বাড়িটা শেষ হোক, আমারও খুব ইচ্ছে, কিন্তু একতলাই শেষ হল না ভালো করে তার আবার দোতলা—

—কিন্তু একতলাটা তো অন্তত অল্প খরচে শেষ হতে পারে।

—কই আর হচ্ছে, ঝরে জলে আমাদেব যা দুর্দশা হয় না, যেমন রান্নাঘবেব অবস্থা তেমন বাথরুমের।...দশ-বারো বস্তা সিমেন্ট-সিমেন্ট করে দাদুর কত হা-হুতাশ—

সাধ্যের মধ্যে থাকলে সমু তক্ষুণি দশ-বারো বস্তা সিমেন্ট এনে এখানে ফেলত। কিন্তু দাদা তাহলে খুনই করে ফেলবে ওকে। বাড়ি শুরু করার পব থেকে দাদাব মেজাজ যেন আরো তুঙ্গে উঠে আছে।

রিণা হঠাৎ ফিক করে হাসল একটু।—দিদিদের আশা কোন একদিন এ-বাড়িব কাজ আমার দ্বারাই শেষ হবে—আমিই এটা দেখার মত করে ফিনিশ কবতে পারব—

—কি করে?

—বা রে, আমি ওদের থেকে বেশি সুন্দব দেখতে না। বলেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

সমু চেয়ে আছে। বেশি সুন্দর যে তাতে আব সন্দেহ কি। কি বলতে চায় তাও বুঝল যেন। বেশি সুন্দর তাই বড ঘবে বিয়ে হবে, তখন আর বাড়ি শেষ হতে বাধা কোথায়।

মুড়ি বিস্বাদ লাগছে। বুকের ভিতরটা খচ খচ করছে সমুর। দাদা-বউদি, মেজদা-মেজবউদি আর ছোড়দির কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। ছোড়দি বোজ ফার্নিচাবের দোকানে বসে শুনে খুশি।—দাদা মাস গেলে মাইনে দেয় তাকে?

—মাইনে দেবে কি, ছোডদি তো দোকনের চার আনার মালিক। গোডায় গোটা দোকানটাই ওর স্বামীর ছিল—

—ও মা, তোমার ছোডদি বিধবা নাকি?

সমু মাথা নাড়ে।

—ইস। বয়েস কত?

—সাতাশ-আটশ হবে।

—আ-হা, আমার দেখতে ইচ্ছে করে, একদিন দেখাবে?

—দেখিয়ে কি বলব?

—বলবে রিণা। যে বাড়ি হচ্ছে তার পাশের বাড়িতে থাকে।

—ছোড়দি যদি বলে, পাশের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়িতে উঠে আসার সম্ভাবনা নেই যখন, তুই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?

রিণা চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে গেল কেমন। মুড়ি মুখে তুলতেও ভুলে গেল।

এরকম ব্যাপার সমু আগে লক্ষ্য করেছে। এমনিতে খুব হাসিখুশি আর মেজাজী মেয়ে। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ বিমনা হয়ে যায়। সমুর অনেক সময় তাই দেখে মনে

হয়, কিছু একটা চাপা অশান্তি আছে ওর মধ্যে। কিন্তু কিছু বলে না। সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সহজ হতে চেষ্টা করে একসময়। এই দিনেও তাই।

—আচ্ছা এই যে এতগুলো ঘর হচ্ছে নতুন বাড়িতে তোমাদের—তোমার কোন্ কোন্ ঘর?

—কে জানে, একটাই পাব কিনা ঠিক কি? দাদার মতলব দাদাই জানে।

—হ্যাঁ, পাবে না, তোমার দাদাকে কক্ষনো অত খারাপ লোক মনে হয় না আমার।...ওই বাড়ির নাম কিছু হবে না?

—জানি না। বউদি একদিন বলছিল, শশাঙ্ক-ধাম নাম হতে পারে।

—তিনি কে?

—বাবা। আমার বিশ্বাস হয় না, নাম হলে শংকর-ধাম বরং হতে পারে—ওই বাড়িই দাদার ধ্যানজ্ঞান এখন।

দাদার নাম শংকর রিণা জানে। আবাব কি বলতে গিয়ে থমকালো। সমু চেয়ে আছে তার দিকে। এই গোছের চাউনি সময় সময় বড় অদ্ভুত লাগে ওর। চোখে পলক পড়ে না। যেন ভিতরসুদ্ধ দেখতে চায়। অথচ রাস্তার ছেলেগুলো যে-রকম দেখে সে-রকম নয়। বাগ হয় না। অস্বস্তি হয়।

—কি দেখছ?

—তোমাকে।.

—রোজই তো দেখছ, দেখার কি আছে?

—এ-রকম করে নয়, আবো কাছ থেকে...গায়ে হাত দিয়ে...ছুঁয়ে...আরো কি রকম করে আমি জানি না...

রিণা সোজা উঠে দাঁড়াল।—অসভ্যের ধাড়ী কোথাকার, আর কক্ষনো তোমাকে বাড়িতে ডাকব না, নিজেও যাব না।

সমু বলতে চায়নি কথাগুলো, কিন্তু ভিতরের কথা আপনি যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। নিজের দু গালে দুটো চড় বসাতে ইচ্ছে করল তার। রিণা রাগত মুখে চেয়ে আছে তার দিকে।

সমু হঠাৎ আশ্চর্য ক'টা কথা বলল ওকে। হাসিমুখেই বলল, এটা আমার একটা বোগ বোধহয় রিণা। তোমার মত আমার অত বড দিদি-বউদিও বোধহয় অসভ্য ভাবে আমাকে।...রোগটা ধরার জন্য আমি অনেক বই-টইও পড়েছি। একটা বইয়ে দেখেছিলাম, যে-সব ছেলেরা মায়ের বুকের স্বাদ বুকের স্পর্শ কোনদিন পায়নি, তাদের অনেক সময় এই গোছের রোগ দেখা দেয়, আরো অনেক রকম বিকৃতিও হয়। আমার মা ছ'মাস বয়েসে মরেছে শুনেছি, আমার কি জন্যে এ-রকম হয় বুঝি না—সত্যি কথা বললে দোষের হলে তোমার যা খুশি কর।

রিণা হাঁ করে চেয়েছিল ওর দিকে। না, মুখে রাগের ছিটেফোঁটাও ছিল না আর। মুড়ির বাটি নিয়ে আবার কাছে এসেছে। হাত ধরে টেনে বসিয়েছে।

জগুদাকে টেনে এনে দাদা আজ এমন একটা নাটকীয় কাণ্ড করে গেছে এখানে, অথচ রিণার দেখা নেই। না ওপরে, না নীচের দরজায়। শুনেছে তো নিশ্চয়, আশা

করেছিল ওকে দেখা মাত্র ছুটে আসবে।

দেয়ালের আড়ালে বসার জায়গাটার কাছে দাঁড়িয়ে সমু রিণাদের বাড়ির দিকেই চেয়ে রইল। ভাবল হয়তো দিদিরা কেউ আছে তাই আসছে না। কিন্তু দিদিরা থাকলে ও ফাঁক-মত দোতলায় উঠে ইশারায় জানান দেয়।

একটু বাদে ওদের বাড়ি থেকে যে মানুষটা বেরুলো তাকে সমু আশা করেনি। ন্যাড়াদা। নারায়ণ শর্মা। সে-ও ওকে দেখল। দেখে এ-দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পিছনে দরজার কাছে রিণা দাঁড়িয়ে এখন। তার হাসি-হাসি মুখে চাপা কৌতুক।

ন্যাড়াদার মুখখানা বিমর্ষ অথচ ঠোঁটে হাসি টেনে আনার চেষ্টা। এর মধ্যে ন্যাড়াদার সঙ্গে অজস্রবার চোখাচোখি হয়েছে সমুর কিন্তু কোনদিন সে ওকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেছে বলেও মনে হয়নি। আজ ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখার প্রকৃতি সমুব। কিন্তু আজ একেবারে উল্টো কাজ করল। বাড়ি তৈরির তদারকে তন্ময় যেন, চার দিকে তাকাচ্ছে, রিণার গত দিনের দামী সিগারেটের প্যাকেট হাতে উঠে এসেছে। একটা সিগারেট সবে ঠোঁটে ঝুলিয়েছে, পিছনে কারো অবস্থান অনুমান করেই যেন ঘুরে দাঁড়াল। ঈষৎ বিব্রত মুখ তারপর।

হাতে অত দামী সিগারেটের প্যাকেট দেখে ন্যাড়াদাব চোখ ঠিকরলো এক দফা। অন্তরঙ্গ সুরে বলল, খাও না, খাও, এতে দোষেব কি আছে।

নিরীহ মুখে সমু সিগারেটের প্যাকেটটা তার সামনে খুলে ধরল।

—খাব? ন্যাড়াদা দ্বিধায় পড়ল যেন।—কম করে তিরিশ পয়সা দাম যে এক-একটার—আচ্ছা দিচ্ছ যখন খাই। সিগারেট ধরানো হল।—তোমার নাম সমু চ্যাটার্জী, না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রিণা বলছিল চমৎকার ছেলে তুমি।...আমাকে চেনো বোধহয়?

—চিনি, ন্যাড়াদা।

—ভালই তো চেনো তাহলে। অন্তরঙ্গ হাসির চেষ্টা আরো চওড়া হল।—একেবারে সকলের আদরের নামে ডাকলে।...একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে ভাই সকালে...শুনেছ বোধহয়?

—ব্যাটের পঞ্চাশ আর পুজোর আড়াইশো চাঁদা দেওয়ার কথা?

—তোমার দাদা বলেছেন? উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

—না। জগুদা বলেছে।

—ও...আরো শুকনো মুখ।—কি বলেছেন, খুব রেগে গেছেন বুঝি?

সমু অবাক যেন একটু।—সে রাগতে যাবে কেন?

—তোমার দাদা তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন...

সমু নির্লিপ্ত জবাব দিল, নিজের কোন কাজে ডেকেছে হয়তো।...কারো ওপর রাগ হলে দাদা নিজেই তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে পারে, কাউকে ডাকার দরকার হয় না।

সমুর কাজ সারা। ত্রাসের চকিত ছায়া স্পষ্টতর।—ইয়ে...জগুদার সঙ্গে তোমার

দাদার খুব ভাব বুঝি?

—ভাব আর কি, গুরুর মত মান্য করে। দাদার রাগ হলে সে-ও বলির পাঁঠার মত কাঁপে।

নিজের বচনে সমু ভিতরে ভিতরে নিজেই মুগ্ধ। ন্যাড়াদার আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা কাঁপছে।—দেখো ভাই, ওই অল্পবয়সী ছেলেগুলোর জন্যেই এ-রকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল...আমিও না জেনে না বুঝে ঝোঁকের মাথায় ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম...এখন বুঝছি এমন মানী লোককে এভাবে হেনস্থা করা খুব অন্যায় হয়ে গেছে।...কি করা যায় বল তো?

ভাবলেশশূন্য চোখে সমু তার দিকে চেয়ে রইল শুধু।

—ওদের বললেই ওরা ওই আড়াইশো টাকা ফেরত দিয়ে দেবে, তাই বলব?

—বলতে পারেন...কিন্তু ফেরত যে দিতে আসবে সে কি আস্ত থাকবে?

—ও...তাহলে? উৎকণ্ঠার সীমা-পবিসীমা নেই।

—আচ্ছা, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, কিছু ভাববেন না, হাতের সিগারেটের শেষ টুকরো দূরে ছুঁড়ে ফেলল, আমি বুঝিয়ে বলব'খন...একমাত্র আমার কথাই দাদা যা একটু শোনে-টোনে...সকলেব ছোট আদরেব ভাই তো—

অকূলে কূল পেল যেন নাবাযণ শর্মা।—আচ্ছা ভাই আচ্ছা, শুধু দাদার কেন, তুমি আমারও ছোট ভাই আজ থেকে...দাদাকে বোল এ পাড়ার আর কক্ষনো কেউ অমন বোকার মত কাজ করবে না।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ন্যাড়াদা চলে গেল।

একটু বাদে ন্যাড়া দোতলায় রিণাব দর্শন মিলল। ছেলেরা আজ ইতি-উতি জটলা করছে, আজ ও এখানে আসবেই না জানা কথা। হাতের ইশারায় রিণা ওকেই আসতে বলে অদৃশ্য হযে গেল।

...ইদানীং রোজ দুপুরে শাড়ি পরা দেখে ওকে। আজও তাই। সমুর ধারণা, তার ভাল লাগে বলেই দিদিদের কারো না কারো শাড়ি টেনে নিয়ে পরে। রিণা শাড়ি পরলে সমুর শুধু ভালে লাগে না, লোভনীয় মনে হয় ওকে।

ন্যাড়াদার সঙ্গে বাক্য-বিনিময়ের ফিরিস্তি শুনে রিণা হেসে সারা। শোনার আগ্রহে ওর পাশ ঘেঁষে বসেছিল, হাসির উচ্ছ্বাসে ওর পাঁজর আর কাঁধের স্পর্শ পাচ্ছে। একটা অননুভূত তাপের তৃষ্ণা সমুর—সেটা গোপন করার চেষ্টা।

—খুব আক্কেল হয়েছে, সর্বাঙ্গে খুশির তরঙ্গ রিণার, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর--এই শেষেরটুকু ছোড়দি শুনলে আজ তোমাকে রসগোল্লা খাইয়ে দিত। আনন্দে খপ করে সমুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।—তুমি এত দুষ্টু জানতুম না তো!

সমুর একটা হাত ওর কাঁধ বেষ্টন করেছে। তাপের তৃষ্ণা আকণ্ঠ সেই মুহূর্তে। চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছে। কানের ডগা লাল।

—ধেৎ! হঠাৎ থমকে একটা ধাক্কা মেরে সরাল ওকে, নিজেও সরল।—পেটে পেটে কেবল বজ্জাতি তোমার!

ভালই হয়েছে। আর একটু অবকাশ পেলে কিছু একটা হয়ে যেতেও পারত। শুকনো হাসি।—বজ্জাতি কি করলাম?

এই চাউনি আর এই শুকনো মুখ রিণা আরো দেখেছে। রাগ করলেও আগের মত রাগ হতে চায় না। তবু ঝাঁজিয়ে উঠল, এবার থেকে পাঁচ গজ তফাতে থাকব আমি—

সমু বলল, তফাতটা তাহলে পঞ্চাশ গজ হোক, আমি চলি—

—খবরদার! বোস বলছি! পাঁচ গজ না হোক, গজ খানেক ফারাক রেখে আবার বসল রিণা।—কারো আদর না পেলেও তুমি এক নম্বরের আদুরে ছেলে।

—তুমি এত বুঝলেও তো আদর করলে না কখনো।

—আমার বয়ে গেছে। হেসে উঠল, কেন, ন্যাড়াদা অমন আদরের কথা বলে গেল তাতে হল না? .

আবার ন্যাড়াদা-প্রসঙ্গ। সমু বলল, তোমার ছোড়দি অত খুশি হবে জানলে আর একটু না হয় ঠুকে দিতাম।...কিন্তু বেচারা ন্যাড়াদাকে এত অপছন্দ কেন তোমাব ছোড়দির?

—রিণা অবাক।—ন্যাড়াদাকে কারো আবার পছন্দ হয় কি করে—নেহাত ফাই-ফরমাশ খাটার একটা লোক দরকার, তাই যা একটু আসকারা দেয়। মনে মনে আসলে ঝাঁটা-পেটা করে।

সমু গম্ভীর হঠাৎ।—ন্যাড়াদার সঙ্গে আমার তফাত কতটুকু?

—তার মানে? ভুরু কোঁচকাল।

—মানে দুজনেই বাউণ্ডুলে, দুজনেরই একই দশা।

—সত্যি, তোমার জন্যে মাঝে মাঝে এমন ভাবনা হয় আমার। গলায় আন্তরিক সুর এবার।—বি. এ. পাস করার আগেই হুট করে লেখাপড়া ছেড়ে বসলে। তা না হয় হল, দাদার মত একটা ব্যবসা-ট্যাবসায় মন দিলেও তা পার—কিছু তো একটা করতে হবে।

সমু মাথা নেড়ে সায় দিল।—দাদারও সেই জন্যেই খুব রাগ—তার কাঠের কারবারে ঢুকলে খুশি হয়।

—রাগ তো হবেই! তাই করো না কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

—কি ভাল লাগে?

—কিচ্ছু না। অন্যমনস্ক একটু।—আমার ঠিক ওপরে একজন দাদা ছিল, বুঝলে--দু'বছর আগে পুলিসের গুলি খেয়ে মরে গেল। সে ভারী মজার মজার কথা বলত।...বলত, এটা যুদ্ধের কাল, ঘরে যুদ্ধ বাইরে যুদ্ধ, সক্কলের সঙ্গে সক্কলের যুদ্ধ...এমন কি নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ—এই যুদ্ধশেষে সব শ্মশান হয়ে গেলে তার ভস্ম থেকে যদি ভাল করা বা ভাল লাগার মত কিছু গজায়। কিন্তু ছোড়দা জানত না, এই যুদ্ধ দেখাটাও বেশ মজার জিনিস হতে পারে। নিজেও যুদ্ধ করছি আবার সক্কলের যুদ্ধ দেখছিও।...এমন কি ওর গুলি খেয়ে মরাটা পর্যন্ত এখন এক-এক সময় বেশ মজার ব্যাপার মনে হয় আমার।

রিণা হাঁ করে চেয়ে আছে।

চেয়ে আছে সমুও। চোখে-মুখে বুকের তলায় আবার সেই উষ্ণ তাপের তৃষ্ণা।

—খাব? ছাই খাব আমি—উনুনের ছাই—আর সক্কলকে তাই খাওয়াব—বুঝলে? লীলা করতে এসেছেন সব—লীলা করে বেড়াচ্ছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। সমু নিজের ঘরে বসে কাগজের ওপর পেন্সিলের আঁচড় কাটছে। দাদা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় এসে চাপা গর্জন করে উঠছে আবার। বউদি এদিকে আছে সম্ভবত। সে আসামী নয়, তার রিসিভারের ভূমিকা। তাপ খুব বেশি জমাট বাঁধলে দাদা সেটা এ-ভাবে খালাস করে থাকে।

—সকালে উঠেই কতগুলো শয়তানের পেটে আড়াইশো টাকার জলাঞ্জলি, তখনি বোঝা গেছে সমস্ত দিন কেমন যাবে—আর তুমি আছ তোমার খাওয়া নিয়ে।

—না খেলে তো চলে না মানুষেব, সেই কোন সকালে না-খেয়ে বেরিয়েছ—

বউদির নবম গলা। একটু ইন্ধন না যোগালে দাদাব বাগ আরো চড়ে জানা আছে।

—থাক-থাক। আব দবদ দেখাতে হবে না—ঘবের কে কোন দিকে ছুটেছে কোন দিকে না তাকিয়ে, তুমি সুদের স্বপ্ন দেখগে যাও!

আধ মিনিটের বিরতি।

—বাড়ি আসতে উনি নিশ্চিন্ত খবর দিলেন, সুবি সিনেমা দেখতে গেছে! ঘন ঘন সিনেমা দেখা চাই। সিনেমাব তাগিদে হিসেবের খাতায় তিন জায়গায় ভুল!...দোকানে যাবার সময় দেখি পঞ্চাশ গজ আগেব মোড়ে শম্ভুর সেই বখাটে খেলোয়াড় বন্ধু মণ্টু দত্ত হাঁ কবে দাঁড়িযে আছে। আগে একদিন দেখেছিলাম মিনু শিকদার ওই রকম দাঁড়িয়েছিল। সেদিনও শুনেছি সিনেমায় গেছে। এখন বুঝতে পারছ কিছু?

মেজদাব বন্ধু মণ্টু দত্ত আব মিনু শিকদাবেব সঙ্গেও অনেক কালের জানাশোনা সকলের। কিন্তু তাবা ইদানীং বাড়ি আসে না বড একটা।

পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের বিরতি।

—আর ওই শম্ভু শযতানটাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব সে তাব ব্যবস্থা দেখে নিক। ফ্যাক্টরীতে চাকরি করে কোন দিকে তাকানোর সময় হয না তার—আর এদিকে নিজের বউকে বাপের বাড়ি পাঠিযে অন্য মেয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে হাওয়া খাওয়ার সময় হয় তার—ওই জগা যে মেয়েটাকে অত কেলেঙ্কারির পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে —ওই গুণধর তাকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন—আজ নিয়ে দু'দিন দেখলাম —বড় আশায় আছে নতুন বাড়িতে নতুন ঘরে রাজার হালে থাকতে পারবে—দূর দূর করে তাড়াব আমি সব!

এবারে বউদির গলা শোনা গেল।—আমি তো কবেই বলেছি তার মত স্বার্থপরের সঙ্গে থাকা পোষাবে না-সে আলাদা ব্যবস্থা দেখে নিক—

—থাম। তুমি তো সবই আগে বোঝ আগে বল—সুদের হিসেব আর লাভের হিসেব ছাড়া তুমি আর কিচ্ছু বোঝ না—বুঝলে?...আজ থেকে লোডশেডিং-এর জন্য সাড়ে ছটায় দোকান বন্ধ—তাতে কত লোকসান সেই হিসেব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ?

বিশ সেকেণ্ডের মত বিরতি। সমু ঘড়ি দেখছে না। ঘড়ি নেই। সময়টা আঁচ করছে।

—আর ওই যে ছোটটা—ভেজা বেড়ালের মত মুখ করে বসে থাকে—সে পর্যন্ত তলায় তলায় প্রেম করে বেড়াচ্ছে তোমার নতুন বাড়ির পিছনের এক বাড়ির মেয়ের সঙ্গে—সেই তাগিদে রোজ তদারক করতে ছোটে—কি হচ্ছে না হচ্ছে চেয়েও দেখে না—

দেড় মিনিট খানেকের বিরতি। তারপর আচমকা নতুন প্রহসন। বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল বোধহয়, এ-ঘরে আলো দেখে নিঃশব্দে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজের মনেই হাসছিল সমু, আর কাগজটার ওপর মাঝে মাঝে লিখছিল কি। ঘাড় ফিরিয়ে দাদাকে দেখে চমকে উঠল। হাসি মিলিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকল দাদা। ও বাড়ি আছে জানত না। ভ্রূকুটি কুটিল।—হাসছিস যে বড়? খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস, কেমন?

জবাব না দিয়ে সমু নিরাসক্ত মুখে চেয়ে রইল।

রাগের চোটে আরো খানিকটা এগিয়ে এল দাদা।—তোর ওই চোখ দুটো আমি গেলে দেব একদিন—বুঝলি?

সমুর বোকা-চাউনিতে পলক পড়ে না। ওর সামনের কাগজটাব ওপব চোখ গেল দাদার। পেন্সিলে বড় বড় হরফে কি লেখা তাতে। টেনে নিল।

'—দাদা তুমি বোকার মত রাগ করছ, তার থেকে পেট ঠেসে খেয়ে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। লীলার লোভ সকলেরই, তুমি মাঝখান থেকে তাব ওপর প্রভুত্বের পাথর চাপিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরছ—'

নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না শংকর চাটুজ্যে। এ-রকম দুঃসাহস কল্পনার অতীত। তার পরেই চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল।—তোকে আমি চাবুক মেরে শায়েস্তা করব—চাবকে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে বাড়ি থেকে তাড়াব—বুঝলি?

ও-দিক থেকে গায়ত্রী ছুটে এসেছে। সমু দাদার মুখের দিকে তেমনি চেয়ে আছে।

হাতের কাগজটা বউদির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দাদা দুর্জয় রাগে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কি হল হঠাৎ বুঝতে না পেরে বউদিও লেখা কাগজটা তুলে চোখের সামনে ধরল। তারপর তারও দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

—এ-সব তুই লিখেছিস। এরপর আর তোকে আস্ত রাখবে?

একটা হাই তুলে সমীর জবাব দিল, রাখল তো...।

সকালে সেই ঠাকুরঘরের ব্যাপারটার পর থেকেই ঘুরে-ফিরে সমুর কথাই অনেকবার মনে পড়েছে বউদির। ওর চোখে চোখ পড়তে সচকিত হয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

...গায়ত্রীর গরমবোধ একটু বেশি। তারপর রান্নার কাজ সেরেছে। গায়ে ব্লাউজ নেই। শাড়ির নীচে শুধু আঁট ছোট জামা। ওর চোখের ধাক্কায় সচেতন হয়ে ঘর ছেড়ে পালাল। অথচ কাজের সময় এ-রকম বেশবাস তার নতুন নয়।

রাত ন'টা হবে তখন। এর ঢের আগেই সমু নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। অতএব তার ঘরের সামনের বারান্দার অংশটুকুও অন্ধকার। খিদে পেয়েছে। চুপচাপ উঠে দরজার বাইরে মুখ বাড়াল। তারপর আর পা না বাড়িয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দেই একটা দৃশ্য দেখল।

তার ঘরের সামনের বারান্দাব কোণাকুণি কাঠের চেয়ারে বসে দাদা মদ খাচ্ছে। সামনের টেবিলে মদের বোতল। আর বড় ডিশে কিছু খাবার—ভাজাভুজি। বউদি এক-একবার সামনে দাঁড়াচ্ছে আবাব বান্নাঘর থেকে গরম ভাজা এনে ডিশে ঢেলে দিচ্ছে, তারপব আবাব দাঁড়াচ্ছে। দাদার লালচে মুখ দেখে মনে হয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় গেলাস হবে। মুখ গম্ভীর, কিন্তু চাউনি সজাগ। মদ খাওয়ার ফাঁকে চোখ দুটো বউদিব সর্বাঙ্গে ঘুরে-ফিবে বেডাচ্ছে। ওঠা-নামা করছে। বউদিও ব্যাপারখানা বুঝতে পারছে। দাদাব সঙ্গে এক-একবার চোখাচোখি হতে তার চোখে-মুখে আর ঠোঁটেব ফাঁকে এক ধবনেব চাপা হাসি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। সাদা বাংলায় ইঙ্গিতজ্ঞা সুলভ তোষামোদের মূর্তি বউদির।

হঠাৎ দাদা ঘাড বাড়িয়ে পিছনেব দরজার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষ মুখ। চেয়ার ঠেলে উঠে সেদিকে গেল। আট বছবের বাচ্চু দরজার সামনে মেঝেতে ব?? ?খেলা করছিল বোধহয। ঠাস কবে একটা চড় পড়ল তাব পিঠে। সেই সঙ্গে গর্জন।—তোকে না ঘুমোতে যেতে বললাম? যা—পাঁচ মিনিটের মধ্যে না ঘুমোলে তোকে আমি তুলে আছাড দেব।

রাগত মুখে আবাব এসে চেযাব টেনে বসল।

সমুর মনে হল চড়টা যেন ওব পিঠেই এসে পড়ল। এতবড মারটা খেয়েও ওইটুকু ছেলে মুখ দিযে টুঁ-শব্দটি বার কবল না।

ঘব থেকে বেরিয়ে সোজা দাদাব ঘরের দিকে এগোল সমু। দাদা তাকাল তার দিকে। বউদিও। কিন্তু সমুব ভ্রূক্ষেপ নেই। দাদাব চেযারেব পিছন দিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

বাচ্চু শুয়ে আছে উপুড হযে। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। গাযের গেঞ্জি আর জামার ওপব দিয়ে চড়টা পডেছে। তুলে দেখল। ফর্সা পিঠে পাঁচ আঙুলের পাঁচটা দাগ দাগডা মেরে বসে গেছে। টেনে খাট থেকে নামা? ওকে।—আয়।

হাত ধরে ঘর থেকে বাব কবে আনল তাকে। আবো ঘাবড়ে ছেলেটা শক্ত হয়ে আছে।

ধমকের সুরে দাদা বলল, কোথায নিয়ে যাচ্ছিস ওকে?

—আমার ঘরে।

—কেন? এবারে আরো রুষ্ট।

—আমার সঙ্গে শোবে।

—কে? দ্বিগুণ অসহিষ্ণু।

—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর ঘুম আসবে না—পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়েছে, আরো কিছু পড়তে পারে।

দাদার মুখের ওপর থেকে দু'চোখ বউদির দিকে ফিরল একপ্রস্থ। বউদি নির্বাক। দাদার নেশা ছোটার উপক্রম। যেটুকু বোঝাবার তাদের বুঝিয়ে দিয়েই বাচ্চুকে নিয়ে সমু নিজের ঘরে ঢুকল। আলো না জ্বেলে ওকে বিছানায় তুলে দিল।—শুয়ে পড়।

ওইটুকু ছেলেও যেন ব্যাপারখানা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। সকালেও মায়ের হাত থেকে বেলুন-চাকা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দাপট দেখেছে এক প্রস্থ। পিঠের জ্বালা ভুলে জিজ্ঞাসা করল, বাবা আর কিছু বলবে না?

—না, তুই ঘুমো।

আট বছরের ছেলেটা আনন্দে আটখানা।

সুবর্ণা ঘরে ঢুকল সাড়ে ন'টায়। বারান্দা অন্ধকার তখন। মেজদার ঘরের শেকল তোলা অর্থাৎ ফেরেনি। শুধু রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, আর পর্দা ফেলা দাদার ঘবে। ওর আর সমুর ঘরেরও আলো নেভানো।

পা টিপে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেই থতমত খেলে একটু। ভেবেছিল সমুও ঘরে নেই।...বাচ্চু ওর বিছানায় ঘুমোচ্ছে, আর সমু পাশে বসে। সমুব ভ্যাবলাকান্ত মুখের দিকে চেয়েই সুবর্ণার খটকা লাগল কেমন। কিছু একটা ঘটলে ও এই বকম করে তাকায়।

—কি হয়েছে রে?

—অনেক কিছুই হয়েছে।

সুবর্ণার চোখে চকিত শংকার ছাযা।—কি বল না? দু'পা কাছে এগিয়ে এল।

সমু চেযেই ছিল। অল্পস্বল্প সাজে সত্যি বেশ দেখায় ছোড়দিকে। ব্লাউজটা বরাববই চকচকে সাদা পরে ছোড়দি—হয় ফুলভযেলেব নযতো চিকনের।

সমু বলল, প্রথম নম্বর, সকালে আড়াইশো টাকা খসাব দরুন দাদার মেজাজ গরম, সে তো জানিস।

সুবর্ণা নীরবে মাথা নাড়ল।

—দ্বিতীয় নম্বর, তুই ঘন ঘন সিনেমা দেখিস—সিনেমা দেখার তাগিদে আজ তুই হিসেবের খাতায় তিন জায়গায় ভুল করেছিস।

—বেশ করেছি। সুবর্ণা হঠাৎ রেগে গেল—ভুল মানুষের হয়, দাদা চেঁচামেচি করে বলল?

পরের জবাবটা না দিয়ে সমু আগেবটুকুর দিল।—দাদার ধারণা, তোর ভুল হয়েছে মণ্টু দত্তর জন্য, সে আগের রাস্তায় মোড়ের মাথায় হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল তোর জন্যে। তার আগে একদিন মিনু শিকদারকেও ওই রকম দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। দাদার ধারণা আজ তুই মণ্টু দত্তর সঙ্গে সিনেমায় গেছিস।...তার ধারণা যে ঠিক নয়, তুই মণ্টু দত্তর সঙ্গেও যাসনি সিনেমায়ও যাসনি সে-কথা আমি বলিনি।

শেষেরটুকু শুনে সুবর্ণা আচমকা বিস্ময়ে বিমূঢ় একটু। সামলে নেবার তাগিদে রাগ দেখানোর চেষ্টা।—দেখ, তুই ভালো হাতে মার খাবি আমার হাতে কোন দিন—

তারপর শোন—তিন নম্বর—শম্ভু শয়তান, মানে মেজদা নিজের বউকে বাপের

বাড়িতে রেখে এখন অন্য মেয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে...জগুদা অত কেলেংকারিব পর যে মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মেজদাকে দাদা সেই মেয়েকে নিয়ে মোটবে আজও হাওয়া খেতে দেখেছে, আগেও একদিন দেখেছে। নতুন বাড়িতে ওঠার আশায় ছাই দিয়ে তাকে দূর করে তাড়ানো হবে।

আলস্যমাখা চোখ দুটো সমু ছোড়দির মুখের ওপর তুলল।—যেতে দে, জগুদা তার আগেও তিন-চারটে মেয়ের দফা-রফা করেছে—তারা সকলেই বাজে মেয়ে সবাই জানে—দাদাও জানে। তাবপর চার নম্বব আমি। এদিকে ভেজা-বেড়াল-মুখো, ওদিকে বাড়িব তদাবকে বেরিয়ে সেখানকার একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছি। আঙুল তুলে টেবিলেব ওপরের পেন্সিলে লেখা কাগজটা দেখাল।—তারপর ঘরে ঢুকে আমাব লেখা ওই কাগজটা হাত থেকে টেনে নিয়ে দেখল। আর তারপর গলা দিয়ে ডবল কামান দাগল—

কিছু না বুঝেই সুবর্ণা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাগজটা তুলে নিল। পড়াব পর ওবও মুখেব সূচারু বিস্ময়েব কারুকার্যটুকু দেখার মতো। চোখ কপালে।—এ-সব তুই লিখে বেখেছিস আর দাদা দেখল?

—বউদিও। আমি কি কেউ দেখবে ভেবে লিখেছিলাম।

তাবপব? সুবর্ণা উদগ্রীব।—দাদা দিল না ধবে দু'ঘা?

—মুখে দিল। বলল, চাবুক মেবে শায়েস্তা কববে—চাবকে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে বাড়ি থেকে তাড়াবে।

—ইস, চাবকালেই হল! এই ভাইটাকে হঠাৎ কি-যে ভালো লাগছে সুবর্ণাই জানে। কিন্তু মাত্র দুটো বছরেব মধ্যে কত যে বদলে গেল ও ভেবে পায় না। পবক্ষণে উৎসুক।—কিন্তু তুই কি সত্যি সত্যি কোন মেযের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছিস নাকি?

জবাব না দিযে সমু চুপচাপ চেয়ে বইল তার দিকে।

উসকে দেওযাব মতো কবে হাল্কা সুরে সুবর্ণা বলল, বল না রে হাঁদা—হাঁ কবে চেযে আছিস কি?...এক পয়সার মুবোদ নেই, তো সঙ্গে প্রেম কবতে যাবে কোন বোকা মেযে।

সমুব চাহনিটা আবাব অদ্ভুত ঠেকেছে। আগ্রহের সুরে আলতো করে জিজ্ঞাসা কবল, প্রেম কাকে বলে রে?...ছোড়দা বলত, যুদ্ধের কাল...যুদ্ধের কালে প্রেম জিনিসটা কি?

চুলেব মুঠি ধরে সুবর্ণা আচমকা ওকে মাটিতে টেনে ফেলে দিল।—যুদ্ধের কালে প্রেম জিনিসটা এই। বলেই শাড়ি আর তোয়ালে টেনে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। আসলে পালিয়েই গেল। এ ছেলেকে আর একটুও বিশ্বাস নেই। কোন কথা থেকে বেফাঁস কি বলে বসবে আবার কে জানে!...সানুটার জন্য এক ধরনের ভয়, কিন্তু ওকে তবু বোঝা যেত। এটাকে বোঝাও যায় না বলে এর জন্যে ভয় যেন আরো বেশি।

ও এ-রকম হয়ে উঠল কখন? কি করে? কেন?

অন্ধকার শয্যায় শুয়ে বেশ রাত পর্যন্ত এই চিন্তা করছিল গায়ত্রী চাটুজ্যেও।

আর, অন্ধকার শয্যায় শুয়ে আরো বেশি রাত পর্যন্ত ঠিক এই চিন্তা করছিল শংকর চাটুজ্যেও।

সুনন্দ অর্থাৎ সেজভাই সানু বেঁচে থাকতে 'যুদ্ধের কাল' কথা দুটো হামেশাই শোনা যেত এ-বাড়িতে। সামনে থেকে বা দূর থেকে শংকর চাটুজ্যেও অনেক শুনেছে। সানু বলত। রঙ্গ করে বলত, ব্যঙ্গ করে বলত, তর্কে বলত, উচ্ছ্বাসে বলত, রাগলে বলত। এই কথা দুটোর অনেক রকমের বিশ্লেষণ শোনা যেত তার মুখে। সে-সব কানে এলে অবশ্য শংকর চাটুজ্যের রাগই হত বেশি। শুধু ওই 'যুদ্ধের কাল' কথা দুটো তার অপছন্দের ছিল না খুব। এ-কালের সাধারণ মানুষগুলো সব বিচ্ছিন্ন, যে-যার জীবনযুদ্ধে মগ্ন। শংকর চাটুজ্যে নিজেও ব্যতিক্রম নয়। অনেক যুঝেছে, অনেক ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নিজেকে আজ তাই অনেকখানি সফল সংগ্রামী পুরুষ ভাবে সে।

বাবা শশাঙ্ক চাটুজ্যে ছিলেন স্কুল-মাস্টার। অভিমানী স্বভাবের মানুষ। দারিদ্র্যের বড় সংসার সচল রাখার জন্য দিবারাত্র খাটতেন। স্কুলে পড়ানোর আগে-পরে অনেকগুলো টিউশন করতেন। শংকরের ঠিক পরেই একটা বোন ছিল, সেটা তিন বছর বয়সে মারা যায়। তাকে মনে নেই, কিন্তু তাকে বাঁচানোর চেষ্টায় বাবার অনেক খরচ হয়েছিল শুনেছে। যে চারটে ভাই আর বোন বেঁচে তাদের নিয়েই সমস্যা। মা চোখ বুজেছেন সমুর ছ'মাস বয়সে, শংকবের তখন বছর আঠারো—সবে কলেজের মুখ দেখেছে। অন্য চারটে ভাইবোনের মধ্যে শুধু শম্ভু স্কুলে পড়ছে। সুবর্ণা সানু খুবই ছোট।

সমুর জন্মের পর থেকেই মাকে রোগে ধবেছিল। কত কি রোগ সে আব মনে নেই শংকরের। ছ'টা মাস ধরে বাবা কত সেবা করেছেন মায়ের আর কত টাকা জলের মত খরচ করেছেন তাই শুধু মনে আছে। বাবাকে লোকে বিশ্বাস করত, ধার পেতে অসুবিধে হত না। ছ'মাস ঝকাঝকির পর মা গেলেন। সেই কারণেও ওই সব থেকে ছোট ভাইটাকে ভাল চোখে দেখত না শংকর। শুধু বাবাই তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। ওর জন্য গোটা দুই তিন টিউশনিও ছাডতে হয়েছিল বাবাকে।

সংসারের অবস্থা চরমে ঠেকেছে। মায়ের অসুখের দেনার কিস্তি শোধ কবে বাবার হাতে বড় কিছু থাকে না। বাবা তখনো একা যুঝছেন, বড় ছেলেকে ডেকে কিছুই বলছেন না। মাত্র একটা বছর কলেজে পড়েছিল শংকর। তারপর নিজেই পড়া ছেড়ে উপার্জনের রাস্তায় ঝাঁপ দিয়েছে। মনের তলায় অনেক পড়ার শখ ছিল, মন্দ ছাত্র কেউ কখনো বলেনি। ফলে ওই বয়সেই মুখে একটা রুক্ষ ছাপ পড়েছে, বুকের ভেতবটা কঠিন হতে শুরু করেছে।

উপার্জনের পথে নামলেই উপার্জন করা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে গ্র্যাজুয়েট ছেলে বেকার, তার মত আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছেলের দিকে কে তাকায়। কেরানীর কাজ জোটাতে না পেরে শেষে মেহনতী কাজ শুরু করেছে। অভিমান ছাড়তে পারলে এ-রাস্তায় বরং দুটো পয়সা আনা সহজ। খবরের কাগজ ফেরি করেছে, সাইকেল

আব মোটর মেরামতের কারখানায় কাজ করেছে। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাস্থ্য ছিল বটে। নিয়মিত ব্যাযামের ফল। পুষ্টির মধ্যে দু'চার পয়সার আদা-ছোলা খেয়েই ও-রকম স্বাস্থ্য। কিন্তু স্বাস্থ্য আর চেহারা দেখে যারা ডেকে নিত, মেজাজ দেখে তারা আবার একদিন তাড়াত। তার এই মেজাজ দেখে বাবাও কম দুঃখ পাননি। বেদম মারধোর করত ছোটগুলোকে। বাবা বাধা দিতেন না, বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকতেন। কিন্তু বাবার ওপরেও এক ধরনের চাপা আক্রোশ ছিল বড় ছেলের। এই দারিদ্র্যের সংসার এত বড কেন এটাই হযতো রাগের কারণ তার। দারিদ্র্যের সংসারই যে বড় হয় সেটুকু ভাবাব মত সহিষ্ণুতা নেই।

বছব পাঁচেক নানাদিক অলি-গলি চযে বেডাবাব পর মোটামুটি একটু স্থায়ী উপার্জনের পথ দেখতে পেল সে। ধীরেন গাঙ্গুলী তার বাবার ছোট্ট ফার্নিচারের দোকান নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে তখন। স্কুলে শংকরের দু'ক্লাস নীচে পড়ত ধীবেন। বযসেও বছব তিনেকেব ছোট। ববাববকার রুগ্ন ছেলে। স্কুল-ক্যাপ্টেন শংকর চাটুজ্যে তাব কাছে তখন হিমালযসদৃশ পুরুষ একটা। বাড়িব কাছেই থাকত। এ-রকম একনিষ্ঠ ভক্ত শংকরের কমই ছিল। ধীরেনেব বাবা মাবা যেতে দোকান নিয়ে সে চোখে অন্ধকাব দেখছে।

শংকর এগিয়ে আসতে হাতে চাঁদ পেল সে। এমন যোগ্য মানুষ আর কে আছে, আর এত বিশ্বাসই বা আব কাকে কবা যেতে পাবে। তা শংকর চাটুজ্যে যোগ্যতাব আর বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পেবেছে। নিজে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছে, মিস্ত্রী খাটিয়েছে, দরকারে নিজেব হাতে কাঠ পালিশ করেছে। দিনে দিনে খদ্দেরও সে-ই বাডিযে চলেছে। দোকান যেন তাব, ধীবেন গাঙ্গুলী তার নির্দেশে উঠেছে, বসেছে।

গোডাব চুক্তি, লাভের দু'আনা ভাগ পাবে, আব কিছু মাসোহাবা নেবে। মাসোহারা দোকানেব অবস্থা অনুযাযী বাডবে। আব চুক্তি, লাভের অংশ সে ইচ্ছে করলে এই দোকানেই খাটাতে পাববে।

এই উদ্দাম আব উদ্দীপনার তিন বছবেব মুখেই আবার বজ্রঘাত।

বাবাব আকস্মিক মৃত্যু। এক বন্ধুব অপমানেব আঘাতে মৃত্যু।

তখনো হাঁ-কবা দাবিদ্র্যের মধ্যে সংসাব চলছিল। পাঁচ মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ে আছে জেনেও শংকব তেমন গা করেনি। তার সমস্ত মন তখন ব্যবসার দিকে। বাবারই এক পুরনো বন্ধুব বাড়িতে থাকে তারা। বাডি এসে সেই ভদ্রলোক এ-ভাবে বাবাকে অপমান করে যেতে পারেন কল্পনাব মধ্যেও ছিল না। শংকর তখন বাড়ি ছিল না। পরে এসে শম্ভুব মুখে শুনেছে, বহু তাগিদের পরেও ভাড়া না পেয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভদ্রলোক বাড়ি এসে বাবাকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছে, চোর-জোচ্চোর বলে গালাগাল করেছে।

বাবা একেবারে চুপ। সকলে দেখেছে বাবার ফর্সা শরীর একটু একটু করে লাল হয়ে উঠছে। ঘাম হচ্ছে। শংকর বাড়ি এসেও তাই দেখেছে। উত্থানশক্তিরহিত। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। বাতাসের অভাব। ডাক্তার এসেছে, দেখেছে। তক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কবতে বলেছে। কিন্তু সে-সময় মেলেনি।

শংকর অদূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে-কি নীরব আকৃতি বাবার চোখে। বেশির ভাগ সময় তার দিকেই চেয়েছিলেন, তাকেই দেখছিলেন, তাকেই খুঁজছিলেন। দুই চোখের সেই নিঃশব্দ বেদনামাখা আকৃতি তার বুকের ওপর মুগুরের ঘা বসিয়ে গেছে। সেই চোখের ভাষাও সে পড়তে পেরেছিল।

...আর সেই দিন সেই মুহূর্তে শংকর চাটুজ্যের সঙ্কল্পের মধ্যে আজকের এই নতুন বাড়ির অবিচল ভিত গাঁথা হয়ে গেছল। যেখান থেকে কেউ আর কোনদিন অপমান কবে তাড়াতে চাইবে না...বাবার বাড়ি, বাবার হাসি সেই বাড়ির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকবে। সেই শান্তির অঙ্গনে ওদেরও সকলের আশ্রয় মিলবে।

বাবা মারা গেলেন। ধীরেনেব কাছ থেকে আগাম টাকা এনে প্রথমেই বাড়িভাড়া শোধ ক্রেছে শংকর চাটুজ্যে। বাবাব সেই বন্ধুর মুখের ওপর টাকাগুলো শুধু ছুঁড়ে দিয়ে এসেছে, আর কিছু বলেনি। শম্ভু আর তার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু জগা পাঠক, মণ্টু দত্ত আর মিনু শিকদাব তখন বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে। উনিশ-কুড়ির মধ্যে বয়েস। রক্ত গবম। বন্ধুদের সঙ্গে এনে দাদার কাছে শম্ভু প্রস্তাব করেছিল বাবার ওই বাড়িওলা বন্ধুকে এবাব ভালরকম শায়েস্তা করতে চায় তারা।

শম্ভুর গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল শংকব চাটুজ্যে।—ভিখেরিব দশা কবে ঘুচবে সেই চিন্তা করতে পাব না?

তার সেই মূর্তি দেখে বাকি তিন বন্ধু চোঁ-চা দৌড়।

আবার নতুন কবে দোকানের কাজে লেগেছে শংকর চাটুজ্যে। তার সেই উদ্যম আর সেই পরিশ্রমেব পাশে দোকানের মালিক ধীরেন গাঙ্গুলী অস্তিত্বশূন্য। এতটুকু গাফিলতি হলে উঠতে-বসতে ধমক খেতে হত তাকেও। কোথাও বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয়েছে শুনলে শংকব চাটুজ্যে সকলে আগে ছোটে, আর অর্ডার আদায় না করে ফেরে না বড় একটা। কোথাও কেউ নতুন দোকান করেছে শুনলেও তাদের ফার্নিচার সাজানোর অর্ডার পাওয়ার চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে। দোকানের অবস্থা আরো কিছুটা ফেবানোব পব আবার ধীরেনেব সঙ্গে ফায়সলায় বসেছে সে। মৌখিক নয়, কাগজে-কলমে। বাবার মৃত্যুব পর বন্ধুত্বের ওপব আস্থা কমেছে। নতুন চুক্তি, লাভের চার আনা অংশ তার। বাবার মৃত্যুর পর তার মাসিক ববাদ্দ আগেই বাড়িয়ে নিয়েছিল।

এই চুক্তিতেও ধীরেন সানন্দে রাজী। সে জানে ওই লোকের অবর্তমানে দোকান চালাবার ক্ষমতা তার নেই। নিজে তো মাসের মধ্যে সাত দিন শ্বাসকষ্টে ভোগে। সে উল্টে বলেছিল, তোমার ছ'আনাই পাওয়া উচিত।

শংকর চাটুজ্যে বলেছে, সেটা পরে, আগে আমার ক্যাপিটাল বাড়ুক, ক্যাপিটাল খাটুক—অ্যাসেট সমান হলে তখন ছ'আনা কেন, আট আনাই দিতে হবে তোকে।

কিন্তু এ-দিকে সংসারের অবস্থা আরো হতশ্রী হয়েছে। খরচের ব্যাপারে বাধ্য হয়েই সে নির্মম, কঠিন। কেবলমাত্র বাড়ি-ভাড়ার তাগিদ কোনদিন দিতে হয়নি। মাসকাবারে সেটা সে সবার আগে মিটিয়েছে। তারপর যেমন জুটবে তেমনি খাও, না জোটে না খাও। ভাই-বোনদের ওপর শাসনটাও তার অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়াত। দাদার ছায়াও কেউ মাড়াতে চাইত না। এক শম্ভু ছাড়া সকলেই ওরা

স্কুলে পড়ে। পাড়ার এক বাজে স্কুলের হেডমাস্টারকে ধরে ভাই দুটোব ফ্রী পড়ার ব্যবস্থা করেছিল। সুবর্ণা তখন নাইন না টেনে পড়ে—তাব ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পেরেছিল।

গণ্ডগোল বাধত শম্ভুর সঙ্গে। সে তখন বাইশ বছবের লাযেক ছেলে। তার বন্ধুরা রীতিমত মাস্তান হয়ে উঠেছে এক-একজন। বিশেষ কবে জগা পাঠক একজন নতুন এম. এল. এ-ব নেকনজরে পড়েছে, তার বৃহস্পতিব দশা। বন্ধুদেব জোবটা শম্ভুও নিজেব জোব ভাবত। এর মধ্যে দাদাব মাবমুখী শাসন আব বোজগাবেব তাগিদ তার ভাল লাগত না। চড-চাপড খেযে দাদার ওপব রুখে উঠতে চাইত. তার বন্ধুদেরও অনেক সময় অপমানই কবত।

...শম্ভুব দাদা, নইলে বন্ধুবা তাব এই মেজাজেব দেমাক কিছুটা ঠাণ্ডা করে দিতে পাবে। বন্ধুদেবও তাই ধাবণা। বিশেষ কবে জগা পাঠকেব। তাদেব ভরসাতে শম্ভুরও মেজাজ ঠিক থাকছে না। একদিন কি একটা ঘটনায জগা পাঠক আব মিনু শিকদাবের সামনেই শংকব গর্জে উঠেছিল শম্ভুব ওপব, বলেছিল, হয বোজগারেব পাকা ব্যবস্থা কর, নয়তো এ-বাড়ি থেকে বেবোও।

শম্ভুও তিরিক্ষি হয়ে জবাব দিযেছিল, না বেরুলে তুমি—

শেষ করতে পাবেনি। শংকরেব ডান হাতটা বজ্রেব মতই মাথাব ওপব উঠে এসেছে। কিন্তু নেমে আসাব আগেই জগা পাঠক মাঝে এসে দাঁড়িযেছে।

গম্ভীর।—শংকুদা, একটা কথা, অত বড ভাইকে তুমি যাচ্ছেতাই বল, যখন-তখন তাব গাযে হাত তোল—আমাদেব সঙ্গেও ভাল ব্যবহাব কব না। এটা আমাদের কারোরই পছন্দ নয এটা তোমাব জেনে বাখা উচিত।

শংকর চাটুজ্যের কঠিন দু'চোখ তার মুখেব ওপর আটকেছে। তারপব নিজেব বাঁ-হাতখানা সামনে বাডিয়ে ডান-হাতেব আঙুল দিযে চেটোতে ঠুকে বলেছে, আমি আমাব প্রাণটা এই মুঠোয নিযে চলাফেরা কবি, যখন খুশি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি—তোরা কতটা পাবিস্?

শম্ভুকে নিয়ে জগা পাঠক আব মিনু শিকদাব বেবিয়ে গেছে। তিন দিনেব মধ্যে শম্ভু আর বাড়ি ফিবল না।

কিছু একটা ঘটেও যেতে পারত এবপব। কিন্তু তাব মধ্যেই শংকব চাটুজ্যের জীবনের একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। তাব বযেস তখন আটাশ ছাড়িযে সবে উনত্রিশ।

এক ভদ্রলোকের মারফত একটা বিয়ের অর্ডার পাবাব আশায় সে সেই সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতা থেকে একেবারে উত্তব কলকাতাব শেষ পর্যন্ত চলে গেছল। বড অর্ডার হলে এতদূব থেকেও লরি বোঝাই করে মাল দিয়ে আসতে পারলে লাভই থাকবে। সেখান থেকে ফিরতে রাত প্রায় দশটা। নির্জন রাস্তা ধবে আসছিল। বাস পাবে কি পাবে না সেই চিন্তা মাথায়। দিন-কাল ভাল না, একটু বাত হতে না হতে আশপাশের সব এলাকাই নির্জন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শংকর চাটুজ্যে। কে একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে তার দিকেই।...হ্যাঁ একটি মেয়ে। দিশেহারা ত্রাসেই ছুটে এল।—আমাকে বাঁচান—

ওই ওরা আসছে—আমাকে মেরে ফেলবে। বাঁচান আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তিনটে লোক এদিকেই ছুটে আসছে, দু'জনের হাতে খোলা ছোরা। তিনজনেরই পরনে পাজামা আর হাফশার্ট। মুহূর্তের মধ্যে শংকরের মনে হল ওরা ছুটেছে বটে কিন্তু বেশ টলতে টলতে ছুটছে। চকিতে এদিক-ওদিক তাকাল শংকর। পায়ের সামনেই বড় পাথর একটা। চোখের পলকে সেটা তুলে নিয়ে দু'হাত পিছনে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওই তিনজন এসে গেল। খালি হাত যার সে দু'হাতে মেয়েটাকে জাপটে ধরে টেনে নিতে চেষ্টা করল, মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। বাকি দুজনে ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়াল শংকরের দিকে। একজন টেনে-টেনে বলল, প্রাণের মায়া থাকে তো এক্ষুণি পথ দেখ চাঁদ—

পরের মুহূর্তে লোকটার কপাল-নাক-মুখ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মুখ দিয়ে একটু আর্তনাদ বার করারও ফুরসৎ মিলল না, তার আগেই উল্টে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা ছোরা বসিয়েছে পিঠের দিকে, কিন্তু মাতালের হাত বলে হোক বা নড়াচড়ার দরুন হোক ওটা সামান্য মাংস আর কিছু চামড়া কেটে দিয়ে গেল। হাতের পাথর তখনো শংকরের হাতে, লোকটার ছোরা আবার ওপরে ওঠার আগেই শংকরের বাঁ-হাতের ধাক্কায় পা টলে গেল। মদে চুর হয়ে আছে, শূন্যের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় দফা ছোরা চালাল সে—ঝোঁক সামলাবার আগেই তারও মাথা ফেটে চৌচির। তৃতীয় লোকটা চোখের পলকে এই মর্মান্তিক ভোজবাজী দেখে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে সত্রাসে ছুট লাগাল। শংকরের মাথায় খুন চেপেছে তখন—ওই মাটিতে পড়া লোকের মাথা মধ্যে দুটো আরো বারকয়েক পাথরটা দিয়ে থেঁতলে উঠে দাঁড়াল। ওরা জ্ঞান হারাল কি মরেই গেল ঠাওর হল না।

মেয়েটা চাপা আর্তস্বরে বলল, শীগগির পালাতে হবে, ও আরো লোক ডেকে নিয়ে আসবে।

পাশাপাশি ছুটল দুজনে। আরো জোরে ছোটা দরকার, কিন্তু মেয়েটা পারছে না। প্রায় দশ-বারো মিনিট ছুটে আসার পর একটা মোড়ের মাথায় দু-চারটে খোলা দোকানপাট আর কিছু লোকজন দেখা গেল। বরাতক্রমে একটা ট্যাক্সি মিলল সেখানে। শংকরের জামার পিঠ তখন রক্তে চুপসে আছে।

থানা। সেখান থেকে আবার ঘটনাস্থলে ভ্যান ছুটেছে। দুটো লোককেই অচেতন অবস্থায় পেয়েছে তারা। তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

থানায় মেয়েটার এজাহার শুনে স্তব্ধ।

নাম গায়ত্রী রায়। বয়েস বাইশ। বাবা-মা নেই। কাকা গার্জেন। উকীল কিন্তু পসারশূন্য। দরিদ্র অবস্থা। নিজের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ওই তিনটে লোককে গায়ত্রী চোখেও দেখেনি কোনদিন। তিনদিন আগে ছ'টার শোয়ে গায়ত্রী লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গেছল। বাড়িতে বলে গেছল অমুক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে, ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। সিনেমা থেকে বেরিয়ে দেখে ট্রাম-বাস সব বন্ধ। অনেক জায়গায় কি গণ্ডগোল হয়েছে শুনল। মারামারি হয়েছে। বাড়ি দু মাইল দূরে। তার মধ্যে এক মাইল হেঁটেছে তারপর রিকশা নিয়েছে। হাঁটতে ভয় করছিল, তার মধ্যে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিছন থেকে একটা চলন্ত মোটরগাড়ি কিছুটা এগিয়ে গিয়েও

থেমে গেল। গাড়ি থেকে ওই তিনটে লোক নেমে রিকশার দিকে এগিয়ে এলো। তাদের একজনের হাতে রিভলবার, দুজনের হাতে ছোরা। রিকশাওলা রিকশা ফেলে দৌড় লাগাল। কয়েক পলকের মধ্যে গায়ত্রীকে তারা রিকশা থেকে নামিয়ে গাড়িতে তুলে ফেলল। আশপাশের দু-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। দেখেছে। কিন্তু রিভলবাব উঁচনো লোকটাকে দেখে কেউ এগোয়নি তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যেতে এক মিনিটও সময় লাগেনি।

...ওই তিনজন লোকই তিনদিন ধরে অত্যাচাব করেছে তার ওপর। দলে আবো লোক আছে—কিন্তু এরা তিনজনেই মাতব্বর। এইদিনে এরা যখন খুব মদ খাচ্ছিল তখনই ফাঁক পেয়ে সে ছুটে বেরিয়েছিল।

শংকর হাঁ করে মেয়েটাকে দেখছিল। কমনীয় মুখ। ত্রাসে বিবর্ণ। বড় বড চোখে জল টলটল কবছে। প্রায় নিরাভবণ দেহ, শুধু দু'হাতে দু'গাছা সোনার বালা। পরনের বেশবাসও অতি সাদামাটা।

পুলিসের লোকসহ গায়ত্রীকে কাকাব বাড়িতে আনা হয়েছে। সেই দুখানা ঘর আর ভিতরের অবস্থা দেখেই বোঝা গেছে মেয়েটা বাডিয়ে বলেনি, সত্যিই দরিদ্র দশা। কিন্তু পুলিস বিদায় হবাব সঙ্গে সঙ্গে ওই কাকাব ভিন্নমূর্তি। শংকরকে বলেছে, উদ্ধাব করেছেন খুব ভাল কথা, এখন যেখানে পাবেন নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন। এখানে জায়গা হবে না।

মুখেব ওপর দরজা বন্ধ কবে দিয়েছে সেই কাকা।

রাত তখন বারোটা। আশপাশেব সব বাড়ি অন্ধকার। কেউ কিছু টের পায়নি। মেয়েটা কাঠের মত দাঁডিয়ে।

শংকর জিজ্ঞাসা কবেছে, আর আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও আছে?

কলের মত মাথা নেড়েছে। আছে।

—কোথায়?

—কালীঘাটে।

—কে আছেন?

—মাসিমা।

—সেখানে গেলে তিনিও এরকম কববেন?

গাযত্রী মাথা নাড়ল। কববে না।

—বাড়ির ঠিকানা জানা আছে?

জানান দিল, ঠিকানা জানা নেই, বাড়ি চিনি।

মেয়েটার কথাবার্তা পরিষ্কার। মুখখানা কমনীয় বলেই এই নিদারুণ অসহায় মূর্তি দেখলে ভিতরটা খচ খচ করে। এত রাতে ওই কাকাকে আবার দরজা খুলিয়ে খচাখচি করে লাভ নেই ভেবে শংকর মেয়েটাকে নিযে আবার রাস্তায় নেমে এল।

ট্যাক্সিতে কালীঘাট। সমস্ত পথে একটিও কথা হয়নি। থানায় এজাহারের সময় তার পিঠে ডেটল ঘষে বার্নল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন জ্বালাটা অনুভব করছে। তবে সামান্যই কেটেছে।

কিন্তু এখানেও বিভ্রাট। গায়ত্রী বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এল ঠিকই। কিন্তু এত রাতে

কড়া নাড়ার পর ভিতর থেকে অচেনা মুখ বেরিয়ে এল। না, গায়ত্রী রায়ের কোন মাসি-টাসি এখানে থাকে না—সাত মাস হল তারা এ বাড়িতে আছে। এর আগে যারা ছিল তারা কোথায় গেছে সেই হদিসও দিতে পারল না।

গায়ত্রী আবার মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

শংকর জিজ্ঞাসা করল—কতদিন আগে মাসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—সাত-আট মাসের মধ্যে হয়নি।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই ছিল। ওকে নিয়ে আবার উঠেছে। সোজা বাড়ি।

পথে একবার শুধু তিক্তবিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিল, সিনেমা দেখার সাধ ভালোরকম মিটেছে?

যে াড়িতে থাকত তখন, তারই একটা খুপরি ঘরে সুবর্ণার সঙ্গে তাকে রাতটাব মত থাকতে দেওয়া হল। শম্ভু বাড়ি নেই, সে সেই দুদিন আগে বাগ করে বেরিযেছে। দাদার সেই মূর্তি দেখে সুবর্ণাও সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাবেনি, অন্য দু'ভাই তো আরো ছোট।

না, শংকর এই রাতে আর কিছু ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। কাল যা-হয ভাববে।

কিন্তু পরদিন সকালের কাগজেই যে এ-রকম আদ্যোপান্ত রিপোর্ট বেরুবে কল্পনা করে নি। নাম-ধাম দিয়ে তার বীরত্বের খবর ছাপা হয়েছে। গায়ত্রী রায়ের দুর্দশাব বিবরণ লেখা হয়েছে। অবস্থায় যে দু'জন অজ্ঞান দুর্বৃত্তকে আটক করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তারা নাকি নাম-করা দাগী লোক—পুলিস তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সকালে শংকর চাটুজ্যের বাড়ি ঘিরে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। জগা পাঠক, মণ্টু দত্ত, মিনু শিকদার ছুটে এসেছে। এসেছে শম্ভুও। গায়ত্রী রায়কে সশরীরে ঘরে দেখে তাদেরও আর সংশয়ের অবকাশ নেই। জগা পাঠকেব মনে পড়েছে দুদিন আগে এই মানুষ বলেছিল, এই মানুষ নিজের প্রাণটাকে হাতেব মুঠোয় নিযে ঘুরে বেড়ায়, আর যখন খুশি সেটা ছুঁড়ে দিতে পারে।

পারে। নইলে তিনটে শয়তানকে ঘায়েল করে একটা মেয়েকে উদ্ধার কবে আনা সম্ভব নয়।

কিন্তু তখনো শংকর চাটুজ্যের পায়ের ধুলো নেয় নি সে। নিয়েছে আবো ছ'দিন বাদে।

গায়ত্রীকে নিয়ে কি করবে শংকরের পরদিন থেকেই সেই সমস্যা। আবার তার কাকার কাছেই ছুটে গেছে সে। কিন্তু কাকার এক কথা, ও মেয়ের আব তার বাড়িতে ঠাঁই হবে না, ঠাঁই দেবার সামর্থ্যও নেই, তাছাড়া ও এখানে আছে টের পেলে ওই গুণ্ডার দলের আর যারা আছে তারা শোধ নিতে ছাড়বে না--সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে।

হ্যাঁ, খবরের কাগজ পড়ে সাড়া এ পাড়াতেও পড়েছিল। সেখানেও ওই বাড়ির কাছে লোক জড় হয়েছিল। তাদেরও কেউ কেউ গায়ত্রীর উকীল কাকার কথা শুনেছে, আর বুঝেছে এই সেই শংকর চাটুজ্যে যে এ-বাড়ির মেয়েকে উদ্ধার করেছে। বয়স্ক কাকাটির ওপর তারাও সঙ্গে সঙ্গে বিরূপ হয়েছে বোঝা গেছে।

শংকব ঠাণ্ডা গলায বলেছে, মেযে আপনাকে ফেবত নিতে হবে, নইলে যে ভয আপনি কবছেন, সে-কাজটা আমিও কবতে পাবি।

ভদ্রলোক তক্ষুণি হাতজোড কবে বলেছে, আমাকে দযা কবে অব্যাহতি দিন, আমি এমনিতেই আধ-মবা মানুষ।

শংকব বেবিযে এসেছে। তাব তখনো সংকল্প গাযত্রীকে এনে সে এখানেই বেখে যাবে। দবকাব হলে শম্ভুব দলবলকে সঙ্গে নিযে আসবে। পাডাব কিছু লোক তাব সঙ্গে আসতে আসতে মন্তব্য কবল, এই কাকা গবীব তো বটেই, ভিতবটাও মাযাদযাশন্য। মেযেটা ভালো, কিন্তু কি মন্দভাগ্য তাব।

কাকাব কথা শুনে গাযত্রী বলেছে, ভযে এখন নিলেও ক'দিন বাদে অন্যবকম হবে—তখন আব সেখানে থাকা যাবে না। আমি এমনিতেই কাকাব আশ্রয ছেডে আসাব কথা ভাবছিলাম।

শংকব বিবক্ত।—তাহলে কোন আশ্রযেব ব্যবস্থা কবব আমি? কাকাকে ছেডে কোথায যাবাব জাযগা আছে?

গাযত্রী বলল, মাযেব আব মাসিব একজনই গুরুদেব—তিনি নবদ্বীপে থাকেন। তাঁব সঙ্গে মাসিব যোগাযোগ আছে—তাঁকে লিখলে মাসিব ঠিকানা পাওযা যাবে। তাছাডা মাযেব গুরুদেব চেষ্টা কবলে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকাব ব্যবস্থা হতে পাবে। আমাব চাব-পাঁচটা দিন সময দবকাব...।

শংকবেব আবাবও মনে হযেছে মেযেটাব কথাবার্তা বেশ পবিষ্কাব। আব এই দুর্যোগ আব অনিশ্চযতা সত্ত্বেও একেবাবে যেন ভেঙে পডেনি। আব মুখখানা কালকেব থেকে আজ আবো বেশি কমনীয লাগছে।

হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞাসা কবল, লেখাপডা কিছু কবা হযেছে?

গাযত্রী জানাল, হাযাব সেকেণ্ডাবী পবীক্ষাব ছ'মাস আগে মা মাবা যায। পবীক্ষা দেওযা হযনি।

বাডিতে কম সমযই থাকত শংকব চাটুজ্যে। কিন্তু যেটুকু সময থাকত, তিনদিন ধবে গাযত্রীকে লক্ষ্য কবেছে। নবদ্বীপে চিঠি লেখা হযেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে সে মাথা নেডেছে। হযেছে। উদ্বিগ্ন মুখ, কিন্তু কমনীয। প·দিনই সকালে সুবর্ণা দাদাকে বলেছিল, বাঁধতে জানেন বলেছেন...বাধবেন কি না তোমাকে জিজ্ঞেস কবতে বললেন...

শংকব বলেছিল, আপত্তিব কিছু নেই, তবে কি দবকাব...

সুবর্ণাব ষোল-সতেবো বছব বযস তখন। দু'বেলাই তাকে বাঁধতে হত। সেই দুপুবেই খেতে বসে বান্নাব হাত বদল হযেছে টেব পেযেছে শংকব।

চাব দিনেব দিন হঠাৎ মন স্থিব কবে ফেলল শংকব চাটুজ্যে। এই তিন দিন খুব একটা কাজে মন বসছিল না বলে নিজেব ওপবেই বিবক্ত হচ্ছিল। চতুর্থ দিন সকালে বেরুবাব জন্য প্রস্তুত হযে বান্নাঘবেব দিকে পা বাডাল। সুবর্ণা আব দু'ভাইযেব স্কুলেব দরুন সকালেই বান্না চাপে। এ কর্ণ.নই সুবর্ণাকে কিছুই কবতে হচ্ছে না।

গাযত্রী বাঁধছিল। সুবর্ণা পাশে দাঁডিযেছিল। শংকব তাকে বলল, তুই ওদিকে যা একটু—

চলে গেল। গায়ত্রী ওদিক ফিরে কড়াইয়ে নাড়ছে কি। গলার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ থেকে কোন খবর এল কি না ভেবে উতলা। গলার স্বর খুব একটা আশাপ্রদ মনে হয় নি তার।

—শোন। দরকারী কথা আছে।

কড়াইটা পাশে নামিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল।

—নবদ্বীপ থেকে চিঠি এলে তুমি নবদ্বীপে চলে যেতে পার, কিন্তু আমার দিক থেকে আমি আর একটা প্রস্তাব দিচ্ছি।...এই আমাদের সংসারের অবস্থা, আমি সামান্য একটা ব্যবসায় দাঁড়াতে চেষ্টা করছি, আশা করছি ভবিষ্যতে ভাল হবে। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। এখন তোমার ইচ্ছে।

এই শুনবে গায়ত্রীর স্বপ্নের অগোচর। চোখ তুলে তাকাল। চেয়েই রইল। দু'চোখে জল টলমল করে উঠল।

চোখে জল থানায় এজাহার দেবার সময়ও দেখেছিল। আর আজ দেখল।

—শোন, আমি নিজেও কখনো কাঁদি না, কান্নাকাটি পছন্দও করি না। আর দুদিন বাদে একটা বিয়ের তারিখ আছে, তারপর ভাদ্র আশ্বিন দু'মাসের মধ্যে আর বিয়ের তারিখ নেই। তুমি রাজী হলে ওই পরশুর তারিখেই বিয়ে হবে...আর আমাদের বিয়ে আমাদের মত করেই হবে, উৎসবের কোন প্রশ্ন নেই।

গায়ত্রী নির্বাক দাঁড়িয়ে।

—তুমি চুপ করে থাকলে আমি বুঝব কি করে। যা হয়ে গেছে তার জন্যে তোমার ভাবনার কারণ নেই, আমি ওসব কেয়ার করি না, অ্যাক্সিডেন্ট—অ্যাক্সিডেন্ট।...আমি ধরে নেব তুমি রাজী আছ?

গায়ত্রী মাথা নাড়ল। ধরে নিতে পারে।

বিয়ে হয়ে গেল। শম্ভুর দলবল এল। আর পাড়ার দু-দশ জন। বীরেন গাঙ্গুলী তো বলতে গেলে বাড়ির লোকই।

এইদিনই জগা পাঠক শংকরের কাছে এগিয়ে এসে সোজা পায়ের ওপর কপাল ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠল একটা। বলল, শংকুদা, এ-পর্যন্ত যা বলেছি যা করেছি মাপ করে দাও। আজ থেকে তুমি আমার গুরু—আর এই দুটো হাত তোমার দাস।

শংকরও সেদিন হাসিমুখে জগা পাঠককে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

ভবিষ্যতের সাফল্যের পিছনে শংকর চাটুজ্যের পুরুষকারই বড় কথা, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে এই জগা পাঠকই তাকে অনেকখানি তড়িঘড়ি এগিয়ে দিয়েছে।

আজকের এই দিন তখনো অনেক দূরের স্বপ্ন। শংকর চাটুজ্যে আবার সেই দিবারাত্র পরিশ্রমের জাঁতাকলে ঠেলে দিয়েছে নিজেকে। একটা সুফল হয়েছে। খদ্দেররা তার কথার মূল্য আর কাজের সততা আগেই দেখেছে। একটা মেয়েকে অতগুলো দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজে তাকে বিয়ে করার ফলে সমস্ত এলাকার লোক তাকে চিনেছে। গুডউইল বেড়েছে। ব্যবসার কিছু সুবিধে হয়েছে। হলেও বাড়ির হাল সে বদলায় নি। সেই অনটনের মধ্যেই চলেছে দীর্ঘদিন।

লাভের সবটাই সে আবার ব্যবসায় ঢেলেছে ব্যবসার শ্রী ফিরছে।

দায়ে পড়ে গায়ত্রীও যে নিজস্ব একটু উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছে, শংকর চাটুজ্যে অনেকদিন পর্যন্ত সেটা টের পায়নি। বিয়ের পনেরো দিনের মধ্যে যে মেয়ে সবদিক বুঝে নিয়ে সংসারের হাল ধরেছে, তিন বছরের মধ্যে সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাবে এ আর বিচিত্র কি। সংসারের জন্য বাড়তি টাকা চাইলে স্বামী সাফ জবাব দেয়, হবে না। তার মধ্যে এই তিন বছরের শুরুতে বাচ্চু এসেছে। তাতেও খরচ কিছু বেড়েছে। জিনিষপত্রেরও দাম বাড়ছে। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে এর কোনটাতেই কান দিতে রাজী নয় শংকর। তার এক কথা, হবে না। চলবে কি করে? না চলে উপোস করুক। সুবর্ণা হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছে, কলেজে পডতে চায়। পড়তে হবে না। কি করবে? টাইপ শিখে চাকরির চেষ্টা করুক।

সবেতে এই গোছের জবাব।

হঠাৎ একদিন শংকব লক্ষ্য করল, স্ত্রীব হাতের একগাছা বালা নেই। শুধু লোহা। বিয়ের সময় শংকর একখানাও গয়না দেয়নি, দিতে পারেনি। হাতের বালা আগেই ছিল। ধীরেন গাঙ্গুলী জোরজবরদস্তি করে একটা সরু হার, দুটো পাতলা দুল আর একটা আংটি কিনে দিয়েছিল।

তাব মধ্যে হাতেব বালা নেই একটা, চোখে পড়ারই কথা। শংকরের দেরিতেই সেটা চোখে পড়েছে।

—একটা বালা কি হল?

—কাজেব অসুবিধে হয়, খুলে বেখেছি। ব্যস, আব বালা নিয়ে মাথা ঘামায় নি শংকর।

...প্রতিবেশীদেব অনেকেই তাদেব থেকেও গরীব। সামনে বস্তি আছে একটা, তারা আরো গরীব। এর মধ্যে অনেকেই অনেক সময় বিপাকে পড়ে দু'চারটাকা ধারের জন্য হত্যা দিয়ে পড়ে, কেউ বা ঘটি-বাটি বাঁধা দিতে আসে। নিজের সংসারের অভাবের তাড়নায় এই থেকেই হয়তো প্ল্যানটা মাথায় এসেছিল গায়ত্রীর। নবদ্বীপে তাদের জানাশুনা একজন মেয়েছেলে এই করে নিজের বাড়ি ঘর জমিজমা করেছে। অল্প কিছু মূলধন চাই—সেটা আসবে কোত্থেকে? অতএব হাতেব একটা বালা নিঃশব্দে এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে উঠেছে।

গোড়ায় গোড়ায় খুব সংগোপনে এই কাজ করেছে গায়ত্রী। ঘটি-বাটি বাসন-কোসন বেখে জিনিস অনুযায়ী দু'পাঁচ দশ টাকা ধার দিয়েছে। বলা বাহুল্য, যা দিয়েছে তার থেকে জিনিসের দাম ঢের বেশি। সুদের হারও সে অবস্থা বুঝে ঠিক করেছে। শতকরা হিসেবের ধার ধারে না। দু'টাকা নিলে আড়াই টাকা ফেরত দিতে হবে, তিন টাকা নিলে চার টাকা, পাঁচ টাকা নিলে সাড়ে ছ'টাকা, দশ টাকা নিলে তেরো টাকা—এই গোছেব। খুব যে কখনো নির্দয় হয়েছে কারো ওপর গায়ত্রী সেটা ভাবে না। সময়ের জন্য কেউ হত্যা দিয়ে পড়লে সময় দিয়েছে, প্রাপ্যটা হয়তো দু'চার আনা বাড়িয়েছে। কেউ যখন বলেছে টাকা আর ফেরত দিতে পারবে না তখনই শুধু তার জিনিস বিক্রী করেছে। তাতে অবশ্য আবো বেশি লাভ।

সুবর্ণা আর সুনন্দ সমুর বউদির এই ব্যবসাব খবর টের পেতে খুব বেশি

সময় লাগে নি। কিন্তু দাদার কাছে তারাও কেউ কিছু বলে নি। শম্ভু তখন কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, সকালে বেরোয় রাতে ফেরে।

শংকব যখন জেনেছে, স্ত্রীর তখন ফলাও ব্যবসা। তখন আর বস্তির মেয়েছেলে নয়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর মাঝারি-মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারাও বিপাকে পড়লে টাকার জন্য ছুটে আসে। অবস্থা বুঝে আর জিনিস বুঝে গায়ত্রী একশো দুশো টাকাও ধার দেয়। সোনার জিনিস পর্যন্ত বন্ধক নেয় আর খুব সন্তর্পণে নিজের ট্রাঙ্কে রাখে। খুব বিশ্বাসীর মধ্যে বিনা বন্ধকে বেশি সুদের হারে টাকা ধার দিয়েও কখনো ঠকে নি।

সব জানার পর শংকর চাটুজ্যে রাগবে কি অবাক হবে ভেবে পায় নি। কিন্তু লোকটা নির্বোধ নয়। ক'বছর তার দেওয়া টাকায় সংসার চলল কি করে তলিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা হল। তবু কাজটা মনঃপূত নয় খুব তার। ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভালো। স্ত্রীকে বলেছিল, থাক, আব এ-সব করে দরকার নেই।

কিন্তু গায়ত্রী ততদিনে এ-কাজেরই ভারী একটা স্বাদ পেয়ে গেছে। বলেছে, কতজনের কত কি আছে আমার কাছে, হুট করে মাঝখানে বন্ধ করে দেওয়া যায় নাকি। তাছাড়া কি-রকম সব বিপদে পড়ে টাকার জন্যে ছুটে আসে—সাধ করে তো কেউ আসে না—কারো বাড়িতে রোগী মর-মর, হঠাৎ ডাক্তাব ডাকার পয়সা নেই, হাতে ওষুধ কেনার পয়সা নেই—কারো ছেলের অল্প ক'টা টাকার জন্য পৈতে আটকে গেল, অন্নপ্রাশন আটকে গেল—কারো মেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে হঠাৎ, হাতে টাকা নেই—এ রকম কত ব্যাপার। এমনিতে টাকা চাইতে এলে তুমি দেবে না। আর কেউ দেবে? আমি লোকের উপকাব ছাড়া অপকাব কিছু করছি না।

অকাট্য যুক্তি। এর ওপর আর কথা কি।

এমনি করেই দিবারাত্র কাজে অথবা কাজের ভাবনায় মগ্ন শংকর চাটুজ্যেকে হঠাৎ হঠাৎ এক-একবার একটু নাড়া খেয়ে নিজের সংসারের দিকে তাকাতে তারপর কর্তব্য পালন করতে হয়েছে।

প্রথম সুবর্ণার বিয়ে।

বোনের কুড়ি বছর বয়েস হল, তবু, দিব্যি চোখ-কান বুজেই ছিল। গায়ত্রী মাঝে-মাঝে তাগিদ দিয়েছে, কিন্তু কানে তোলে নি। বলেছে যখন হবে তখন হবে, এখন ও-সব ভাবার সময় নেই আমার।

এ-দিকে শম্ভুর তিন বন্ধুর সঙ্গে সুবর্ণার বেশ ভাব-সাব। জগা পাঠক, মণ্টু দত্ত আর মিনু শিকদার। শম্ভু ফ্যাক্টরীতে চাকরি করে, সকালে বেরিয়ে রাতে ফেরে। কিন্তু ওদের আনাগোনার বিরাম নেই। এর মধ্যে বেশি আসে মণ্টু দত্ত আর মিনু শিকদার। জগা পাঠকের পাঁচজন হোমরা-চোমরা মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে হয়, দলের মাতব্বর হিসেবে অনেক ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়, তার এ-বাড়িতে নৈমিত্তিক হাজিরার সময় হয়ে ওঠে না। অন্য দু'জন প্রায়ই আসে। আর কাউকে না পেলে সানু-সমুর সঙ্গেই আড্ডা জমাবার আগ্রহ, নয়তো বউদির হাতের চা-পাঁপরভাজার টান। কিন্তু আসল আগ্রহ বা টানটা যে কোথায় গায়ত্রী সেটা ভালোরকমই

জানে। দাদার বন্ধুদের সঙ্গে এ-রকম মেলা-মেশা তার পছন্দ নয়, হাব-ভাবে কত সময় বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু সুবর্ণা সে-সব গায়ে মাখার মেয়ে নয়। বেশি বলতে পারে না, নিজের ভিতরেই বাধা। ওই মেয়ে হয়তো উল্টে তার অদৃষ্টের কথাই মনে করিয়ে দেবে।

মণ্টু দত্ত স্পোর্টসম্যান। মিনু শিকদার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এবং কবি। বাপের চাল-ডাল তেল-নুনের ব্যবসার প্রতি নিরাসক্ত। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার অনেক বকমের জল্পনা-কল্পনা। গায়ত্রীর ধারণা, শম্ভুর তিন বন্ধুর মধ্যে এই মিনু শিকদারকেই পছন্দ সুবর্ণার। তার সাড়া পেলেই ও উসখুস করে ওঠে দেখেছে। মুখের রং বদলায়, নিজের হাতে চা করতে ছোটে। কিন্তু গায়ত্রীর আদৌ পছন্দ নয়—এদেব মধ্যে তবু জগা পাঠক ভালো, তার মধ্যে তবু এক ধরনের চটক আছে, জোরের জলুস আছে।

কিন্তু তার সঙ্গে বোনেব বিয়ে দেবার প্রস্তাব শুনেই মার-মুখো মূর্তি শংকর চাটুজ্যেব।—ও যতই খাতির করুক আমাদেব আব উপকার করুক, ছেলে কেমন তুমি জানো না? সেই যাদেব পাল্লায তুমি পডেছিলে চরিত্রেব দিক থেকে তাদের সঙ্গে ওব খুব একটা তফাৎ নেই—বুঝলে?

ব্যস গাযত্রী চুপ একেবাবে। কিন্তু ভিতবে ভিতবে বাগে জ্বলেছে সেদিন। সেই বাগেব মাথায় ভেবেছে, ভিতবেব চবিত্র সব পুরুষেরই সমান, কেউ সেটা বিয়ে-করা বউযের ওপব দিযে ফলায, কেউ বা অন্যের ওপব দিযে।...দারিদ্র্যের ভয়ে ছেলেই না-হয একটার বেশি দুটো নেই—কিন্তু দিন-রাত কাজ যার ধ্যান-জ্ঞান, বিছানায় এলে তার সংহার মূর্তি। বাইরেব ব্যাপাবে মেজাজ খারাপের জেরটাও যেন বউয়ের ওপব দিযে উশুল করে নিতে হবে। এখন না হয় সয়ে গেছে, গোড়াব চার-ছ'মাস পর্যন্ত রাত এলে ভয়-ভয়ই করত। আব মদেব মাত্রা চডলে তো ডবল ধকল।

হ্যাঁ, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি লাঘবের তাগিদে শংকর চাটুজ্যে একটু আধটু মদ খাওয়া শুরু কবেছিল। যে কাঠের গোলা থেকে কাঠ আনতে যেত তার মালিকটিই শরীর মন ঠিক রাখাব এই ব্যবস্থা বাতলে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অল্প অল্প করে খাবার জন্য একটা দামী বোতলও উপহার দিয়েছিল। হ্যাঁ, অত পরিশ্রমের পর খেলে ভালো লাগে বটে। তারপব স্বাভাবিকভাবেই এটা অভ্যাসের দিকে গড়াচ্ছে।

শংকব চাটুজ্যের ফুরসৎ থাক বা না থাক, সুবর্ণার বিয়েটা এগিয়েই এল।

এ-বছরেই শংকর চাটুজ্যে দোকানের এত কাজ এনেছে আর নিজের প্রাপ্য অ্যাসেটের মধ্যে ঢুকিয়ে যে-পর্যায়ে এনেছে দোকানটাকে, তাতে ধীরেন গাঙ্গুলী নিজে থেকেই সেধে লাভের দশ-আনা ছ-আনার নতুন চুক্তি করেছে আবার। অদূর ভবিষ্যতে যে এটা আট-আনা হবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। শংকর চাটুজ্যে ধীরেনের টাকা টেনে অ্যাসেট বাড়াচ্ছে না, বেশির ভাগই নিজের প্রাপ্য ঢালছে। তাছাড়া দোকান তো আছেই, শংকর চাটুজ্যে কাঠের গোলার কারবারীর সঙ্গেও একটা নিজস্ব চুক্তিতে মাথা গলিয়েছে। সেই ভদ্রলোকও তার উদ্যম আর অনমনীয় অধ্যবসায় দেখে মুগ্ধ। তার পরামর্শ আর সাহায্যে দক্ষিণ কলকাতাতেই ছোট একটা কাঠের গুদাম আর একটা থার্ড হ্যাণ্ড করাত-কল চালু করতে পেরেছে সে। কাঠের গুদামের

মালিককে কিছু লাভ দিয়ে কিস্তিতে টাকা শোধ করতে হবে। কাঠ তো নিজের দোকানেই লাগছে, অন্য দোকানই বা নেবে কেন? আর নিজের দোকানের কাঠ চেরাইয়ের পয়সা অন্তত অন্যত্র যাবে না, শংকরের পকেটেই যাবে। এটা আরো একটু চালু হলেই দোকানের অ্যাসেট সমান-সমান করে নিতে বেশি সময় লাগবে না। তখন আট আনার মালিক দু'জনে। তারপর দোকান আরো বড় করতে হলে দুজনেরই সমান টাকা ঢালতে হবে। ধীরেন গাঙ্গুলী ভবিষ্যতের এ প্রস্তাবেও সানন্দে রাজী। শংকর চাটুজ্যের তখনো ধারণা, তারও পর ধীরেনেব অগাধ আস্থা আছে বলে আর নিজের রোগা শরীরের ক্ষমতা কতটুকু জানা আছে বলেই এত সহজে সব কিছুতে সায় দেয়। সে তিনটে দিন গা-ঢাকা দিযে থাকলেও ধীবেন চোখে অন্ধকার দেখবে। শংকর চাটুজ্যে ছাড়া 'গাঙ্গুলী-চ্যাটার্জী ফার্নিচারস' চলতে পারে না সেটা দোকানেব কুলিরাও জানে।

সবই সত্য। কিন্তু এ-ছাড়াও আবো একটা সত্যেব দিক থেকে যেন প্রায় অন্ধেব মতই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল শংকর। ধীবেনের এত সহৃদয়তার পিছনে আবো যে কিছু কারণ থাকতে পারে কল্পনাও করেনি।

সেই কবে থেকে বাড়ির ছেলের মতই তাব যাওযা-আসা। ছুটির দিনে শংকব প্রায়ই তাকে খেতে ডাকে। তাব থেকে শুভার্থী এ পবিবারেব আর কেউ নয, এটুকু সকলেই জানে। স্বাস্থ্য ভাল না, দুর্বল মানুষ—তাব অবস্থান অনেক সমযেই প্রায় অস্তিত্বশূন্য। বিনীত এমন যেন শংকব চাটুজ্যে মালিক আর সে কর্মচারী। কেবল সুবর্ণাকে হঠাৎ-হঠাৎ বিরক্ত দেখা গেছে তার ওপর। ওকে দেখলেই হয় জলতেষ্টা পায়, চায়ের তেষ্টা পায়, আধুনিক গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে জ্ঞানেব স্পৃহা দেখা যায। খেতে বসে দাদার সামনে ওকে অবধারিত জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কোনটা বাঁধলে?

এই সেদিনও সুবর্ণা রাগ করে জবাব দিযেছিল, জলটা আর নুনটা আর নেবুটা।

শংকরও শুনেছে, কিন্তু লক্ষ্য কবাব মত কিছুই তার মাথায ঢোকেনি কখনো।

সেদিন সব-কিছু একই সঙ্গে মাথায ঢুকল।

দোকানে বসে ছিল। কর্মচারীরা চলে গেছে। একটা দবজা ছাডা দোকানেব আর সব দরজা বন্ধ। রাত আটটা বেজে গেছে। এবার ওই বাকি দবজা বন্ধ কবে তাদেরও বেরিয়ে পড়লেই হয়।

. বেশ সাহস সঞ্চয় কবে আমতা-আমতা করে ধীরেন বলল, একটা কথা ছিল দাদা—

শংকর চাটুজ্যে অবাক একটু।—কি?

—তুমি রাগ করবে কিনা ভাবছি...

এবারে সন্দিগ্ধ।—কেন, কিছু ভুল-টুল করে বসে আছিস নাকি?

—না, ব্যবসা-ট্যাবসার কিছু না। বলছিলাম...সুবিকে আমার হাতে দাও না।

শংকর হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক। এক জগৎ থেকে যেন হ্যাঁচকা টানে আর এক জগতে টেনে নেওয়া হল তাকে।—তোর হাতে দেব মানে...তুই সুবিকে বিয়ে করবি?

ধীরেন মাটির দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল।

শংকর আরো একটু তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, এই ইচ্ছেটা তোর কতদিনের?

—প্রা-প্রায় আড়াই বছর ধরে ভাবছি, তোমাকে বলে উঠতে পারছিলাম না।

শংকরের ব্যস্ত জীবনে হাসার সুযোগ কমই এসেছে। হাসছে অল্প অল্প।—এই তো তোর স্বাস্থ্য, কেবল ভুগিস—তুই বিয়ে করবি কি?

ধীরেন একটু হতাশভাবে চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু হাসি দেখে আবার ভরসা পেল।—চিকিৎসা তো করেই চলেছি, আরো ভাল করে করব—ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি।

বাড়ি এসে অনেক—অনেক দিন বাদে যেন সুবর্ণাকে ভাল করে দেখল শংকর। অনেক বড় হয়েছে আর বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। গায়ত্রী যখন বিয়ের তাগিদ দিয়েছিল, তখন বোনের দিকে ভাল করে তাকানোর ফুরসৎ হয়নি তার।

—এই সুবি, শোন—

সুবর্ণা কাছে এল। দাদার হাব-ভাবের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছে, গলার স্বরও অন্যরকম লাগছে।

—তোর বিয়ে দেব ঠিক করলাম। গায়ত্রীর দিকে ফিরল, তুমি রেডি হও, এ মাসের মধ্যেই বিয়ে দেব।

সুবর্ণার বুক দুরু দুরু। গায়ত্রীর বিমূঢ় বিস্ময়।—কার সঙ্গে বিয়ে?

—ধীরেনের সঙ্গে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা কর-কর করে উঠল সুবর্ণার। এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে শংকর বিরক্ত।—হাঁ করে চেয়ে আছ কেন? যে লোফারগুলোর সঙ্গে ও আড্ডা দেয়, তাদের থেকে ধীরেন খারাপ?

—খারাপের কথা বলছি না—কিন্তু ইয়ে, সুবি কি রাজী হবে?

এ-সংসারে এ-রকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় শংকর চাটুজ্জে। চেঁচিয়ে উঠল, আমি কারো রাজী-অরাজীর ধার ধারি না, যা ঠিক করেছি তাই হবে, বুঝলে?

এ-ঘর থেকে সুবর্ণার কানেও গেছে সে কথা।

রাতের শয্যায় গায়ত্রী মন্তব্য করেছে, লোক তো ভালই—বড় নিরীহ—কিন্তু একটু রুগ্ন এই যা—

—চেষ্টা থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হতে সময় লাগে না—ভাল যাতে হয় সেদিকে আমিই চোখ রাখব। শয্যায় শুয়ে সে-ও এই বিয়ের কথাই ভাবছিল। না, এদিকে কোন কাণ্ডজ্ঞান তার নেই-ই বলতে হবে, সব-দিক বিবেচনা করলে এর থেকে লোভনীয় প্রস্তাব আর কি হতে পারে? এই প্রস্তাব তারই করা উচিত ছিল, এই বিয়ে তারই ঘটানো উচিত ছিল। ধীরেন নিজে থেকে এসে না বললে কোনদিন এ-দিক দিয়ে সে ভাবত কিনা কে জানে।

বিয়ে হল। কেউ সে-রকম কোন জোরালো আপত্তি করল না। সুবর্ণা মুখঝামটা একটু-আধটু বউদিকে দিয়েছে, কিন্তু দাদাকে কিছুই বলতে পারেনি।

বিয়ের এক বছরের মধ্যে দোকানের অবস্থা আরো ফিরেছে। বলা বাহুল্য এরও সবটুকু কৃতিত্ব শংকর চাটুজ্জের। একে ওকে ধরে দু-একটা স্কুলের কাজও পাচ্ছে।

নিজস্ব কাঠের কারখানাও লাভের মুখ দেখছে। দোকানের আধা-আধি মালিকানার ব্যাপারে এবারে আর শংকরকে কোন কথাই বলতে হয়নি। সে নিজে থেকেই তাগিদ দিয়ে লেখাপড়া করে নিয়েছে।

আরো মাস চার-ছয় বাদে শংকর হঠাৎই একটা মানসিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। ধীরেনের শরীরটা ভেঙেই চলেছে। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। এব আগে শংকর তাকে ভাল কবে চিকিৎসা করানোর কথা বলেছে। বড় ডাক্তার দেখাতে বলেছে। ধীরেন তাকে নিশ্চিন্ত করেছে, বড ডাক্তারই দেখানো হচ্ছে। কিন্তু সুফল কিছু হচ্ছে না, ব্যস্ততাব মধ্যে সেটা হঠাৎ-হঠাৎ চোখে পড়ে শংকবের। এক সময়ে মনে হল, ওর চলতে ফিরতে কষ্ট, আব দোকানে বসেও যেন হাঁপায়।

দেখতে দেখতে শয্যা নিল। এইবারে চক্ষুস্থির শংকবের। চিকিৎসাব ব্যাপাবে সে প্রত্যক্ষভাবে মাথা গলাক ধীবেন সেটা কেন চাযনি এতদিন, সেও অনুমান করা যাচ্ছে। নানারকম পরীক্ষা-নিবীক্ষার পব যা প্রকাশ পেল সেটা শংকব চাটুজ্যে কোনদিন ভাবে নি। ধীরেনেব হার্টেব একটা ভালব সেই ছেলেবেলা থেকেই অকেজো ছিল, এখন আর একটাও অচল হতে চলেছে। এই থেকেই আবো অনেক বকমেব উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

সুবর্ণাব চোখে চোখ পডতেও থমকাতে হযেছে। ও অপলক চেযে আছে তাব দিকে। পরে ওর অনুপস্থিতিতে ধীবেনকে জিজ্ঞাসা করেছে, একটা ভালব ড্যামেজ তোর, আগে জানতিস না?

জবাব দিতে পাবেনি। যে-ভাবে তাকিয়ে ছিল আব কিছু জিজ্ঞাসাও কবেনি শংকর। সে যুঝতে জানে। যুঝেছে। ধীরেনকে জীবনের পথে ফেবাতে চেষ্টা কবেছে।

ধীরেনের মৃত্যু এত কাছে এগিযে এসেছে শংকব বিশ্বাস কবেনি, বিশ্বাস কবতে চায়নি। এর মধ্যে বাড়িতে আবার এক বিযে লেগেছে। শম্ভুর বিযে। মেযে শম্ভুই ঠিক করেছে, শংকব চাটুজ্যে শুধু অগ্রজেব ভূমিকা পালন কবেছে। দাঁড়িযে থেকে বিয়ে দিয়েছে। সুবর্ণা সে বিযেতে আসেনি। শংকব ছোট ভাই সুনন্দকে পাঠিযেছে। সুবর্ণা তাকে বলেছে, দাদাকে আর কিছুদিন অপেক্ষা কবতে বল, একেবাবেই যাব।

শংকর শুনে গুম হয়ে থেকেছে খানিকক্ষণ। পরে স্ত্রীকে শুনিযে বাগারাগি করেছে। এই অসহিষ্ণুতাই চিরদিন তাকে সকলেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বেখেছে।

শম্ভুর বিয়ের আগেই বর্তমানের এই ভাডাটে বাড়িতে উঠে এসেছিল। রোজগাব যা করে এর থেকেও ঢের ভাল বাড়িতে বাস কবতে পারত। কিন্তু বাড়ি তাব মাথাতে একটাই, যেটা আজও তার সঙ্কল্পে গেঁথে আছে। বাবাব মৃত্যুশয্যায় যে বাড়ি তার অব্যক্ত প্রতিশ্রুতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই পিতৃভবনে যেদিন আশ্রয় নেবে সেইদিন শান্তি, সেইদিন বিরতি।

ধীরেন গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর সুবর্ণাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। সুবর্ণা আপত্তি করেনি। না, স্বামীর মৃত্যুতে তাকে এতটুকু শোক করতে দেখেনি কেউ। তার মাথার কাছে বসে অপলক চোখে দাদাকে মাঝে মাঝে দেখেছে শুধু। তাতেই ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু শংকর চাটুজ্যে। বোনকে ক'বার ধমকে উঠতে গিয়েও থেমে গেছে।

...মৃত্যুর তিনদিন আগেও স্পষ্ট কথা বলতে পেরেছে ধীরেন। তার দুই চোখে ক্ষমা-ভিক্ষার অব্যক্ত আকৃতি। অনুনয় করে শংকরকে বলেছে, দাদা, দোকান তোমার নিজের জোরে আরো ঢের ঢের বড় হবে জানি, তোমার নিজের উপার্জনের বহু-টাকা এতে খাটবে—সুবিকে তুমি পাকাপাকিভাবে চার আনার অংশ দিও, তাহলেই আমি খুশি হব—আর আমার জায়গায় দোকানে ওকে বসতে দিও।

শংকর জবাব দেয়নি। সুবর্ণা কঠিন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

দিন গেছে, মাস গড়িয়েছে, বছর ঘুরেছে একটা একটা করে। দেশের শাসন পরিস্থিতিতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে থেকে থেকে। জীবনের মিছিল আর মৃত্যুর উৎসব পাশাপাশি মুখর হয়ে উঠেছে। নেই-নেই রব উঠেছে চাবিদিকে, মন্ত্রীদের বক্তৃতা পুঁজি। মেকী আর ফাঁকির মহোৎসব শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে যার ক্ষমতা আছে সে চড় চড় করে তার আকাঙ্ক্ষার চড়াই পাড়ি দিয়েছে। দিচ্ছে। যার নেই সে হুড়মুড় করে নীচে গড়িয়েছে। গড়াচ্ছে।

শংকর চাটুজ্যের ক্ষমতা ছিল। দেখতে দেখতে সেটা বহুগুণ বেড়েছে। এ-ব্যাপারে জগা পাঠকও তাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। সরকারী স্কুলের বহু কাজ অনায়াসে তার হাতে এসে গেছে। সরকারী দপ্তরের আসবাবপত্র ঢেলে সাজানোর বিরাম নেই নতুন দপ্তরও গজাচ্ছে কত। এ-সব কাজ পাওয়ার ভাগ থেকে শংকর চাটুজ্যে বঞ্চিত হয়নি। জগা পাঠকের আর এলাকার নেতাসদৃশ মানুষদের কল্যাণে বঞ্চিত না হওয়ার বাস্তাঘাট তাব জানা হযে গেছে। যাদের কল্যাণে সহজে কাজ এসেছে সে-ও তাদের বঞ্চিত করেনি। জগা পাঠককেও না স্রেফ লেন-দেনের কারবার।

শংকর চাটুজ্যে একদিন টাকার পিছনে ছুটেছে। এখন টাকা তাড়া করছে তাকে। গত দশ বছরের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমে যা হয়নি প'রর তিন-চার বছরে তার বহুগুণ হয়েছে। অনেক সময় নিজেব কাছেই সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে তার। কিন্তু মাথা গরম হয়নি একদিনের জন্য। শুধু রাতেব মদের মাত্রা বেড়েছে। কাজের ব্যাপারে সেই আগের মতই নিষ্ঠা, আগেব থেকেও বেশি তৎপরতা। অ... এদিকেও ধীরেন গাঙ্গুলীর অনুরোধ পুরোপুরি রেখেছে। সুবর্ণা দোকানে বসছে। ওর চার আনা শেয়ারের প্রাপ্য বছরে দু'বার ওরই নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়।

সংসার-জীবনে হঠাৎ আবার একটা ধাক্কা খেল, বছর তিনেক আগে। অসহিষ্ণু রাগে তখনই আবার মনে হল সব কিছু তার হিসেবমত চলছে না। সুবর্ণার ছোট সুনন্দ অর্থাৎ সানুটা যেন হঠাৎ নিজেব মত করে বড় হয়ে উঠেছে। সর্বদাই হাসি-হাসি মুখ, বেশ মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলত বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে। ওর ভিতরের কোন জোরালো সত্তার অস্তিত্ব শংকরের জানা ছিল না। লেখাপড়ায় ভাল ছিল বরাবর। তার পড়া চালাবার ব্যাপারে শংকরের আপত্তি ছিল না। কিন্তু কলেজে ঢুকে সে আর দাদার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেয়নি। টিউশনি করে নিজের পড়া চালিয়েছে। স্বাবলম্বী হওয়ার এই চেষ্টাটা শংকরের অপছন্দও নয়। কিন্তু তিন বছরের অনার্স কোর্সের শেষের বছরে ওর সম্পর্কে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত কথা শংকরের কানে আসতে লাগল। রাজনীতির আকাশে অনেক রকমের দুর্যোগের খেলা চলেছে।

তার মধ্যে সুনন্দও নাকি বিপজ্জনক সংস্রবে মেলামেশা করছে।

—এ-সব কি শুনছি? চিরাচরিত অসহিষ্ণু অনুশাসনের মূর্তি শংকর চাটুজ্যের।

সানুর একটা গুণ, মুখে হাসিটি লেগে থাকত। সেদিনও ব্যতিক্রম হয়নি।--কি শুনছ দাদা?

—তুই পড়াশনা করছিস না, বাঁদরামো করে বেড়াচ্ছিস?

—পড়াশুনা যেটুকু দরকার করছি।...বাঁদরামো কাকে বলে?

কোন ভাইয়ের মুখ থেকে এ-রকম স্পষ্ট পাল্টা হালকা প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নয় শংকর। দু'পা এগিয়ে এসেছে।—বাঁদরামো কাকে বলে দেখতে চাস?

আশ্চর্য, সানু জোবেই হেসে উঠেছে। ওর চোখ-মুখে ভয়ের লেশমাত্র দেখেনি শংকর। হাঁস থামিয়ে বলেছে, ধরে দেবে নাকি দু'ঘা বসিয়ে? দোহাই দাদা, ওই দেখ, সমুটা হাঁ করে চেয়ে আছে। আবার হাসি, এটা যুদ্ধেব কাল দাদা, এত অল্পেতে ঘাবড়ে লাভ কি...।

শংকর রাগবে কি অবাক হয়ে একে দেখবে ভেবে পাযনি। তিবিক্ষি হয়েই বলেছে, আমি ঘাবড়াব?

আবাব হালকা হেসে সানু বলেছে, না ঘাবডালে কি-না-কি শুনে তোমাব এই মেজাজ হবে কেন—যে যত বেশি ঘাবড়ায় তার শাসন তত অবুঝ আর তত কঠিন হয়—এটাই ববাবরকার নিয়ম।

শংকরের মেজাজ কোন পর্যায়ে চড়ত বলা যায় না, কিন্তু তার আগেই সানুকে বাইরে থেকে ডাকল কে, সে চলে গেল।

যথাসময়ে ভালভাবেই পাস করে বেবিযেছে ও। কিন্তু পাস-ফেল নিয়ে যেন কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই ওর। হঠাৎ হঠাৎ দু'দিন একদিনের জন্য কোথায় চলে যায়। এই সাত-আট মাস ধরেই ওর সম্পর্কে শংকবের মনে চাপা অস্বস্তি একটা। সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে চায় যারা,ও তাদেব দলে গিযে ভিড়ছে মুখ দেখলে একবারও মনে হয় না। তবু ভিতবে ভিতরে ভয়। যে গোছের ভয মনে এলেই ক্ষিপ্ততা বাড়ে। শরীরের রক্ত কতখানি জল করে আজ এই সার্থকতার মোহনায় এসে পৌঁছেছে তা শুধু সে-ই জানে।...যা-সব ঘটছে চারিদিকে, বোমা গুলি চুরি আগুন, মারামারি কাটাকাটি হানাহানি—উন্মাদ পাগল হয়ে গেল কিনা সব শংকর ভেবে পায় না।

—তুই এম. এ. পডবি না? আবার একদিন চড়াও হয়েছে সানুর ওপর।

—নাঃ। যেটুকু হয়েছে তাই পণ্ডশ্রম।

—চাকরি করবি?

মজার কথা যেন।—চাকরি দিচ্ছে কে, আমার মত কত লক্ষ বেকার আছে তুমি জান?

—চোপ রাসকেল। আচমকা গর্জে উঠে তাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে শংকর। —তুই আমাকে তত্ত্বকথা শোনাতে এসেছিস? লক্ষ লক্ষ বেকার তোর তাতে কি? তোকে বেকার থাকতে কে বলেছে। কাল থেকে আমি দেখতে চাই তুই দোকানে —দোকানে না, কারখানায় আসছিস—বুঝলি?

কিন্তু ওর মুখের হাসি দেখে উল্টে ভিতরে ভিতরে স্তব্ধ হয়ে গেছল শংকর চাটুজ্যে। এত বড় ধমকটাও যেন ওর গায়ে কোথাও লাগেনি, আলগা হয়ে খসে পড়েছে। কৌতুকমাখা সুরে বলেছে, আমি এলে তোমার ক্ষতি কতখানি জানলে ডাকতে না। আমি তোমাকে আগেও বলেছি দাদা, এটা যুদ্ধের কাল, এত অল্পেতে মাথা গরম করো না—এখনো ঢের দেখবে, ঢের বাকি।

শংকর চাটুজ্যে আর যা-ই হোক, নির্বোধ নয়। একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে তার। নিরীক্ষণ করে দেখেছে একটু। তারপর বিপরীত ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, তোর 'যুদ্ধের কাল'-এর মানেটা কি?

এইবার যেন উৎসাহ বোধ কবেছে সানু।—মানে তো সহজ! তোমাদের আগের আর তোমাদের সময়ের মানুষ বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা পেয়েছে—আমরা কেউ জন্মেছি কেউ জন্মাইনি—আজ সেই পাওনা যুদ্ধ আমাদের তোমাদের সক্কলের মধ্যে সুদে-আসলে ছড়িয়েছে—ক্ষমতার যুদ্ধ, ভাত-কাপড়ের যুদ্ধ, যাব আছে তার তা আঁকড়ে ধবে থাকার যুদ্ধ, যার নেই তার কেড়ে নেবার যুদ্ধ—তুমি শান্তির স্বপ্ন দেখলেই যুদ্ধ তোমাকে ছাড়বে?

সানুর দিকে তাকিয়ে শংকরের অবাক লেগেছে ওর শংকাশূন্য তাজা মুখখানা। এ সংসারে শংকর চাটুজ্যে নিজেই যেন এক বৃদ্ধ পরাজিত সম্রাট। মনে হওয়া মাত্র শিবায় শিবায় অসহিষ্ণু উষ্ণ তাপ ছড়িয়েছে আবার। কিন্তু গলা চড়েনি।—ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তোকে বাড়ি থেকে তাড়ালেও ছাড়বে না বলছিস?

তাব এ-কথায গায়ত্রী সুবর্ণা শম্ভু এমন কি ওই সমুটাও অস্বস্তি বোধ করেছিল বোঝা গেছে। কিন্তু সানুর মুখের হাসি আবো প্রশস্ত হতে দেখা গেছে। সকৌতুকে মাথা নেড়েছে। ছাড়বে না।

এব মাস দুইয়েব মধ্যে ওই হাসি-ঝবা ভাইটার একটু যেন অবিশ্বাস্য জোরের দিক দেখল একদিন। জগা পাঠক তখন দস্তুবমত দাপটের মানুষ। এ-এলাকাব প্রবলতম রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের অনেকখানি বল-ভরসা। সময় পেলে এক-একসময য়েমন এ-বাড়িতে এসে পড়ে তেমনি এসেছিল। শংকর তখনো সকালের কাজে বেবোযনি। ওই সুবর্ণার ঘরেই সকলে বসে ছিল। সানুই শুধু বাড়ি ছিল না, ও বাইরে থেকে ঘরে ঢুকল।

ওকে দেখে জগা মুখে হাসি টেনে জিজ্ঞাসা কবল, কি মাস্টার, আজ সকাল থেকেই বিজই প্রোগ্রাম নাকি?

সানুও হেসেই মাথা নাডল।—না, বিজই কিছু না, আমাকে একদিকে যেতে দেখে তুমি এ-বাড়ির রাস্তা ধরলে, আবার তুমি এ-বাড়ির রাস্তা ধরলে দেখে আমিও ফিরলাম।

জগা পাঠক আকাশ থেকে পড়ল প্রায।—তার মানে আমি তোকে ডরাই?

—ডরাবে কেন, পছন্দ কর না। শোন জগাদা, যে জন্যে ফিরে এলাম, দাদা একবগগা কাজের মানুষ, তাব মাথায় তুমি আর এ-পাড়ার যে দুজন মুরুব্বীর পায়ে তেল মাখিয়ে বেড়াও তারা আমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ঢোকাবে এটা আমার একটুও পছন্দ নয় তোমাদের জেনে রাখা দরকার।

ঘরের সব ক'টি প্রাণী বিমূঢ় হঠাৎ। শংকর চাটুজ্যে অবাক বিস্ময়ে জগা পাঠকের দিকে তাকাল একবার। সে-ও হতভম্বের মত তার দিকেই চেয়ে আছে। মুখের সহজতায় ফাটল ধরেছে।...সানু যা বলেছে তার একবর্ণও যে মিথ্যে নয় সে আর শংকরের থেকে বেশি কে জানে। হ্যাঁ, জগাই তাকে চুপিচুপি একাধিকবার সানুর সম্পর্কে সতর্ক করেছে, আর এলাকার এই দুই আধা-প্রবীণ নেতাও তাই করেছে।

—ও বা ওর কেউ আমাকে কিছু বলেছে এ তোকে কে বলল? ধমকের সুরেই শংকর জিজ্ঞাসা করেছে।

সানু হাসছে, ওই জগাদার মুখেই লেখা আছে। যেতে দাও দাদা, জগাদাকে কি বললাম আর কেন বললাম সেটা সে বুঝেছে। ভাল কথা ছোড়দি, মিনু শিকদারকে দেখলাম হাতে প্লাস্টার বেঁধে তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, পরশু খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে বিস্ট ভেঙেছে শুনলাম—তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল আর খবরটাও দিতে বলল—

মুখের কথা শেষ হবার আগে ও আবাব দরজার বাইরে। শংকর চাটুজ্যে লক্ষ্য করেছে সুবির মুখ লাল। শোনামাত্র তেতে ওঠার কথা, ওই মিনু শিকদার আর মণ্টু দত্তর সঙ্গে আগের মত মেলামেশা একটুও পছন্দ নয়, কিন্তু তলায় তলায় তাই চলছে এ-রকম আভাস শংকর আগেও পেয়েছে। এই মুহূর্তে সুবিকে ছেড়ে জগার মুখের দিকেই চোখ গেছে তার। উদ্ধত জগা পাঠক তার থেকে সাত-আট বছরের ছোট সানুর কথাগুলো এ-ভাবে হজম করল কি করে ভেবে পেল না। তার বদলে ওর মঙ্গলের জন্যেই ওকে যদি একটা দাবড়ানি দিয়ে উঠত সেটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু স্পষ্ট অস্বস্তি লক্ষ্য করেছে ওর মুখে, প্রায় ভয়-ঘেঁষা অস্বস্তি যেন।

সানু চলে যাবার পরে অবশ্য মুখ খুলেছে। সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করেছে, এদের আমি ছোট-ভাই-ই ভাবি, তাই একটু সাবধান করা দরকার মনে করেছিলাম, তার ফল দেখো, উল্টে আমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেল।

ওয়ার্নিং তুচ্ছ করে হাসতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়নি একটুও।

...হ্যাঁ, ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্তই হয়েছিল শংকর। মনের তলায় একটা অনাগত আশঙ্কা থিতিয়ে আছে ক্ষিপ্ত সেই কারণে। অনেক অনিশ্চয়তা পেরিয়ে এসেছে, আজকের স্থির নিশ্চয়তার বনিয়াদে ফাটল ধরতে পারে মনে হলে মেজাজ ঠিক থাকবে কেমন করে? জগা পাঠককেও হকচকিয়ে দেবার মত জোরটা সানু পেল কোথা থেকে? তলায় তলায় ও কোন্ সর্বনাশের খেলায় মেতেছে?

আর একটা তিক্ত বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল শংকর। কিন্তু হঠাৎই ওই ব্যাপারটার দু'দিনের মধ্যে সমুর সঙ্গে সানুর কিছু কথা কানে আসতে ভিতরটা যেন জুড়িয়ে গেছল শংকরের। ওদের ঘরে ওরা দু'জন ছিল শুধু আর ভিতরে ভিতরে তেতে ছিল্ সুবর্ণার ওপর। দোকান থেকে বাড়ি ফিরে ও আবার সন্ধ্যার আগে বেরিয়েছে, এখনো ফেরার নাম নেই। গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে সে-ও মুখঝামটা দিয়েছে, আমি কি জানি! প্রায়ই তো বেরোয়—জিজ্ঞেস করতে গেলে

উল্টো ঝাঁজ—সে খোঁজে তোমার কি দরকার—আমাকে খুকি পেয়েছ!

খালি পায়ে সামনের অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল। ওদের ঘরে আলো জ্বলছিল, পর্দা ফেলা। সমুর একটা কথা কানে আসতে শংকর দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সমু বলছিল, আচ্ছা ছোড়দা, তুমি তো একটা ইঁদুর মারা হচ্ছে দেখলেও সইতে পারো না...খাওয়ার সময় ভিখিরি এলে কত সময় নিজের খাবারটা দিয়ে দাও—তুমি সত্যিই মানুষ মারার কথা কক্ষনো ভাবতে পারো?

সানুর হাসি আর জবাবও শুনেছে—তুই একটা রাম বোকা, আমরা মারা বা মরার কথা ভাবি না—আমরা শুধু বাঁচার কথা ভাবি, জীবনের কথা ভাবি।

শোনার পর মন ঠাণ্ডা হয়েছিল শংকরের। অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। সুবর্ণার কথাও আর মনে ছিল না। পরদিন একফাঁকে সমুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সানু কি কি বলে বল তো—

সমু অবাক চোখে দাদার দিকে চেয়ে ছিল। শংকরেব তাইতেই বিরক্তি।—একবারে জবাব দিস না কেন—সব কথা তোকে বার বার বলতে হয় কেন?

—জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলে না, আর যা-ও বলে ঠিক বুঝতে পারি না। একটু থেমে সমু আবার বলল—ছোড়দার জন্যে আজকাল আমার খুব ভয় হয়...।

শংকব সচকিত আবার।—কেন?

—কেবল মনে হয় ছোড়দা আমাদের শীগগিরই ছেড়ে চলে যাবে।

হেঁয়ালির কথা শুনে শংকব বিরক্ত বোধ করেছে আবার। সমস্ত সম্পর্ক ছেঁটে দিয়ে, আজকের এই নিশ্চয়তার শান্তির কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সানু যদি চলেই যায়—তাও খুব অনভিপ্রেত হবে কিনা শংকর জানে না।

...দিন পনেরোর মধ্যে আচমকা সমুর কথাগুলো অভাবিত মর্মান্তিকভাবে ফলে গেল।

আগের রাতে সানু বাড়ি ফেরেনি। সেটা খুব নতুন কিছু নয়। পরদিনের কাগজে দুটো মৃত্যু আর গোটাকতক জখমের খবর বেরিয়েছে। এ-ও নতুন কোন খবর নয়।...পুলিস জনাকয়েক ছেলের সন্ধানে ছিল, তাদের [illegible]ককে একসঙ্গে ছেঁকে ধরেছিল। গ্রেপ্তারের আগে তাবা নাকি পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছিল—ফলে গুলি আর জখম। মৃতের তালিকায় সুনন্দ চ্যাটার্জীর নাম।

সকালের কাগজ পড়ে সমু একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল। সকলে ছুটে এসেছিল।

...পুলিসের হেপাজতে মৃতদেহ শ্মশানে এসেছিল পরদিন সন্ধ্যায়। শংকর চাটুজ্যে বোবা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দেখেছে, সানুর মুখখানা ঠিক সেই রকমই হাসি-হাসি। যুদ্ধের কালে ও যেন সব থেকে মজার কৌতুকটা দেখিয়ে দিয়ে গেল।

একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে শংকর চাটুজ্যের বুকের তলা থেকে। —এ-ভাবে নিরাপদ হতে আমি চাইনি'

দিন গেছে। মাস ঘুরেছে। শংকরের দু'চোখ আবার হোঁচট খেয়েছে সব থেকে ছোট ভাইটার দিকে চেয়ে। সমুর দিকে চেয়ে। এ ভাইটা সানুর মত হাসে না, কথা বলে না—কিন্তু এ-ও যেন তার শাসনের বাইরে, দখলের বাইরে।...আগেই

বলেছিল, সানু সকলকে ছেড়ে চলে যাবে। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েও যেন অনেক দূরের কিছু দেখতে পায়। দেখে।

—তুই একমাস ধরে কলেজে যাচ্ছিস না শুনলাম?

এ-রকম জেরার মুখে পড়বে ওর যেন জানাই আছে, অথচ মুখে জবাব নেই।

—কানটা টেনে ধরে তারপর বললে কানে ঢুকবে? কলেজে যাচ্ছিস কি যাচ্ছিস না?

মাথা নাড়ল, যাচ্ছে না।

—কেন?

—ভাল লাগে না।

খুব বেশি রকমই তেতে উঠেছিল, পড়াশুনা সিকেয় তুলে বসে আছে, তাব অনুমতি নেবার প্রশ্নও ওদের মনে ঠাঁই পায় না। কিন্তু যে শিক্ষা সানু দিয়ে গেছে, চট করে মেজাজ দেখাল না। বলল, ঠিক আছে, কাঠের কারখানায় এখন লোক দরকার, কাল সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে আমি তোকে সেখানে দেখতে চাই।

—কাল হবে না।

—পরশু?

কি একটা যন্ত্রণা ভিতরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে ও, শংকব যেন সেটা অনুভব করল।

—এখন হবেই না দাদা।...দু'বেলা তোমার এখানে চারটি করে খাই, তাতে যদি খুব অসুবিধে হয় তো বলো।

শংকর বিমূঢ় কয়েক নিমেষ। সমস্ত মুখ লাল করে দু'পা এগিয়ে গেল তাবপর। —কি বললি? কি বললি তুই?

সমু আর জবাব দিল না। ওর প্রসারিত দুই চোখের চাউনিটাই যেন জবাব। না, শাসনের দিন গেছে। গুলি খেয়ে মরার পরেও সানু হাসছিল। রাগ বেশি হলে নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। পরে বোঝাপড়া করবে।

কিন্তু দু'বছরের মধ্যে এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। অত ব্যস্ততার ফাঁকেও একটু লক্ষ্য রেখেছে ওর ওপর। রাগ বেড়েছে, অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। কারণ, থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, বাবা মারা যাবার আগে পর্যন্ত সমুর সঙ্গে তার একটা সত্তার যেন ভারী একটা মিল ছিল। কথা কম বলত ওরই মত, দেখত, কত কি অনুভব করত—নিজেরই নিভৃতে হারিয়ে যেত। তার সেই সত্তাটা এখন যেন সমুর মধ্যে আটকে আছে। সেটাও ওর ভিতর থেকে টেনে এনে আজকের দুনিয়ার রূঢ় বাস্তবের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে চায়। পারলে নিজেরও মুক্তি, সমুরও মুক্তি।

অনেক রক্ত ঝরার পর বাইরের আবহাওয়া কিছুটা শান্ত এখন। শাসনশক্তি এখন পরাজিতের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। সমুর কথা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের যুদ্ধটাই এখন একমাত্র যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসনযন্ত্রের গলায় বক্তৃতার মেশিন বসেছে। তুমি প্রতিবাদ যদি কর তুমি শত্রু। মরবে। প্রতিবাদ না করে যদি মরো তুমি যোগ্য নাগরিক। তা বলে টাকা কি নেই নাকি? টাকা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মুষলধারে টাকার বৃষ্টি ঝরছে। টাকার বন্যায় কত কি ভেসে

আছে। মুষ্টিমেয়র হাতে তার দখল। তুমি তোমার বিশীর্ণ হাত বাড়ালে সেই হাতে কিছু উঠে আসবে না। মুষ্টির জোর থাকলে তুমি কিছু পেতে পার।

না, শংকর চাটুজ্যে এই উচ্ছৃঙ্খল লুটতরাজের মধ্য দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠেনি। বরং সততা আর অক্লান্ত পরিশ্রম তার মূলধন। কিন্তু এই দিনে ওটুকুই যথেষ্ট নয়। দাক্ষিণ্যের পরোয়ানা যাদের হাতে, তারই সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রেখেই চলতে চেষ্টা করেছে। ক'গুণ ফেরত আসতে পারে হিসেব কবে তাদের হাত ভরে দিতেও কার্পণ্য করেনি।

...তারপর সময় হয়েছে অনুভব করেছে। বাবার কাছে সেই অব্যক্ত প্রতিশ্রুতির ভিত কল্পনার জঠর থেকে এবারে মুক্তির কাঠামোয় বাঁধা পড়বে। বাবার মৃত্যুর তারিখটাই তাব গৃহ-প্রবেশের দিন। আর কোন দিনে নয, ওই দিনেব ওই সময়ে। ওই আশ্রয়ে প্রবেশের পর তার যুদ্ধের কাল শেষ। মহাশান্তি।

৫

একটা জোরাল তাড়ার মুখে পড়ে বাড়িটা যেন তার অস্তিত্ব ঘোষণার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আব ঠিক এক মাস বাদে সেই তাবিখ। যে তারিখে পরগৃহবাসের অভিশাপ শেষ।

কিন্তু এবই মধ্যে হঠাৎ এ-বাড়িতে একটু অশান্তিব সূচনা দেখা দিয়েছে। প্রথম অশান্তি মেজদা শম্ভু চাটুজ্যেকে নিয়ে। দাদা তার বেচাল বরদাস্ত করে উঠতে পাবছিল না। ছ'মাস হযে গেল মেজবউদি বাপের বাড়ি। মেজদা অন্য মেয়েব সঙ্গে স্ফূর্তিতে মেতে আছে। একদিন দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে দাদা গর্জন করে তাকে বলেছে, এ-ভাবে চলতে হলে সে তার নিজের পথ দেখতে পারে—তার সঙ্গে থাকতে হলে বউমাকে নিয়ে এসে বাড়ির একজন হয়ে থাকতে হবে। আজ ন'দিন হল মেজদা ঘর তালাবন্ধ করে চলে গেছে। আর ফিববে কি ফিববে না কেউ জানে না।

...বেশ কিছুদিন হল দাদার সঙ্গে ছোড়দি সুবর্ণাব এক ধবনেব ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলেছে। সমু সেটা অনুভব করতে পারে। ছোড়দির চাল-চলন বেশ একটু উদ্ধত হয়ে উঠেছে। দোকানের পর রাত ন'টা-দশটাযও বাড়ি ফেবে এক-একদিন। কোনবকম কৈফিয়ৎ দেওয়ার ধার ধারে না যেন। দাদা এখন পর্যন্ত ফেটে পড়ছে না সেটাই আশ্চর্য। দাদার সহ্যগুণ বেড়েছে মনে হয়।

মেজদার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র জগা পাঠকের সঙ্গেই বাড়ির সকলের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় আছে। দাদার সে অনেক উপকার করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ব্যস্ত মানুষ, খুব বেশি আসার সময় পায় না। মিনু শিকদার ছোড়দির খোঁজে কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যার পরে বাড়ি এসেছিল। লোড-শেডিংয়ের ফলে দাদাও প্রায়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে সেটা তার হিসেবের মধ্যে ছিল না বোধহয়। ...তা মিনু শিকদারের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারই করেছিল দাদা, বলেছিল, রাত করে পরের বোনের খবর নিতে বেরিয়েছ, ঘরে নিজের বোন নেই?

মিনু শিকদার পালিয়ে বেঁচেছিল। আর একদিন নাকি মোড়ের মাথায় মণ্টু দত্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকেও কি-সব বলেছিল দাদা। বলা বাহুল্য দুজনেই তারা ছোড়দির কাছে নালিশ করেছে। ছোড়দি দাদাকে কিছু বলেনি। বউদির ওপর হম্বি-তম্বি করেছে, দাদাকে বলে দিও আমার ভাল-মন্দ নিয়ে আর তাকে মাথা ঘামাতে হবে না—আর আমার চেনা-জানা লোকদের অপমান করলে সেটাও আমার সহ্য হবে না—বুঝেছ?

বউদি যা-ই বুঝুক, দাদাকে কিছু বলে কুরুক্ষেত্র বাঁধানোর মত বোকা মেয়ে নয়। কেবল তার সুদের কারবার নিয়ে ঠেস না দিলে তার সহিষ্ণুতার সীমা-পরিসীমা নেই।

..ঠাণ্ডা যুদ্ধটা সেদিন আর এক-প্রস্থ স্পষ্ট হল। ভুরু কুঁচকে দাদা ছোড়দিকে জিজ্ঞাসা করল, তুই নাকি বউদির কাছ থেকে তোর ব্যাঙ্কের পাস-বই চেয়ে নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

ছোড়দি এখনো দাদার চোখে চোখ রাখতে পাবেনি। কিন্তু সমুর বিশ্বাস শীগগিরই পারবে।

—কেন?

—দেখলাম কি আছে না আছে?

—ও...কম আছে মনে হল?

—না, যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি আছে।

—দেখার পরে পাস-বই ফেরত দিসনি যে?

ছোড়দি নিরুত্তর। দাদা জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল।...হ্যাঁ, দাদার সহিষ্ণুতা আগের থেকে অন্তত অনেক বেড়েছে।

নিজের শয্যায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে ঘাড় কাত করে ছোড়দির মুখখানাই দেখছিল সমু। চোখাচোখি হতে হাসল একটু।—কত আছে রে পাস-বইয়ে?

—পাস-বই আব ফিক্সড় ডিপোজিট মিলিয়ে এক লাখ টাকাব ওপর।

—ওরে বব-বা, মেরে দিয়েছিস। তা সরালি কি মতলবে?

সুবর্ণা রেগে গেল।—বেশ করেছি। ফ্যাচাং ফাচাং করবি তো মার খাবি বলে দিলাম।

সমু আবার কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কি। সুবর্ণার মেজাজ খুশি এখন। দাদা ও-ভাবে চলে যাবার পর নিজের একটা জোরের স্বাদ পাচ্ছে। দাদা ঘরে ঢোকার আগেও সমুটা অন্যমনস্কের মত কি ভাবছিল। এখনো সেই মূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করে, এই ছোঁড়া, কি ভাবছিস সেই থেকে?

সমুর দু'চোখ আবার তার দিকে ফিরল।—বিশ বস্তা সিমেন্ট আর খানচারেক ভাল শাড়ি।...তুই ফেলে দে না কিছু টাকা।

হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে সুবর্ণা জবাবের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করল। —শাড়ি...ওখানকার এক বাড়ির সেই মেয়েটার জন্য?

সমু মাথা নাড়ল। তাই।

কৌতূহল আর অস্বস্তি বোধ করার মত একটা খোরাক পেল যেন।—শাড়ি নেই?

—না। উনিশ পেরুতে চলল, এখনো ফ্রক পরে। শাড়ি পড়লে বেশ সুন্দর দেখায়।

—আর সিমেন্ট কি জন্যে?

—সাত দিন আগে তার দাদু কাঁচা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে হাতের হাড় ভেঙেছে। রান্নাঘরেরও সেই অবস্থা। বিশ বস্তা সিমেন্ট হলে একতলা শেষ করে দোতলারও একখানা ঘরের কাজ হতে পারে।

সুবর্ণা ভাইয়ের মুখখানা গম্ভীর ভাবে নিরীক্ষণ করছে।—কত টাকার ব্যাপার?

—ব্ল্যাকে আটাশ টাকা করে বিশ বস্তা সিমেন্টের দাম হল গিয়ে পাঁচশো ষাট, আর চারখানা মোটামুটি শাড়ি আজকের দিনে কম করে দুশো টাকা—মোট সাতশো ষাট টাকা। হেসে উঠল, দিয়েই ফেলবি নাকি টাকাটা?

সুবর্ণা হাঁ-না জবাব দিল না। আগে জানার-বোঝার ব্যাপার আছে।—তলায় তলায় এতখানি বাড় বেড়েছে তোর...দাদা জানে?

—জানে নিশ্চয়। দাদা যখন যায় তখন তো বেশির ভাগ সময় আমি ওই বাড়িতেই থাকি। আর এই জন্যেই বাড়ি দেখতে যাওয়ার নাম শুনলে গজরায়--সামনা-সামনি এখনো কিছু বলছে না।

দাদা গজরায় আর সমু সেটা উপেক্ষা করে শুনেই মনে মনে খুশি সুবর্ণা। —মেয়েটার নাম কি?

—রিণা।

—দেখতে কেমন?

—আমার চোখে দিনকে দিন সুন্দর।

—মারব কষে এক থাপ্পড়। তোর মত ছেলের সঙ্গে মিশছে, পলকা স্বভাব না হয়ে যায় না।

—ঠিক তার উল্টো। এমনিতে হাসি-খুশি। সময় সময় বেজায় মন-মরা। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু একটা আতঙ্ক আছে ওর।

—আতঙ্ক কেন?

—দিদিদের জন্যে বোধহয়।

—দিদিরা কি করে?

—দুই দিদি, দু'জনেই ভাল চাকরি করে শুনেছি।...রিণাও তাই বলে। আমার বিশ্বাস চাকরি করে না।

সুবর্ণা অবাক।—তাহলে রোজগার করে কি করে? সংসার চালায় কি করে?

—চাকরি না করে যে-ভাবে রোজগার করা সম্ভব আর সংসার চালানো সম্ভব। দিদিদেরও চেহারা-পত্র ভালই।

সুবর্ণা আঁতকে উঠল একেবারে।—এই সব সংসর্গে মিশছিস তুই, অ্যাঁ? তুই ঠিক জানিস ওর দিদিরা ওই রকম?

—ঠিক আর কি করে জানব...মনে হয়।...ন্যাড়াদাও একদিন সেই রকম আভাস দিয়েছিল।

—ন্যাড়াদা আবার কে?

—জগাদার ছোট সংস্করণ। রিণার ওপরের বোন শোভনার ওপর তার চোখ। কি কারণে একদিন তার মনে ঘা পড়েছিল, হয়তো শোভনা অপমান করেছিল...আমাকে এসে বলেছিল, কে কেমন সব জানা আছে, তাকে তুচ্ছ করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে, পাড়া থেকে বাস তুলে তবে ছাড়বে।

সুবর্ণা ঝাঁজিয়ে উঠেছে, এত সবের পরেও তুই ওদের সঙ্গে মিশছিস কেন? ভাল চাস তো সরে আয়, নয়তো আমিই দাদাকে বলে দেব সব।

তারপরেও ওর দিকে চেয়ে সমু অল্প অল্প হেসেছে, নির্লিপ্ত, নিরুদ্বিগ্ন।—তোরও খারাপ মনে হচ্ছে খুব?

শোনামাত্র সুবর্ণার প্রচণ্ড রাগ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটা প্রকাশ করতে পারেনি। ঘর ছেড়ে চলে এসেছে।

সমু ছোড়দির দোষ ধরে না। রিণা কত ভাল মেয়ে ও কি করে জানবে? নিজের দিদিরাই তো জানল না।...গায়ে পিঠে হাত দিলে রিণা আজকাল ঝটকা মেরে সরে যায় না, সরিয়ে দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে। আরো ঢের ঢের বেশি কাছে টেনে আনতে ইচ্ছে করে সমুর ওকে। দেখতে ইচ্ছে করে, অনুভব করতে ইচ্ছে করে। এক-একসময় দুর্বার তৃষ্ণার মত হয়ে ওঠে এই ইচ্ছাটা।...কিন্তু রিণার জন্যে ভয়ও করে তার। কিসের ভয় কেন ভয় জানে না। শুধু ভয়। রিণা হঠাৎ-হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওর মতই কিছু একটা দূরের চিত্র দেখে বোধহয়। সময় সময় শিউরেও ওঠে। জেরা করলে তখন পাঁচটা বাজে কথা বলে আর ডবল হেসে সব কথা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। সমুর তাই আরো বেশি ওকে কাছে টেনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ওর সব দুশ্চিন্তা সব দুর্ভাবনা টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

দিন দশেক পরের কথা। নতুন বাড়িতে উঠে যেতে আর বিশ দিন বাকি।

দাদার সঙ্গে ছোড়দির ঠাণ্ডা যুদ্ধটা হঠাৎই যেন চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল।

সকালে দাদার ঘরে গিয়ে সুবর্ণা ঠাণ্ডা গলায় একটা প্রস্তাব দিল।—দোকানে আমার চার আনা অংশের দু'আনা সমুর নামে লেখা-পড়া করে দিতে চাই, আর দু'আনা তোমাকে বেচে দিতে চাই।

প্রস্তাব শুনে শংকর চাটুজ্যে হতভম্ব প্রথম। নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। গায়ত্রীও স্তব্ধ।

—কি চাস? দু'আনা সমুর নামে লেখাপড়া করে দিবি? আর দু'আনা বিক্রী করবি?...তুই লেখাপড়া করবি তুই বিক্রী করবি?

সুবর্ণা শক্ত হয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এই নীরবতার অর্থ, দাদা ঠিকই শুনেছে।

এবারে ফেটেই পড়ল শংকর চাটুজ্যে।—গায়ের রক্ত-জল-করা ব্যবসা আমার, আর তোর খেয়ালখুশি মত যা ইচ্ছে তাই করবি? এত সাহস যে এ-কথা আমাকে বলতে আসিস।—কিছু হবে না, কিচ্ছু হতে দেব না—তুই যা পারিস কর গে যা—।

দাদার চিৎকার কানে যেতে সমু এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। শুনছে। ছোড়দির গলাও কানে এল, অত চড়া নয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

—তোমার আপত্তি হবে সেটা আমি আগেই জানতাম। নিজের বারো আনা অংশ থেকে সমুকে এক কড়াও দেবে না তাও জানতাম। ও যদি তোমার কারখানার কর্মচারী হয়ে কাজ করে, তাহলেই তুমি খুশি, সানুর বেলায়ও তাই চেয়েছিলে—

শংকর আবার গর্জন করে উঠল, চোপ!

সুবর্ণা বলল, চেঁচিও না, তুমি নিজের স্বার্থে আমাকে বলি দিয়েছ, তাও সহ্য করেছি—যাক, যা বলছি তাই করে দাও, আমি আর এ ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাই না—

নিজের স্বার্থে ওকে বলি দেওয়ার কথাটা শুনে শংকর স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ। চুলের ঝুঁটি ধরে ওর মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এই শাসনের দিন গেছে জানে। এবারে আব গলা চড়াল না। বলল, আমি কিছুই করব না—কের্টে গিয়ে নিজের অংশ নিয়ে বোঝাপড়া কর গে যা—আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস না, যা বলছি!

সুবর্ণা বেরিয়ে এল। সমুকে দেখে থমকালো একটু। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

অসহিষ্ণু আক্রোশে শংকরও চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছিল। সমুকে দেখে ভ্রূকুটি আরো ধারালো হল।—এই শোন তো!

সমু আস্তে আস্তে দাদার দিকে এগিয়ে গেল।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে শংকর বলল, সুবি তার চার আনা অংশ থেকে দু'আনা তোকে লিখে দিতে চাইছে...কেন? তুই তাকে কিছু বলেছিস?

সমু নিরীহ দুই চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে রইল।

—একবারে জবাব দে!

—আমি ছোড়দিকে কিছু বলিনি, তোমাকে কিছু বলতে পারি...শুনলে কাজ হবে।

—কি?

—আর দেরি না করে জগাদার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে দিয়ে দাও।

অনেক উঁচু থেকে আচমকা একটা আছাড় খেল যেন শংকর চাটুজ্যে। হাঁ করে সমুর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপরেই সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে মাথার দিকে ধাওয়া করল। খপ করে এক হাতে তার ঘাড় ধরে অন্য হাতে কাঁধ ঠেলে হিড় হিড় করে এদিকের ঘরে সুবর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। গলার স্বর সপ্তমে চড়েছে এবার।—এ-সবের মানে কি? ও কেন বলে আর দেরি না করে জগাদার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে দিয়ে দাও। চারটে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারি করে বেড়িয়েছে যে থার্ড রেট লোফার—তাকে নিয়ে এ-সব নাটকের অর্থ কি আমি জানতে চাই!

সুবর্ণা বিষম চমকে বসা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরক্ষণে ক্ষিপ্ত আক্রোশে সমুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে খাবলা দিয়ে চুলের মুঠি ধরে ওকে

দাদার কাছ থেকে টেনে নিয়ে এল। পিঠের ওপর এলোপাথাড়ি ক'টা কিল-চড় পড়ল।—পাজী, উল্লুক, বাঁদর—কেন—কেন তোর এত বাড় বেড়েছে—কেন?

দু'চোখ টান করে এই মারের মুখেও সমু ছোড়দিকেই দেখছে এখন। সেই চোখে চোখ পড়তে দুটো হাতই হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঘরের বাতাসেও টান ধরেছে যেন, ধড়ফড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুবর্ণা।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। রাত ন'টা...দশটা...এগারোটা...বারোটা...সুবর্ণা বাড়ি ফেরেনি। গায়ত্রী আজ তাকে দুপুরেই দোকান থেকে চলে আসতে দেখেছে। কিন্তু সাহস করে কাছে আসতে পারেনি। আবার ঘন্টাখানেক বাদে বেরুতেও দেখেছে তাকে। তখনো জিজ্ঞাসা করেনি কোথায় যাচ্ছে।

মাথায় খুন চেপেছে শংকর চাটুজ্যের। রাগারাগি করছে না। একটা কথাও বলছে না।

রাত্রি একটার সময় বাড়ি ছেড়ে বেরুলো সে। একটা ঘুমন্ত রিক্সাওয়ালাকে টেনে তুলল। জগা পাঠকের বাড়ি সোয়া মাইল দূরে এখান থেকে। পৌঁছল। দরজার কড়া নাড়ল। যে দরজা খুলল সে শংকরকে চিনল।

—জগা কোথায়?

সবিস্ময়ে জবাব দিল, কলকাতায় নেই, দিন কয়েকের জন্য বাইরে গেছে—

—কবে কখন গেছে?

—আজই। বিকেলের দিকে...

ফিরে এসেছে। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে গায়ত্রীর ভয় ধরেছে।

অত রাত্রে শংকর চাটুজ্যে মদের বোতল বার করে বারান্দায় বসেছে।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে—রাত তখন আড়াইটে পৌনে তিনটে—দাদার হুঙ্কার কানে এসেছে সমুর।—কোনদিন ওদেব হাতের নাগালের মধ্যে পেলে দুজনকেই খুন করব আমি—বুঝলে? খুন কবে ফাঁসি যেতে হয় তাও আচ্ছা, কিন্তু শংকর চাটুজ্যে কি মানুষ ওরা বুঝবে।

খাট থেকে নেমে সমু দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। বউদি তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

দাদার চোখ সমুর দিকে ঘুরল। শুধু নেশায় অত টকটকে লাল হয় না দাদার মুখ।

...হ্যাঁ শংকরের যত আক্রোশ এবারে সমুর দিকে ধাওয়া করেছে। উঠে এসে ওরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াব তাড়না। সব জেনে বুঝে ও আগে থাকতেই সতর্ক করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল—আক্রোশ সেই কারণে কিনা জানে না।

সমু ঘরে চলে এল।

দু'দিনের মধ্যে সমু বাড়ির তদারকে যায়নি। রিণার সঙ্গে দেখা হয়নি। রিণা সর্বক্ষণ টেনেছে তাকে। কিন্তু একটা নিদারুণ স্তব্ধতার মধ্যে সমু শুয়ে বসে কাটিয়েছে

দুটো দিন। কারো মুখে কথা নেই। দাদার মুখে না, বউদির মুখে না। বাচ্চাটাও কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভয়ে ভয়ে চুপ মেরে আছে।

...এই দুদিন ধরেই সমুর ভিতরে ভিতরেও প্রচণ্ড একটা অশান্তি শুরু হয়েছে। থেকে থেকে ওর কেবলই মনে হচ্ছে এখনো কিছু বাকি। তাকেও কিছু একটা অমোঘ পরিণামের দিকে এগোতে হবে। সেটাই বাকি।...এ-রকম চিন্তা মনে এলে তার ভয় করে। প্রাণপণে চিন্তাটাকে বাতিল করেছে, সেটা বুদ্ধির গোচরে আসতে দিতে চাইছে না।

তৃতীয় দিন বেলা এগারোটার মধ্যে নতুন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। শেষ হয়েই এসেছে বলতে গেলে। রঙের কাজ হচ্ছে এখন। দাদার ধ্যান-জ্ঞান মতই কাজ হয়েছে। ঠিক দিনে ঠিক সময়ে এসে ওঠার ব্যাপারে কোনরকম বিঘ্ন হবার কথা নয়।

বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠল সমু। ও যেন স্পষ্ট অনুভব করল, এ-বাড়ির সঙ্গে তার সংস্রব মুছে গেছে। ও এখানে আসছে না। ও এখানে থাকছে না।

পায়ে পায়ে এ-ধারে চলে এল। যেখান থেকে রিণাদের বাড়ি দেখা যায়। এ-বাড়িটার পাশে হাড়গোড় বার করা অসমাপ্ত কুৎসিত। রিণাকে দেখা যাচ্ছে না। এত সকালে তাকে আশা করছে না, নইলে দু'দিন আসেনি—সময় হলে ঠিক ওই দোতলার আলসের সামনে এসে দাঁড়াবে।...গায়ের সব রক্ত আবার যেন সির সির করে উঠল হঠাৎ। আবার সেই গোছের অনুভূতি একটা।...রিণার সঙ্গেও যেন তার যোগাযোগের অবসান আসন্ন।

না, এ-সব উদ্ভট চিন্তার আমলও দিতে চায় না। দেবে না। ঘুরে দাঁড়াল। অদূরে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি। ন্যাড়াদা। নারায়ণ শর্মা। এত দূর থেকেই কুটিল কঠিন মনে হল মুখটা। তার দিকেই চেয়ে আছে। একটু ইশারা পেলেই কাছে আসার ইচ্ছে।

...সিমেন্ট রাখার শেডটার দিকে চোখ গেল সমুর। এখনো স্তূপীকৃত সিমেন্টের বস্তা সাজানো সেখানে। গেট-টেট করতে হলে আরো কিছু সিমেন্ট লাগবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক বাঁচবে সন্দেহ নেই। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। বস্তাগুলো দেখতে লাগল।...কন্ট্রোল দামে কেনা সিমেন্ট দাদার, যেগুলো বাঁচবে কালোবাজারে সেগুলো ডবল দামে বিকোবে।

সংকল্পটা হঠাৎই মাথায় চেপে বসল। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে কন্ট্রাক্টরের খোঁজ করল। সে নেই। ইদানীং তার কাজের চাপ নেই বলতে গেলে—প্রায়ই থাকে না। ভালোই হল। সমু পকেটে হাত দিল। চারটে টাকা আছে। দুজন কুলিকে ডেকে ওই গুদোম থেকে সিমেন্ট তোলার হুকুম দিল।

কড়া নাড়তে রিণা ছুটে এসে দরজা খুলল।—কি ব্যাপার? দুদিন দেখা...এ কি।

সিমেন্টের বস্তা মাথায় লোক দুটোকে দেখে বিষম অবাক সে।

—জল-টল না লাগে এমন একটা জায়গা দেখাও—গোটা তিরিশেক বস্তা রাখতে হবে।

রিণা হাঁ তবু।

সমু নিজেই রাখার মত উপযুক্ত জায়গা বেছে কুলিদের দেখিয়ে দিল।

দু'বস্তা রেখে ওরা চলে যেতেই রিণা চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।—এ কি করছ! এত সিমেন্টের আমরা দাম দেব কি করে?

—আগে কাজটা শেষ হতে দাও।

বেরিয়ে এসে সমু আবার গুদোমের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতবটা এত নিরুদ্বিগ্ন কি করে নিজেই ভেবে পাচ্ছে না।

দু'বস্তা দু'বস্তা করে সিমেন্ট যাচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে নারায়ণ শর্মা তাই দেখছে। আর দূরে দাঁড়ানো সম্ভব হল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

—ওদের সিমেন্ট দিচ্ছ বুঝি?

সমু সামান্য মাথা নাড়ল।

নারায়ণ শর্মার বিবস মূর্তি।—তোমাব দাদা ওদেব সিমেন্ট দিতে রাজী হলেন?

খুব ঠাণ্ডা গলায় সমু জবাব দিল, সে-খোঁজে তোমার বিশেষ দরকাব আছে?

কুৎসিত একটা হিংস্র ভাব চেপে নারায়ণ শর্মা চলে গেল।

দু'জনে মিলে তিরিশ বস্তা সিমেন্ট ও-বাড়িতে তুলে দিতে আধ-ঘন্টাও সময় লাগল না। পকেটের চারটে টাকাই সমু লোক দুটোকে দিয়ে এ-বাড়িতে এসে ঢুকল।

রিণার চোখে-মুখে বিষম উদ্বেগের ছাপ।—এ কি কাণ্ড করলে? দাদা জানে? তাঁকে বলেছ?

সমু মাথা নাড়ল। কিছু বলা হয়নি।

—তাহলে? তাহলে এ-কাজ কেন করলে তুমি! দাদা টের পেলে তোমাকে কি বলবে?

—টের না-ও পেতে পারে। অনেক আছে।...পেলে আদর করবে না নিশ্চয়। যাক, সে ভাবনা আমার, তোমার নয়—কালই আমি অন্য মিস্ত্রী ঠিক করে আসব —একতলাটা অন্তত ভালোভাবে শেষ হওয়া দরকার—দোতলারও কিছু কাজ হতে পারে—আরো কিছু সিমেন্ট আনা যায় কিনা চেষ্টা করব—

—না না—তোমাকে চেষ্টা করতে হবে না—এইতেই আমার বুক কাঁপছে—

সমুর চোখে চোখ পড়তে থমকাল হঠাৎ। চাউনিটা কি-রকম যেন লাগছে। জিজ্ঞাসা করল, দু'দিন আসনি কেন?

তাকে সামনে ঘরে টেনে এনে বসাল। নিজেও গা ঘেঁষে বসল।—কি গণ্ডগোল?

—ছোড়দি চলে গেছে।

—সে কি! রিণা আঁতকে উঠল।—চলে গেছে মানে?

মানেটা দু'কথায় বলল সমু। দাদার মেজাজের কথাও বলল।

অস্থির মুখে রিণা বলে উঠল, তার মধ্যে তুমি তিরিশ বস্তা সিমেন্ট পাচার

করলে, তোমার ভয় করছে না?

—সত্যি আশ্চর্য রিণা, আমার একটুও ভয় করছে না।

রিণার মুখের ওপর চোখ দুটো অপলক আটকে আছে, অথচ ও যেন দূরের কিছু দেখছে।

কি ভেবে রিণা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এ বাড়িতে উঠে আসছ কবে?

—উঠে আসার তারিখ আর সতেরো দিন বাদে...কিন্তু আমি বোধহয় আসছি না।

—তার মানে? বিষম চমকেই উঠল রিণা।

—তার মানে জানি না, আমার মন বলছে আমি আসছি না। আমার মন বলছে তোমার সঙ্গেও আমাব যোগাযোগ খুব শীগগিরই শেষ হয়ে আসছে।

রিণার ভয় ধরল। মুখেব উপর চাউনিটা আরো অস্বাভাবিক লাগছে। কেন? আমাকে নিয়ে কারো সঙ্গে কোন কথা হয়েছে নাকি?

মাথা নাড়ল।—না, কোন কথা হয়নি।

—তাহলে কি পাগলেব মত বকছ তুমি?

সমু আস্তে আস্তে বলে গেল, আমাব যে-মনটাকে আমি সব থেকে বেশি ভয় কবি বিণা—সেই মনই এ-বকম আঙুল দেখাচ্ছে।...আট বছর বযসে আমার বাবা মারা যাবার আগে আমি স্পষ্ট দেখতে পেযেছিলাম বাবা চলে যাচ্ছে। সেই থেকে ওই মন ঢের আগেই কত কি যে বলে দেয় দেখিয়ে দেয় ঠিক নেই। তাব বেশির ভাগই সত্যি হয়।...দু'বছর আগে পুলিসের গুলি খেয়ে আমার ছোড়দা মারা গেল, কিন্তু তার ঢেব আগে আমি তার মৃত মুখ দেখতে পেয়েছিলাম...মেজদা চলে গেছে, আমি জানতাম...ছোড়দি চলে যাবে তাও আমি আগে থাকতেই দেখেছি। আমি যেটা দেখতে পাই সেটাই অভিশাপ। আমাব মন বলে দেয় কি হবে। ঠিক তেমনি করে আমার মন আজ বলে দিল এই নতুন বাড়িতে আমি এসে উঠব না...আমার মন বলে দিল, শীগগিবই তোমাব সঙ্গেও আর যোগাযোগ থাকবে না...যেমন করে তোমাকে দেখতে চাই ধবতে ছুঁতে চাই তাও হবে না, [illegible] ও পাব না।

বুক নিংড়ে কথাগুলো বেবিযে এল। রিণা শুনল। মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছে সে-ও। দেখছে বিণাব মুখেও বেদনাব ছাযা। কিন্তু একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত।

শরীবটাকে একটু বেঁকিযে উঠে দাঁড়াল। তাবপব একটু দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।...আজও বাসন্তী রঙেব শাড়ি পরেছে রিণা। সুন্দর লাগছে। চলে যাবাব পরেও যেন ওকে দেখতে পাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল। চাউনিটা গভীর।—চলো, ওপবে গিয়ে বসি।

—আবার ওপরে কেন...

হাত ধরে টানল।—ওঠো।

ন্যাড়া সিঁড়ি ধরে পাশাপাশি দোতলায় উঠে গেল। সামনেব ঘরটাতে একটা মাদুর বিছানো। হাত ধরাই ছিল, টেনে বসাল তাকে।—বসো। নিজেও একেবারে

গা ঘেঁষে বসল। মুখের কাছে মুখ। চাউনি আরো গভীর।

—কি? সমু হঠাৎ বিহ্বল যেন।

—দেখ আমাকে। ধরো।

সমু চেয়ে আছে। চোখের গভীরে দেখছে।

দু'হাত বাড়িয়ে মাথার পিছন দিকটা ধরে রিণা ওর মুখটা নিজের মুখের ওপর টেনে আনল। তারপর দুই নরম অধরের উষ্ণ নিবিড় স্পর্শ ওর ঠোঁটের ভিতব দিয়ে যেন সমস্ত দেহে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

কত কালের কত যুগের একটা তৃষ্ণার বাঁধ ভেঙেছে যেন। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে এক জীবন্ত অমৃতের উৎসকে পাগলের মতই দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে সে। ওই উষ্ণ নরম দেহ মাদুরের ওপর শয়ান এখন...দুই বাহুর নিষ্পেষণে ওকে যেন নিজের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে সমু, আর মুখে গালে বুকে অজস্র চুমু খেয়ে চলেছে।

সমু হারিয়ে যাচ্ছে। রিণাও।

তারপর সত্তার গভীরতম নিভৃতের গভীর থেকে আবারও যেন অমোঘ অব্যক্ত শিহরণ একটা। প্রকৃতির দুর্নিবার হাতছানি। সমু থমকে আধা-আধি উঠে বসল, রিণার কালো চোখের গভীরে চোখ রাখল।

দু'হাতে রিণা আবার বুকের ওপর টেনে নিল তাকে।

কুমারীর দেহ-যমুনায় কৌমার্যের প্রথম আবাহন। থরো থরো কাঁপছে দুজনেই আর নিঃশেষে হারিয়ে যাচ্ছে। দুটি সত্তার মিলনে বিস্মৃতির নবজন্ম। পৃথিবী স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে সমু জানে না—মহাকালের শেষ প্রান্ত ছুঁ গ আবার যেন এখানেই ফিরে এল সমু। রিণাকে ছেড়ে উঠে বসল আস্তে আস্তে।

গভীর কালো দুই চোখ মেলে রিণা অপলক চেয়ে আছে তার দিকে। সমস্ত মুখ লাল। কোন কারিগর যেন এইমাত্র তার সমস্ত মাধুর্য ঢেলে এই মুখের শেষের আঁচড়টি টেনে দিয়ে গেল।

সমুও চেয়ে আছে। এই মুহূর্তে বুকের তলায় একটা তীক্ষ্ণ মোচড় পড়ল। সমস্ত মুখ হঠাৎ বিবর্ণ সমুর। অস্ফুট আর্তস্বরে বলল, এ কি হল রিণা!

রিণার মুখ তেমনি সুন্দর। ঠোঁটে হাসি।—তোমার মন সব সময় ঠিক কথা বলে না। তুমি আমাকে যে-ভাবে দেখতে চেয়েছিলে—দেখেছ, যেমন করে পেতে চেয়েছিলে—পেয়েছ।

মুখের ব্যাকুলতা দূর হল না তবু।—কিন্তু এরপর তুমি আমাকে ঠিক-ঠিক বিশ্বাস করবে তো?

তার উদ্বেগ যেন চোখ দিয়েই অনুভব করল রিণা।—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি, আমি তোমার ভুল ভাঙাতে চেয়েছি।

সমু মাথা নাড়ল।—ও কথা ছাড়, অতখানি ভাল না বাসলে আমার ভুল নিয়ে তোমার মাথাব্যথা হত না। ঝুঁকে চুমু খেল। ওর স্রস্ত বসন নিজেই একটু টেনেটুনে দিল। বুকের তলায় এত দরদের সন্ধান আগে কখনো পায়নি। তুমি বিশ্বাস করো, এবারে আমি নিজের দু'পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করব, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারি

তোমাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাব।

রিণার দু'চোখ তার মুখের ওপর নড়াচড়া করল একপ্রস্থ। আঙুল তুলে ওদের বাড়িটা দেখিয়ে হালকা করে জিজ্ঞাসা করল, ওখানে?

—ওখানে হোক, যেখানে হোক এটাই পাকা কথা জেনো। আমি আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি—

রিণা তাড়াতাড়ি একটা হাত বাড়িয়ে মুখে চাপা দিল তার।—শপথ করতে হবে না। প্রায় ধমকের সুর। উঠে বসল আস্তে আস্তে।—বলেছি তো যা হয়েছে তার জন্যে তোমার কোন দায় নেই, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে।

সমু আহত বিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিক।—তুমি একথা বলছ কেন রিণা?

রিণার দু'চোখ ওরই মুখের ওপর আটকে আছে। তবু বিমনা একটু।—এমনও হতে পারে ভবিষ্যতে তুমি আমার কাছ থেকে ঘেন্নায় ছুটে পালিয়ে যাবে। গেলেও তোমাকে দোষ দেব না...অবস্থার চাপে পড়ে আমার দিদিরা আজ কোন পথে চলেছে, আর কোন আশায় আমাকে তারা বড় করে তুলেছে এ যদি জানতে...

ওকে আশ্বস্ত করার জন্য ভিতরটা আকুল হয়ে উঠল সমুর।—জানি রিণা, আমি সব জানি, তোমার দিদিদের আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি না—আমি তোমাকে চেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি—দুনিয়ার দিদিরা সব চুলোয় যাক—

রিণা হেসেই ফেলল। কিন্তু ভিতরে তার ভিন্ন আলোড়ন। উদগ্রীব আশার মাধুর্য নিয়ে সামনে ঝুঁকল।—দিদিদের সম্পর্কে তুমি কি জানো? কি করে জানো?

—যা তোমার মনে আছে সব জানি। ন্যাড়াদা বলেছে, কিছু রেখে-ঢেকেও বলেনি—

—ও...। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দে আর আবেগে গলা জড়িয়ে ধরল সমুর। —তুমি এত ভাল! তুমি কত ভাল! আমার কত ভাবনা কত যন্ত্রণা দূর করে দিলে তুমি জান না—তুমি জান না!

সমু হাসছে। মৃদু মৃদু পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে।

একটু বাদে নিশ্চিন্ত খুশির জোয়ারে জ্বলজ্বলে মুখ।—ভালই হয়েছে, তোমাকে বলে ওই ন্যাড়াদা শয়তানটা এতদিনে একটা সত্যিকারের উপকার করেছে আমার...কালও মেজদি ওটাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে।

—কেন?

—বুঝেও আর কেন-কেন কোর না। ঝুঁকে প্রবল আবেগে তার বুকে নিজের মাথাটা ঘষতে লাগল রিণা।

আর সমুর বুকটা এত ভরাট যে নিজের মধ্যেও আর কুলিয়ে উঠছে না যেন।

৬

ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার শেষ বাঁধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার জন্য যে-কোন একটা উপলক্ষ্য দরকার ছিল হয়তো শংকর চাটুজ্যের। জীবিকার ক্ষেত্রে সে এক অপ্রতিহত

সৈনিক। কিন্তু তার সেই দুর্দম ইচ্ছার বেগ সংসারের আঙিনায় বার বার ঠোক্কর খাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, সেটাই অসহ্য। সেই আঙিনায় নিজের স্ত্রীর অস্তিত্ব আছে, দেহ সমর্পণের আপস আছে—কিন্তু যা নেই তার খোঁজ কখনো করেনি শংকর চাটুজ্যে। ফলে নিভৃতের একটা দিক যেমন নিঃসঙ্গ খরখরে ছিল, তেমনিই থেকে গেছে। এই আঙিনা থেকে সানুটা যেন তার মুখের ওপর একটা বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। শম্ভু চলে যাক সত্যিই চায়নি—চলে গেছে।...সুবিটা তাকে মুখের ওপর বলল নিজের স্বার্থে সে ওকে বলি দিয়েছে। নিজের বলতে ও যা বুঝেছে সেটা একটুও সত্যি নয় বলেই এত যন্ত্রণা এত অপমান শংকরের। সকলকে জড়িয়ে সকলের সব কিছু জড়িয়ে নিজের ভাবত শংকর চাটুজ্যে। সুবর্ণা তার উঁচু মাথা পায়ের নীচের মাটিতে থেঁতলে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

...আর ওই সমু...তার সত্তার আধখানা দখল করে বসে আছে। ও সব জানে সব দেখে সব বোঝে। এই জানা দেখা বোঝার সহজাত প্রবণতা শংকরেরও ছিল একদিন। এই সংসারের প্রয়োজনে তার ওপর পাথরচাপা পড়েছে। কিন্তু ও মুক্ত, ওর কোন দায় নেই। নেই বলেই ও সব জানে সব দেখে সব বোঝে। সানু থাকবে না ও জানত, সুবর্ণা কি করবে তাও জানত। তাকে সতর্ক করেছিল। এখন ও-ই হয়তো তার দুর্দশা দেখে হাসছে মনে মনে। ওর ওই বড় বড় বোকা-বোকা চোখ দুটোকে আর একটুও বিশ্বাস করে না শংকর চাটুজ্যে।

...এখন একমাত্র স্থির আশার আলো ওই বাড়িটা। ওই শান্তির আশ্রয়ে গিয়ে পড়তে পারলে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, সব জটিলতা সরল হবে, সমস্ত ক্ষতর ওপর প্রলেপ পড়বে।

মনের এই অবস্থায় ওই স্থির আলোর শিখার গায়ে এতটুকু বাতাস লাগলে শংকর চাটুজ্যে তা বরদাস্ত করবে কেমন করে?

বাতাস লাগল।

সকালে বাড়ির তদারকে এসেছিল যেমন রোজ আসে। বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে নারায়ণ শর্মা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এবারে আস্তে আস্তে পা বাড়াল। ...সিমেন্ট বেঁচেছে অনেক। ন্যায্য দামে সে-ও কযেক বস্তা সিমেন্ট পেলে বাঁচে। পিছনের ওই অসমাপ্ত বাড়ির মেয়েরা তিরিশ বস্তা সিমেন্ট পেয়ে গেল—সে-ও কিছু পেতে পারে না? সাহসে ভর করে এটুকু রিহার্সেল দিতে দিতে এগিয়েছে সে। বরাত ভাল থাকলে তারপর আর রিহার্সেলের দরকার হবে না হয়তো...কানে বিষ ঢালার এটাই যে শেষ সুযোগ।

সরাসরি দোকানে না গিয়ে শংকর চাটুজ্যে পায়ের জুতোয় মাটি আছড়াতে আছড়াতে বাড়ি ঢুকল।—কোথায়? সেই রাসকেলটা কোথায়? শুয়ারটাকে আজ আমি চাবকে ছাল-চামড়া তুলে নেব।

ঘরে সমুকে না দেখে বারান্দায় এসে ফেটে পড়েছে শংকর চাটুজ্যে।

গায়ত্রী ছুটে এল। ত্রাসের কাঁপুনি।—কি হয়েছে?

—কি হয়েছে শুনবে? সুদের হিসেব ছাড়া আর কিছু কানে ঢুকবে তোমার?

আক্রোশটা এই মুহূর্তে স্ত্রীর মাথার ওপর ভেঙে পড়তে চাইল।—কতগুলো বেশ্যা মেয়ের খপ্পরে পড়ে সমু নেচে বেড়াচ্ছে এখন...শুনলে? আমার গুদোম থেকে সিমেন্ট তুলে ও এখন তাদের বাড়িতে পাচার করছে—তিরিশ বস্তা সরানো হয়ে গেছে—বুঝলে?

গায়ত্রী নির্বাক দাঁড়িয়ে।

সমুকে না পেয়ে শংকর আবার জ্বলতে জ্বলতে বেরুলো।

...তিরিশ বস্তা সিমেন্ট নয়, স্থির আশার আলো তার ওই শান্তির আশ্রয়ের গায়েই যেন অশুচি বাতাসেব ঝাপটা লেগেছে একটা।

খেতে এল না। কারখানা থেকে সোজা আবার নতুন বাড়িতে চলে এল শংকর চাটুজ্যে। এ-দিক ও-দিক তাকাল। সমু নেই। থাকবে না জানা কথাই। পিছনের ওই বাড়িতে আছে।

হন হন করে এগিয়ে গেল। জোরে বন্ধ দবজার কড়া নাড়ল। ভিতর থেকে কে ছুটে এসে দরজা খুলছে টের পেল।

দবজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁপা-রঙের শাড়ি-পবা মেয়েটা যেন ভূত দেখার মত করে চমকে উঠল।—আ-আপনি...

—আমাকে তমি চেন?

মেযেটা সভয়ে মাথা নাডল। চেনে।

—সমু কোথায়?

—আসেনি...এক্ষুণি আসাব কথা...

—ও। সেই জন্যেই বড আশা নিয়ে দবজা খোলার জন্য ছুটে এসেছিলে? তুমি কে?

—রি-রিণা। বুকেব ভিতরটা কাঁপছে তার।

—তিন বোনের মধ্যে তুমিই তাহলে ছোট?

গলা শুকিয়ে কাঠ, রিণা মাথা নাড়ল। তাই।

—সমু কাল তোমাদের এখানে তিরিশ বস্তা সিমেন্ট সরিয়ে এনেছে?

রিণা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জবাব দিতে পারল না। দূরের দিকে চোখ গেল একবার, সঙ্গে সঙ্গে আরো ত্রাস।

—সিমেন্ট নিয়ে দাম দিয়েছ তোমরা?

বিণার ত্রস্ত দৃষ্টিটা একবার তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল। মাথা নাড়ল। দেয়নি।

দু'চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে শংকরের।—তাহলে সিমেন্ট নিচ্ছ কোন ভরসায়? —তোমরা কেমন মেয়ে কোন জাতের মেয়ে জান না? কোন আশায় সিমেন্ট নিচ্ছ? সমু তোমাকে বিয়ে করবে? বিয়ে করে ওই বাড়িতে নিয়ে তুলবে?...তার আগে ওকে আমি কুচি-কুচি করে কাটব সেটা জেনেছ?

মেয়েটার আতঙ্ক-ভার চাউনি ঠিক তার কাঁধের পিছনে এবার। শংকর ঘুরে দাঁড়াল। পিছনে সমু।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে পাঁচ হাত দূরে মাটির ওপর ঘুরে পড়ল

সে। রিণা রুদ্ধশ্বাসে ছুটে ভিতরে চলে গেল।

যা-কিছু ফয়সলা এক চড়েই হয়ে গেছে। শংকর মাটিতে আঘাত করতে করতে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

পরদিন।

আগের রাতে সমু বাড়ি ফিরেছে কিনা খবর রাখে না। সন্ধ্যা থেকেই মদ গিলছিল শংকর চাটুজ্যে। রাত দশটা পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

সকালে ওর ঘরের দরজা ভেজানো দেখল। কিছু না বলে বেরিয়ে এল। গায়ত্রীর সঙ্গেও একটি কথাও হল না।

নতুন বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অবাক একটু। কাছে দূরে ছেলেরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের ওই অসমাপ্ত বাড়িটাই দেখছে সব মনে হল।

নিজের বাড়ির সামনে আসতে খবরটা কণ্ট্রাক্টর দিল।...ভোররাতে ওই অসমাপ্ত বাড়ির ছোট মেয়েটা খুব সম্ভব ওই ছাতে উঠে ঝাঁপ দিয়েছে...দোতলা থেকে হলে বেঁচে যেত হয়তো।...হাসপাতালে নিতে নিতেই শেষ।

শংকর চাটুজ্যে বিমূঢ়। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে। কথাগুলো কানে ঢুকেছে, মাথায় আসছে না যেন।

...মাথার ওপর সূর্যটা জ্বলছে এখন। শংকর চাটুজ্যে দাঁড়িয়েই আছে। অসম্পূর্ণ বাড়িটার দিকেই চেয়ে আছে।

কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। ফিরে তাকাল। হাত তিনেক দূরে সমু। ও তাকেই দেখছে।

এখনো দেখতেই লাগল। তার ভিতরের আনাচ-কানাচ সুদ্ধ দেখে নিচ্ছে যেন।

শংকরের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠতে চাইল। বলতে চাইল, কি দেখছিস রে সমু...আমার কাছে আয়...

বলতে পারল না।

সমু ও-দিক ফিরেছে। চলে যাচ্ছে। কোথায় চলল আবার, পাগল নাকি ওটা। চিৎকার করে ডাকতে চাইল শংকর চাটুজ্যে, কোথায় চললি রে সমু, শোন, কাছে আয়!

ডাকতে পারল না।

ঠিক দিনের ঠিক সময়টিতে এই বিশাল নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে তিনজন। শংকর চাটুজ্যে আর তার স্ত্রী গায়ত্রী চাটুজ্যে আর তাদের ছেলে বাচ্চু।

...এত বড় বাড়িটা যেন সর্বক্ষণ হাঁ করে গিলছে গায়ত্রীকে। দু'দিনেই যেন একটা দুঃসহ রকমের হাঁপ ধরে গেছে। এতদিন ধরে শুধু সুদ-কষার হিসেবের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, ওই এলাকার সেই মানুষদের সাদরে ডেকে এনে যদি এই শূন্যতা ভরাট করার সাধ্য থাকত—তাও করত বোধহয়।

এই নির্জনতা ছেলেটার বুকের ওপরেও চেপে বসে আছে। সে-ও বোবা হয়ে আছে একেবারে।

...নীচে আর ওপরে অবিরাম টহল দিয়ে চলেছে শুধু শংকর চাটুজ্যে। তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, শূন্যতাবোধও নেই। সে তার শান্তির আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। দু'দিন দু'রাতে সব ক'টা ঘর আর বারান্দায় বোধহয় দুশো বার টহল দেওরা হয়ে গেল। আর সারাক্ষণ বিড়বিড় করে বলছে কি। কি বলছে গায়ত্রী চাটুজ্যে জানে। কতবার তাকেই বলেছে।

...নীচের এই ঘর দুটো শম্ভুর জন্য ঠিক করে রেখো। ঘাড় ধরে নিয়ে এলে সুড়-সুড় করে আবার বউ নিয়ে ঢুকবে।

...আর এ-দিকের ঘর দুটো সুবর্ণাদের, দোতলায় বোন আর ভগ্নীপতি নিয়ে পাশাপাশি লেপটে থাকতে পারব না আমি, ওদের নীচে থাকাই ভাল—কিন্তু ওই লোফারটা যদি ফের আবার অন্য মেয়ের দিকে তাকায় তো ওর আমি চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব বলে দিলাম।

...আর এই বাকি ঘরটা ওদের ড্রইংরুম হতে পারে, কি বল?

...দোতলার ওই মাঝের ঘরটা আমাদের আর সমুর ড্রইংরুম। হেসেছে—আমরা আর ড্রইংরুম দিয়ে কি করব, আসলে এটা বাচ্চুর আর সমুর ড্রইংরুম হবে।

...আচ্ছা এর দু'পাশের কোন দুটো ঘর বেশি ভাল বল তো? যে দুটোয় আমরা আছি, না এ-দিকের এই দুটো? সমুর জন্য যে দুটো রেখেছি সেই দুটোই বোধহয়, না?

...তুমি হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি মুখের দিকে? বিরক্ত।—সমু আর আসবে কি আসবে না ভাবছ নাকি! যুদ্ধের কাল শেষ হলেই বোকাটা আবার ঠিক আসবে, দেখো। যুদ্ধের কাল কি চিরকাল বসে থাকে নাকি! দুদিন আগে হোক পরে হোক শেষ হবেই।...যুদ্ধের কালে কত কি হয়, কত কি হারায়...ওই রিণা কি দুনিয়ায় একটাই নাকি, যুদ্ধের কাল ফুরোলে গাধাটা আবার রিণার দেখা ঠিক পাবে, আর তাকে নিয়ে তখন এখানেই ফিরে আসবে দেখো। না এসে যাবে কোথায়? এটা আমার বাড়ি নয়, এটা বাবার বাড়ি—বাবা ঠিক এই বাড়ি চেয়েছিল—বুঝলে? সক্কলে আসবে—বুঝলে? তুমি হাঁ করে দেখছ কি? অত ভাবছ কি?

...স্বামীকে কি কখনো তেমন করে দেখেছে গায়ত্রী চাটুজ্যে? কাল দেখেছে। আজ দেখছে। এখন দেখছে। বুকের ভিতরে মোচড়ের পর মোচড় পড়ছে।

এই মানুষের চোখে জল দেখেনি কখনো। অস্বাভাবিক চক চক করছে ওই দুটো চোখ।

জল কিনা জানে না।

ঝংকার

১

আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। সামনের উঁচু আসনে বিচারক বসে। বিচারের ঘর—লোক গিসগিস করছে। সকলের জোড়া জোড়া চোখ আমার ওপর।

বিচারের এই মহড়া আগেও বারকয়েক হয়ে গেছে।

আমার চারদিকে একটা জোরালো আলোর বেষ্টনী। সেই বেষ্টনী ছাড়ালে এতবড় পরিবেশের সবটাই যেন আবছা অন্ধকার। চেষ্টা করলেও সহজে চোখ চলে না। কিন্তু তবু আমি যেন দেখতে পেতাম, অনুভব করতাম। ওই জোড়া জোড়া চোখগুলো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরে আছে। সেই দৃষ্টিতে শালীনতা নেই, লজ্জা নেই, অনুকম্পা নেই।

আমি খুনের আসামী সেটা প্রতিদিনের ক্লান্তিকর জেরায় জেরায় প্রায় প্রমাণের মুখে এসে ঠেকেছে। সুচিন্তিত এক নির্মম হীন চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আমি। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, রমণী দেহের এই কাঠামোয় পুরুষের লোভনীয় কিছু সম্পদ আছে। এই আদালত ঘরে একটু একটু করে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে রমণী দেহের এই সুন্দর সহজ সরল নিষ্পাপ খোলসটার আড়ালে একটা বিষাক্ত সাপ বাসা বেঁধে আছে। সে সময়ের অপেক্ষায় ছিল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন সেই সময় চুপিসারে এগিয়ে এসেছে, সেই সুযোগ পুরুষের জৈবিক ক্ষুধা আর বিস্মৃতির ফাঁক ধরে হাতের মুঠোয় এসে উপস্থিত হয়েছে। আর তক্ষুণি এই মোহিনীর বুকের তলায় সেই সাপ ফণা তুলেছে, অব্যর্থ দংশনে পুরুষের অচরিতার্থ অভিলাষ চিরদিনের মতো স্তব্ধ করেছে।

সেই পুরুষ আমার স্বামী। আমার প্রেমের অন্তরায়। আমার প্রেমিকের অন্তরায়। তাই সে সদাসন্দিগ্ধ, সর্বদা নিষ্ঠুর, কঠিন। রমণীর যে দেহ আর যে মন অপরের প্রণয়াসক্ত, সেই দেহ মনের ওপর দখল নেওয়ার ব্যাপারে তার নিষ্ঠুর উল্লাস, অকরুণ আসক্তি। তার এই দুর্বলতার ফাঁক ধরেই চক্রান্তের সুচতুর বুনটে আমি তার এই জগতের কামনা-বাসনা চিরদিনের মতো শেষ করে দিয়েছি নাকি। দিয়ে নিজেকে নিষ্কণ্টক ভেবেছি। আমার সেই চক্রান্ত সমস্ত দুনিয়ার চোখে ধুলো দেবার মতোই নিপুণ বটে। কিন্তু এই সভ্য যুগে পারফেক্ট ক্রাইম সম্ভব নয় বলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয়েছে। আমি ধরা পড়েছি। জেরায় পড়ে শেষ পর্যন্ত আমার প্রণয়ী আমার সামনে দাঁড়িয়েই স্বীকার করেছে, স্বামীর কারণে আমার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল, যথার্থই আমি মনে প্রাণে মুক্তির পথ খুঁজছিলাম। আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচ্ছেদের চেষ্টা করি নি কারণ স্বামীকে আমি ভয় করতাম, তার বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে আতঙ্কের কারণ। প্রসিকিউশন কাউনসিলর এই যুক্তিও প্রায় নস্যাৎ করেছেন। বিচ্ছেদের রাস্তা নিয়ে স্বামীর বিপুল বৈভব থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করার লোভেই ডিভোর্স চাই নি—এটাই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি।

আদালতে যারা উপস্থিত এ-যুক্তি তারাও অখণ্ডনীয় ভাবছে। আলোর বেষ্টনীর বাইরে খুব ভাল করে ঠাওর না হলেও সেই জোড়া-জোড়া চোখগুলো তাই অকরুণভাবে আমার দেহের সঙ্গে আটকে আছে অনুভব করছি। ক্ষমাশূন্য জনতার

ওই লুব্ধ দৃষ্টি এই সুন্দর রমণী-দেহ অনাবৃত করে দেখে নেবার সুযোগ পেলে হয়তো তাই দেখে নেয়।

কাঠগড়ার মধ্যে আমার নির্বাক দ্রষ্টার ভূমিকা, মূক শ্রোতার ভূমিকা। বিচাবক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি দোষী কি নির্দোষ। বলেছি, সম্পূর্ণ নির্দোষ। তারপর থেকে এই বিচারের মহড়া চলেছে। আমাব উকিলেব নির্দেশ প্রতিপক্ষের কোনো কথা বা কোনো জেরাব একটিও জবাব দেবেন না। তার নির্দেশ মতো আমি মুখ সেলাই করে আছি। আমি রমণী, বিচারক তাই অনুগ্রহ করে কাঠগড়াব মধ্যে একটা বসার চেয়ার রাখার অনুমতি দিয়েছেন। বোবার মতো সেই চেয়ারে বসে থাকি।

কিন্তু আজ আমি বসতে পাবছি না। দাঁড়িযে আছি। আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। তবু দাঁড়িয়ে আছি। একটা চাপা উত্তেজনায় বুকেব মধ্যে ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছে। মাথার মধ্যে কিসের দামামা বেজে চলেছে। আমাব অপবাধ প্রায় প্রমাণের মুখে এসে ঠেকেছে বলে নয়। বিচারক অবধারিত অন্তিম রায় ঘোষণা করবেন বলেও নয়।

...সাময়িক বিরতির পব পুলিশের হেপাজতে আবার এজলাসে ঢোকার সময় সামনের বিশিষ্টজনদের আসনে একজনকে আমি বসে থাকতে দেখেছি।

অভিজাত বেশবাস, লম্বা ছিপছিপে চেহাবা, পুষ্ট লম্বাটে দু'হাতের আঙুল, শরীরের তুলনায় ঠোঁটদুটো একটু ভারী। মাথায় ঈষৎ অবিন্যস্ত বড় চুল। বসে থাকাব ভঙ্গিটা নির্লিপ্ত শিথিল।

ওই লোক আমাকে দেখেছে কি দেখে নি জানি না। হযতো দেখেছে। এখানে আমাকে আর না দেখেছে কে। কিন্তু দেখলেও ওই লোক চিনবে না আমাকে। আমি চিনি। সমস্ত সত্তা দিযে চিনি। সমস্ত রক্তকণা দিয়ে চিনি। তাকে দেখামাত্র একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আমাব বুক ঠেলে উঠে আসছে। সেই যন্ত্রণা ঘৃণার আকারে দুই চোখ দিয়ে গলগল করে ঠিকরে বেরুচ্ছে কিনা জানি না।

...প্রতিপক্ষের উকিল আঙুল নেড়ে নেড়ে আমাকে দেখাচ্ছে আর বলছে কি। ওই বসা লোকটার মুখেব ওপব থেকে নিজেব চোখ দুটোকে জোর করে টেনে নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। ঠাস ঠাস করে এক-একটা শব্দ আমাব কানেব পর্দায় যেন প্রচণ্ড বিস্ফোবণেব মতো বেজে চলল।

...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত...বিশ্বাসঘাতিনী...!

মার্ডার...প্রি-প্ল্যাণ্ড কোলড ব্লাডেড মার্ডার!

আমার চোখের সামনে দ্রুত, খুব দ্রুত এই আদালতের দৃশ্য মুছে যেতে লাগল। আর এক দিনের এক আদালতের বিচারেব দৃশ্য চোখেব সামনে ভেসে উঠল। সেখানে কাঠগড়ায় দাঁড়িযে প্রায়-বৃদ্ধ এক মানুষ। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সেই মানুষ তার বিচার দেখছে, শুনছে। ফ্যাল-ফ্যাল করে জনতাকে দেখছে, বিচারককে দেখছে। তারপর যেন একটু একটু করে সচেতন হচ্ছে। লজ্জায় অপমানে ত্রাসে বিবর্ণ মূর্তি তার। তার দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে পুরু ঠোঁট নেড়ে একটি মানুষ কথার ঝড় তুলে বলছে, এ ফার্স্ট গ্রেড ক্রাইম...প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত...আভিজাত্যের মুখোস আঁটা বিশ্বাসঘাতক...তিন তিনজন

মানুষ চক্রান্তের বলি হয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর সরল বিশ্বাসে কতজন সর্বস্বান্ত হয়েছে...কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের সঙ্গে এ রকম অপরাধের তফাৎ কোথায়? কোথায়? কোথায়?

...কাঠগড়ার সেই প্রৌঢ় কাঁপছে থরথর করে, ঘামছে দরদর করে। মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে...

আমার চোখের সামনে থেকে প্রতিপক্ষের উকিলের মুখ মুছে যাচ্ছে, তার বদলে লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে আর এক-জন ওই কথাগুলো বলছে যেন—আর এক দিনের আর এক আদালতের সেই একজন।

...চোখের সামনে সেই লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁটই যেন নড়ছে।...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত...রূপের কোমল সুন্দর মুখোস আঁটা বিশ্বাসঘাতিনী...মার্ডার...প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার।

জ্বলন্ত ক্রোধে আর ঘৃণায় আর বিদ্বেষে আর যন্ত্রণায় সমস্ত আদালত ঘর আমার চোখের সামনে দুলে দুলে উঠলো, পায়েব নীচের মাটি সরে যেতে লাগল, চোখের সামনে যেন রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। জ্ঞান হাবাবার আগে একটা অন্তিম আর্ত চিৎকাব বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে—না না না! সব মিথ্যে! সব ষড়যন্ত্র! না না না- না না না! মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকের উল্লাসভরা গলাব সুব কানে এলো—কাট...কাট! তারপর খানিকক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু মনে নেই।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা পড়তে সম্বিৎ ফিরল।

স্টুডিও ঘরের সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। অনেকগুলো উদগ্রীব মুখ আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচালক আর সহকারী পরিচালক, একটু আগের উঁচু আসনে সমাসীন বিচারক. এই তিনজন একসঙ্গে আমাকে প্রায় আলতো করে তুলে আনতে চেষ্টা করছে। তাদের নিরস্ত করলাম। তবু যেন আত্মস্থ হতে সময় লাগছে একটু। মাথার ভিতবটা এখনো ঝিমঝিম কবছে। উঠে চেয়ারে বসলাম। তারপর দু'পায়ের ওপব ভব কবে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত নায়িকার জন্যে যেমন থাকে স্টুডিওর মধ্যে আমার জন্যেও তেমনি ঘর আছে একটা; সেখানে যাব। সত্যিই বিশ্রাম দরকার একটু।

পরিচালক আর সহকারী পবিচালক আমাকে ধরে স্টুডিওব কাঠগড়া থেকে বার করে আনল। আনন্দে ডগমগ তারা। এমন একাত্ম জীবন্ত অভিনয় আর বুঝি তারা জীবনে দেখে নি।

বিশিষ্ট আসনগুলোর সামনে দিয়ে যেতে যেতে আড়চোখে সেই মানুষটার দিকে তাকালাম আমি। সেই একজনের দিকে, যার অভিজাত বেশবাস, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, পুষ্ট লম্বাটে দু'হাতের আঙুল. দুটো ভারী ঠোঁট, মাথায় ঈষৎ অবিন্যস্ত বড় চুল। কমনীয় মুখ, কিন্তু লক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ওই কমনীয় মুখের চোয়ালসুদ্ধ কত দৃঢ় কঠিন হয়ে উঠতে পারে সে শুধু আমিই জানি। চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। কারণ ওই লোক আমার দিকেই চেয়ে আছে, শিথিল বসার

ভঙ্গি সত্ত্বেও দুই চোখে ঈষৎ হাসি-মাখা বিস্ময়ভরা প্রশংসা।

এখানে সকলেই আমার দিকে চেয়ে আছে, আমাকেই দেখছে জানি। এই সব চোখের আঘাতে এরই মধ্যে আমি অনেকখানি নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হয়ে উঠেছি। আজ তো বিশেষ আগ্রহ নিয়েই দেখবে সকলে। কারণ এমন একাত্ম অভিনয় সচরাচর কি দেখা যায় যেখানে নায়িকা অভিনয়ের ইমোশনে সত্যি সত্যি মূর্ছা যেতে পারে।

কিন্তু শুধু ওই একজনের এই স্তুতি মাখা চাউনিটা অসহ্য মনে হল আমার, দৃষ্টিটা যেন শরীরে বিদ্ধ হতে থাকলো। তাকে ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম আমি।

নিজের ঘরে এসে গদি আঁটা ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলাম। সত্যি অবসন্ন লাগছে। বুকের ভিতরটা এখনো যেন উত্তেজনায় ধকধক করছে। সেই আর এক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অসহায় প্রৌঢ় মূর্তি চোখে ভাসছে, আর বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে এখনো সেই সোচ্চার ধিক্কার মাখা অভিযোগের লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁট নড়ছে।

ওই আঙুল আর ওই মুখ আর ওই দুটো পুরু ঠোঁট আমার অনেক দিনের শান্তি নষ্ট করেছে, অনেক রাতের ঘুম কেড়েছে। আজও ওগুলো এক দুঃস্বপ্নের মতো আমার ভিতরে একটা ক্ষত সৃষ্টি করে বসে আছে।

অভিনয় জগতে আমি এক নবাগতা চিত্রতারকা। প্রথম আবির্ভাবেই আমি নামজাদা প্রযোজক পরিচালকের ছবিতে কাজ করছি। আমার বিপরীতের পুরুষ তারকাটিরও ভারতজোড়া নাম। তাই আমাকে নিয়ে ছায়াছবির পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা অনেক জল্পনা-কল্পনা আর অনেক ছবির ছড়াছড়ি। ওই সব কাগজে আজকের এই ঘটনা আবার নতুন করে সাড়া জাগাবে জানি। আর্তনাদের পর সত্যিই যখন সেই সাময়িক বিস্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, মুখের ওপর তখন ফটাফট কত ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠেছে জানি না। অভিনয়ের ইমোশনে সত্যি সত্যি ফেন্ট হয়ে যাওয়াটা ওই সব কাগজের চটকদার খবর হবেই। প্রযোজক ফ্লোরে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু নামী পরিচালকের মুখে খুশি ধরে না দেখেছি। কতবার পিঠ চাপড়ে বলেছে, স্প্লেনডিড্ ম্যাডাম্, স্প্লেনডিড্!

কিন্তু এক পেয়ালা কড়া কফি খাবার পর একটু সুস্থ হয়েও ও-সব সৌভাগ্যের কথা আমি ভাবছি না। ঘৃণা আর বিদ্বেষ মেশানো বিস্ময়ে আমি শুধু ভাবছি স্টুডিও ফ্লোরের বিশিষ্ট চেয়ারে আজ ওই লোককে দেখলাম কেন। সে এখানে কোন্ সুবাদে এসে উপস্থিত হল। তবে কি কাগজে কাগজে আমার চেহারার চটক দেখে আর পাঁচজনের মতো লোভের বশে কাউকে ধরে স্বচক্ষে শুটিং দেখতে এসেছে? ও-রকম সঙ্কল্পবদ্ধ দাম্ভিক পুরুষেরও ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্তিগত দুর্বলতা লুকিয়ে আছে?

আজ কোন্ বিতৃষ্ণায় কোন্ অবরুদ্ধ ক্ষোভে আর কোন্ যন্ত্রণায় অভিনয়ের ফাঁক দিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল সে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

ও. কে. ম্যাডাম? দরজা ঠেলে পরিচালক হাসিমুখে গলা বাড়িয়েছে।

আমিও হেসেই মাথা নাড়লাম।—ও. কে।

উৎফুল্ল গলায় পরিচালক বলল, তাহলে আমার এক বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে তোমার

পরিচয় করিয়ে দিই—এ ভেরি রেসপেকটেবল্ পারসন, কাম ইন সার। দরজার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে একজনকে অন্তরঙ্গ আহ্বান জানাল পরিচালক।

আমি ভালো করে সোজা হয়ে বসার আগেই তার পিছনে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখা মাত্র হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি সজোরে লাফিয়ে উঠল আমার। ধমনীর রক্তের কণায় কণায় একটা জ্বালা অনুভব করলাম। একই সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আর বিতৃষ্ণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল।

সেই মানুষ। সত্যিকারের আদালতে দাঁড়িয়ে আসামীর দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে যে অভিযোগের স্ফুলিঙ্গ ছোটাতে পারে। পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে যে ঝড় বইয়ে অভিযুক্ত আসামীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে পারে। কমনীয় মুখের চোয়াল দুটো কঠিন হলে যাকে ভয়াবহ মনে হয়।

আরামচেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। আমি অভিনেত্রী। সেটাই সৌজন্য। কিন্তু চেষ্টা করেও মুখে একটু সহজ হাসি টেনে আনতে পারলাম না। তার ওই কমনীয় মুখের ওপর আমার চোখ যেন এঁটে বসতে চাইল।

পরিচয় দিতে গিয়ে পরিচালক আমার প্রশংসায় প্রগলভ হয়ে উঠল। —ইনি মিস সুজাতা পাণ্ডুরং, একদিকে এম. এ, আর একদিকে এই প্রথম ছবিতে নামার ফলেই ইনডাসট্রির একজন প্রমিসিং স্টার হয়ে বসেছেন, একটু আগে এঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে তোমার মতো রসকষশূন্য মানুষও মুগ্ধ।

পরিচালক হেসে উঠল। লোকটির মুখেও ছেলেমানুষের মতো লাজুক হাসি।

হাসলে ওই কমনীয় মুখ আরো মিষ্টি দেখায়। দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। জবাবে আমি বার দুই একটু মাথা নাড়তে পাবলাম শুধু। আমি প্রমিসিং স্টার, কিন্তু চেষ্টা করেও এই মুহূর্তে ঠোঁটে একটুও হাসি টেনে আনতে পারছি না কেন!

পরিচালক এবার ও-তরপের পরিচয়েব দিকে এগলো। আর ইনি হলেন...

শুরু করার আগেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, এঁকে আমি চিনি—

পরিচালক অবাক, আর ওই মানুষ ততোধিক।

পরিচালক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি চেনো কি করে! কে বল তো?

এবারে আমার ঠোঁটের ফাঁকে ছুরির ফলার মতো একটু ধারালো হাসি উঁকিঝুঁকি দিল বোধহয়। দু'চোখ ওই মুখের ওপরেই এঁটে বসে আছে। বললাম, মিস্টার প্যাটেল...বিনায়ক প্যাটেল...মস্ত ব্যারিস্টার...

মিথ্যে বলি নি। এখন সামনাসামনি দেখে মনে হচ্ছে বড় জোর তিরিশ একত্রিশ হবে বয়েস। এই বয়সে এত নাম আর এত পসার খুব কম ব্যারিস্টারেরই হয়ে থাকে। অবশ্য এর বাবাও এই বোম্বাইয়ের একজন নামজাদা ব্যারিস্টার ছিল। সেই ভদ্রলোক মারা যেতে তার পসারও ছেলের দিকে ধাওয়া করেছে। তা হলেও এর নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে এ কেউ অস্বীকার করবে না। আমিও করি না।

বিস্ময়ের আতিশয্যে পরিচালক হাঁ একেবারে। ওই মানুষের অর্থাৎ বিনায়ক প্যাটেলের মুখেও কম বিস্ময়ের আঁচড় পড়ে নি। পরিচালক বলে উঠলো, ঠিকই তো চেনো দেখছি, কিন্তু তুমি এত চিনলে কি করে?

লোকটির চোখেও সেই জিজ্ঞাসা।

আমার চোখের কোণে কি আগুন ঝলসাচ্ছে? জানি না। ভিতরের সমস্ত বিরূপতা ঠেলে সরিয়ে সত্যিকারের অভিনেত্রী হওয়ার তাড়না আমার। আমার দুটো চোখ সেই থেকে মুখের ওপর বিদ্ধ হয়ে আছে তাই দেখেই বা কি ভাবছে লোকটা? সকলে বলে আমার টানা কালো চোখের চাউনি খুব গভীর, ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ। কাগজে কাগজে আরো কত প্রশংসা বেরিয়েছে এ দুটো চোখের। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের এই চোখ আয়নায় দেখতে পাচ্ছি না। ঠোঁটের হাসির ওপর বরং কিছুটা দখল এসেছে। ভদ্রলোকের মুখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পরিচালকের কথার জবাব দিলাম। —ওঁর কত কেস কাগজে পড়েছি। ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে উনি আপোসশূন্য লড়াই করেন, উনি রুখে দাঁড়ালে অপরাধীর মাথায় সর্বনাশেব খড়্গ নেমে আসবেই।

পরিচালক হরিহর শর্মা সহাস্যে মন্তব্য করলো, এ-সবে ইন্টারেস্ট তোমার জানা ছিল না তো!

পরিতুষ্ট হাসি বিনায়ক প্যাটেলের মুখেও। কিন্তু ব্যারিস্টাব মানুষ, দু'যে দু'য়ে চারের হিসেব মিলছে না তার। বলল, কোর্ট কেস না হয় কাগজে পড়ে বোঝা গেল, কিন্তু আমিই সেই লোক দেখেই বুঝলেন কি করে?

ভিতরটা বিতৃষ্ণায় জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু অভিনেত্রীর মতোই দু'চোখ বড বড কবে ফেললাম।—বাঃ, তুমুল লডাই যখন চলে আপনার ছবি কাগজে বেরোয় না।

লোকটা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। একটু চিন্তা কবে বলল, ইদানীং কোনো কাগজে ছবি-টবি বেরিয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না...

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিযে ফস করে বেরিযে এলো, কেন, এই গেল বছরে বোম্বাইয়ের সবগুলো বড কাগজেই তো দু' তিন দিন ধরে আপনার ছবির ছডাছড়ি —লোনাভালার সেই বসন্তরাও বীবকর কেসে, জেরায় জেরায় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সাধুতার মুখোশ আপনি টেনে ছিঁড়লেন! আসামীব দিকে আঙুল নেড়ে তার মাথায় আকাশের বাজ টেনে নামাচ্ছেন—আপনার সেই ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল।

...হ্যাঁ এইবারে মনে পড়েছে, আব এবারে লোকটা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। আর তক্ষুণি কেন যেন আমাব মনে হল লোকটা অবিবাহিত এখনো। একটা ষষ্ঠ চেতনা যেন বলে দিল, রমণীর মন এই লোকের এখনো চিনতে জানতে বাকি, রমণীর হৃদয় এখনো এর স্থূল আবিষ্কারের আওতায় আসে নি। সত্যি মিথ্যে জানি না। মনে হল।

পরিচালক অকৃত্রিম তারিফ করে উঠল, অসম বয়সের বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, দেখ, ট্যালেন্ট দেখ, দ্যাটস হোয়াই সী ইজ সো প্রমিসিং—এক বছর আগের কাগজে দেখা ছবিও হুবহু মনে রাখতে পারে।

হ্যাঁ, ট্যালেন্ট যে আছে এবার আর অস্বীকার করা গেল না যেন। পরিতুষ্ট মুখ। মুখের আদলে এখন কাঁচা লাজুক ভাব। চাউনিতে একটা চাপা প্রশংসা উপছে উঠতে চাইছে। বলল, কোর্ট কেসে কোনো আর্টিস্টের এত ইন্টারেস্ট থাকতে পারে জানা ছিল না...।

মোক্ষম জায়গায় সুড়সুড়ি পড়েছে এ আর আমার থেকে ভালো কে জানে। লোনাভালার ওই বীরকর কেসই এই মানুষের পেশার জীবনে সব থেকে রোমাঞ্চকর

ঘটনা। সেই কেসের জিতই রাতারাতি তাকে জনপরিচিতির তুঙ্গে তুলে দিয়েছে। সেখানে এমন এক মানুষের হীন চক্রান্ত আর অভিযোগ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যার মান মর্যাদা আর নিরহঙ্কার স্বভাবে কোনোদিন এতটুকু সন্দেহের আঁচড় পড়ে নি।

আমার ভিতর থেকে একটা চাপা বাষ্প যেন মুক্তির পথ খুঁজছে। এবারে পরিচালকের দিকে ফিরলাম। গলার সুরে ছদ্ম বিস্ময় আমার।—এঁর মতো মানুষেরও শুটিং দেখার ঝোঁক নাকি?

হুঁ। আমার অজ্ঞতায় পরিচালক উৎফুল্ল।—ক'দিন তাগিদ দিয়ে তবে আজ এই সেটে ধরে আনা গেছে। পরিচালকের দায়িত্ব তো আর চাট্টিখানি নয়। কোর্ট কেসটা ঠিক স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্যেই এই এক্সপার্ট ধরে আনা।

শুনে আমার গাত্রদাহ যেন বেড়ে গেল আরো। পলকা বিদ্রূপের সুরে বললাম, স্বাভাবিক লাগার বদলে এ রকম এক্সপার্টের চোখে এ-সব জোলো লাগার কথা—

না না, বিনায়ক প্যাটেল সবিনয়ে সংশয় নিরসন করতে চাইল ভালোই লেগেছে আর সবই মোটামুটি স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তাছাড়া আপনার অ্যাকটিংএর তো তুলনাই নেই..কেবল ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের যা একটু ওভার অ্যাকটিং হয়েছে।

শোনা-মা" কান দুটো ঝা-ঝা করে উঠল আমার। এতক্ষণ ধরে যে বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা উদরস্থ করে বসে ছিলাম সেটা যেন বেগে ঠেলে বেরুতে চাইল আবার।...অ্যাকটিং! আমার অ্যাকটিংএর তুলনা নেই! আমি কেন আজ ও-রকম অ্যাকটিং করতে পেরেছি সেই সত্যটা যদি একরাশ জঞ্জালের মতো ওই লোকের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া যেত! আমি যে অ্যাকটিং আদৌ করি নি এ-কথাটাও যদি বলা যেত। ব্যারিস্টারের ভূমিকায় যে পার্ট করছে তার ওভার অ্যাকটিংএর কথা শুনে আরো রাগ হল। চোখ দুটো আপনা থেকেই আবার তার মুখের ওপর ফিরে গেল। স্থির হল। কোন অচপল চাউনির ধাক্কায় মার্জিত পুরুষও ঘায়েল হয় সেটা অভিনয় জগতে এসে আরো ভালো বুঝতে শিখেছি। গলার স্বর সহজ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা। বললাম, আপনি যখন আঙুল নেড়ে নেড়ে আসামী বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ছোটান সেটা ওভার অ্যাকটিং হয় না—এ আপনি হলপ করে বলতে পারেন?

পরিচালক হা হা শব্দে হেসে উঠল। হাসছে মৃদু মৃদু এই লোকও। প্রতিবাদ করল না। আমার অভিনয় দেখে সে অভিভূত, মুগ্ধ। এই সাক্ষাৎ আর আলাপচারির পর আরো বেশি মুগ্ধ কিনা কে জানে। কিন্তু আমার ভিতরের অসহিষ্ণু জ্বালা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর কতক্ষণ এই মেকি সাক্ষাৎকার চালিয়ে যাব। এ অভিনয়ের থেকে ফ্লোরের অভিনয় ঢের সহজ।

পরিচালক অব্যাহতি দিল। সঙ্গীকে ডাকল, চল, লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাক, তারপর শুটিং। তুমিও লাঞ্চ সেরে তৈরি হও ম্যাডাম।

ওই লোক আর একবার ভব্য অভিবাদন জানিয়ে পরিচালকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণের চাপা রাগ আর উত্তেজনা ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো। সেই সঙ্গে কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। কাঠগড়ার সেই অসহায় প্রৌঢ় মানুষটা

যেন আমার দিকেই চেয়ে আছে এখন। আর আমি লম্বা লম্বা আঙুল আর পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এই ঢ্যাঙা মানুষটাকে—এই বিনায়ক প্যাটেলকে ফেটে পড়তে দেখছি। অনেক অনেক রাতের বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে চোখের সামনে ওই ভয়াবহ মূর্তি দেখেছি। লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়া দেখেছি। সে দৃশ্য আজও আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। বিভীষিকার মতো। জীবনের এই লোকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতে পারে কল্পনা করি নি। দেখা হবার পর মনে হচ্ছে এত ঘৃণা জীবনে আমি আর কোনো মানুষকে করি নি। করি না।

দুপুরের খাবার নিয়ে নাড়াচাড়াই সার। খাওয়া হল না। উত্তেজনা আর বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ভরাট হয়ে আছে, খাব কি। লাঞ্চের বিরতির পর আবার শুটিং শুরু হবে। বিশিষ্ট আসনে তখনো ওই লোক বসে থাকবে। আমার ধারণা, থাকবেই। শুধু আমার কাজ দেখার জন্যেই বসে থাকবে। বুঝতে পারছি অভিনয় আজ আর আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া ওই লোকেব আশায় ছাই দেবার একটা সঙ্কল্পও ভিতর থেকে চাড়া দিয়ে উঠল।

ঘর সংলগ্ন কলঘরে এসে তাড়াতাড়ি মেকাপ তুলে ফেললাম। তেমনি দ্রুত আসামীর সাজ বদলে নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম। আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিতে গিয়ে নিজের দুটো চোখের ওপর দৃষ্টি পড়ল। না, যন্ত্রণা বা রাগ বা বিদ্বেষ এই দুই চোখের কালো তাবার এত গভীরে যে, কাবো চট করে সেটা ধরে উঠতে পারার কথা নয়।

ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে বেয়ারাকে ডেকে পরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক লাইনের বয়ান—শরীরটা হঠাৎ কি রকম অসুস্থ বোধ করছি, আজ আর আমার পক্ষে সেটে যাওয়া সম্ভব নয়, আজ অন্যেরা শুটিং করুক, আমি কাল এসে পুষিয়ে দেব।

ঘর ছেড়ে বিশাল স্টুডিও প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের ইউনিটের একটা গাড়ির খোঁজে এগিয়ে চললাম। এখন পর্যন্ত আমি স্টার নই—প্রমিসিং স্টার। শুনেছি স্টারদের অঢেল টাকা, তিনখানা চারখানা করে বিদেশীগাড়ি এক-একজনের। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার বিদেশী ছেড়ে একখানা দেশীগাড়িও নেই। কিছুদিন আগেও যার খাওয়া-পরার সংস্থানও ছিল না, এরই মধ্যে তার গাড়ির চিন্তা বাতুলতা মাত্র। ইউনিটের গাড়িই আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে আর দিয়ে আসে।...রমেশ সামতানি অবশ্য এই শুরুতেই একটা নতুন গাড়ি আমাকে কিনে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, টাকাটা এখন না-হয় ধার হিসেবেই নিলে, একটা ছবি উতরে গেলে এ-টাকা শোধ করতে আর ক'দিন। এখনো এই গাড়ি কেনা নিয়ে ঝোলাঝুলি করছে সে। কিন্তু আমি রাজি হই নি। ওই লোকের কাছে কৃতজ্ঞতার বোঝা আর কত বাড়াব। যতদিন গাড়ি না কেনা হয় ততদিন তার নিজের একখানা গাড়ি আমাকে ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছিল রমেশ সামতানি। আমি তাতেও রাজি হই নি। জীবনের এই শুরুটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলুক। সফল হলে তখন সবই হবে।

...রমেশ সামতানির এত আগ্রহের কারণ বুঝতে পারি। পারি তার কারণ মানুষটার আচরণ সাদাসিধে, মনে মুখে এক, তার মধ্যে রাখাঢাকার ব্যাপার কিছু

নেই। সে আমাদের অনেক করেছে, আমার তো করেইছে। আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ভয়াবহ দুর্যোগের সময় কপর্দকহীন অবস্থায় কেমন করে কার সুপারিশ নিয়ে সে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আজ আর সে-কথা মনে নেই। সে আজ এগারো বছর আগের কথা। তখন তার বয়েস ছাব্বিশ, আমার বারো। এখন আমাব তেইশ, তার সাঁইতিরিশ—চৌদ্দ বছরের ফারাক।

প্রবল কর্মী মানুষ এই রমেশ সামতানি। জিজ্ঞাসা করলেই হেসে হেসে বলে, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিটল থিংস। পাকিস্তানের দুর্যোগ কেটে যাবার পর দেশ থেকে ছলে কৌশলে কিছু সম্পত্তি সরিয়ে আনতে পেরেছিল। তার আগে থাকতেই বোম্বাইতে নিজের পথ নিজে গড়ে নেবার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে। দেশের সম্পত্তি হাতে আসার পব সেই পথ দ্রুত প্রশস্ত হয়েছে। এই বম্বেই তার কর্মক্ষেত্র এখন। এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ব্যবসার তাগিদে এখানে অবশ্য স্থির হয়ে বসতে পারে না একটানা দেড় মাসও। দুবাই, পোর্ট সৈয়দ, পোর্ট এডেন এমন কি আমেরিকাতেও বছরের মধ্যে ক'বার করে ছোটাছুটি করতে হয তাকে। মাত্র এগারোটা বছরের মধ্যে নিজের এত বড় ভাগ্যখানা সে নিজে গড়েছে। এত সাফল্যের চাবিকাঠি? সেই এক কথা। নিজের ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলি নিজে কবে ফেলি—আই অলওযেজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিটল থিংস। কিন্তু এত বড হয়েও মানুষটার চরিত্র বদলায় নি, আচরণ বদলায় নি। আগের মতোই সাদাসিধে স্পষ্টবাদী, আব আগের মতোই গোঁ। মনে যা আসে সোজাসুজি বলেও ফেলে তা।

যাক, রমেশ সামতানি পরের প্রসঙ্গ। এখন শুধু তার কথা মনে হচ্ছে কারণ বর্তমানে সে এই বম্বেতেই আছে। আমাব কেন যেন এক্ষুণি তার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে কবছে। সব কথা শুনে আর আমার এই উত্তেজনা দেখে সে হযতো হাসবে। এখনো ছেলেমানুষ ভাববে। অনেকবাব যা বলেছে আজও হয়তো তাই বলবে। বলবে, বিনায়ক প্যাটেলের যা কাজ সে তাই করেছে, পেশার প্রতি আসক্তি ভিন্ন কেউ বড় হয় না, সকলকে ছেড়ে এই লোকের ওপর এখনও এত রাগ এত ঘৃণা কেন তোমার।

আমার চেনাজানার মধ্যে রমেশ সামতানি একমাত্র ক্ষমতাবান পুরুষ। টাকার জোরে আর বুদ্ধির জোরে সে অনেক কিছুই করতে পাবে বলে বিশ্বাস। আট ন'মাস আগে পর্যন্ত তার-এই জোরটা দাম্ভিক ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলের ওপর নৃশংস হয়ে উঠুক, যে-করে হোক তার মাথায় একটা বজ্রাঘাত নামিয়ে আনুক এ আমি মনে প্রাণে চেয়েছি। কিন্তু আমার এই অবুঝ মনোভাব দেখে সে কখনও বিরক্ত হয়েছে, কখনও হেসেছে। বলেছে, তোমার মধ্যেও অনেক শক্তি আছে, বাজে চিন্তায় সেটা নষ্ট কোরো না। ওই লোকের আমি কোনও দোষ দেখি না, তার যা কাজ সে তাই করেছে। এভরিবডি শুড ডু দেযাব ওউন লিটল থিংস্। যুক্তির দিক ভাবতে গেলে সে সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে জগৎ চলছে না। পেশা বলেই মানুষ মানুষের ওপর এত নিষ্ঠুর এত নৃশংস হয়ে উঠবে সেটা আমি মানি না। সত্যিকারের অপরাধের জালে না আটকালেও হাতের মুঠোয় পেয়ে আইনের

কশাঘাতে কেউ একজনকে তিলে তিলে হত্যা করবে, আর তারপর আত্মপ্রসাদে টইটম্বুর হয়ে উঠবে, এও আমার কাছে অসহ্য। তার ওপর কেউ যদি কোনো নিরপরাধ মানুষকে এই মর্মান্তিক পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়? তাহলে?

মাথাটা আবার অসম্ভব গরম হয়ে উঠছে। আর সেইজন্যেই যে ক্ষমতাবান পুরুষ এই এত বড় দুনিয়ায় আমার একমাত্র সহায়, প্রথমেই তার কথা মনে পড়ছে। রমেশ সামতানির কথা।

ইউনিটের গাড়ির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পিছন থেকে একটা ডাক কানে এলো, মিস সুজাতা!

ঘুরে দেখি হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছে আমার ছবির পরিচালক। কিন্তু সে একা নয়। তার পিছনে বিনায়ক প্যাটেল। সে ঢ্যাঙা মানুষ। তাই মনে হচ্ছে লম্বা পা ফেলে সে ধীরে-সুস্থেই আসছে।

দেখা মাত্র শরীরের রক্তকণা আবার যেন মাথার দিকে ধাওয়া করছে। প্রায় নিজের অগোচরে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম।

উদ্বিগ্ন মুখে পরিচালক জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কি হল ম্যাডাম?

তার পিছনের লোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, বেয়াবা আপনাকে চিঠি দেয় নি?

তা তো দিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ শুটিং বন্ধ করলে..শরীর বেশি অসুস্থ নাকি?

এই স্বাভাবিক প্রশ্ন শুনেও আমার রাগ হয়ে গেল। নামী পরিচালক, যে কোনো নতুন আর্টিস্টের তাকে সমীহ করে চলার কথা। আর কেউ হলে ও-ভাবে চিরকুট পাঠিয়ে শুটিং বন্ধ করে বাড়ি রওনা হতে পাবত না। কিন্তু আমার জোরের দিকটা আমি জানি। এই ব্যাপারে রমেশ সামতানি আমার পিছনে। নইলে বোম্বাইয়ের এত বড় চিত্রজগতের কেউ চট করে আমার দিকে ফিরেও তাকাত না। এ-জগতেও রমেশ সামতানির এমন নীরব প্রতিপত্তিব খবর আমাব একটুও জানা ছিল না। এত প্রভাবের সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রভাব-প্রতিপত্তি যে কম নয় সেটুকুই শুধু অনুভব করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তের রাগটা তার জোরে নয়। ভদ্রলোকের পিছনে যে দাঁড়িয়ে, রাগ তার কারণে।

তবু যথাসম্ভব সংযত জবাব দিলাম, যেটুকু অসুস্থ হলে শুটিং ভালো লাগে না, সেটুকুই।...একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন।

পরিচালক থমকে তাকালো একবার। তারপর ব্যস্ত মুখে বলল, ও...গাড়ি রেডি নেই বুঝি, এ-সময় যাবার কথা নয় তো, তাই...আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আমার গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল। স্বাভাবিক ভদ্রতার সুরে বিনায়ক প্যাটেল জিজ্ঞাসা করল, উনি কোন্ দিকে যাবেন?

সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট...কেন, তুমিও এক্ষুণি যাচ্ছ নাকি?

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই যাচ্ছে। তারপর বলল, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না দাদা, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। মনে হল, আমার শুটিং বন্ধ তাই এরও

আগ্রহের শেষ। প্রায় অশোভন সুরেই বাধা দিয়ে উঠলাম, কিছু দরকার নেই, আমি এঁর গাড়িতে যাচ্ছি, আপনি ব্যস্ত মানুষ, এত কষ্ট করতে হবে না।

পা বাড়িয়েও একটু অবাক মুখেই ফিরে তাকালো সে। প্রত্যাখ্যানের সুরটা কানে লেগেছে বোধ হয়। আমার চোখে চোখ। বলল, আমার কোনো কষ্ট হবে না, রাদার এ প্লেজার, আমি পালিহিল যাচ্ছি, সেখান থেকে আপনার বাড়ি তিন-চার মাইলের মধ্যেই হবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে অদূরে দাঁড় করানো ছোট শৌখিন গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। নিজের ভিতরের একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফুটতে লাগলাম আমি। তার ওপর পরিচালকের কথায় গায়ে আরও যেন জ্বালা ধরে গেল। সে বলছে, এই বয়সেই ব্যারিস্টার কত বড় সে-তো নিজেই জানো, মানুষটাও চমৎকার, তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।...তাছাড়া তোমার অভিনয় দেখে খুব ইমপ্রেসড, বলছিল, প্রথম অভিনয় মনেই হয় না।

কানে শুনছি বটে, কিন্তু তার দিকে তাকাচ্ছি না। যত রাগ আর বিতৃষ্ণার কারণই হোক, আমার আচবণে কাবও মনে কোনো বকম খটকা লাগুক সেটা চাই নি। দৃষ্টি ওই গাড়ির দিকে।

...চাবি লাগিয়ে দরজা খুলল, চালকেব আসনে বসল, স্টার্ট দিল। গাড়িটা এবার আস্তে আস্তে এদিকে এগিয়ে আসছে। এলো। দাঁড়াল। লম্বা হাত বাড়িয়ে পাশের আসনের দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

আমার মাথার মধ্যে কি-যেন এক বিষম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত সংযত রাখার চেষ্টা করছি। অভিনেত্রীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে গাড়িতে উঠে পাশে বসলাম। একটু শব্দ কবেই দরজা বন্ধ করলাম। বেশ ছোট গাড়ি, পাশাপাশি দু'জন বসলে একটু ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয়। আমাব দিকেব দরজার সঙ্গে লেগে বসলাম। ওপরঅলার চক্রান্তে যেন একটা ঘৃণ্য অশুচি স্পর্শের আওতায় এসে পড়েছি আমি। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করা হয় নি। হাসিমুখে লোকটা পরিচালকের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে রওনা হল।

স্টুডিওর বিশাল চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম আমরা। ভিতরে ভিতরে আমার কিসের প্রস্তুতি চলছে জানি না। বোধহয় সংযম রক্ষার প্রস্তুতি। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছি।

গাড়ি চালানোর ফাঁকে পাশের লোকের দু'চোখ বারকয়েক আমার দিকে ঘুরল টের পেলাম। এই চোখ এই মিষ্টি মুখ আর এই চোয়াল দুটো সংকল্পের আসরে নামলে কত অকরুণ কঠিন হতে পারে সে আমি জানি। দু'কান খাড়া হল। এবারে বলবে কিছু...।

বলল।—আপনার অভিনয় যেটুকু দেখলাম সত্যিই ভালো লেগেছে, আপনাদের ডিরেক্টরকে সে-কথা বলছিলাম...

থ্যাঙ্কস্।

আবার নীরব একটু। তারপর মুখে নরম হাসি।—আপনারা আমাদের মতো বাইরের লোককে কিছুটা এড়িয়ে চলতে চান, তাই না?

সামান্য মাথা ফেরালাম।—কেন বলুন তো...?

হাসছে।—লিফ্‌ট দেবার নামেই আপনি যে রকম বাধা দিয়ে উঠলেন, তাই ভাবছিলাম কথাটা।

এই ছবিতে নামার আগে শুধু ফোটোজেনিক টেস্ট নয়, আমার কণ্ঠস্বরের টেস্টও হয়ে গেছে। তাতেও যে আমি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছি তাও জানি। মোলায়েম জবাব দিলাম, আপনাদের মতো বিশিষ্টজনেরা ফিল্ম আর্টিস্টদের কি চোখে দেখে সে ভয় একটু আছেই।

একটু জোরেই হেসে উঠল। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম তার ফলে মুখখানা আরও ছেলেমানুষের মতো দেখালো। বলল, এটা ঠিক কথা হল না বোধহয়, হরিহরদার কাছে শুনেছি এই প্রথম আপনি এ-লাইনে এসেছেন আর এটাই প্রথম ছবি আপনার...এরই মধ্যে কি নিজেকে আপনি পাকাপোক্ত একজন ফিল্ম আর্টিস্ট ভাবেন নাকি?

সামান্য একটু হাসতে পারা কি নিতান্তই দরকার? অল্প করে মাথা ফেরাতে হল আবার।—ভাবতে চেষ্টা করি বলে প্রথম ছবির অভিনয় আপনার ভালো লেগেছে।

সোজা বলে বসল, শুধু অভিনয় নয় আপনার চালচলন কথাবার্তা সবই আমার ভালো লেগেছে। আপনি অনেক ওপরে উঠে যাবেন বলেই মনে হয়।

থ্যাঙ্কস্‌। শরীরের রক্তকণাগুলো এত অবাধ্য হতে পারে জানা ছিল না। গাড়ি ধীর গতিতে চলেছে লক্ষ্য করেছি। আন্ধেরির স্টুডিও থেকে আমার সান্তাক্রুজের বাড়ি চার মাইলও পথ নয়। আর পালিহিল সাত সাড়ে-সাত মাইলের মধ্যে। এটুকু পথ চট করে ফুরিয়ে যাক কাম্য নয় বলেই গাড়ির এই মন্থর গতি সেটুকু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

...শুধু অভিনয় নয়, এক কথায় আমাকেই ভালো লেগেছ বলল। বোম্বাই শহরে পুরুষের ভালো লাগার অনেক রকম লোভাতুর দৃষ্টি এই তেইশ বছর বয়সে আমি দেখেছি। এক একজনকে এক এক রকমের জানোয়ার মনে হয়েছে। যত বড় ব্যারিস্টারই হোক সে-রকম একটা জানোয়ার কি এর মধ্যেও নেই? এত রাগ সত্ত্বেও দেখার লোভ আমায়।

আচ্ছা, আপনি একজন শিক্ষিতা এম-এ পাশ মহিলা শুনেছি,আপনার হঠাৎ এই ফিল্ম লাইনে আসার ঝোঁক হল কেন?

মুখ ঘুরিয়ে ভালো করেই তাকালাম এবার। আপোস-শূন্য ব্যারিস্টার কেউ বলবে না, ছেলেমানুষি কৌতূহল যেন। জবাব দিলাম, মাথার ওপর কোনো গার্জেন নেই বলে।

স্টিয়ারিং হাতে থমকে তাকালো। চোখাচোখি হতে শব্দ করেই হেসে উঠল। হাসিটা সরল নয় এ কথা আমিও বলব না। কিন্তু আমার এই দুটো কানের পর্দায় বিষাক্ত লাগছে। কথাগুলোও।—আচ্ছা জবাব দিয়েছেন, যাদের গার্জেন নেই সকলেই তারা ফিল্ম লাইনে এসে ঢুকছে নাকি। আসলে এদিকেই আপনার ন্যাক।

আমি সামনের দিকে চেয়ে আছি। স্নায়ুর ওপর এত ধকল আর যেন সহ্য

হচ্ছে না। এর ওপর আবার সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কোনো গার্জেন নেই মানে কি, বাবা মা কেউ নেই?

শোনা মাত্র ঝলকে ঝলকে রক্ত মাথায় উঠতে লাগল যেন। প্রায়-বৃদ্ধ এক অসহায় মানুষের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।...তার দিকে লম্বা আঙুল নেড়ে নেড়ে ত্রাস ছড়াচ্ছে একটা লোক, পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে সেই অসহায় মানুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে চলেছে। আর তারপর দিনের পর দিন ঘুমের মধ্যে আধা-ঘুমের মধ্যে এমন কি জেগে থেকেও সেই আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য কত দেখেছি ঠিক নেই।

দাঁতে করে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে এখনো নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা আমার। নিজের গলার স্বরের ওপরেও বিশ্বাস নেই এই মুহূর্তে। মাথা নেড়ে জানালাম, কেউ নেই।

ভাই বোন আত্মীয় পরিজন কেউ নেই?

আবারও মাথা নাড়লাম—নেই।

সান্তাক্রুজে আপনি তাহলে কার কাছে থাকেন?

এবারে জবাব দিতে হল।—কারো কাছে না, একজন আয়া আছে।

কি কারণে সঙ্গে সঙ্গে একবার মুখ ঘুরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো বলতে পারব না। তারপরেই সচেতন হল যেন, মনে পড়ল বোধহয় আমি অসুস্থ হয়ে শুটিং বাতিল করে বাড়ি চলেছি। জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর কি এখন বেশী খারাপ লাগছে নাকি?

...বেশী না।

কিন্তু আপনার মুখ হঠাৎ ভয়ানক লাল দেখছি! একজন ডাক্তারকে খবর দিলে হত না?

উদ্বেগের প্রকাশ আন্তরিক। কিন্তু এর জবাবে দুই চোখের এক · ঘৃণার ঝাপটা সজোরে মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করল। সামনের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলাম, তার দরকার হবে না, আপনি শুধু আর একটু স্পীড বাড়ান গাড়ির।

আই অ্যাম সো সরি। হকচকিয়ে গিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটের সামনে এসে গেলাম। আমার ইঙ্গিত বুঝে গাড়ি থামালো।—এই ফ্ল্যাট?

দরজা খুললাম।—হ্যাঁ।

একটু ঝুঁকে ভালো করে ফ্ল্যাটটা দেখে নিল একবার। তিন ঘরের ফ্ল্যাট। সাধারণ মধ্যবিত্তের এলাকা এটা। ওই লোক পালিহিলে থাকে নিজের কানেই শুনেছি। অভিজাত পয়সা-অলা মানুষদের পশ এরিয়া সেটা। মালটিস্টোরিড আর হাল ফ্যাসানের সব বাংলো সেখানে। সেখানে বাড়ি যখন, এই লোকেরও টাকার জোর আছে নিশ্চয়। থাকারই কথা, বাপ মস্ত ব্যারিস্টার ছিল আর এই বয়সে নিজেও কম যায় না।

একটু অভ্যর্থনা-সূচক আহ্বান প্রত্যাশিত ছিল বোধহয়। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে এক পেয়ালা চা বা কফি খেয়ে যাবার কথা বলা উচিত। কিন্তু বিতৃষ্ণায় মাথার

ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে সেই থেকে। একটি কথাও না বলে একবার শুধু ঘুরে তাকালাম।

শুনুন, আপনাকে সত্যিই অসুস্থ দেখাচ্ছে, অনুমতি করেন তো আমি সঙ্গে আসি, আর কে আপনার ডাক্তার জানলে তাকেও একটা খবর দিই...।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, একটু বাদে আমি নিজেই সুস্থ হয়ে যাব। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সোজা ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেলাম। ভিতরে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এলো না।

দোতলা'র তিন ঘরের ফ্ল্যাটে থাকি। একটা মানুষের স্বাভাবিক উদ্বেগ যেন পায়ে করে মাড়িয়ে মাড়িয়ে দোতলায় উঠে এলাম। সামনের ঘরে তালা ঝুলছে। এ ঘরে আমি থাকি। পাশের ঘর ভেতব থেকে বন্ধ। সেখানে আয়া ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চাবি বার করে শব্দ না করে দরজা খুললাম। নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই খানিকক্ষণ এখন একলা থাকা দরকার আমার।

ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শয্যায় এসে গা ছেড়ে দিলাম। শ্রান্ত লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে যুঝছি নিজের সঙ্গে। ছোট গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি বসার ফলে মাঝে আট-দশ আঙুলও ফারাক ছিল না। ওই ফাঁক ভরাট করে একটা জ্বালা-ধরা স্পর্শ অনেকক্ষণ ধরে আমার কলজে পুড়িয়েছে। কিন্তু চোখ বুজে যে চুপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকব তারও উপায় নেই। মাঝে বেশ কয়েকটা দিন ভুলে ছিলাম, কিন্তু এখন চোখ বুজলেই আবার কাঠগড়ার সেই অসহায় মূর্তি দেখছি, আর এক অকরুণ মানুষের লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া আর পুরু ঠোঁট নাড়া দেখছি। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। কিন্তু মাথার তালুটা যেন আগুন হয়ে আছে।

আধ ঘন্টা না যেতে টেলিফোন বেজে উঠল। এ সময় আমার বাড়ি থাকার কথা নয়...কে আবার।

—হ্যালো?

ও-ধারে আমার পরিচালক হরিহর শর্মার গলা। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন কানে এলো, কেমন আছ?

জবাব দিলাম, মোটামুটি। এরই মধ্যে টেলিফোন...কি ব্যাপার?

হরিহর শর্মা বলল, ব্যাপার তো তোমার—বিনায়ক প্যাটেলের টেলিফোন পেয়ে ঘাবড়ে গেছি, বাড়ি গিয়েই ফোন করেছে, গাড়িতেই নাকি তোমার শরীর খুব খারাপ দেখেছে, সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল, এক্ষুণি ডাক্তার ডাকা উচিত আর ব্লাডপ্রেসার চেক করা উচিত—বিনায়কই ব্যবস্থা করতে পারত কিন্তু তুমি তার সে-প্রস্তাব বাতিল করেছ।

এ-রকম মানসিক অবস্থার পর একজন অভিনেত্রী এই ফোন পেলে সে কি করবে? আমি যা করলাম বা বললাম তাতে ও-ধারের ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেল হয়তো। প্রথমে হাসলাম একপ্রস্থ। তারপর বললাম, আপনার এক্সপার্ট ব্যারিস্টার যা দেখেছে যা বলেছে তা মিথ্যে বলি কি করে, মুখ নিশ্চয় লাল হয়েছিল আর ব্লাডপ্রেসারও হয়তো বেড়েছিল...কিন্তু তার মতো অমন ডাকসাইটে ভক্তি শ্রদ্ধার

মানুষকে হঠাৎ অত কাছে পেলে ভক্তর রক্তের তাপ আর চাপ কি আর কোনো কারণে বেড়ে যেতে পারে না।

কথাগুলো মাথায় নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, তারপর ফোনে হা হা হাসির শব্দ।—সে কি গো! তুমি তার এত প্রেমে পড়ে আছ নাকি! দাঁড়াও এক্ষুণি আবার ফোনে জানাচ্ছি তাকে।

জবাব দিলাম, বলবেন তো, কিন্তু আমার তো শুধু মুখ লাল হয়েছিল আর রক্তের চাপ বেড়েছিল, একথা শুনে সে না মূর্ছা যায়।...তা ভদ্রলোক বিবাহিত না অবিবাহিত?

অবিবাহিত—অবিবাহিত, তোমার কিছু ভাবনা নেই।

বললাম, তাহলেই তো সত্যিকারের ভাবনা, আপনার আর কিছু বলে কাজ নেই, এ-কথা শুনলে ব্যারিস্টারি ছেড়ে ভদ্রলোক হয়তো আপনার নায়ক বাতিল করে নিজে নায়ক হতে চাইবেন।

ফোন ছেড়ে দিলাম। আমার উল্টোপাল্টা কথা থেকে পরিচালকের কিছু বোধগম্য হবার কথা নয়। নিছক পরিহাসই ধরে নেবে। আর সেই সঙ্গে একটু অবাকও হবে হয়তো। আজ ছ'মাস হল স্টুডিও যাতায়াত শুরু হয়েছে আমার, তার মধ্যে এই গোছের প্রগল্‌ভতা কখনো দেখে নি।

আয়াটা এখনো আয়েস করে ঘুমুচ্ছে ও-ঘরে। তাতেও বিরক্তি। ব্লাডপ্রেসার বাড়া সত্যিই বিচিত্র নয়। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরের ছটফটানি ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় মুখ এখনো লালই বটে একটু। নিজের চোখে চোখ রাখলাম। ভ্রূকুটি করে সংযত করতে চাইলাম নিজেকে।

কি মনে হতে ফোনের রিসিভার তুলে নিলাম আবার। পর পর তিনবার তিন জায়গায় ডায়েল করেও রমেশ সামন্তানিকে ধরা গেল না। ব্যস্ত মানুষ, কোথায় ঘুরছে ঠিক নেই। তাকে এই সাক্ষাৎকারের খবরটা দেবার ইচ্ছে ছিল। যাক, ভালই হল। শুনলে হেসে ঠাট্টাই করত বোধহয়। বলত, তোমার ছেলেমানুষি রাগ আর গেল না।

...রমেশ সামন্তানির মতে আমাদের আসল শত্রু শেখর নায়েক। সে-ই নাটের গুরু। মনে মনে তারও মরা-মুখ দেখার সাধ আমার। হাতের মুঠোয় পেলে রমেশ সামন্তানি হয়তো এতদিনে কিছু একটা করেও বসত। আমার ধারণা শেখর নায়েকের ওপর তার এত রাগ ভিন্ন কারণে। সেই ভয়াবহ বিপাকের দিনে শেখর নায়েক এক শর্তে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল। সেই শর্ত আমি। আমার রূপ, যৌবন। বয়সে রমেশ সামন্তানির থেকেও তিন চার বছরের বড় হবে লোকটা। কম করে চল্লিশ। বিবাহিত, দুটো ছেলে মেয়ের বাপ। আমি রাজি হলে সেই বিয়ে খারিজ করবে এমন কথাও বলেছিল। আমি প্রায় মেরে তাড়াতে বাকি রেখেছিলাম তাকে। কিন্তু সমস্ত অঘটনের মূলে সে এ-কথা তখনো মনে হয় নি। কারণ, তাহলে সে বহাল তবিয়তে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি করে? পুলিশ তাকে আটক করে নি কেন? আজও আসল দোষী সে-ই কিনা হলপ করে বলতে পারব না। রমেশ সামন্তানি তখন নিজের কাজে বিদেশে। ফিরে

এসে সব শোনার পর তাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে সে। কারণ গোড়া থেকেই তাকে নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল রমেশ সামতানির। সব শোনার পর প্রথমেই তার খোঁজ করেছে, শেখর কোথায়? অনেক সন্ধান করেও আর তার দেখা মেলে নি। একেবারে উবেই গেছে যেন। সন্দেহটা তখন বদ্ধমূল হয়েছে আমার। সমস্ত ফয়সলা হয়ে যাবার পরে সে এভাবে সপরিবারে নিপাত্তা হয়ে যাবে কেন?

রমেশ সামতানিকে ফোনে না পেয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়েছি। কিন্তু চোখ বুজলেই সেই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অসহায় মানুষটার মুখ, আর, আর এক উদ্ধত দাম্ভিক মানুষের সেই ভয়াবহ লম্বা লম্বা আঙুল নাড়া, আব পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে অভিযোগের সেই আগুন ছোটানো। সেই ক'টা দিন আদালতে দাঁড়িয়ে কে আসল দোষী এ-কথা আমার মনে আসে নি। কাঠগড়ার সেই অসহায় মানুষের মাথায় বহু লোকের সামনে বিচারের নামে বজ্রাঘাত হেনেছে, অপমানের কশাঘাতে কশাঘাতে তার উঁচু মাথা চিরদিনের মতো মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে যে লোকটা, আমার চোখে আসল অপরাধী সে। এত বড় একটা মিথ্যেকে বুদ্ধি আর যুক্তির জালে জড়িয়ে যে নিশ্ছিদ্রভাবে সত্যি বলে প্রমাণ করেছে আমার আসল শত্রু সে।

...এই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল।

২

সুজাতা পাণ্ডুরং আমার সত্যি নাম নয়। আমি লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরএব মেয়ে সুজাতা বীরকর। বিয়ের আগে আমার মায়ের পদবী ছিল পাণ্ডুবং। কল্যাণী পাণ্ডুরং। কত গ্লানি আর কত বড় পরিতাপ নিয়ে অত গর্বের পবিচয় ছেড়ে এই বোম্বাই শহরে সুজাতা পাণ্ডুরং হয়ে বসেছি সে শুধু আমিই জানি। আর জানে রমেশ সামতানি। আর যে জানত, সেই শেখর নায়েক নিখোঁজ।

বোম্বাই থেকে লোনাভালা মাত্র সত্তর মাইল দূরে। চোখে দেখা না থাকলে এখানে বসে ওই ছোট পাহাড়ী-শহরের চিত্র কেউ কল্পনা করতে পারবে না। নির্জন ছিমছাম জায়গা। কাছে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। দূরে দূরে ছোট বড় বাংলো। অনেকের খামার বাড়িও আছে। এত কাছে হলেও বোম্বাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলই না বলতে গেলে। এমন কি লোনাভালার সকলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। কারণ একেবারে অল্প বয়েস থেকে আমার ছাত্রী-জীবন কেটেছে জুনাগড়ে মায়ের বাবার কাছে। বুড়ো বড় ভালোবাসত আমাকে। বম্বের হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার চেয়ে জুনাগড়ে দাদুর কাছে আমাকে রাখাটাই বাবা-মা ভালো বিবেচনা করেছে।

স্কুল বা কলেজ পাঁচ সাত দিনের জন্যে বন্ধ থাকলেও আমি লোনাভালায় ছুটে চলে আসতাম। জায়গাটা আমার ছেলেবেলা থেকেই ভালো লাগত। সে-জায়গার সঙ্গে আমার বংশগত নাড়ির যোগ। লোনাভালায় এত বিশাল জায়গা নিয়ে এত বড় বাড়ি আর একটিও ছিল না। বাড়ি না বলে ওটাকে প্রাসাদ বলা যায়। নিজের মনে সে-বাড়ির এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ঘুরে বেড়াতে অদ্ভুত ভালো লাগত আমার। কিন্তু সে-কারণেও নয়, ফাঁক পেলেই জুনাগড় থেকে আমি লোনাভালায়

ছুটে আসতাম বাবার টানে। বাবার প্রতি যেন একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল আমার। বেশি বয়সেও বাবা যখন মা—মা-মণি বলে আদর করে ডাকত আমাকে, আনন্দে তখন এই রক্তমাংসের শরীরটা যেন গলে যেতে থাকত। একবার বাবার কাছে এলে আর জুনাগড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করত না। ছেলেবেলায় তো মা ধমক-ধামক দিয়েই দাদুর কাছে ফেরত পাঠাত আমাকে। বলত এ রকম করলে আর তোকে আনবই না।

...এখন যে ছবিতে কাজ করছি সে ছবি বাজারে বেরুলে আমার আসল পরিচয় কতদিন গোপন থাকবে জানি না। কারণ, বোম্বাইয়ের লোক আমাকে না চিনলেও জুনাগড়ের সহপাঠী সহপাঠিনীরা তো ছবি দেখে আমাকে ঠিকই চিনবে। তাছাড়া লোনাভালারও অনেকেই চিনবে। আসল পরিচয় তখন হয়তো একভাবে না একভাবে ফাঁস হয়ে যাবেই। কিন্তু ছবি রিলিজ হতে শুনেছি বছর দুই লাগবে আরো। অত দূরের ভাবনা এখন আর ভাবি না। যে অবস্থায় পড়েছিলাম, যে দিনটা ভালো কাটল সেটাই ভালো।

যাক, যে কথা বলছিলাম।

আমার তখন বছর বারো বয়েস, ছুটিতে বাবার কাছে এসে এক নতুন মুখ দেখলাম বাড়িতে। নাম শুনলাম রমেশ সামতানি। বয়েস চব্বিশ। দুর্যোগের সময় পশ্চিম-পাকিস্তানে সর্বস্ব রেখে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখে তার সম্পদ হারানোর ক্ষোভ দেখতাম না কোনো সময়। বেশ খুশি মেজাজ, মিটিমিটি হাসে। নিজের সম্পর্কে হোক বা অন্য কারো সম্পর্কে হোক পরিষ্কার কথা বলে। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তার। বাবাও তাকে খুব পছন্দ করত। আদর করে মিস্টার রমেশ বলে ডাকে। তার দেখাদেখি আমিও তাই ডাকতে শুরু করে দিলাম। মা অবশ্য রাগ করত, বলত, ওইটুকু মেয়ের এ কি ডাকের ছিরি!

কিন্তু রমেশ সামতানি বলত, ওইটুকু মেয়ের মুখে এই ডাকই আমার শুনতে ভালো লাগে—এই নামেই ডাকবে।

সেই আদরের ডাকটাই থেকে গেছে। রমেশ সামতানি আজও আমার কাছে মিস্টার রমেশ। মিস্টার রমেশের আগে থেকে আমাদের লোনাভালার বাড়িতে আরো দুটি প্রিয়জন আছে। আমার জ্ঞান হওয়ার বয়েস থেকেই বাড়ি সংলগ্ন আউটহাউসে দেখে আসছি তাদের। তারা লক্ষ্মী যোশী আর মংগেশ যোশী। মংগেশ যোশী বাড়ির বাগানের তদারক করে, বাবার কাজকর্ম করে দেয়। আর অন্দরমহলের কাজকর্ম দেখাশুনা করে লক্ষ্মী যোশী। আমার একেবারে ছেলেবেলায় কাজের আরো অনেক লোকজন দেখেছি বাড়িতে। কিন্তু বারো চৌদ্দ বছর বয়সের সময় শুধু ওই দুজনকেই টিঁকে থাকতে দেখেছি। বাবার মতো দরাজ মনের ভালো মানুষকেও বাকি লোকগুলো একে একে ছেড়ে যায় কেন তখন ভালো বুঝতাম না।

বুঝতাম না কারণ বাবা তখন পর্যন্ত আমাকে আমাদের ভিতরের অবস্থা কিছুই বুঝতে দেয় নি। বাবার পিতৃপুরুষেরা লোনাভালার জমিদার ছিল। আর এককালে বিরাট অবস্থাও ছিল তাদের। টাকা তাদের কাছে হাতের ময়লা। উড়িয়েছে ছড়িয়েছে দান করেছে। বাবারও ছেলেবেলায় ওই রকম বিলাসিতার মধ্যে কেটেছে। ওদিকে

'জমিদারি প্রথা উঠে গেছে। জমিদাররা অনেকেই জোতদার হয়ে বসেছে। কিন্তু লোনাভালার বীরকর বংশ ও-কাজে নেই। আমার ঠাকুরদার আমল থেকেই অবস্থা পড়ে আসছিল কিন্তু তবু সেই ভদ্রলোক দানের হাত বা খরচের হাত গুটিয়ে নেয় নি। শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে বাইরের যেটুকু জমি-জমা ছিল সেটুকু তার আমলেই নিঃশেষ। বাবার ভাগে শুধু এই বাড়িটাই জুটেছিল, তার বেশি কিছু নয়। তা এই বাড়ির মধ্যেও সম্পদ কম ছিল না।

কিন্তু একটা জীবন বসে খেতে হলে তাই বা আর কতদিন থাকে। অথচ বাবা ভালো লেখাপড়া জানা মানুষ। চেষ্টা করলে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পারত। কিন্তু লোনাভালার বীরকর বংশ অন্যের গোলামী করবে এ আবার একটা কথা নাকি! লোনাভালায় বসে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাবা ছিল আত্মভোলা উদার মানুষ। গান-বাজনা পছন্দ করত খুব। আগে বাড়িতেই উঁচুদরের গান-বাজনার আসর বসত। দিন পড়ে আসার পরেও সে ঝোঁক কাটে নি। কোথাও ভালো গান বাজনা হচ্ছে শুনলেই বাবা ছুটত সেখানে। সুন্দব একটা মন ছিল তার। সকলে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। অবস্থা পড়েছে, কিন্তু লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরের মান মর্যাদা একটুও কমে নি। লেখাপড়া জানলেও এমন লোক এখানে বসে কি কাজ করতে পারে?

বাড়ির এতখানি পড়তি দশার খবর আমি অনেককাল জানতে পারি নি। মোটামুটি জেনেছি যখন এম. এ. পড়ি। তাও বাবা মা বলে নি কখনো। সংসারের অবস্থাটা চুপি চুপি আমাকে জানিয়েছে রমেশ সামতানি। ব্যবসায়ে ততদিনে বরাত ফিরেছে তার। দিনে দিনে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাইরের আচরণে কোনো রকম আলগা জলুস নেই। দেখলে বোঝাও যাবে না কত বড় হয়ে উঠেছে সে। মুখে সেই এক কথা, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিট্‌ল্ থিংস্। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা ভোলে নি। তার কর্মস্থল বম্বে। কিন্তু অবকাশ পেলে দু'চার দিন লোনাভালায় বাবার কাছে কাটিয়ে আসে। আর বাবার মনে আঘাত না দিয়ে যতটা পারে সাহায্যও করে। কাজের তাড়ায় তাকে নানা দিকে নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়। কোনো সময় জুনাগড়ে এসে গেলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না।

জুনাগড়ে বসেই আমাদের সংসারের অবস্থাটা সে আমাকে জানিয়েছিল। বাবা লোনাভালার জমিসুদ্ধু আমাদের সেই বিরাট প্রাসাদ বিক্রি করে দেবার কথা ভাবছে। সে-রকম খদ্দের পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে বাবা তাকেই নাকি অনুরোধ করেছে।

শুনে মনটা যে কি খারাপ হয়ে গেছল আমিই জানি। লোনাভালার ওই প্রাসাদ বংশগত ভাবে আমাদের গর্বের জিনিস। সকালে দরজা খুলে বারান্দায় এলেই নীল আকাশ, কাছে দূরে পাহাড়। সব মিলিয়ে যেন ছবি একখানা। সেই বাড়ি বিক্রি করে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের।

রমেশ সামতানিকে আমি বলেছি, আমার এম-এ পাশ করা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায় না? আর দুটো মাসের মধ্যেই আমার এ-পাট শেষ হবে।

শুনে রমেশ মিটিমিটি হেসেছে। যেমন হাসে। জিজ্ঞাসা করেছে, এম-এ পাশ করে তুমি কি করবে?

যা হোক একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেব।

রমেশ সামতানি বলেছে, চাকরির যা বাজার বড় জোর একটা স্কুল মাস্টারি পেতে পারো। তা দিয়ে তোমাদের বাড়ির ট্যাক্সও দিয়ে উঠতে পারবে না।

বেশ কয়েক হাজার টাকা ট্যাক্সও জমে গেছল জানি। সে-টাকাটা রমেশ সামতানি বাবাকে ঋণ দিয়ে দায় উদ্ধার করেছে। আসলে সে কিছুটা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে, বাবার কাছ থেকে সে টাকা আর পাবে কি পাবে না তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। কিন্তু আবারও তো ট্যাক্স জমছে। তাই ট্যাক্সের উল্লেখ।

আমি বলেছি, কেন, স্কুল মাস্টারির থেকে আর ভালো কিছু পাব না?

রমেশ সামতানি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তেমনি অল্প অল্প হেসেছে, তারপর জবাব দিয়েছে চেহারার জোরে পেতে পারো, কিন্তু মান সম্ভ্রম বজায় রেখে বেশী দিন টিঁকতে পারবে মনে হয় না।

ওই রকমই সাফ-সুফ কথাবার্তা রমেশ সামতানির। অন্য যে কোনো মেয়ে হলে কান মুখ লাল হত। আমাদের এই দুজনের কথাবার্তায় মনে মুখে লাগাম নেই কারো। আমি মুখরার মতো বলেছি, কেন, তোমারই তো বিরাট বিজনেস এখন, ইচ্ছে করলে তুমিই তো আমাকে মোটা মাইনেয় বহাল করে নিতে পারো।

মুখের দিকে চেয়ে রমেশ সামতানি মিটিমিটি হেসেছে খানিক। তারপর বলেছে, আমার দপ্তরে তোমার উপযুক্ত একটা পোস্টই খালি আছে...মাইনেও আনলিমিটেড, কিন্তু সে-কি তুমি রাজি হবে?

বারো বছর বয়েস থেকে একে দেখে এসেছি, কিন্তু এ-কথা শোনার পর সত্যি মুখ লাল হয়েছে আমার। যে পোস্টের ইঙ্গিত করল সেটা তার ঘরণীর পোস্ট। আজ বছরখানেক হল তার এই জায়গাটি খালি। সে তার এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারিকে বিয়ে করে বসেছিল। ব্যবসায়ের শুরু থেকে এই সেক্রেটারিটি ডান হাত ছিল। তারই পুরস্কার। লীলা সামতানিকে আমি চোখে কখনো দেখি নি। কারণ স্বামীর ব্যবসার তদারকে সে তখন আরো ব্যস্ত। নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয় তাকেও।

বছর তিনেক আগে এডেনের এক শাখার ভার দিয়ে লীলা সামতানিকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রমেশ সামতানি তখন বছরের মধ্যে অনে··বার করে এডেনে যেত। কিন্তু এক বছর হল সেই এডেন শাখার সর্বাধিনায়িকাটি নিখোঁজ, সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকাও। সেখানে তার যে আবার এক বিদেশী প্রণয়ী জুটে যেতে পারে রমেশ সামতানির মতো পাকা লোকেরও সেটা হিসেবের বাইরে ছিল। না, পলাতকা স্ত্রীর খবর সে আর করে নি।

শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছে। কিন্তু রমেশ সামতানির এ নিয়ে এতটুকু তাপ উত্তাপ দেখি নি। সে নির্বিকার। বলেছে, এমন যার চরিত্র, সে যে আমাকে এত অল্পেতে অব্যাহতি দিয়েছে সেটুকুই আমার সৌভাগ্য। গলায় ছুরি বসিয়েও তো সটকান দিতে পারত...। আই অ্যাম গ্রেটফুল।

রসিকতা করে এই শূন্য পোস্টটার ক·· বলেছে সে।

সেই সময় আমার জুনাগড়ের দাদু মারা যায়। তাই এম-এ পরীক্ষাটা শেষ

হবার পর সেখানকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। পাকাপাকি ভাবে আমি লোনাভালায় বাবার কাছে এসে বসেছি। আর মোটামুটি জানা ছিল বলেই কিছুদিন না যেতে সংসারের হাল বুঝেছি। বাড়ির চাকর-বাকরদের একে একে বিদায় করা হয়েছে। আছে শুধু আউট হাউসের ওই মংগেশ যোশী আর তার বউ লক্ষ্মী যোশী। মাইনে দিতে পারে না বলে বাবা তাদেরও ছুটি দিতে চেয়েছিল। শুনে কেঁদে কেটে সারা তারা—যে কর্তাবাবুর নিমক খেয়ে এতকাল কাটালো তারা, যার দয়ায় দু'দুটো ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখে বোম্বাইয়ে কাজ করছে, এই দুর্দিনে সেই মংগেশ আর লক্ষ্মী এবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে চলে যাবে? কক্ষনো না। শিবলিতে তাদেরও বাপের আমলের ঘর আছে, বোম্বাইয়ের দুই রোজগেরে ছেলে সেই ঘর-বাড়ি সংস্কার করে কতবার তো বাবা-মাকে সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছিল। এ পর্যন্ত নিজেদের বাড়ি-ঘর আমাকেও দুবার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছে। ছেলেদের কথায় কর্তাবাবু আর কর্তামাকে ছেড়ে যাবে না বলেই তখনো যায় নি তারা। মনিবের এই দুঃসময় দেখে এখন চলে যাবে? মাইনে-টাইনে চাইনে তাদের। শুধু দুটি খেতে দিলেই হলো আর আউট হাউসে যেমন আছে তেমনি থাকতে দিলেই হল।

এছাড়াও ওদের যেতে না চাওয়ার আরো একটা কারণ আছে। সেই কারণটা শুধু আমিই জানি। মংগেশের তিনটে না চারটে বোন ছিল আর লক্ষ্মীর ছিল আরো ছ'টা বোন। কিন্তু ওদের দুটোই ছেলে। একটা মেয়ের ভারী শখ ছিল তাদের। মেয়ে একটা এসেওছিল তাদের ঘরে। কিন্তু ছ'মাসও বাঁচল না। সেই খেদ আর সেই দুঃখ ওদের আর জীবনে ঘুচত কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনিবের মেয়েকে অর্থাৎ আমাকে সেই বাচ্চা কাল থেকে পেয়ে তারা কিছুটা শোক ভুলেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মী। সে আমাকে নিজের মেয়ে ভাবত। খুব ছোট বয়সে প্রায় সমস্তক্ষণ আগলে রাখত আমাকে। মা-বাবার চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে আমার পছন্দসই জিনিস খাওয়াত। অল্প বয়সে আমাকে জুনাগড়ের দাদুর কাছে চলে যেতে হয়েছিল বলে যেমন কান্না কেঁদেছিল লক্ষ্মী, তেমনি আমি। ওকে আমি মাসি ডাকি, সে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে, শেষে বাবার কাছে ধমক খেয়ে ছাড়তে হয়েছে।

তারপর থেকে ছুটি-ছাটায় বাবার কাছে এলে লক্ষ্মীরই যেন সব থেকে বেশি আনন্দ। যাবার সময় আমার সেই কান্না। তারপর উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত আবার কবে আসব। কিছুকাল কেটে যেতে কান্নাকাটি আর করত না বটে, কিন্তু বাড়ি এলে ওর যে সব থেকে বেশি আনন্দ হত সেটা আমি টের পেতাম।

যাক, বাবা-মা মংগেশ যোশী বা লক্ষ্মীকে আর যেতে বলে নি। তারা যেমন ছিল তেমনি আছে। মাইনের বদলে শুধু খেতে পায় বলে কাজে কোনো ত্রুটি নেই। মংগেশের হার্টের ব্যামো আছে তবু সর্বদাই সে বাড়ির কাজে ব্যস্ত। এই বিশাল অট্টালিকা যতখানি সম্ভব দুজনে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। আর মংগেশের জন্যেই বাড়ির চারদিকের এত জমি তখনো জঙ্গল হয়ে যায় নি। হার্টের ব্যামো-ট্যামোর ও পরোয়া করে না।

এম-এ পরীক্ষা দিয়ে পাকাপাকি ভাবে এখানে এসে বসার পর ওই লক্ষ্মীমাসিই আমাকে একদিন ঘরে ডেকে চুপি-চুপি বলল, তোমার বাবা বোধহয় বাড়িটা বিক্রিই

করে দেবেন, হামেশাই বাইরের লোকজন আসছে, ঘরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছে। তুমি এসেছ তাই এ ক'দিন লোক আসা বন্ধ। ঠিক ঠিক দর পেলে মনিব এ-বাড়ি ছেড়েই দেবেন মনে হচ্ছে।

রমেশ সামতানির মুখে এ-ব্যাপারটা আমার শোনাই ছিল। তাই খুব যে একটা ধাক্কা খেলাম তা নয়। তবু মন তো খারাপ হবেই। এসেই লক্ষ্য করেছি বাবা আর তেমন মিষ্টি করে হাসতে পারে না। সর্বদাই কি যেন একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আছে তার মনের তলায়। অত পরিষ্কার রং যেন কাল্‌চে হয়ে যাচ্ছে।

মায়ের মুখেও হাসি কমেছে লক্ষ্য করেছি। আর দিনকে দিন কেমন যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ কিছু একটা অসুখ-টসুখ করেছে। জিজ্ঞাসা করলে মা বলে, না রে, তেমন কিছু হয় নি। তবে মাঝে মাঝে পেটে কেমন জ্বালা করে আর বেশ ব্যথাও হয়।

শেষে বাবাকে বলে একজন ভালো ডাক্তার এনে দেখানোর কথা বলেছি, কারণ জ্বালা যন্ত্রণা বাড়িছিলই আর মা-তা মুখ বুজে সহ্য করছিল। কোনোদিন বাবাকে কিছু বলে নি। আমার কথা শোনামাত্র ঘাবড়ে গিয়ে বাবা হন্তদন্ত হয়ে লোনাভালার সব থেকে বড় ডাক্তারই ধরে এনেছে। বরাবরই কারো অসুখ-বিসুখ শুনলে বাবা খুব ঘাবড়ে যায়। সেই ডাক্তার এসে মাকে পরীক্ষা আর সমস্ত বিবরণ শুনে আগে এক প্রস্থ ব্লাড ইউরিন স্টুল পরীক্ষা করে আব বেবিয়াম মিল এক্সরের ফিরিস্তি দিল। আর, এই লোনাভালার সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র বলে বাবাকে বকাবকি করতে পারল না, কিন্তু একটু অনুযোগ করে গেল, এভাবে ভুগছেন—আপনারা এতদিন করছিলেন কি?

মায়ের এলাহি চিকিৎসাই শুরু হয়ে গেল তারপর। কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে পেটে ভালো রকম আলসার হয়ে বসেছে, তা ছাড়া বেশ অ্যানিমিয়া—রক্তের জোর নেই বলতে গেলে। তাই চিকিৎসার যেমন দরকার রুটিন বেঁধে ভালো খাওয়া-দাওয়ারও তেমনি দরকার।

বরাবরই আমার দরকারী কথাবার্তা যা, তা সবই বাবার সঙ্গে। তারপর এ অবস্থায় তো মায়ের সঙ্গে আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফিরে বসার ঘরে এসে বাবাকে বললাম, এখন তো বেশ খরচের ব্যাপার, কি করবে?

বাবার মান-সম্মান বোধ এমনি যে এ-ব্যাপারে নিজের মেয়ের সঙ্গেও খুব সহজ হতে পারে না। বলে উঠল, খরচের ব্যাপার খরচ হবে, তার জন্যে তোর ভাবনার কি আছে! টাকার জন্যে তোর মায়ের চিকিৎসা আটকাবে নাকি!

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা আছে তোমার হাতে?

বাবা আরো বিরক্ত।—হ্যাঁ আছে আছে—কত টাকা চাই তোর?

তখনকার মতো কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম আমি।

তার ঘণ্টা দুই বাদে দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখি বাইরে কোথাও বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মংগেশ নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে বেরুবার সময় মংগেশ দস্তুরমতো বাবু। বাবা বারান্দায় এসে তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। খানিক বাদে দেখলাম, মংগেশ চলে যাচ্ছে। বেশ যেন অসন্তুষ্ট অথচ শুকনো মুখ। আপাতত নিজের আউট

হাউসের দিকেই যাচ্ছে সে।

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। এ সময় মংগেশ বাগানের কাজ নিয়ে থাকে--হঠাৎ চলল কোথায়? আর বাবার সঙ্গে আমার ও-কথা হবার পর তারই-বা ডাক পড়ল কেন? বাবা ওপরে উঠে আসতেই আমি চুপচাপ নিচে নেমে এলাম। সোজা আউট হাউসে। মংগেশ ভিতরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ডিশে করে খেয়ে নিচ্ছে কি, তার সামনে জলের গেলাস হাতে লক্ষ্মী।

দুজনেই তাকালো আমার দিকে। মুখ দুজনেরই ভার।

আমি মংগেশকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

খাবার চিবুতে চিবুতে মংগেশ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।—বেরুচ্ছে।

কোথায়?

দূরের শহরে।

বাবার কোনো কাজে?

খাবার গলায় আটকালো মংগেশেব। ডিশ রেখে তাড়াতাড়ি জলের জন্যে হাত বাড়ালো। জল খেয়ে আমার দিকে তাকালো। বিপাকে পড়েছে যেন।

আমি আবার বললাম, কি কাজে দূরের শহবে যাচ্ছ?

মংগেশ জবাব দিল, মনিব শুনলে রাগ করবেন...

মনিব শুনবে না, তুমি বল।

বিব্রত মুখে মংগেশ তার বউয়ের দিকে তাকালো। লক্ষ্মীর অত ভয়-ডর নেই। দরকার হলে মা-কেও শাসন করে। সে মাথা নেড়ে সায় দিতে মংগেশ কোর্তার ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজে মোড়া জিনিস বার করল একটা। বলল, দূরের শহরে যাচ্ছি এটা বিক্রি করতে।

মনের তলায় এই গোছেরই কিছু একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল আমার।

কি ওটা?

তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে লক্ষ্মী খুলে দেখালো জিনিসটা কি। ঠাকুরদার আমলের মোটা সোনার চেন বাঁধা বড়-সড় সেই পকেট ঘড়িটা। যার কাঁটা রাতের অন্ধকারেও ঝকঝক করে। শুধু ওই সোনার চেনের ওজনই হবে কম করে আড়াই ভরি। তাছাড়া ঘড়ির চারদিকের অত বড় চাকতিটাও খাঁটি সোনার। এ-রকম জিনিস আজকাল আর চোখেও দেখা যায় না। এটা বাবার শুধু প্রিয় নয়, খুব গর্বের জিনিসও। বিশেষ কোথাও যেতে হলে সেজেগুজে ওই ঘড়ি বুক পকেটে রেখে সোনার চেন ঝুলিয়ে যায়।

আমার চোখের কোণ দুটো শিরশির করে উঠল হঠাৎ। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারলাম না। এটা বেচতে কেন দূরের শহরে যেতে হবে তাও বুঝলাম। লোনাভালায় এ-ঘড়ি অনেকেই চিনে ফেলতে পারে। ঘড়ি চিনুক না চিনুক, লোনাভালার বীরকর বাড়ির সরকার মংগেশ যোশীকে কে না চেনে এখানে? তাই তাকে দূরে যেতে হবে যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ কিছু বুঝবে না।

ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে লক্ষ্মী বলল, এ আর নতুন কি, কত কিছুই তো একে একে চলে গেল এভাবে। মনিবকে জানতে না দিয়ে তোর মা

এর হাত দিয়ে চুপি চুপি কত গয়না বেচেছে, আবার তোর মাকে জানতে না দিয়ে মনিব কত কি বেচেছে। এবারে তুই এসে গেছিস, নিজের চোখে দেখ কিভাবে চলছে, আমরা অনেক দেখেছি।

লক্ষ্মী বরাবরই আমাকে নিজের মেয়ের মতো তুই তুকারি করে কথা বলে। আমার তাতে আত্মসম্মানে একটুও লাগে না। কিন্তু এই ব্যাপার জানার পর এদের সামনেও আমার মাথা যেন হেঁট হয়ে গেল।

একটা গাড়ির আওয়াজ কানে আসতে সচকিত হয়ে ঘুরে তাকালাম। আউট হাউসের পাশ দিয়ে রমেশ সামতানির ঝকঝকে গাড়ি আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। নিজেই ড্রাইভ করে বম্বে থেকে সোজা এক এক সময়ে এখানে চলে আসে সে। আগে এলে দুটো একটা দিন থেকে বিশ্রাম করে যেত। এখন কাজের চাপে বড় একটা থাকতে পারে না। কিন্তু ফাঁক পেলে আসে ঠিকই। একবেলা বা ঘণ্টা দু'চার থেকে আবার চলে যায়। অবস্থা ফিরেছে বলে তার দেমাক বাড়েনি। বরং গোড়ার দুরবস্থার সময় বাবার সাহায্য কত পেয়েছে সে-কথাই বলে। হঠাৎ তার গাড়ি দেখে আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নামল। লক্ষ্মীমাসিকে বললাম, ঘড়িটা এখন রেখে দাও তোমার কাছে, বিক্রি করার দরকার হলে পরে বলব।

মংগেশ আমতা আমতা করতে লাগল, মনিব খোঁজ করলে?

খোঁজ করলে আমার নাম করে দিও, বোলো আমি বারণ করেছি।

একই চত্বরের মধ্যে আউট হাউস থেকে আমাদের বাড়ি কম করে তিন-চার মিনিটের পথ। আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলেছি। এ-সময় রমেশ আসতে খুশি হয়েছি, স্বস্তিবোধও করেছি। বয়সে চৌদ্দ বছরের ফারাক হলেও আমাদের পরস্পরের আচরণ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই। মনে মুখে লাগাম নেই কারোরই, সে যা মুখে আসে তাই বলে হাসি-ঠাট্টা করে আমার সঙ্গে, আর ফাঁক পেলে আমিও জব্দ করতে ছাড়ি না তাকে। এ-সময়ে যেন এই লোকেরই দরকার ছিল আমার।

বাইরে বসার ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির আমার। শুধু রমেশ সামতানি আসে নি, তার সঙ্গে একগাদা ফুল-ফল আর একরাশ মিষ্টিও এসেছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, এত সব কি ব্যাপার?

রমেশ হেসে বলল, আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিটল্ থিংস্।

খুশিতে আটখানা হয়ে বাবা বলে উঠল, দেখ আমি খবর রাখি না, তুই নিজে পর্যন্ত না—এদিকে রমেশ তোর এম-এ পাশের খবর জেনে এ-সব নিয়ে হাজির।

ভিতরে ভিতরে সত্যি খুব আনন্দ হল। মুখে বললাম, তার জন্যে এত সবের কি দরকার ছিল—পাশ যে করব এ তো জানা কথাই।

রমেশ টিপ্পনী কাটল, ইস, টেনেটুনে সেকেণ্ড ক্লাস তার আবার নিশ্চিন্তি কত।

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, টেনে-টুনে।

না তো কি? ফার্স্ট ক্লাস না হলেই টেনে-টুনে।

একটু ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ফার্স্ট ক্লাস ক'জন পেয়েছে?

উল্টে দাবড়ানি দিয়ে রমেশ বলে উঠল, একজনও পেল না কেন? দাদুর

টাকায় আর বাবার টাকায় খাবে দাবে ফূর্তি করে বেড়াবে আর রেজাল্টের বেলায় এই।

বাবা হাসতে লাগলেন।—না রে, তুই ভালো সেকেণ্ড-ক্লাসই পেয়েছিস। যাই তোর মাকে বলে আসি। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার দুঃসংবাদটাও মনে পড়ে গেল তাঁর। বিমর্ষ মুখে বললেন, ওর মায়ের খবর জানো না তো, ভালো মতো বিছানা নিয়েছে —আলসার অ্যানিমিয়া আরও কত কি—

রমেশ বলল, আমি তো কিছুই জানি না, চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছে তো?

তা না হবার কি আছে, এখানকার সব থেকে বড় ডাক্তার ক'বার কবে এসে দেখে গেছে, এক্স-রে ফেক্স-রে সব হয়ে গেছে, ওষুধ পথ্যও কড়া নিয়মে চলছে, টাকা এন্তার খরচ হচ্ছে তার জন্যে খাবড়াই না, এখন সেরে উঠলে হয়।

বাবার এই রকমই কথাবার্তা. যেন খরচের জন্যে কখনোই কোনো উদ্বেগ নেই। আমার পাশের আনন্দ গেল—ঘড়ি বিক্রির ব্যাপারটা মনে পড়ছে। মাকে খবর দেবার জন্যে বাবা দোতলায় উঠে গেল। আমি রমেশের মুখোমুখি বসলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি বেশি অসুখ নাকি?

খুব কমও নয়।

আমাকে একটা খবর দিলে না কেন।...মংগেশের কল্যাণে ভেতরের খবর তো কিছু রাখি, তা ছাড়া উনি নিজেই সেই কবে থেকে বাড়ি বিক্রির কথা বলছেন...চিকিৎসা ঠিক ঠিক হচ্ছে?

এই জন্যেই রমেশকে ভালো লাগে, রেখে ঢেকে জিজ্ঞাসা করে না। জবাব দিলাম, এখন পর্যন্ত হচ্ছে আর, কতদিন হবে জানি না।...বাবার সেই মোটা চেন-অলা আগের কালের ঘড়িটা দেখেছ?

হ্যাঁ, খুব দামী ঘড়ি তো...কি হয়েছে?

বিক্রির জন্যে আজ চেনসুদ্ধু সেটা মংগেশের কাছে চলে গেছে আমি জানতে পেরে আটকে রেখেছি।...টাকা আছে তোমার সঙ্গে?

রমেশ বলল, খুব বেশি তো নেই, হাজার দুই আছে, আরো দরকার হলে চেক দিয়ে যেতে পারি।

সত্যিকারের কাজের মানুষদের বরাত এমনি করেই ফেরে বোধহয়, রমেশ আজ দু'হাজার টাকা পকেটে নিয়ে বেড়ায় আর সে টাকাও বেশি কিছুই নয় বলে সঙ্গে চেক বই থাকে। বললাম, দু'হাজারের দরকার নেই, আপাতত হাজার খানেক হলেই চলবে।

পকেট থেকে মোটা ব্যাগ বার করে গুনে দু'হাজার টাকাই তুলে নিল। বলল, হাজার টাকায় কিছু হবে না, এই দু'হাজার রাখো। আরো দরকার হলে খবর দিও, আর তোমার বাবাকে কিছু জানানোর দরকার নেই।

নিঃসংকোচে একশো টাকার ভাঁজ করা বিশখানা নোট হাত বাড়িয়ে নিলাম।

তারপর বললাম, বাবা জানলেই বা, এ টাকা কি শুধব না নাকি।

শুধবে না মানে, সুদে আসলে আদায় করে ছাড়ব, তোমার মিস্টার রমেশকে কাঁচা ছেলে ভাবো নাকি। হাসি মুখে হাত উল্টে ঘড়ি দেখল।

আমি বললাম, এক্ষুণি ঘড়ি দেখছ মানে?

সুখবরটা দেবার জন্যে বিস্তর কাজ ফেলে ছুটে এসেছি, এখুনি যেতে হবে। তোমার মাকে একবার দেখে যাই।

আমি ধমকের সুরে বললাম, বোসো, এখুনি যেতে হবে না।

বাঃ কাজ আছে বললাম না? আই অলওয়েজ...

থাক্। খেয়ে দেয়ে ও বেলা যাবে।

রমেশ মিটি-মিটি হাসতে লাগল। ওর ওই হাসিটা দুষ্টুমি মাখা বলেই আমার ভালো লাগে। বলল, এম-এ পাশ করেছ বলে এখন থেকে তুমি ধমক-ধামক শুরু করে দেবে নাকি।

হেসেই মাথা নাড়ালাম আমি, অর্থাৎ তাই করব। তারপর বললাম, এখন কাজের কথা শোন, তুমি যতই আপনার জন হও এ ভাবে ধার-ধোর করে তো চলবে না...এখন কি করা যায় তাই বল।

কি করতে চাও, চাকরি?

ঠিক ভাবি নি...

রমেশ বলল, হাই সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ যখন বম্বেতে বা আর কোথাও চেষ্টা করলে মেয়ে কলেজের মাস্টারি একটা পেতে পারো।

তার মাইনে কি রকম?

একটা হাই তুলে রমেশ জবাব দিল, কত আর, হবে চার পাঁচশো...তাই থেকে নিজের খরচ চালাবে না বাড়িতে সাহায্য করবে?

লোনাভালার বীরকর বংশের মেয়ে আমি, আমাকে কিনা চার পাঁচশো টাকার চাকরির কথা ভাবতে হচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ার মতোই ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে চলবে না এটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আমার আছে। বললাম, এর থেকে ভালো আর কিছু যদি না পাই তো কি করব?

একটু ভেবে রমেশ বলল, আমাব ফার্মে আসতে চাও যদি ব্যবস্থা করতে পারি, মাইনে-টাইনের কথা তাহলে ভাবতে হবে না।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সেই সেক্রেটারির চাকরি ন তো?

তুমি চাইলে তাও পেতে পারো।

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, দরকার নেই বাপু, মনের মতো সেক্রেটারি পেলেই তুমি একেবারে ঘরে নিয়ে তুলতে চাইবে।

লাভ কি, ঘরে নিয়ে তুললেও তো পালায় শেষে। মুখের দিকে চেয়ে সেই রকমই দুষ্টু দুষ্টু হাসতে লাগল।—ঘরে নিয়ে তোলার তাগিদ এলে আর সেক্রেটারি করার জন্য বসে থাকব না, সোজা ঘরেই টেনে নিয়ে যাব।

ইস, সাহস কত। কাজের কথা শোন, তোমার ওই সব আপিসের চাকরি-টাকরিও আমার ভালো লাগবে না।

কি মনে হতেই যেন রমেশ হঠাৎ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। আমি যে তার সামনে সাজানো সামগ্রী কিছু, নিবিষ্ট মনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কি হল?

না ভাবছি...

কি ভাবছ?

একটা কাজ করতে পারো, তোমাকে মানাবেও ভালো আর চেষ্টা করলে হয়তো উতরেও যাবে, আর একবার উতরে গেলে টাকা যে কত পাবে তার লেখাজোখা নেই, কিন্তু...

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ সেটা?

ইদানিং বোম্বাইয়ের ফিল্মলাইনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, চেষ্টা করলে ঢুকিয়ে দিতে পারি।...কিন্তু তোমার বাবা শুনলে তো হার্টফেল করে বসবে।

বাবা কেন, ফিল্মস্টার হবার চিন্তা আমার মাথায়ও কখনো আসে নি। জুনাগড়ে থাকতে কলেজে আর য়ুনিভার্সিটির মেয়েদের যাবতীয় ফাংসানের পাণ্ডা ছিলাম আমি। ছাত্রীজীবনের সেই ছ'বৎসরে নাটক-টাটকও কম করি নি, আর দস্তুরমতো নামও কিনেছিলাম। অনেক কাপ মেডেলও পেয়েছি। রমেশ সে-খবর জানে। দুই একটা উৎসবে সে নিজের চোখেই দেখেছে আর প্রশংসা করেছে।

সে কথা ভেবেই এই সম্ভাবনা কথা বলেছে বোধহয়। কিন্তু সে-সব অভিনয়ে একটা পুরুষ মাছিরও সংশ্রব ছিল না, সব চরিত্রই মেয়ে শিল্পীরা করত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাবা তার মেয়ের এই প্রতিভা খুব একটা ভালো চোখে দেখত না। বাবা শুধু গান বাজনার সমঝদার, আমাকে বলত, ও সব দিয়ে কি হবে, তার থেকে ভালো করে গান শেখ।

মনে মনে রমেশের এই চিন্তাটা আমিও বাতিল করলাম। তবে মুখে বললাম, বাবার হার্টফেল করার কি আছে, ভদ্রঘরের অনেক মেয়েই তো ছবিতে নামছে আজকাল।

রমেশ বলল, তা নামছে, কিন্তু লোনাভালার বীরকরদের মতো ঘরের মেয়ে বড় একটা নামছে না।

বাইরে বাবার চটির শব্দ কানে আসতেই মুখে আঙুল তুলে ইশারায় রমেশকে চুপ করতে বললাম। দু'হাজার টাকা ধরা হাতটাও শাড়ির আড়াল করলাম।

ঘরে ঢুকেই বাবা বলল, মেয়ের পাশের খবর শুনে ওর মা তো বেজায় খুশি। তোমাকে না খাইয়ে ছাড়তে বারণ করে দিল।

রমেশ তক্ষুণি বলল, না খেয়ে যাচ্ছে কে।

বাবা খুশি হয়ে আরাম করে বসল। আমার দিকে ফিরে বলল, তারপর তোদের কি কথা হচ্ছিল?

ওদিক থেকে রমেশ ভালো মুখ করে এ-রকম কথা বলে বসবে ভাবি নি। দিব্বি আলতো করে বলে ফেলল, পাশের খবর পাওয়ার পর সুজাতা এখন খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে।

বাবা তার দিকে ফিরল।—কিসের চিন্তা?

আমার ভ্রূকুটি এড়িয়ে সে জবাব দিল, এই কাজ কর্মের চিন্তা...

আহত বিস্ময়ে আবার আমার দিকে ফিরল বাবা।—আমার মেয়ে কাজ করবে!

অগত্যা তাড়াতাড়ি সামাল দেবার চেষ্টা আমার। ধমকের সুরে আমি রমেশকে বললাম, কেন বাবার সঙ্গে লাগছ? না বাবা, আমরা অন্য ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম।

বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে না পেয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করল, কোন ব্যাপারে আলোচনা?

সেই মুহূর্তে মগজের মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল আমার। আমতা-আমতা করে বললাম, শুনলে তুমি রাগ করবে।

তক্ষুণি প্রসন্ন মুখ বাবার।—তোর ওপর কবে আবার আমি রাগ করি।

অগত্যা বলতেই হল যেন।—রমেশকে বলছিলাম এখানে এত বড় একটা ঢাউস বাড়ি নিয়ে বসে থেকে কি লাভ আমাদের। তার থেকে বাবা যদি বম্বেতে বা সেই বকম কোথাও ছোটোব ওপব একটা হালফ্যাশানের ছিমছাম বাড়ি কিনে আমাদের নিয়ে বসতেন, বেশ হত। এত বড় বাড়ির এমাথা-ওমাথা কবতে হাঁফ ধরে যায়। মংগেশেরও বযেস হয়ে গেল, এরপর কে দেখে কে শোনে।

বমেশ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল। বাবার মতোই লোনাভালার এই বাড়ি, এ-বাড়ির বংশেব গৌবব আমার কত প্রিয় সে জানে। বাবা যখন চুপি চুপি তাকে বাড়িটা বেচে দেবার কথা বলেছিল, তখন জুনাগড়ে এই নিয়ে আমাদের কত আলোচনা হয়েছে। বাবাব দুর্বলতার সম্মান বজায় রেখেও তার সংকোচ ভেঙে দেবার জন্যেই যেন ঘুরিয়ে নিজের মতামতটা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। আর যখন কোনো পথ নেই, একথা শুনে বাবা আশ্বস্ত হবেন। একটু স্বস্তি যে পেল বোঝা গেল। আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক।

বাবা—এখানে থাকতে তোর আর ভালো লাগছে না?

এবার সত্যি কথাটা গলা দিয়ে বেরুল না। মাথা নাড়লাম, ভালো লাগছে না।

সত্যিই ভালো লাগছে না মনে হলেও বাবাব ভালো লাগার কথা নয়। একটু থেমে বলল, এ বকম জায়গা হয় না রে...যাকগে, তোর জন্যই সব, তুই যখন চাস না এখানে থাকতে তখন এ বাড়ি বেচেই দেব।

আমি মেকি আনন্দে বলে উঠলাম, তুমি এত সহজে রাজি হবে আমি ভাবি নি বাবা। রমেশের দিকে ফিবলাম, মিস্টার বমেশ, এ রকম একখানা বাড়ি কেনার মতো পার্টি আছে তোমাদের বোম্বাই শহরে?

বাবা ঘরে ঢোকার পর থেকে আমার মুখখানাই যেন পর্যবেক্ষণের বস্তু রমেশেব। এবারে অল্প হেসে জবাব দিল, ঝুড়ি ঝুড়ি।

ভালো দাম চাই কিন্তু, এত জায়গা-জমিসুদ্ধু কত দাম হতে পারে বল তো?

চার সাড়ে চার লাখ তো বটেই।

সোৎসাহে বললাম, আচ্ছা চার লাখই ধর, তার থেকে দু'লাখ খরচ করলে বোম্বাইয়ে ছোটোর ওপর দারুণ একখানা বাড়ি হতে পারে, বাকি দু'লাখ হাতে থাকলে, হাই ক্লাস! তুমি আজ থেকেই লেগে পড় মিস্টার রমেশ। নিজের ছেড়ে অন্যের কাজও একটু ভালোবাসতে চেষ্টা কর।

সত্যিই বাড়ি বেচার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল দেখে বাবা মনের ভার চেপেই উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন, তোমরা রেডি হও, লাঞ্চের সময় হল।

বাবা ঘর থেকে বেরুতেই রমেশ ঘটা করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর মন্তব্য করল, ফিল্ম লাইনটাই তোমার ভালো স্যুট করবে আমি বলে দিলাম।

ভিতরটা কেমন বিষণ্ণ লাগছিল আমার। জবাব দিলাম না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার খানিক বাদেই রমেশ চলে গেল। চুপি চুপি বাড়ি কেনার পার্টি দেখার কথা তাকে আর একবার বলে দিলাম।

কিন্তু বিকেল পর্যন্তও বাবার মুখখানা গম্ভীর কেমন। ভাবলাম বাড়ির জন্যেই। কিন্তু আমার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে কি জানি না। হঠাৎ ডাকলেন একসময়, শোন্ তো—

কাছে এসে দাঁড়ালাম।

মংগেশকে একটা কাজে যেতে বলেছিলাম...তাকে আটকেছিস কেন?

আমার তক্ষুণি মনে হল, আমার চোখে সংসারের হালটা এভাবে ধরা পড়বে বাবার কাছে সেটাই কম প্রাণান্তকর ব্যাপার নয়। বাড়ি বেচে দেওয়ার অত উৎসাহ কেন হঠাৎ সেটাও যেন বাবা এই থেকেই বুঝে ফেলেছে। তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার রাগই হয়ে গেল একটু। বললাম, আচ্ছা বাবা, আমি কি বাড়ির কেউ নই? সংসারের অবস্থা মংগেশ জানবে লক্ষ্মী মাসি জানবে রমেশ জানবে তবু আমাকে তুমি কিছু বলবে না।

এই রাগ দেখে বাবার মুখে বিড়ম্বনার ছায়া পড়ল। থেমে থেমে বলল, ঠিক তা নয়...ও ধরনের সেকেলে ঘড়ি তো চলে না, আজকাল...তাছাড়া মিছিমিছি অতগুলো সোনা আটকে আছে...আর তোর মায়ের জন্যে টাকারও দরকার...

সেটাই আসল কথা। ও ঘড়ি তুমি মংগেশের থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দাও। মায়ের চিকিৎসার জন্যে টাকার ব্যবস্থা আপাতত হয়েছে—

নিজের ঘরে এসে সেই দু'হাজার টাকা নিয়ে বাবার হাতে দিলাম।—এই নাও।

অতগুলো টাকা হাতে নিয়ে বাবা বিমূঢ় হঠাৎ।—কত টাকা এখানে?

দু'হাজার।

বাবা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—এত টাকা তুই পেলি কোথায়?

আমি নিরুত্তর।

বাবার ভারি মুখখানা উতলা এখন। তারপর প্রায় ভেঙে পড়ার সুরে বলে উঠল, আমার মেয়ে হয়ে রমেশের কাছ থেকে তুই হাত পেতে টাকা নিলি!

আবারও রাগই হয়ে গেল আমার।—এভাবে বলছ কেন, ভিক্ষে নিয়েছি নাকি! আপদে বিপদে মানুষই মানুষের কাছ থেকে ধার নেয়—বাড়ি বিক্রি হলে এ টাকা শোধ করা যাবে না?

বাবা চুপ হয়ে গেল।

৩

কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্যরকম। অদৃষ্টের অলক্ষ্য সুতোর বুনট কে আর দেখতে পায়। বাবার মতো এমন ভালো মানুষকে সমস্ত অহংকার ছেড়ে সত্যি বাড়ি বেচে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হল না। আর তখনকার মতো সেটা ভগবানের অযাচিত আশীর্বাদ বলেই ধরে নিলাম। বাবা খুশি, অসুস্থ মা খুশি আর আমি তো খুশি বটেই।

রমেশ চলে যাওয়ার দিন দশ-বারো বাদে ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে জনা চারেক বেশ অভিজাত ভদ্রলোকেব সমাগম হল বাড়িতে। তারা এসে মংগেশের কাছে বাবার খোঁজ করল। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে আমি রমেশের কাছ থেকে চিঠিপত্র আশা করছিলাম। এদের দেখে ভাবলাম বাড়ি কেনার কোনো পার্টি হবে। বাবা নিচে নেমে গেল। আমিও উৎসুক চিত্তে নিচে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে একটু উঁকি দিলে বাবার মুখখানাই দেখা যায় শুধু। ভদ্রলোক চারজন পর পর চারখানা চেয়ারে আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। তাই তাদের আমাকে দেখার কোনো প্রশ্ন নেই। এ-ভাবে এসে দাঁড়ানোর আরো কারণ, আমাব ভালো মানুষ বাবাকে কিছু বিশ্বাস নেই, তোয়াজ কবলেই কোন দর থেকে কোন্ দরে নেমে আসবে ঠিক কি। তবে রমেশ সামতানি কাঁচা মানুষ নয়, এই যা ভরসা। সে যদি পাঠিয়ে থাকে এদের মোটামুটি একটা দরের আঁচ দিয়েই পাঠিয়েছে।

কিন্তু সৌজন্য বিনিময়ের পব আলোচনা শুরু হতেই বাইবে আমি যেমন অবাক, ভিতরে বাবাও তেমনি। বাড়ি কেনার খদ্দের নয় এরা, আর রমেশ সামতানিও পাঠায় নি। এরা এসেছে একটা ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে। শহর আর শহরতলিতে তাদের হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের স্কীম। মূল কোম্পানি বোম্বাইয়ে। তাদের চেয়ারম্যান বাবার নামে একখানা ব্যক্তিগত চিটি দিয়েছে। চিঠি দেখার আগে তার নাম শুনেই বাবা অবাক একেবারে, তিনি তো বিরাট মানুষ একজন, নাম শুনেছি...এস আর মোদী মানে শিবরাম মোদী?

হাসি মুখে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাদের একজন চিঠিখানা বাবার হাতে দিল। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম সেই চিঠি পডতে পড়তে খুশিতে আর উত্তেজনায় বাবার মুখ লাল হচ্ছে। বড় চিঠি মনে হল, কারণ পড়তে সময় লাগছে বেশ। একবার পড়া শেষ করে বাবা আরো একবার পড়ল বোধহয় সেটা। তারপর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে বলল, মিস্টার মোদী এত বড় একটা ব্যাপারের মধ্যে আমাকে চাইছেন...কিন্তু আমাকে কি করতে হবে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!

শৌখিন পোর্টফোলিও হাতে লোকটি মৃদু হেসে জবাব দিল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না, আমাদের মধ্যে আসতে হবে শুধু, কেন কাকে দরকার সেটা আমাদের অর্গানাইজাররা খুব ভালো করে যাচাই করে নেবার পরেই মিস্টার মোদী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বলতে বলতে ভদ্রলোক পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে কোম্পানির ছাপা প্ল্যান প্রোগ্রাম বার করে বাবার সামনে রাখল। শহরতলির কোন্ অঞ্চলে হাউসিং ডেভেলপমেন্টের কি কি কাজ হয়েছে তার নকশা আর ঝকঝকে ছাপা ছবি দেখালো।

বাবা তাদের চায়ে আপ্যায়ন করার জন্যে বেল বাজিয়ে মংগেশের খোঁজ করতে আমি তখনই সানন্দে ওপরে উঠে এলাম। কারণ এটা এখন আমারই কাজ। তার আগে মাকে সুখবরটা দিলাম। বললাম, খুব সম্ভব এবারে একটু সুদিন আসছে, এক মস্ত কোম্পানি থেকে কিছু প্রস্তাব নিয়ে বাবার কাছে লোক এসেছে।

মায়ের রুগ্ন মুখে আশার আলো দেখা গেল। তবু সংশয়, উনি কি এই বয়সে আবার চাকরি-বাকরিতে ঢুকবেন নাকি! বিশেষ করে এই লোনাভালায়...

সাধারণ চাকরি থেকে ঢের ভালো কিছুই হবে হয়তো। দাঁড়াও শুনি আগে সব! মংগেশের হাত দিয়ে চা জলখাবার পাঠিয়ে খানিক বাদে আবার নিচে নেমে এলাম। বাবা ততক্ষণে কাগজপত্র দেখা শেষ করেছে। সকলে মিলে আলোচনায় তন্ময় এর পর।

ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি হাঁকিয়ে তারা চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আপনি ধীরে সুস্থে দেখুন সব—তারপর চেয়ারম্যানের চিঠির জবাব দেবেন। তিনি আপনার চিঠি পেলে পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্যে আমরা আবার আসব।...আর এত বড় বাড়ি, আপনার আপিসও এখানেই হতে পারে। কোম্পানি তার জন্যে ন্যায্য ভাড়া দেবে, আর আপনার সুবিধে অনুযায়ী আপিস ঘরও সাজিয়ে দেবে।

তারা চলে যেতে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাবার সমস্ত মুখ যেন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। এ-রকম ভাগ্যোদয় এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। টেবিলের ওপর কাগজ পত্র ছড়ানো, সামনে চেয়ারম্যান মোদীর লেটার হেড-এ টাইপ করা চিঠি।

সেই চিঠিটা তুলে নিয়ে একবার পড়লাম আমি। বেশ বড় চিঠি। বক্তব্য, বোম্বাইয়ের শহর আর শহরতলিতে হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের দিকে-দিকে সফল অভিযানের খবর নিশ্চয় মিস্টার বীরকরের জানা আছে। পরিকল্পনা সম্প্রসারণের জন্যে তারা জনাকতক রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব থেকে সম্মানিত এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই এই আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার সঙ্কল্প। এদিকের সমগ্র অঞ্চলে লোনাভালার মিস্টার বীরকরেব থেকে সর্বজনপরিচিত মানী ব্যক্তি আর যে কেউ নেই এটা সকলেরই সুবিদিত। চেয়ারম্যান তাই এই বিশেষ পদটি গ্রহণ করার জন্যে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। মিস্টার বীরকর যে জনসাধারণের সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হবেন চেয়ারম্যানের তাতে সন্দেহ নেই। রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরদের ড্রইং আপাতত মাসে আড়াই হাজার টাকা করে হবে বলে স্থির হয়েছে। এ-ছাড়া আনুষঙ্গিক সমস্ত বিধি ব্যবস্থার দায়িত্বও কোম্পানির। অর্গানাইজারদের সঙ্গে আলোচনার সুবিধার্থে কোম্পানির লিটারেচার এবং প্যামফ্লেট পাঠানো হল। এখন মিস্টার বীরকর যদি যথাশীঘ্র তাঁর অনুমোদন-পত্র চেয়ারম্যানের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে লোনাভালাতেই এই অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক কাজের গোড়াপত্তন হতে পারে।

চিঠি নিয়ে আমি তখন দোতলায় মায়ের কাছে ছুটলাম। বাবাও এলো একটু বাদে। অনেক দিনের জমাট বাঁধা দুশ্চিন্তা যেন হঠাৎ এক খুশির হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি আর মা দুজনেই বাবার মুখখানা দেখছি, আর বাবা তাইতে বেশ লজ্জা

পাচ্ছে। বলল, এ-বয়সে আবার এক ঝামেলার মধ্যে টানাটানি—

এ-যে খুশির কথা জেনেও মা বলল, এটা তো আর সাধারণ চাকরি কিছু নয় যে মান মর্যাদার প্রশ্ন উঠবে।

বাবা জবাব দিল, তা অবশ্য নয়, মান মর্যাদা আছে বলেই ডাকছে।

...হ্যাঁ এই গোটা অঞ্চলে যদি সব থেকে মানী আর সুপরিচিত একজন মানুষকেও খুঁজে বার করতে হয়, তাহলে বসন্তরাও বীরকরের নামই যে সর্বাগ্রগণ্য হবে তাতে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

তিন চার দিন আমরা বাবা মেয়েতে লিটারেচারগুলি আর প্যামফ্লেটের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। নানা আকারের সত্যিই চোখ জুড়ানো বাড়ির ছবি এক-একটা। আমার তাগিদে বাবা চারদিনের দিন এস আর মোদীর নামে রেজিস্ট্রি ডাকে অনুমোদন-পত্র পাঠিয়ে দিল।

আর তার তিনদিনের মধ্যেই খুশি মুখে সেই অর্গানাইজারের দলটি আবার এলো। শুধু গোড়ার দিনের চিফ অর্গানাইজার আসে নি। বাবার ইচ্ছে বুঝে এবারে তাদের আরো ভালো করে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হলো।

কাজ শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে নিচের দুটো ঘরের ভোল বদল করা হল। দামী আসবাব-পত্র আর আলমারি এলো। আপিস ঘর সাজানো হল। স্থানীয় একজন ক্লার্ক আর একজন টাইপিস্ট নিযুক্ত হল। শুনলাম একজন সেক্রেটারিও দেওয়া হবে বাবাকে, দেখেশুনে বাবা তাকেও নিযুক্ত করতে পারে। ঠাট্টার সুরে আমি তখন বাবাকে বললাম, আমাকেই সেক্রেটারি করে নাও না।

বাবা পাল্টা ঠাট্টা করল, তোর অভিজ্ঞতা কোথায়?

আমি বললাম, বিনা অভিজ্ঞতায় তুমি ডাইরেক্টর হয়ে বসতে পারো আমি সেক্রেটারি হতে পারি না!

বাবা হাসতে লাগল। বলল, আমি ডাইরেক্টর হয়ে আব করছিটা কি, করার যা তা-সব অর্গানাইজাররাই করবে, আমি শুধু মাথার ওপর থাকব, সই সাবুদ করব, আর গাড়ি করে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরব। ছেলেগুলো ভালো আর কাজেরও। তাহলেও বেশ বোঝে-টোঝে এরকম সেক্রেটারি একজন দরকার। ভাবছি কাগজে একটা অ্যাডভার্টাইজ করে দেব।

কিন্তু তার দরকার হল না। দিন চারেক বাদে একজন অভিজ্ঞ লোককে বোম্বাই আপিস থেকে তারাই পাঠিয়ে দিল। নানা জায়গায় কাজের অভিজ্ঞতা আছে তার। এর মধ্যে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরের যদি যোগ্য কোনো সেক্রেটারি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই লোকটিকে ইন্টারভিউ করে দেখতে পারেন—এই মর্মে প্রথম দিন যারা এসেছিল তাদের মধ্যে চিফ অর্গানাইজার এই চিঠি দিয়ে লোকটিকে পাঠিয়েছে। অবশ্যই চূড়ান্ত বিবেচনার পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়াটা সম্পূর্ণ রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টরের নিজস্ব ব্যাপার।

সুপারিশ পত্রের ফলে আর অভিজ্ঞতার কাগজ-পত্র সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখে আর লোকটির বিনম্র কথা-বার্তা শুনে বাবার সত্যিই পছন্দ হয়ে গেল। এই নতুন

সেক্রেটারির নাম শেখর নায়েক। ভদ্র আর সভ্য ভব্য মানুষ, কিন্তু লোকটিকে দেখে একটু বেশি বিনয়ী আর লাজুক মনে হয়েছে আমার।

তার কাজ দেখে বাবা দিন কয়েকের মধ্যে ভারী খুশি। বড় বড় ফাইলে দাগ মেরে রাখে কোন্ জায়গাটা দরকারী, কোন্খানটা পড়ে বিবেচনা করতে হবে। নিজেকে পাতা উল্টে সই করতে হয় না, সে-ই সামনে ধরে দেয়। হিসেবপত্র রাখার ব্যাপারেও বেশ চতুর। বাবাকে খুশি দেখলে আমারও আনন্দ। কিন্তু দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই শেখর নায়েকের একটা দুর্বলতা আমার চোখে ধরা পড়েছিল। আমার দিকে সোজাসুজি তাকায় না কিন্তু ফাঁক পেলে চোরা চোখে দেখে। লোকটার দুর্বলতা বুঝতে আমার বাকি থাকল না। বয়েসে কম করে আমার থেকে ষোল সতেরো বছরের বড়, এক-একসময়ে আমি তার দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে থাকতাম। তার ফলে আবার হাঁসফাঁস দশা। কিন্তু পরে হাসিই পেত। দিনের মধ্যে দু'-একবার বাবাকে এটা সেটা বলার জন্যে বা মায়ের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে আপিস ঘরে আসি। আর তখন মনে হয় কখন আসব বাবার সেক্রেটারি যেন সেই অপেক্ষায় আছে। নিছক কৌতুক বশেও এক এক সময় ঘরে ঢুকি। অল্প স্বল্প আলাপের পর কাজের ব্যাপারে ভদ্রলোকের আমার সঙ্গে আলোচনার ঝোঁক দেখা গেল।

দশ বারো দিনের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাবার নামে একরাশ কাগজপত্র ছাপা হয়ে এসেছে। ফর্ম, আবেদনপত্র সব কিছুর নিচে বাবার নাম। প্রত্যেক অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক সেখানকার রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর। সাধারণ নিয়ম কানুন মানা ছাড়া খোদ আপিসের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নেই। এ রকম স্বাধীনতা পেয়ে বাবা আরও খুশি।

গোড়ার ক'দিন অর্গানাইজারদের সঙ্গে প্রায় রোজই বাবাকে গাড়ি করে বেরুতে হচ্ছিল। স্থানীয় পয়সা-অলা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় দরকার, প্রচার দরকার। বিশ তিরিশ পঞ্চাশ মাইল দূরের লোকদেরও লোনাভালার বীরকরদের নাম অন্তত শোনা আছে। তাই বাবা সঙ্গে থাকলে সুবিধে। সেই সব লোকদের সমস্ত প্ল্যান বোঝানো, আর বুঝিয়ে আকর্ষণ করার ব্যাপারে অর্গানাইজাররা সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া নতুন প্ল্যান অনুযায়ী জমি কেনা সাইট দেখার ব্যাপারেও বাবাকে বেরুতে হয়। দেখতে দেখতে লোনাভালায় বেশ একটা তৎপরতার সাড়া জেগে গেল।

রমেশ সামতানির ঝকঝকে গাড়িটা বাড়ির দোরে এসে দাঁড়াল আবার তিন সপ্তাহ বাদে, এক ছুটির দিনে। আপিস বন্ধ সেদিন, তাই ক্লার্করা আসেনি, কিন্তু ঘর খুলে শেখর নায়েক ছুটির দিনেও একটু কাজ সেরে যেতে এসেছে। আমি নিচের বাগানে ঘুরছিলাম, আর একটু বাদে শেখর নায়েক এসে হাজির হতে পারে ভেবে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। ছুটির দিনেও তার এত কাজের ঝোঁক কেন সেটা আমি অন্তত অনুভব করতে পারি।

রমেশের গাড়ি দেখে ভিতরটা ভারী খুশি হয়ে উঠল। ছুটে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে রমেশও হাসিমুখে বলল, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে মায়ের খবর ভালো।

বললাম, খুব ভালো না, তবে আগের থেকে ভালো।

আমাদের নিচের বসার ঘর বদলে গেছে সে আর জানবে কি করে। ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকালো। কোনো কথা ফাঁস না করে আমি হাসছি মিটিমিটি।

ঘরের মধ্যে এসে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরটার দিকে এগোল। এ ঘরেরও ভোল বদলেছে লক্ষ্য করল। শেখর নায়েক বসে কাজ করছে সেখানে। সে মুখ তুলে তাকাতে রমেশও তাকে দেখে নিল একদফা। ওদিকে শেখর নায়েক নিরীক্ষণ করে দেখছে তাকে। আমার হাসি খুশি মুখখানাই হয়তো শেখর নায়েকের অস্বস্তির কারণ। আকাশ থেকে ঝুপ করে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির হল কিনা ভাবছে হয়তো।

রমেশ সামতানি সবিস্ময়ে তাকালো।—এ ঘর দুটো ভাড়া দেওয়া হয়েছে নাকি?

হাসি চেপে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই দেওয়া হয়েছে।

কোনো আপিস টাপিস?

হ্যাঁ।

কত ভাড়া?

'মাসে সাতশ'।

রমেশ সামতানি এদিকে সরে এসে মন্তব্য করল, কাজটা কিন্তু ভালো হল না।

কেন?

এরপর বাড়ি বিক্রি করা একটু শক্ত হবে। আমি একটা পার্টি ঠিক করেই এসেছিলাম, টার্মস মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছল, তাদের বাড়ি পছন্দ হলেই কাজ হত, আমার মুখে যা শুনেছে তাতেই এক রকম পছন্দ হয়েছিল—কিন্তু প্রধান শর্ত ভেকেন্ট পজেশান দিতে হবে।

বললাম, ওপরে চল তো, তারপর আলোচনা করা যাবে।

বাবা মায়ের ঘরেই ছিল। বলা বাহুল্য রমেশকে দেখে সে-ও খুশিতে আটখানা। মায়ের কুশল সমাচার নেওয়ার পরে তাকে নিয়ে আমরা পাশের ঘরে এসে বসলাম। বাবার আর সবুর সয় না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, রমেশকে বলেছিস সব কথা?

আমি জবাব দিলাম নিচের দু'খানা আফিস-ঘর ভাড়া দেবার জন্যে মিস্টার রমেশ রেগে গেছে—ও বাড়ি বিক্রির পার্টি ঠিক করে আমাদের খবর দিতে এসেছিল। রমেশের দিকে ফিরলাম, কত টাকায় বিক্রির কথা হয়েছিল?

পাঁচ লাখ।

প্রসন্ন মুখে বাবা বলল, তার আর দরকার হবে না রমেশ, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আসলে কি জানো, বাড়িটাকে সকলেই আমরা বড় ভালবাসি...শেষ সময়ে একটা উপায়ও হয়ে গেল। তুই বল্ না রে সুজাতা—

ভগবান তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিই বলো।

রমেশ সবিস্ময়ে আমাদের দুজনকেই দেখতে লাগল।

বাবা বলল, তোমাকে অবশ্য একটা চিঠি লিখে আমাদের জানানো উচিত ছিল, ভুল হয়ে গেছে...

এরপর হৃষ্ট মুখে বাবা মোটামুটি সব সমাচার জানালো তাকে। শোনার পরেও রমেশের মুখে কি রকম যেন সংশয় মেশানো বিস্ময় দেখা গেল। সে ব্যবসায়ী মানুষ তাই হয়তো সন্দিগ্ধ মন একটু। বলল, বোম্বাইয়ের হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের নামটা অবশ্য শোনা আছে...কিন্তু এত লোক থাকতে তারা হঠাৎ আপনাকে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর করতে গেল কেন?

অর্থাভাবে পড়া গেছে বলে রমেশের এ রকম সংশয় বা প্রশ্ন আমার খুব ভালো লাগল না। আমি বললাম, এখানেই যদি ব্রাঞ্চ খুলতে হয় বাবার থেকে নির্ভরযোগ্য সকলের পরিচিত নামী লোক পাবে কোথায়? তুমি কি ভাবছ...?

না...অনেক রকম গজায় তো আজ-কাল, তাই হঠাৎ শুনে কি রকম লাগছিল। বাবার দিকে ফিরল, তারা আপনার সিকিউরিটি কি নিয়েছে...বাড়ি মর্টগেজ?

এ প্রশ্ন শুনে বাবা দস্তুর মত ক্ষুণ্ণ। জবাব দিল, তাদের গরজে তারা আমাকে নিয়েছে। বাড়ি মর্টগেজ দিতে যাব কেন, আমার নামটাই তাদের কাছে সিকিউরিটি।

আমি বললাম, অনেকরকম গজায় মানে কি, একটু আগেই তো বললে হাউসিং করপোরেশনের নাম শোনা আছে—

তা আছে...।

এই সময় মংগেশ চা আর জলখাবার নিয়ে এলো। বাবা তাকে বলল, নিচে সেক্রেটারিবাবুর কাছ থেকে মিস্টার মোদীর চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে এস তো।

নাম শুনে রমেশের মুখ-ভাব বদলালো।—এস আর মোদী মানে শিবরাম মোদী?

বাবা হাসিমুখে মাথা নাড়ল, এবারে যেন ঘায়েল করা গেছে রমেশকে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার মোদী এর মধ্যে কি?

বাবা বলল, বা রে তিনিই তো চেয়ারম্যান সে খবর রাখ না?

রমেশ মাথা নেড়ে জবাব দিল, অনেক রকমের বিজনেসের হেড ওই ভদ্রলোক...এর মধ্যেও আছেন জানা ছিল না।

মংগেশ চিঠি নিয়ে এলো। সেটা পড়ার পর রমেশ তখনকার মতো এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না কিছু।

এরপর শুনলাম মাস দুই আড়াইয়ের সফরে রমেশ সামতানি গোয়া দুবাই আর কোথায় কোথায় বাইরে যাচ্ছে। তার বাইরের সফরটা বোম্বাইয়ের এ-মাথা ও-মাথা করার মতোই ব্যাপার। সব মিলিয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটায়। যাবার আগে এই বাড়ি বিক্রির ফয়সলা করতে আর একবার দেখা করে যেতে এসেছিল।

চলে যাবার আগে আমাকে একলা পেয়ে রমেশ বলল, আমার কিন্তু তোমাদের এই ব্যবস্থা খুব ভালো লাগল না। আড়াই হাজার টাকা মাইনে হলেও তোমার বাবা কত কাল আর চাকরি করবেন...বয়েস তো হয়েছে। আমি তোমার কথা ভাবছি, তোমার বাবার পরে তোমাকে তো আর এ চাকরিটি দিচ্ছে না কোম্পানি। এর থেকে পাঁচ লাখ টাকায় বাড়ি বিক্রি করে বম্বেতে লাখ দেড় দুইয়ের একটা বাড়ি

বা ভালো ফ্ল্যাট কিনে বাকি টাকা তোমার আর বাবার নামে ব্যাঙ্কে মজুত রাখলে তোমার দিক থেকে অনেক ভালো হত। এরপর ডেথ ডিউটি আর ওয়েলথ ট্যাক্স দিয়ে বাড়ি রক্ষা করাটাই তো প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে তোমার পক্ষে।

খুবই বিবেচনার কথা বলল রমেশ সামতানি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর সম্ভাবনার উল্লেখও খারাপ লাগল আমার। বললাম, অত সব সমস্যার কথা আমার মাথায়ও আসে নি, পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আর দরকার হলে তখন না হয় বাড়ি বিক্রি করে দেব। আর ডিউটি বা ট্যাক্স-ফ্যাক্স যা দেওয়া উচিত তাই বা ফাঁকি দেব কেন।

হাসি মুখেই রমেশ সামতানি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। তারপর বলল, এর ওপর আর কথা কি আছে।...কিন্তু এম-এ পাস করার পর তুমি কি করবে, এখানে বসে বাবার টাকায় খাবে দাবে ঘুমুবে আর মুটোবে?

এ অবশ্য এক সত্যিকারেব সমস্যার কথাই বলেছে। আমি কি যে করব এখন পর্যন্ত নিজেই ভেবে উঠতে পারি নি। বললাম, ঠিক আছে, তুমি বাইরে থেকে ঘুরে এসো, তারপর দুজনে মিলে পরামর্শ করে যা-হোক কিছু ঠিক করা যাবে।

দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কেবল মাকে নিয়ে যা একটু সমস্যা। কিছুতেই আর সুস্থ কবে তোলা যাচ্ছিল না তাকে। নইলে বাবার মুখের রঙ বদলেছে, আমিও ভালোই আছি। মংগেশ আর তার বউ লক্ষ্মী মাসিও খুশি মনে আছে। মাস গেলে আড়াই হাজার টাকা আসছে বাবার হাতে, সেই সঙ্গে আপিস ঘর ভাড়ার পাঁচশো। এই ক'টি প্রাণীর দিব্বি আনন্দেই কেটে যাচ্ছে।

বাবার কাজের চাপ আগের থেকে আরো কমে এসেছে। এত দিনে কাছের দূরেব বহু লোক হাউসিং ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের এই শাখার খবর জেনেছে। কোম্পানির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ছে। জমি কিনে বাড়ি আর ফ্ল্যাটের কাজ শুরু হবার কথা ঠিক এক বছরের মাথায়। কাছে দূরের অনেক জমিও দেখে রাখা হয়েছে, দুই একটার বায়নাও করা হয়েছে।

বাবার বলতে গেলে এখন নিচের ঘরে বসে সই-সাবুদ করাটাই আসল কাজ। এ নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় না খুব, কি করতে হবে না হবে সেক্রেটারি শেখর নাযেকই বাতলে দেয়।

আমার ভিতরে ভিতরে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে রমেশ সামতানিকে নিয়ে। এবারে তিন মাস বাদে বাইরে থেকে ঘুরে এসেই হাজিরা দিয়েছে। আর তারপর আমাকে যেন বেশ ভিন্ন চোখে নিরীক্ষণ করেছে। শেষে চপল মন্তব্য, আমার বারোটা বাজালে দেখছি—

আমার দিক থেকে না বোঝার বিস্ময়।—কি ব্যাপার?

আয়নায় নিজেকে দেখ?

দেখি তো...কেন? ও, তুমি বলে গেছলে খাব দাব ঘুমুব আর মুটোব—মুটিয়েছি বুঝি?

রমেশ নিজের কানে আর নাকে হাত দিল।

এই নাক কান মলছি আমি, আর ও কথা বলব না...আমার ওই কথা শুনে

এক্সারসাইজ টেক্সারসাইজ শুরু করেছ বুঝি?

পরিশ্রমের মধ্যে নিয়মিত দু'বেলা অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়াই আমি, কখনো একলা কখনো লক্ষ্মী মাসির সঙ্গে। জবাব দিলাম, তোমার কথা শুনে কিছু করতে আমার বয়ে গেছে।

রমেশ সামতানি ছদ্ম ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কার কথা শুনে চলছ আজকাল—বাবার সেক্রেটারি ওই শেখর নায়েকের?

এবার এসে দু'দিন থেকে গেছে রমেশ, আর সেই ফাঁকে ফাঁকে শেখর নায়েকের দুর্বলতাও লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া ওই লোকের সম্পর্কে হাসি মুখে আমিও মন্তব্য করেছি কিছু।

এর পরের দু-তিন মাস অর্থাৎ আবার বাইরে বেরুনোর আগে পর্যন্ত মাসে অন্তত দুবার করে রমেশ এখানে এসেছে। প্রতিবারই তার হাসিঠাট্টার ফাঁকে কিছু দুর্বলতার আঁচ আমি পেয়েছি। কিন্তু আবার বাইরে যাবার আগে শেষের বার এসে মনের কথা পষ্টা-পষ্টি বলে ফেলেছে।—দেখ, আবার একটা বিয়ে করার সাধ আমার মনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিক তক্ষুণি তোমাকে মনে পড়ে যায় আর সাধটা পোস্টপোন করি৷ আজ যাবার আগে তোমার মন্তব্য বা বক্তব্য শোনার বাসনা।

আমার মুখে রং ধরেছিল কিনা জানি না। মনের তলায় এ রকম একটা প্রস্তাব শোনার আশংকা ছিল। বয়সে চৌদ্দ বছরের ফারাক সত্ত্বেও আমরা চূড়ান্ত সমবয়সীর মতো মিশেছি। দুজনে দুজনকে পছন্দ করি। কিন্তু ওই চূড়ান্ত সম্ভাবনার কথা ভাবতে কি রকম যেন লাগে। কেমন একটা অস্বস্তি। রমেশ আপনার জন...কিন্তু ওকেই তা বলে বিয়ে করব...।

আসল কথা, আমি নিজেই কিছু স্থির করে উঠতে পারি নি। তাই ওর লঘু প্রস্তাবের জবাবে আমিও পলকা বিস্ময় দেখিয়েছি।—তোমার বিয়ের সাধ হয়ে থাকে তো চটপট্ট সেরে ফেলোগে, তোমার মতো বুড়োর সম্পর্কে আমার আবার কি মন্তব্য বা বক্তব্য থাকতে পারে।

সেও দু'চোখ বড় করে ফেলল, সবে ছত্তিরিশ পেরুল—আমি বুড়ো। তোমার বাবার সেক্রেটারির তো আরো বয়েস বেশি!

রাগ দেখিয়ে বললাম, ওর জিভে আমি ছ্যাঁকা দিয়ে দেব কোন্‌দিন—

আমার মুখখানা প্রথমে দু'চোখে আটকে নিল রমেশ। গম্ভীর।—জিভে ছ্যাঁকা অনেক রকম ভাবে দেওয়া যায়, তুমি কি ভাবে দেবে?

অসভ্যের ধাড়ী! হাত তুলে মারতে এলাম ওকে।

রমেশ সরে গিয়ে হাসতে লাগল।

তারপর বলল, এবারে একটা ডেফিনিট প্রোপোজাল দিয়ে গেলাম, বাইরে থেকে মাস দুইয়ের মধ্যে ঘুরে আসছি, এর মধ্যে তুমি শক্তপোক্ত একটা পাথরের মতো মন স্থির করে রেখ।

সে চলে যাবার পর মন উল্টে বরং আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। বারো বছর বয়েস থেকে অবাধে মেলামেশা করেছি রমেশের সঙ্গে, কিন্তু সেটা আর যা-ই হোক

প্রেমিক প্রেমিকার মতো মেলামেশা আদৌ নয়। সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে এক একবার মন্দ লাগছে না বটে, আবার ভিতরের কেউ যেন সেটা নাকচ করতেও চাইছে। দু'বছর আগেও বিয়ের সম্পর্কে আমার মনের তলায় একটা আবছা রোমাঞ্চকর চিত্র উঁকিঝুঁকি দিত। একজন কেউ আসবে, যাকে পরস্পর আমরা নতুন করে দেখব জানব আর দিনে দিনে আবিষ্কার করব। সেই চিত্রে এই অতি-চেনা রমেশের স্থান ছিল না।

...হঠাৎ বাবার কথা মনে হতে লাগল আমার। এই ভদ্রলোকই বা কি, দিব্বি মনের আনন্দে আছে, মেয়ের ওদিকে বাইশ পেরুতে চলল, একটু চিন্তা-ভাবনাও নেই। মা না হয় নিজের শরীরের জ্বালায় অস্থির, কিন্তু বাবার তো একটু ভাবনা-চিন্তা হতে পারত!

আবার বিয়ের পর এই বাবাকে ছেড়ে যাবার কথা মনে হলেও বুকের তলায় টনটনানি। মরুকগে, যা হবার হবে, পরে দেখা যাবে।

...কিন্তু পরের মাসের গোড়াতেই নীল আকাশ থেকে হঠাৎ যে অকল্পিত বিপর্যয় হুড়মুড়িয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ল, তার মর্মান্তিক ধাক্কায় লোনাভালার এই গোটা বীরকর পরিবারটিরই বিলুপ্তি অবধারিত যেন।

পর পর পাঁচ ছদিন বাবার সেক্রেটারি শেখর নায়েকের আর দেখা নেই। লোকটার কি হল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে বাবা চিন্তিত। বাসে আট-দশ মাইল দূরের এক জায়গা থেকে রোজ যাতায়াত করত সে। কাজ যার ধ্যান জ্ঞান তার হল কি হঠাৎ! এ ক'দিনের মধ্যে আবার একটি অর্গানাইজারেরও টিকির দেখা নেই।

এই অবস্থায় এক সকালে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল একটা। বাড়ির দরজায় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। দুজন পুলিশ অফিসার আর জনাতিনেক কনস্টেবল নামল। বিমূঢ় মুখে বাবা নিচে নেমে এলো, পিছনে আমিও। পুলিশ অফিসার দুজন বাবার পরিচয় নিয়ে জানালো তাকে তাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। বাবার নাম তাদের চেনাজানা, তাই বোধহয় সম্ভ্রমের সুরেই এই বক্তব্যটুকু জানালো।

বাবা হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বলুন তো, আমাকে থানায় যেতে হবে কেন?

একজন অফিসার বাবাকে বলল, ব্যাপার সীরিয়াস, থানায় গেলেই জানতে পারবেন।

তখনো বাবার আর আমার ধারণা শেখর নায়েকেরই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বোধহয়। চিন্তিত মুখে বাবা জামা কাপড় বদলে এলো।

অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবার সঙ্গে আমি যেতে পারি?

সে মাথা নাড়ল, শুধু বাবাকেই দরকার তাদের।

আমার, মংগেশের আর লক্ষ্মী মাসির বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে বাবাকে নিয়ে তারা চলে গেল। আমি দোতলায় উঠে মাকে কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ এ-রকম দুশ্চিন্তার ধাক্কা তার সহ্য না হতে পারে।

সকাল গড়াল, দুপুর গড়াল। বিকেলে আমি মংগেশকে থানায় খোঁজ করতে

পাঠালাম। থানা আমাদের বাড়ি থেকে ন'দশ মাইলের পথ। বাসে যেতে আসতেও অনেক সময় লাগবে। সকাল থেকে বাবাকে না দেখে মা ভয়ানক ছটফট করছিল, তাকে হঠাৎ ট্যুরে বেরুনোর কথা বলে ঠাণ্ডা করেছি। কিন্তু নিজে দুশ্চিন্তায় অস্থির।

ঘণ্টা আড়াই তিন বাদে মংগেশ ফিরল। শুকনো পাংশু মুখ। বলল, ভয়ানক কিছু বিপদ হয়ে গেছে নিশ্চয়, মালিকের সঙ্গে তারা দেখা করতে দিল না, তাকে আটকে রেখেছে।

আমি সত্রাসে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কিছু বলল না? শেখর নায়েক কোথায়?

মংগেশ মাথা নাড়ল শুধু। তারা কিছু বলে নি, শেখব নায়েকেরও দেখা মেলেনি।

এবারে আর মায়েব কাছে গোপন রাখা সম্ভব হল না। সিঁডিব মাথায় দাঁডিযে মংগেশের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখেছে। কানেও হযতো গেছে কিছু। শোনাব পব মা সেখানেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পডল।

বিভীষিকাময় রাতটা সেদিন কাটল কোনোরকমে। পরদিন সকালে বাডিতে আবাব পুলিশের গাড়ি। আপিস ঘব সার্চ করাব পরোয়ানা নিযে এসেছে তাবা। আমি নির্বাক, স্তব্ধ। মংগেশ দরজা খুলে দিতে ঘণ্টাখানেক ধবে তারা তাদেব কাজ সাবল। ছাপা কাগজ-পত্র আর অনেকগুলো ফাইল নিয়ে আবার গাডিতে উঠল তাবা। আমি ছুটে গেলাম তাদের কাছে।—কি হয়েছে? এ-সবেব মানে কি? আমাব বাবাকে আপনাবা আটকে রেখেছেন কেন?

একজন অফিসার জবাব দিল, আপনার বাবাব বিরুদ্ধে সীবিয়াস চার্জ ম্যাডাম—

কি সীরিযাস চার্জ?

লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির।

তাদের গাড়ি চলে গেল। এবাবে আমি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম। লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির চার্জ আমার বাবার বিরুদ্ধে! আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি। হুঁশ ফিরতে মংগেশকে নিয়ে এব্যরে আমি থানায় ছুটলাম। থানা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম। আমাকে একটা খালি ঘবে এনে বসানো হল। একটু বাদে দুজন লোকের প্রহরায় বাবা ঘরে এলো।

তার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠলাম আমি। একটা দিনের মধ্যে বাবার যেন পাঁচ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। রক্তশূন্য মুখ, দু'চোখ বসে গেছে। আমাকে দেখে কোনোরকমে কান্না সামলে বলল, কি হয়েছে বলতো রে...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওই মুখের দিকে চেয়ে কি হয়েছে আমি আর বলে উঠতে পারলাম না। তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম, এদের সাংঘাতিক কিছু একটা ভুল হয়েছে—তুমি কিছু ভেব না বাবা, কালকের মধ্যেই আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।...এখানকার এরা তোমাব কাছ থেকে কোনো স্টেটমেণ্ট নেয় নি?

বাবা বলল, খাতা পেন্সিল নিয়ে এরা কবার করেই তো ডাকাডাকি করছে। কিন্তু কে-যে সব জিজ্ঞেস করছে আর কি জানতে চায় আমি কিছু বুঝতেই পারছি না। আমিও কি-যে বলেছি তাও জানি না।

বললাম, ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেব না। আমি ব্যবস্থা করছি।...কাল থেকে

তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছে এরা?

বাবা মাথা নাড়ল শুধু। দিয়েছে। কিন্তু যা-ই দিক সে খাবার যে বাবার গলা দিয়ে নামে নি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বাড়ি না ফিরে খোঁজ করে একজন নাম-করা উকিলের কাছে গেলাম। যতটুকু বুঝেছি তাকে বললাম। লোনাভালার উকিল যখন বাবার নাম ধাম তারও জানা আছে। সেই ভদ্রলোক আশ্বাস দিল, আজ রাতে তো কিছু হবে না, কাল খোঁজ নিয়ে দেখি কি ব্যাপার।

আরো একটা ভীষণ রাত কাটল। পরদিনের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফের একটা খবর দেখে আমার দু'চক্ষু স্থির, বুকের তলায় কাঁপুনি।

কাগজ লিখছে, দিন কয়েক আগে হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন নামে এক ভুয়ো প্রতিষ্ঠানেব খবর পুলিশের কানে এসেছে। পুলিশেব গোপন অনুসন্ধানের ফলে এক বিরাট জালিয়াতির গ্যাং-এর হদিশ মিলেছে। দলের বেশির ভাগ লোকেই জনসাধারণের বহু লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়েছে। এই জালিয়াতের দল অনেক ভুয়ো প্যামফ্লেটে নানা জায়গার শৌখিন বাড়ির ছবি ছেপে জনসাধারণের চোখে ধুলো দিয়েছে। এই ভুঁইফোড় হাউসিং ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের চেয়ারম্যানটির নামও জাল। কোন্ সেবক রাম মোদী এস আর মোদির নাম স্বাক্ষর করে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়েছে এবং সেটা বিশিষ্ট শিল্পপতি শিবরাম মোদীর স্বাক্ষর বলে চালিয়েছে। এই জালিয়াতি চক্রের একজন মাত্র কর্ণধারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে। সে লোনাভালার বিশিষ্ট বীরকর পরিবারের বসন্তরাও বীরকর। নিজেকে রিজিয়ন্যাল ডাইরেক্টর বলে ঘোষণা করে সেই প্রবীণ ভদ্রলোক নিজের বাড়িতেই ঘটা করে আপিস সাজিয়ে বসেছিল। তার ছাপা অনেক কাগজ-পত্র স্বাক্ষরিত ফাইল ইত্যাদি পুলিশ সেই বাড়ির আপিস থেকে উদ্ধার করেছে। এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি ওই সংস্থার একজন কর্ণধার জেনে বহু সরল বিশ্বাসী লোকের সঞ্চয় পঁচিশ তিরিশ লক্ষ টাকা ওই ভুয়ো সংস্থার নামে জমা পড়েছিল। সময় বুঝে সেই টাকা তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। পুলিশ এখনও সেই টাকার কোনো হদিশ পায় নি।

কাগজ হাত থেকে পড়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছি আমি। কিন্তু একটু স্থির হবার আগেই পুলিশ আবার আমাদের বাড়ি হানা দিয়েছে। সমস্ত বাড়ি ওলট-পালট করে সার্চ করেছে। এমন কি মংগেশদের আউট-হাউসও বাদ পড়ে নি। আমি আর মা আর মংগেশ আর লক্ষ্মী মাসি নির্বাক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখেছি। সকালের কাগজ পড়ার পরে আবার এসে হানা দিয়েছে তারা, কেন তাও স্পষ্ট, এবারের সার্চের নমুনাই আলাদা। তারা চুরির টাকা খুঁজছে।

তারা চলে যেতে আমি উকিলের বাড়ি ছুটলাম। সেই ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর। বলল, খুব শক্ত ব্যাপার। আপনার বাবাকে তারা কোর্টের কাছের বড় থানায় চালান দিয়েছে। সঙ্গে উকিল থাকায় সেখানে গিয়ে বাবার সঙ্গে সহজেই দেখা করা গেল, কিন্তু তার দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। এই দুদিনে আধখানা হয়ে গেছে বাবা। কোন্ বিপাকে পড়েছে এই দুদিনে মোটামুটি বুঝেছে। আমার সঙ্গের

উকিল ভদ্রলোক কিছু কথা জিজ্ঞাসা করল তাকে, আর কিছু পরামর্শও দিল। সেখানে ঘণ্টা তিনেক থেকে মোটা জামিনে খালাস করে আনার চেষ্টা করা হল তাকে। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টের গুরুত্ব বুঝে কোর্ট জামিনের আবেদন নাকচ করে দিল।

আবার পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা বাবার সঙ্গে। বিড়বিড় করে বলল, আমার দোষটা কি, ওই অর্গানাইজারদের চাহিদা মতো শেখর নায়েক কাগজ-পত্র যেমন যেমন সামনে এনে ধরেছে আমি সই করে দিয়েছি। ওদের কাউকে না ধরে এরা আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে কেন!

আমি বললাম, বাবা, তুমি কিচ্ছু ভেব না, সবই আস্তে আস্তে ফাঁস হয়ে যাবে, তুমি যে কিছু কর নি তাও প্রমাণ হয়ে যাবে—কেবল ক'টা দিনের দুর্ভোগ এই যা।

বললাম বটে। কিন্তু দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমার ভিতরটা হিম. হয়ে আসছে। এই সময় আমার সব থেকে বেশি মনে পড়েছে রমেশ সামতানিকে।...বাবার হঠাৎ অমন সৌভাগ্যের কথা শুনে তারই প্রথম খট্‌কা লেগেছিল। তার সন্দিগ্ধ মন দেখে আমরা বরং মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু সবে সে বাইরে গেছে, তার ফিরতে এখনও অনেক দেরি। এই বিপদে সাহায্য একমাত্র সে-ই কবতে পারে। তাছাড়া এ সময়ে অনেক টাকার দরকার। তাকে এখন কোথায পাব? সে যেখানে আছে এখানকার কাগজ সেখানে যায় কিনা তাও জানি না। কেবল আশা, যেখানেই থাক, সে, যদি তার কানে এই অঘটনের খবর পৌঁছয় তাহলে নিশ্চয় ছুটে আসবে।

কিন্তু সবই দুরাশা।

...কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য, বাবাকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে বাবা বিচারকের দিকে আর কোর্টের লোকজনের দিকে চেয়ে থাকে। টাকা যাদের গেছে তারা আসে, তাছাড়া দ্রষ্টা হিসেবেও আসে বহু লোক। এ-রকম একটা রোমাঞ্চকর কেস এই তল্লাটে আর হয় নি বোধহয়। লোনাভালার বসন্তরাও বীরকর আসামী, সেও কম কথা নয়।

আমাদের দিকের উকিলটি বয়স্ক আর অভিজ্ঞ মানুষ হলেও বিপক্ষের বাঘা তরুণ ব্যারিস্টারটির কাছে যেন কিছুই নয়। তার নাম শুনেছি বিনায়ক প্যাটেল। কেস চালানোর জন্যে তাকে নাকি বম্বে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তীক্ষ্ণ জেরায় আর বাক্যবাণে কেসটাকে ক্রমশ সে কোণঠাসা করে আনছে। লোকে বলাবলি করছে বাপ অমন দুঁদে ব্যারিস্টার, ছেলে তার ওপর দিয়ে যায়।

অনেক টাকার কড়ারে মংগেশ একটা গাড়ি যোগাড় করেছে। সেই গাড়িতে রোজ লোনাভালা থেকে আমরা কোর্টে যাতায়াত করছি। মা-ও এক একদিন সঙ্গে এসেছে। অসুখের দোহাই দিয়ে তাকে আটকানো যায় নি। কিন্তু ফিরে এসে একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বাবার সেই মুখ দেখা তার পক্ষে আরও অসহ্য। দেখতে দেখতে মা আবার বিছানা নিল। রাতে একফোঁটা ঘুম নেই চোখে। দিন কয়েকের মধ্যেই মা উত্থানশক্তি-রহিত প্রায়।

আমি আর মংগেশ কোর্টে আসি। বাবার দিকে তাকাতে পারি না আমিও।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে বাবা উকিলদের লড়াই দেখে, সাক্ষীদের জেরা শোনে। কিন্তু কিছুই তার বোধগম্য হচ্ছে বলে মনে হয় না।

হ্যাঁ, বিপক্ষের ওই ব্যারিস্টারটিকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। কথা বলার সময় বা জেরা করার সময় তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়, পুরু দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যেন জ্বলন্ত আগুন ঠিকরোতে থাকে। হাতের লম্বা লম্বা আঙুল কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বাবার দিকে নেড়ে নেড়ে দেখায় আর তার যুক্তিতে ঠাসা ধিক্কার সোচ্চার হয়ে ওঠে। যত ঘন ঘন আঙুল নড়ে আমার মনে হয় বাবার মাথা লক্ষ্য করে ঘাতকের হাতের খড়্গ ততই উঠছে আর নামছে।

এখানে বিপক্ষের সাক্ষী হিসেবে শেখর নায়েককে দেখা গেল। তার আগে বাবার ক্লার্ক দুটোকে জেরায় জেরায় নাজেহাল করেছে বিনায়ক প্যাটেল। শেখর নায়েক এসে দাঁড়াতে আমি ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। শুনছি, জেরার জবাবে সে যা বলেছে তাও যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। ইন্টারভিউ করে বাবাই তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, বাবার আর অর্গানাইজারদের নির্দেশ মতো সে কাজ করেছে। বাবার স্বাক্ষরিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাল সে। আর শেষের ক'দিন কাজে না আসার কৈফিয়ত স্বরূপ ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাল।

আমাদের পক্ষের উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবাকে লেখা এস আর মোদীর টাইপ করা চিঠিখানা তার পারসোনাল ফাইলে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। তার জবাবে সে জানালো সেই চিঠি মিস্টার বীরকর একদিন মংগেশের মারফত চেয়ে ওপরে নিয়ে গেছল, তারপর মিস্টার বীরকর সে চিঠি নিয়ে কি করেছেন তার জানা নেই।

মংগেশের ডাক পড়তে সে জানালো, সেইদিনই সে চিঠি সে আবার সেক্রেটারির টেবিলে এনে দিয়ে গেছে। আর এই থেকেও বিনায়ক প্যাটেল আঙুল নেড়ে নেড়ে বাবাকে দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইল ওই চিঠি সরানোও একটা হীন চক্রান্ত। আসলে এস আর মোদী নাম নিয়ে যে লোকই এর সঙ্গে জড়িত থাকুক তার সঙ্গে আসামীর যোগসাজস আছে। আর এমনও হতে পারে বসন্তরাও বীরকর নিজেই এস আর মোদীর নাম ব্যবহার করেছিল বলে সময় মতো তার নিয়োগের চিঠি সরিয়ে ফেলেছে, অন্যথায় হাতের লেখা যাচাইয়ের ভয়েই সম্ভব সেই আষাঢ়ে চিঠি গায়েব করা হয়েছে।

সেই সন্ধ্যাতেই শেখর নায়েক বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তাকে দেখামাত্র কেন জানি না পিত্তি জ্বলে উঠেছে আমার। তবু প্রাণের দায়ে তাকে ড্রয়িং রুমে এনে বসিয়েছি। সে যে বিবাহিত এবং দুই ছেলেমেয়ের বাপ কোর্টের জেরায় আজই সেটা প্রথম জেনেছি। অথচ এতদিন সে আমার কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলেই চালিয়ে এসেছে।

প্রথম দু-চার কথায় সে বাবার এই দুর্বিপাকের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করল। কিন্তু তার মুখে দুঃখের ছিটেফোঁটাও দেখলাম না আমি। কেবলই মনে হচ্ছিল একজন শঠ আর প্রবঞ্চক আমার সামনে বসে আছে। তারপর সে জানালো, বিপক্ষকে বেগ দেবার মতো কিছু নজির তার দখলে আছে, আর তার ধারণা এস আর মোদীর সেই স্বাক্ষরিত চিঠি ওই অর্গানাইজারদের কেউই সরিয়েছে। তাদের সকলের সম্পর্কেই মাসখানেক ধরে নানারকম সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল তার...নজিরসহ সমস্ত

বৃত্তান্ত সে আদালতের সামনে তুলে ধরতে পারে।

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলাম, তাহলে বলছ না কেন? তুলে ধরছ না কেন?

সে সোজা মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিল, ভয়ে। এরা সাংঘাতিক লোক বোঝাই যাচ্ছে, এদের সম্পর্কে কিছু কথা আমার কানেও এসেছে—তোমার দলে এলে কোন্দিন হয়তো দেখব বুক ফুটো হয়ে আমার লাশ কোথাও পড়ে আছে।...কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে সমস্ত বিপদের ভয়ই আমি তুচ্ছ করতে পারি...কিন্তু এত বড় রিস্ক যে নেব, আমার পুরস্কার কি?

আমি স্থির চোখে লক্ষ্য করছি তাকে।—কি পুরস্কার চাও তুমি?

সেই বিনম্র লাজুক মানুষ নয় আর শেখর নায়েক। বলল, পুরস্কার তুমি, তোমাকে চাই...সেই প্রথম দেখার দিন থেকেই চেয়ে এসেছি।

শুনে আপাদমস্তক জ্বলে গেছল।—তুমি না বিবাহিত আর ছেলেমেয়ের বাপ?

তোমাকে পেলে সেই বিয়ে নাকচ করে দিতে আমার সময় লাগবে না।

দ্রুত ভেবে নিলাম। রাগ দেখানোর সময় নয় এটা। বাবার মুখ চেয়ে শঠকে শঠতায় বশীভূত করার সংকল্প আমার।—সত্যি এত ভালোবাস তুমি আমাকে?

আমার একটা হাত চেপে ধরে ও বলল, সত্যি সত্যি সত্যি—বুক চিরে দেখাতে পারলে তাও দেখাতাম।

ভাবলাম একটু। তারপর বললাম, বাবার জন্যে আমি সব পারি। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়িয়ে আনতে পারলে আমার আপত্তি নেই। আমার সঙ্গে এখুনি আমার উকিলের কাছে চল, তাকে সব জানিয়ে কালই কোর্টে যা বলার বলো।

মুখ মচকে ও বলল, উকিল-ফুকিলের কাছে এখন যাচ্ছি না, স্পষ্ট করে আগে তোমার মন বোঝা দরকার—তারপর যদি তুমি আমাকে কলা দেখাও?

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলে তুমি বিশ্বাস করতে পারো? ইচ্ছে করলেও ডিভোর্সের আগে তুমি বিয়ে করতে পারছ না।

তা পারছি না, কিন্তু তুমি বিয়েই যদি কর আমাকে, তোমার মন বুঝতে দিতে আপত্তি কি?

কি করে?

রাতটা তোমার সঙ্গে গিয়ে কোনো ভালো হোটেলে কাটিয়ে আসতে পারি।

ইচ্ছে হল ঠাস ঠাস করে গালে দুটো চড় বসিয়ে দিই। আগে হলে তাই দিতাম।

চিৎকার করে মংগেশকে ডেকে লোকটাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বললাম।

তার দরকার হল না, বেগতিক দেখে সে নিজেই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

পরদিনই উকিলকে জানালাম, ওই শেখর নায়েককে আজও ভালো করে জেরা করুন, অনেক কিছু জানে স্বীকার করে একটা কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে কাল সন্ধ্যায় সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

কিন্তু সেই জেরারও সুফল কিছু হল না। সেই ভ্যাবাচাকা খাওয়া বিনম্র মুখ। গত সন্ধ্যায় সে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গও অস্বীকার করল না। বলল, এত বড় একটা অঘটনের দরুন সে মিস বীরকরকে সমবেদনা জানাতে গেছল।

কেন সমবেদনা জানাতে গেছল, আপনি মিস সুজাতার বাবাকে নির্দোষ ভাবেন?

হতচকিত মুখ করে শেখর নায়েক বলেছে, মিস্টার বীরকরের কথা সে ভাবেই নি, মিস বীরকরের জন্যে তার দুঃখ হয়েছিল তাই গেছল।

দক্ষ কঠিন হাতে যেন একটা জাল টেনে তুলছে বিনায়ক প্যাটেল। এক সুতোর সঙ্গে আর এক সুতো জড়িয়ে কি-যে সব মারাত্মক প্রমাণ টেনে টেনে বার করছে সে তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। শুধু এটুকু বুঝছি, চূড়ান্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে। নিজস্ব কোনো স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও শুধু কেসে জেতার জন্যে একটা মানুষ কি করে এমন নিষ্ঠুরভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে ভেবে পাই না।

দিশেহারা হয়ে শেষে একটা ছেলেমানুষের মতোই কাণ্ড করলাম আমি। এই কেস করার জন্যে লোনাভালার যে হোটেলে সে আছে এক সন্ধ্যায় সেখানে ছুটলাম। আসল ব্যাপারটা যদি কোনো রকমে তাকে বোঝাতে পারি। বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা কবছিলাম। একটু বাদে বেয়ারা সেই স্লিপ ফেরত নিয়ে এলো। সাহেব দেখা করবেন না।

স্লিপে সুজাতা বীরকর নাম লেখা ছিল দেখেই উদ্দেশ্য বুঝেছে লোকটা। দেখা করবে নি। কোর্টে এরপর এই লোকটাকে দেখলেই আমার কেমন কাঁপুনি ধরত। একজন ঘাতকের মতো মনে হত তাকে। বিচারের ধারালো অস্ত্র সে যেন আঙুলে করে নাড়াচ্ছে আব পুরু দুই ঠোঁটের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গে শান দিচ্ছে। আমি ভিতরে ভিতরে কেঁপেছি আর মনে মনে তাকে অভিসম্পাত করেছি।

কেস শেষের মাথায় রমেশ সামতানি এসে হাজির হয়েছে। মরণকালে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, বমেশ সামতানি সবল সমর্থ পুরুষ একটা। সব শোনার আর বোঝার পরে আমার বা বাবার জালে পড়ার অবিবেচনার প্রসঙ্গে একটি কথাও না বলে সে বোম্বাইয়ে ছুটে গেছে। সেখান থেকে নামজাদা প্রবীণ ব্যারিস্টার ধরে নিয়ে এসেছে একজন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার আর করার বিশেষ কিছু ছিল না। বিনায়ক প্যাটেল ততদিনে জাল এক রকম গুটিয়েই এনেছে।

...উপসংহারের মাথায় বাবার দিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে আর পুরু ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তার সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা কানের পরদা দুটো যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে একাকার করে দিচ্ছিল। এ ফার্স্ট গ্রেড ক্রাইম...প্রি-প্ল্যাণ্ড প্রি-মেডিটেটেড কোল্ড ব্লাডেড অফেন্স...হীন ঘৃণ্য চক্রান্ত...আভিজাত্যের মুখোশ আঁটা বিশ্বাসঘাতক,...তিন তিনটে মানুষ এই চক্রান্তের বলি হয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর সরল বিশ্বাসে কত জন সর্বস্বান্ত হয়েছে...কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের সঙ্গে এ-রকম অপরাধের তফাত কোথায়? কোথায়? কোথায়?

আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা কাঁপছে থরথর করে, ঘামছে দরদর করে, মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি। আমি বুঝতে পারছি আর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

মাটি সরে গেল। বিচারক বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে ন'বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করল।

এতদিনের এই মর্মান্তিক ব্যাপারে মায়ের ওপর দিয়ে কি-যে ঝড় যাচ্ছে সেটা

দেখারও ফুরসত মেলে নি। আজ বিচারের রায় বেরুবে মা জানে। দোতলার বারান্দার কার্নিশে ঝুঁকে অপেক্ষা করছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত ভগ্ন হৃদয়ে রমেশ সামতানির গাড়ি থেকে আমি রমেশ আর মংগেশ নামলাম।

ওপর দিকে তাকিয়েই দেখি মা দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে ব্যাকুল চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, কি? কি রায় হল?

জবাব না দিয়ে আমরা নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকলাম। সিঁড়িতে পা দিয়েই মায়ের আর্ত চিৎকার শুনলাম, সিঁড়ির দিকে ছুটে আসতে আসতে বলছে, কি হল? অ্যাঁ? তোদের মুখে রা নেই কেন? সর্বনাশ হয়েই গেল?

যে ভাবে ছুটে আসছে আমি চিৎকার করে সামাল দিতে চেষ্টা করলাম, মা।

হ্যাঁ, যা কল্পনা করি নি চোখের পলকে সেই অঘটনই ঘটে গেল। ছুটে আসার তাগিদে সিঁড়ি-টিড়ি ভুল হয়ে গেছে মায়ের। বারান্দার শেষ মাথা থেকে সোজা তিন সিঁড়ি টপকে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল—তারপর উল্টেপাল্টে আরো কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে বাঁকের মুখে তার ক্ষীণ দেহ নিশ্চল হল।

না, সে-রাতে আমাদের আর দোতলায় ওঠা হয় নি। রমেশ সামতানি আর মংগেশ মায়ের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নিয়ে আবার গাড়ির দিকে চলল। নিস্পন্দের মতো আমিও অনুসরণ করলাম তাদের। মায়ের দেহ গাড়িতে উঠল। আমাদের তিনজনেরও। গাড়ি হাসপাতালের পথে ছুটল আবার। মায়ের রক্তমাখা বিবর্ণ পাণ্ডুর অচেতন মুখখানা দেখছি আমি। এক ফোঁটা জল নেই আমার চোখে। পাথর হয়ে গেছি।

ভোর রাতে মায়ের সমস্ত দুঃখ বেদনার অবসান। মা চলে গেল।

পরদিন শ্মশান যাত্রার আগে রমেশ সামতানি কি-ভাবে তদ্বির করে পুলিশ হেপাজত থেকে বাবাকে বার করে নিয়ে এলো জানি না। মায়ের মুখখানা বাবা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে পারলে হয়তো একটু ঠাণ্ডা হওয়া যেত। কিন্তু বাবার ওই মুখ দেখে তাও পারা গেল না।

পাঁচ ঘন্টার মেয়াদে বাবাকে আসতে দেওয়া হয়েছিল। মেয়াদ ফুরোতে বাবাকে আবার নিয়ে যাওয়া হল।

বিচারে বাবার শুধু ন'বছরের জেলই হয় নি, এই বাড়ি আর বাড়ির যাবতীয় সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। এ বাড়ি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দিতে হবে। রমেশ সামতানি সান্ত্বনা দিয়েছে, আমি তো আছি, ভয় কি...।

কতটুকু সান্ত্বনা পেয়েছি আমি জানি না।

মায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প করেছি। রমেশ সামতানি আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই-এ নিয়ে এসে সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর এই ফ্ল্যাটে তুলেছে। একজন ভদ্র আয়াও সঙ্গী হিসেবে জুটিয়ে দিয়েছে। একমাত্র ছুটির দিনে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে হয়। সেদিন সে তার নিজের বাড়িতে যায়। আর একটা সান্ত্বনার খবর, বাবাকে এই বোম্বাইয়ের কোনো একটা জেলেই নিয়ে আসা হয়েছে। রমেশ সামতানি আশ্বাস দিয়েছে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু মুখে তাকে কিছু বলতে পারি নি।

ঠিক উনিশ দিনের দিন, রমেশ সামতানির টেলিফোন—বাবা অমুক হাসপাতালে ভয়ানক অসুস্থ। এক্ষুণি সেখানে চলে আসতে হবে। সেও যাচ্ছে।

এই অসুস্থতার মানেও কি আমি বুঝতে পেরেছিলাম? হ্যাঁ, মনে যা ডাক দিয়েছিল, হাসপাতালে গিয়ে সেই দৃশ্যই আমি দেখেছি। বাবার আপাতমস্তক চাদরে ঢাকা। রমেশ সামতানি সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। আমি ভেঙে পড়তে পারি ভেবে সে তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরল। আমি ভেঙে পড়ি নি। আমার ইচ্ছে বুঝে একজন নার্স বাবার মুখ থেকে চাদর সরাল। রমেশ সামতানি জানালো, হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে বাবা মারা গেছেন। হাসপাতালে আসার আগেই সব শেষ।

বাবার শান্ত মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি। বাবার এত বড় অপমান আর জ্বালা যন্ত্রণার সব শেষ। দু'চোখ ভরে দেখার মতো এত সুন্দর মুখ আর যেন দেখি নি।

বাবার কাজও ঠাণ্ডা মুখেই শেষ করলাম আমি। আমার সেই মূর্তি দেখে রমেশ সামতানি ঘাবড়ে গিয়েছিল। উল্টে আমি তাকে বলেছি, বাবা চিরশান্তির জগতে চলে গেছে, ভালোই হয়েছে।

এত কাজের মধ্যেও রমেশ প্রায় সন্ধ্যায় সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর এই ফ্ল্যাটে একবার করে আসে। ছুটির দিনে আয়া থাকে না বলে আরো আগে আসে। ঘণ্টা দুই আড়াই কাটিয়ে যায়। আমার এই ঠাণ্ডা ভাব দেখে সে মনে মনে ঘাবড়েছে বুঝতে পারি। সে আমাকে কাজের মধ্যে টেনে নামানোর জন্যে ব্যস্ত। সে বলে, কোন কাজ তোমার ভালো লাগবে বল, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি বলি, রোসো, ভাবি একটু।

কিন্তু আসলে তখনো আমি শুধু দুটি লোকের কথাই ভাবি। একজন ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল। ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্নে দেখি। হাত নেড়ে আর পুরু ঠোঁট নেড়ে বাবার মাথার ওপর অভিযোগের খড়্গ তুলে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেলেও সে দৃশ্য সরে না মন থেকে। সে-ই পয়লা নম্বরের শত্রু আমার। দ্বিতীয় জন শেখর নায়েক। যে সেই কুৎসিত প্রস্তাব দিয়েছিল।

আমার মুখ থেকে এই দুজনের কথা শুনে রমেশ সামতানি প্রথম জন অর্থাৎ বিনায়ক প্যাটেলকে বাতিল করতে চেয়েছে। বলেছে, তার কি দোষ, সে পেশাদার ব্যারিস্টার—নিজের কাজ করেছে।

আমি বলেছি, সে আমার কত ক্ষতি করেছে তুমি জানো না। কোনো স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও সে এমন কাজ করেছে যার জন্যে আমি আমার বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছি। আমি তাকে জীবনে ক্ষমা করব না, জীবনে ভুলব না।

তর্ক না করলেও রমেশ সামতানি আমার সঙ্গে একমত হতে পারে নি আমি বুঝি। সে যুক্তির পথে চিন্তা করে। আমার ক্ষোভের সবটাই এক অবিশ্বাস্য অনুভূতিপ্রবণ ব্যাপার।

শেখর নায়েকের প্রসঙ্গে অবশ্য আমার সঙ্গে সে একমত। তার সেই কুৎসিত

প্রস্তাবের কথাও তাকে বলেছি। শুনে সে রাগে ফুঁসেছে। বলেছে, সবকিছুর মূলে ওই শয়তান আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি—আর এও বলেছি আমি তাকে চরম শিক্ষা দেব। দেব দেব দেব।

আরো মাসখানেক বাদে সে বিমর্ষ মুখে এসে খবর দিয়েছে, বাড়ি ঘর ছেড়ে শেখর নায়েক কোথায় উধাও হয়ে গেছে খবর পাচ্ছি না। কিন্তু কোথায় কতদিন পালিয়ে থাকবে সে, আমিও দেখে নেব।

আমি মুখে কিছু বলতে পারি নি। দু'চোখ ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে তার দিকে চেয়ে থেকেছি। তারপর তাকে বলেছি, এবারে তুমি একটা কাজ কর্মের ব্যবস্থা কিছু করতে পারো কিনা দেখ। এ-ভাবে বসে থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সে-ও মনে মনে এইটেই চাইছিল। উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন ধরনের কাজ তোমার ভালো লাগবে বলো?

সেটা ভাবতে ভাবতে আবার কিছুদিন কেটে গেল। আসলে তখনও কাজের জন্যে কোনোরকম উৎসাহ নেই আমার। শোক ভোলার জন্যে কাজ। অপমান ভোলার জন্যে কাজ। লোনাভালার দুঃস্বপ্ন মন থেকে মুছে দেবার জন্যে কাজ। কোন কাজের কথা বলব আমি তাকে? কলেজে পড়াতে হলে আবার বইপত্র নিয়ে বসতে হবে। অত ধৈর্য নেই আমার। কোনো আপিসে ঢুকলেও কাজের সে-রকম একাগ্রতা আমার আসবে না। ভিতরটা এখনও বিক্ষিপ্ত।

এ-সব কাজে আর একটা সব থেকে বড় অন্তরায় আমার নাম। কে আমি? ...সুজাতা বীরকর। কাগজে কাগজে বীরকর নামটা এমনি প্রচার লাভ করেছে যেন লোনাভালার সঙ্গে এই উপাধিটি অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। কলেজে কাজ করি বা কোনো আপিসে ঢুকি—কলেজ য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে আমি সুজাতা বীরকর। আমার সার্ভিস রেকর্ডের পরিচয়ে প্রথমে লিখতে হবে আমি বসন্তরাও বীরকরের মেয়ে সুজাতা বীরকর। পৈতৃক ঠিকানা? লোনাভালা। আমি লোনাভালার বসন্ত বীরকরের মেয়ে সুজাতা বীরকর এই পরিচয় কি এখন আমার কাছে অপমানের সামিল? আদৌ না। আসলে এই পরিচয় শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যে-চোখে দেখবে আমাকে সেটাই আমার অপমান, তার থেকেও ঢের বেশি আমার বাবার অপমান। এই অপমান অসম্মান আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

তাহলে কে আমি? আমি সুজাতা পাণ্ডুরং। আমার বাবা পাণ্ডুরং কি না এ-খবর কে নিতে যাচ্ছে? আর সুজাতা নামে হাজারও মেয়ে আছে দেশে। কিন্তু এ নামে আমি ডিগ্রীর সার্টিফিকেট পাব কোথায়? পরিচয়-পত্র পাব কোথায়? তাই এমন কাজ চাই আমার যেখানে ও-সবের দরকার নেই।

রমেশ সামতানির ব্যবসায়ে ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু মন থেকে সায় মিলছে না। এ-যেন আর কোনো রাস্তা না পেয়ে তার বউ হয়ে তার ঘরে গিয়ে ওঠার মতো। যে কাজের মধ্য দিয়ে আমি ক্ষত ভুলতে চাই অপমান ভুলতে চাই, রমেশ সামতানি আমাকে টেনে নিলে সেটা হবে না। আর একজনের দরদের প্রলেপে ক্ষত আর অপমান ঢাকার সামিল হবে সেটা।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মিস্টার রমেশ, একদিন তুমি আমাকে ফিল্ম

লাইনে ঢোকার কথা বলেছিলে, সেটা ঠাট্টা না সত্যি?

আগের মতো মিস্টার রমেশ ডাক শুনে সে খুশি। ভাবছে, হয়তো কত আর মানুষ শোক নিয়ে বসে থাকতে পারে। অনেকটা সেই আগের মতোই আমার আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। তারপর বলল, রমেশ সামতানি বাজে ঠাট্টা করে না। লোনাভালায় সেই আলোচনার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে এ লাইনটা সব থেকে ভালো সুট করবে তোমার।...কিন্তু কথা হচ্ছে, এই মানসিক অবস্থায় সুট করবে কি?

জবাব দিলাম, সব থেকে ভালো সুট করবে। কারণ নিজের পরিচয়ে এখন মেকি রাস্তা ধরতে হবে আমাকে, এরপর আমি কোথাও সুজাতা বীরকর নই, সুজাতা পাণ্ডুরং।

রমেশ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসিতে চিকচিক করতে লাগল চোখ দুটো। সে বুদ্ধিমান মানুষ, এর বেশি কিছু বলার দরকার হল না।

রমেশ সামতানি পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে নিজের প্যাড বার করে তক্ষুণি চিঠি লিখতে বসল একটা। তিন মিনিটে লেখা শেষ। খামের মুখ বন্ধ করে ঠিকানা লিখল। তারপর বলল, অমুক স্টুডিওকে গিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কালই দেখা করে এই চিঠি তার হাতে দাও।

বললা।ম, তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না আমাকে?

না, তাতে একটু অসুবিধে আছে, আর তার দরকারও হবে না, তুমি কাল গিয়ে দেখাটা করেই এসো না।

খামের ওপর এক মস্ত প্রযোজকের নাম লেখা দেখলাম। জুনাগড়ে বসে এর প্রযোজনার কত ছবি দেখেছি ঠিক নেই। তাই এ-চিঠির ওজন সম্পর্কে মনে একটা সংশয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু জুনাগড় বা লোনাভালায় থাকতে এতদিনের দেখা এই রমেশ সামতানিকেও আমি বা বাবা চিনি নি। তার প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝতে হলে বম্বেতে আসতে হবে, আর তারপরেও তার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, নিজের প্রচারের চটক সম্পর্কে সে এমনি নির্লিপ্ত আর নির্বিকার।

চিঠি নিয়ে তার নির্দেশ মতো আন্ধেরির স্টুডিওতে এসেছি। এ-রকম বিরাট কিছুর মধ্যে কোনোদিন পা ফেলতে পারব ভাবি নি। প্রযোজকটি কোথায় বসে তার হদিশ পেতেই খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল।

ঘরের সামনে দুজন বেয়ারা বসে। তাদের একজনের হাতে স্লিপ লিখে দিলাম। রমেশ সামতানির কাছ থেকে সুজাতা পাণ্ডুরং।

দু'মিনিটের মধ্যে ঘরে ডাক পড়ল। পরদা ঠেলে ঢুকলাম। আর ঘরের মধ্যে যে পাঁচ ছ'জন লোক ছিল তারা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। বিশাল টেবিলের ও-মাথা থেকে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনায় প্রযোজক বলল, বসুন বসুন—

বসে হাতের চিঠি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

এ-চিঠির ফলাফল কি হবে না হবে সে-সম্বন্ধে তখনো আমি স্থির নিশ্চয় নই। বড় বড় হরফের লেখা ওই চিঠি পড়তে তার এক মিনিটও লাগল না। মনে হল দ্বিতীয় দফা পড়ছে। তারপর আমার দিকে তাকালো। এবারের চাউনিটা অন্য

রকম। অস্বস্তি বোধ করছি একটু। মনে হল সামনের পণ্য সামগ্রীটি কেমন বিকোবে পলকে তারই একবার যাচাই করে নেবার চোখ।

আন্তরিকতার সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

কিছু দরকার নেই, ধন্যবাদ।

অ্যাট লিস্ট এ কোল্ড ড্রিঙ্ক? অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই প্যাঁক করে বেল টিপল। বেয়ারা আসতেই হুকুম হল, কোল্ড ড্রিংক।

সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেল্ টিপল। এবারে অন্য বেয়ারা। পর পর দুজন ভদ্রলোকের খবর জিজ্ঞাসা করল প্রযোজক। তাদের একজন ফ্লোরে, আর একজন অনুপস্থিত। প্রযোজকের মুখে বিরক্তির আভাস, রমেশ সামতানি চিঠিটা হাতে করেই উঠে দাঁড়াল।—এক্সকিউজ মি, দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।

দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে হাতের চিঠি টেবিলে রেখে পেপারওয়েট চাপা দিল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। প্রযোজকের এই ঈষৎ ব্যস্ততা চোখে পড়েছে আমার। সামনে তাকিয়ে দেখি চিঠিটা আমার দিকে মুখ করেই ফেরানো। এভাবে চিঠি পড়ার মতো হালকা মেয়ে আমি নই। তাছাড়া দরকার বুঝলে রমেশই আমাকে পড়ে শোনাত কিংবা খামের মুখ বন্ধ করত না। তবু এই একটা মুহূর্ত যখন কৌতূহল নিষেধ মানে না। চিঠির ওই বড় বড় হরফগুলো যেন চোখ দুটোকে আপনা থেকেই টানছে। বাচ্চা ছেলের মতোই বড় বড় হাতের লেখা রমেশ সামতানির।

দেখব না দেখব না করেও সেই দিকে দু'চোখ আটকে গেল—যে মেয়েটি এ চিঠি নিয়ে যাচ্ছে তার নাম সুজাতা পাণ্ডুরং, এম-এ পাস। চেহারা-পত্র নিজেই দেখবে। কোন্ রোলে সুট করবে দেখে নিও। শুধু একটা কথা হেঁজিপেজি কিছুর মধ্যে দিও না, এর স্টার হবার গুণাবলী আছে আর সেইজন্যেই তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—আর, এস্।

বেয়ারা কোল্ড ড্রিংক সামনে ধরেছে। গেলাস তুলে নিলাম। গলাটা সত্যিই শুকিয়ে এসেছিল।

একটু বাদে যে ভদ্রলোককে সঙ্গে করে প্রযোজক ফিরে এলো সে এই বর্তমান ছবির পরিচালক হরিহর শর্মা।

ঘরে ঢুকেই প্রযোজক প্রথমে রমেশ সামতানির চিঠিখানা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরলো। তারপর পরিচয়ের পালা। কিন্তু এই পর্বে রমেশ সামতানির নামটা অনুক্ত থাকল। পরিচালক হিসাবে হরিহর শর্মার নামও আমার শোনা আছে আর তার কিছু ছবিও দেখা আছে।

সব-কিছুই যেন ভারী সহজে হয়ে গেল এরপর। দু-চার কথার পর প্রযোজকের ইঙ্গিত মতো পরিচালক হরিহর শর্মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। তারপর নানা রকম ভাবে স্টিল ফটোগ্রাফ নেওয়া হল আমার। গোড়ার দিকে আমি আড়ষ্ট নিজেই বুঝেছিলাম। শেষে যেন চাবুক মেরে সজাগ করলাম নিজেকে, এই যাচাইয়ে ফেল করলে চলবে?

এরপর সহজ হওয়া গেল। কম করে পঁচিশ তিরিশবার ফ্ল্যাশ বাল্ব ঝলসে উঠেছে আমার মুখের ওপর। দাঁড়ানো ছবি বসা ছবি ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দেওয়া

ছবি, খুশি মুখ গোমড়া মুখ রাগত মুখের ছবি, মৃদু হাসি চাপা হাসি আর অঢেল হাসির ছবি।...প্রথম তিন-চারটে ছাড়া আর সবই ভালো উৎরেছে বলে আমার ধারণা।

ছবি তোলার পর ভয়েস টেস্ট। এ ব্যাপারে অত বেশি বেগ পেতে হল না। পরিচালক হরিহর শর্মা আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রযোজকের ঘরে ঢুকল। তার টেবিলের ওপর ততক্ষণে সারি সারি ভেজা আর্ট পেপারের ছবিগুলো ছড়ানো পড়ে আছে। আমাকে দেখেই খুশির অভ্যর্থনা জানালেন।—আসুন মিস পাণ্ডুরং, আই অ্যাম সিওর ইউ উইল ডু ভেরি ওয়েল।

তখনকার মতো শোক-টোক সব ভুলেছি, ভিতরে শুধু এক ধরনের উত্তেজনা। হরিহর শর্মা টেবিলে বিছানো ছবিগুলো নিরীক্ষণ করে দেখে নিল। সে-ও অখুশি নয় বোঝা গেল।—হাউ ইজ ভয়েস? প্রযোজক জানতে চাইল।

পরিচালক ঘাড় কাত করে অনুমোদন জানালো। প্রযোজকের মতো এই পরিচালকটির গোড়াতেই অত উৎসাহ লক্ষ্য না করার কারণ পরে অনুমান করা গেছে। একজন নবাগতাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার ছবির নায়িকা হিসেবে। তার খুঁতখুঁতুনি থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রযোজকের সিদ্ধান্ত পাকা। সে বলল, মিস্টার শর্মা দুই এক মাসের মধ্যেই তার নতুন ছবি শুরু করছেন। ইউ উইল স্টার্ট অ্যাজ এ গ্রেট স্টার মিস পাণ্ডুরং, সো ইউ মাস্ট জাস্টিফাই ইওর ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স। মিস্টার শর্মার কাছ থেকে আপনার রোল বুঝে নেবেন—হি উইল ট্রেন ইউ আপ। ...আপনার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট কি-রকম হবে না হবে একটু ভেবে নিই, ইউ উইল গেট ইওর কন্ট্রাক্ট সাইণ্ড নেক্সট উইক—ও কে?

দুজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এত বড় এক জগতে এ-রকম সহজে কেউ ঢুকে যেতে পারে এ যেন কল্পনার বাইরে। শুধু ঢোকা নয়, নায়িকার ভূমিকায় প্রথম পদার্পণ। কি মানুষ এত কালের দেখা এই রমেশ সামন্তানি সেটাই যেন এক মস্ত বিস্ময় আমার কাছে।

সন্ধ্যায় এসে সে জিজ্ঞাসা করল, কাজ হল?

হবে যে সে তো তুমি জানতেই। ...সামনের উইকে কনট্রাক্ট সই হবে। আমার মনে হল, ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট কি-রকম হবে না হবে প্রযোজক সেটা তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

রমেশ হাসতে লাগল। বলল, আলোচনা করুক আর যা-ই করুক প্রথম ছবিতে তুমি স্টার ভ্যালু পাচ্ছ না—সেটা দৃষ্টিকটু হবে।

আমি বললাম, না, দৃষ্টিকটু হয় এমন কোনো কাজ তুমি কোরো না।

কনট্রাক্ট সই হয়েছে। পারিশ্রমিকের এই অঙ্ক দেখেও আমার চক্ষু স্থির হয়েছে। ...একটা ছবির জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকা। তার মধ্যে পঁচিশ হাজার এমনি পাব, বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন যেমন পাব তেমনি রিসিট দিতে হবে। ছাড়টুকু যে ইনকাম ট্যাক্স এড়ানোর চালু রীতি এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। স্টার ভ্যালু কাকে বলে সেটা কিছুদিনের মধ্যেই জেনেছি।...একটা ছবির জন্যে পাঁচ

—সাত—দশ—লক্ষ টাকা যার যেমন বাজারে নাম আর চাহিদা। কিন্তু আমার কাছে এই পঁচাত্তর হাজার টাকাই বিপুল ঐশ্বর্যের মতো। এ ছবি বাজারে চালু হতে যদি দুটো বছরও সময় লাগে, এ-টাকায় সেই দুটো বছর আমার হেসে খেলে চলে যাবে।

সই করার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছে আমাকে, তার মধ্যে চার হাজার টাকা নগদ, বাকি ছ'হাজারের চেক। এক সঙ্গে ওই টাকা নিতেই হাত কেঁপেছে আমার।

এই প্রথম ছবির গল্পও আমার মনের মতো হয়েছে। আগে হলে এই এম-এ পাশ মেয়ে সেটা অবাস্তব আর আজগুবি বলে হেসে উড়িয়ে দিত।...নায়িকার বিয়ে হয়েছে নিষ্ঠুর প্রকৃতির এক মানুষের সঙ্গে, কিন্তু গোড়া থেকেই আর এক সাধারণ মানুষের প্রণয়াসক্ত সে। শেষে স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সে। কিন্তু আসলে সে নির্দোষ।...নির্দোষ কেউ কি চরম শাস্তির যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেয় না? দেয় কিনা আমার থেকে ভালো আর কে জানে? ছবির পরিণামে অবশ্য নায়িকা নায়ক-প্রেমিকের এক আশ্চর্য তৎপরতায় দায়মুক্ত হতে পেরেছে। মনে মনে সেটুকুতেই আমার যত আপত্তি। নির্দোষ নিষ্পাপ একটা মেয়ে বিচারের নামে ফাঁসীকাঠে গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল?

কিন্তু ছবির রাজ্যে তা হয় না।

আমি নবাগত অভিনেত্রী। পরিচালক হরিহর শর্মা প্রযোজককে বলে বুদ্ধিমানের মতো দু-দুজন নামজাদা অভিনেতাকে আমার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের আমার নিষ্ঠুর নির্মম স্বামীর ভূমিকা, আর একজনের প্রণয়ীর। কিছুদিন শুটিং-এর পর ওই দুই প্রতিষ্ঠিত নায়কই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছে। আর ছ'মাস না যেতে পরিচালকের সংশয়ে বিপরীত জোয়ার এসেছে। প্রযোজকের কাছে ভদ্রলোক প্রভূত প্রশংসা করেছে আমার। কালে দিনে আমার জুড়ি থাকবে না এমন কথাও বলেছে। সেই সব প্রশংসা প্রযোজকের মারফত রমেশ সামতানির কানেও এসেছে। সে আনন্দে উৎফুল্ল।—ঠিক লাইনে ঢুকে গেছ, এরপর আর তোমাকে পায় কে?

আমি নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করি, কেউ পাবে না বলছ?

হাসি মুখে সে তাড়াতাড়ি সামাল দেয়।—না, একটি মাত্র লোকের পাবার আশা আছে। কিন্তু এক্ষুণি পেতে চেয়ে সে তোমার বর্তমানের একাগ্র নিষ্ঠায় ফাটল ধরাবে এমন বোকা তাকে ভেব না। সে সবুর করতে জানে।

জানে বলেই মনে মনে আরো বেশি কৃতজ্ঞ আমি। সত্যিই মনে-প্রাণে তখন এই ছবির সাফল্য ছাড়া আর আমি কিছুই চাই না।

ন'মাসে ছবির আধাআধি অবস্থায় স্টুডিও ফ্লোরে এই অকল্পিত যোগাযোগ। আমার সমস্ত সত্তার গভীরে যে শত্রুর মুখ ক্ষতর মতো খোদাই হয়ে আছে, সেই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলকে ফ্লোরে ধরে আনা হয়েছে এক্সপার্ট হিসেবে। কি ভাবে কাজ করলে স্বাভাবিক হয় তার কাছে সেই মতামতের প্রত্যাশা।

টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিতে ওধারে রমেশ সামতানির গলা। তার কথা শোনার আগেই চাপা উত্তেজনায় বলে উঠলাম, কাল বিকেলে কোথায় ছিলে, ক'জায়গায় কতবার টেলিফোন করলাম, কোথাও তোমার পাত্তা নেই।

খুব দরকার ছিল?

খুব। কাল স্টুডিওতে হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা, যার কথা তোমাকে না বললেই নয়, আজ সন্ধ্যায় আসছ?

আসব'খন...কিন্তু বল তো, কোনো নতুন প্রোডিউসার নাকি?

না, না, তার থেকে ঢের বড় দরের লোক আমার কাছে। টেলিফোনে বলব না, সন্ধ্যায় এস তখন বলব।

ওদিক থেকে রমেশ ঠাট্টা করল, কি রকম বড় দরের লোক আবার, আমাকে পথে বসাবে নাকি!

না, শুনলে উল্টে তুমি খুশি হবে।

ঠিক আছে। আজ শুটিং আছে?

আছে।

আচ্ছা শোন, পরশু দিন আবার আমাকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে...লম্বা পাড়ি।

কোথায়?

আমেরিকার এ মাথা ও মাথা। সেখানে ব্যবসা ঢেলে সাজাতে হবে। কম করে চার ছ'মাসের ধাক্কা। যদি হঠাৎ দরকার পড়ে তাই পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা তোমার নামে কোনো ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে যেতে চাই।

আমি জোর দিয়ে বললাম, কিচ্ছু করতে হবে না, আমার প্রোডিউসার এর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ টাকা দিয়ে দিয়েছে, তার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে জমা আছে। টাকার ভাবনা নেই, সন্ধ্যায় তোমার আসা চাই। হেসে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

টাকার ভাবনা সত্যিই ভাবি না আর। প্রথমেই নায়িকা হিসাবে এত বড় এক ছবিতে কাজ করছি দেখে আর সিনেমা মাসিক সাপ্তাহিকের প্রচারের দাপটে এরই মধ্যে জনাকতক ছোটখাটো প্রযোজক আমার দরজায় হানা দিয়েছে। তাছাড়া স্টুডিও মহলের নাড়ির খবর এ লাইনের লোকে রেখেই থাকে। পরে পাঁচ সাত গুণ মাশুল দেওয়ার থেকে নাম ফেটে পড়ার আগেই চুক্তিবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ভাবে। এতে প্রথম ছবির পঁচাত্তর হাজার টাকাটা বড় জোর সোয়া লাখ হবে। নাম একবার হয়ে গেলে এ টাকা কিছুই নয়। রমেশকে জিজ্ঞাসা করতে সে সোজা নিষেধ করে দিয়েছে। ওসবে মাথা দিও না, তোমার দর কোথায় উঠবে তুমি নিজেও ধারণা করতে পারো না।

ঠিক এই গোছের ইঙ্গিত আমার প্রতি বেজায়-খুশি বর্তমানের নামজাদা প্রোডিউসারটিও করে রেখেছে। স্টুডিওর মিনিয়েচার শোর পর্দায় সে তো পনেরো বিশ দিন পর পরই এখন আমার কাজ নিজের চোখে দেখে নিচ্ছে। খুব ভালো

লাগছে বলেই এত ঘন ঘন দেখছে সে খবরও আমার কানে এসেছে। সেই ভদ্রলোকও বলেছে, এখন তোমার কাছে অনেকে আসতে পারে, কিন্তু হুট করে কারো সঙ্গে নতুন কোনো কনট্রাক্ট-এ ঢুকো না...তোমার ফিউচার ভালো, এ ছবিটা উতরে গেলে আমিই সব দিক পুষিয়ে দেব।...তাছাড়া মিস্টার রমেশ সামতানি তোমার পিছনে আছেন যখন তখন তোমার ভাবনা কি।

রমেশ সামতানি পিছনে থাকার ফল কি সে তো নিজের চোখেই দেখছি। এ লাইনে তার এতখানি প্রতিপত্তির সঠিক কারণ এখনো আমি জানি না। জিজ্ঞাসা করলে রমেশ হাসে। তবে এটুকু আঁচ করেছি এই শিল্পটিতেও তার অনেক টাকা খাটছে। কত হতে পারে তার পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

যাক। মোট কথা, টাকার দুশ্চিন্তা এখন আর আমার মাথায় নেই।

খানিক বাদে আবার টেলিফোন। রিসিভার তুলতে পরিচালক হরিহর শর্মার গলা।—আজ শরীর কি বলছে ম্যাডাম?

এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই। হঠাৎ যে! আমি কেমন যেন সন্দিগ্ধ একটু।

ব্যারিস্টার প্যাটেল ফোন করেছিল, আজও সে সেটে আসছে, তুমি আসছ তো?

নিশ্চয় নিশ্চয়! আজ আমার কাজ কেমন?

আজকের প্রোগ্রামে তোমার খুব বেশি কাজ ছিল না...কিন্তু প্যাটেলের মতো লোককে তো বেশি দিন পাওয়া যাবে না, বল তো প্রোগ্রাম বাড়িয়ে দিতে পারি।

উৎফুল্ল জবাব দিলাম, দেবেন। কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যাওয়াই ভালো। জবাবের তাৎপর্য কি বুঝল জানি না, হেসেই ফোন নামিয়ে রাখল পরিচালক।

চটপট স্নান সেরে নিয়ে এবারে আমার তৈরি হবার কথা। কিন্তু ফোন নামিয়ে আমি সোজা বিছানায়। না, আজ আর আমার কোনো তাড়া নেই। আজ আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি না। আয়নায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখব চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো হয়েছে আমার।...প্রোগ্রাম বাড়ানোর বদলে যেটুকুও প্রোগ্রাম ছিল, পরিচালককে তা বাতিল করে কাজ এগোতে হবে। আর তার সেই এক্সপার্ট বিনায়ক প্যাটেল অনেকক্ষণ পর্যন্ত উসখুস করবে আর এদিক-ওদিক তাকাবে আর অপেক্ষা করবে। আমার ষষ্ঠ চেতনা প্রখর, আমি জানি অপেক্ষা করবে যত বড় ব্যারিস্টারই সে হোক, কাজের গণ্ডীর বাইরে সে অপ্রাকৃতিক মানুষ কিছু নয় এ-ধারণা আমার কালই হয়েছে। পরিচালকের সাদর আমন্ত্রণে কাল সে এসেছিল, আজও সেই আমন্ত্রণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ আসার পিছনে আর কিছু আকর্ষণ আছে, অপরিচিত জগতের একটা আলো হঠাৎতার চোখ দুটোকে কিছুটা ঝলসে দিয়ে গেছে, আমার ষষ্ঠ অনুভূতি এ-কথাও আমাকে বলল।

সেটের দর্শকের আসনে বসে তাহলে কতক্ষণ উসখুস করবে ওই লোক? কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? নিষ্ফল প্রতীক্ষা যত দীর্ঘ হয় ততো যেন আনন্দ আমার।

শহেলি! আয়াকে ডাকলাম। সে ঘরে এসে দাঁড়াল।

স্টুডিওর গ্যারাজে ফোন করে জানিয়ে দাও আজ আমার জন্যে গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। ট্যাক্সি করে এক জায়গা হয়ে আমি স্টুডিও চলে যাব।

শহেলি নির্দেশ পালন করল।

শোনো। এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমার কাছে স্টুডিও থেকে ফোন আসবে। তুমি ধরবে। যে-ই ফোন করুক, তুমি বলে দেবে, একটু অসুস্থ শরীর নিয়ে খানিক আগে আমি ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেছি, এক জায়গা হয়ে সেখান থেকে স্টুডিও যাবার কথা।

মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু তার খানিক বাদে স্নান খাওয়া সেরে ধীরে সুস্থে আবার আমাকে একটা ম্যাগাজিন হাতে শয্যায় উঠতে দেখে সে অবাক।

বললাম, যে রকম বলে রেখেছি তা-ই করবে।

ছবির মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার ধরে নিয়ে সে প্রস্থান করল।

আমি বাইরে ধীর, ঠাণ্ডা। ভিতরে ছটফট করছি। আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে দেখছি।

প্রায় প্রত্যাশিত সময়েই টেলিফোন বেজে উঠল। শহেলি ধরল। জবাব দেবার ফাঁকে একবার আমাকে দেখে নিল। তারপর যেমন শিখিয়ে রেখেছিলাম তেমনি বলে দিয়ে রিসিভার নামালো।

আমি উঠে বসলাম।—স্টুডিও থেকে?

হ্যাঁ, ডিরেক্টর শর্মা না কি নাম বলল।

ঠিক আছে। শোনো, এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে আবার এইখান থেকেই টেলিফোন আসবে। এবারও তুমি ধরবে। বলে দেবে, অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি খানিক আগে ফিরে এসেছি, ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছি—এখন ডাকা চলবে না। হাঁ করে চেয়ে আছ কি, শুনছ যা বলছি?

ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। শুনেছে।

দেড় ঘণ্টা নয়, এবার টেলিফোন এলো দু'ঘণ্টা বাদে। শহেলি ধরল। এতগুলো মিথ্যে বলতে তার একবারও ঢোক গিলতে হল না। ফোন রেখে আমার দিকে তাকালো। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে।

ইংগিত বুঝে শহেলি চলে গেল।

কিন্তু আমার ভিতরটা অশান্ত। ঘড়ি দেখলাম। বেলা এখন আড়াইটে। আমার ওই ষষ্ঠ অনুভূতি আবারও যেন বলছে কিছু। হ্যাঁ, আমি ওষুধ খেয়ে শুয়েছি তাই চারটের আগে আর আমাকে কেউ বিরক্ত করবে না। মনে হল ঠিক সেই সময় এ পথ ধরে গাড়ি হাঁকিয়ে এই পথ দিয়ে অভিজাত পালী হিলের রাস্তা ধরবে ওই লোক। বাড়ির দরজায় থামার সম্ভাবনা। যদি হিসেবে ভুল না হয়ে থাকে, একটা খবর নেবার বাসনা ছাড়তে পারবে না।

শহেলি।

মাঝের দরজা খোলা। হাঁ শুনে শহেলি দ্রুত এগিয়ে এলো। তার মনিবের মাথা আজ সুস্থ ভাবছে না হয়তো।

সজাগ থেকো। কেউ আসতে পারে। কলিং বেল্ শুনলে নিচে গিয়ে দেখবে কে। অচেনা লোক হলে ওপরে এনে বসানোর দরকার নেই, পরিচয় জেনে নিয়ে আমাকে খবর দেবে।

শহেলি বছর সাত আট বড় হবে আমার থেকে। কথা বেশি বলে না। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝে নিয়ে চলে গেল।

...ঘড়িতে তিনটে...সাড়ে তিনটে...চারটে...চারটে কুড়ি তিরিশ...পঁয়ত্রিশ...ভিতরে ভিতরে এমন উত্তেজনা শিগগীর অনুভব করেছি?...লোনাভালায় ওই একজন দেখা না করেই আমাকে হোটেল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজ ন'মাসের বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু টাটকা ক্ষতটা যেন মাত্র সেই দিনের।

...চারটে পঁয়তাল্লিশ।

নিচে কলিং বেল বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম।

শহেলি দ্রুত নিচে নেমে গেল। একটু বাদেই উঠে এলো।—মিস্টার প্যাটেল নামে এক ভদ্রলোক...

দু'চোখ ঝলসে উঠল আমার।—বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে? থতমত খেয়ে শহেলি বলল, হ্যাঁ।

হুকুম করলাম গিয়ে বল কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে আমি বাড়িতে দেখা করি না। দরকার থাকলে যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে স্টুডিওতে দেখা করেন। যে কথাগুলো বললাম ঠিক তাই বলবে একটুও এদিক ওদিক হয় না যেন। তারপর আর কোনো কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা দরজা বন্ধ করে দেবে। মনে থাকবে?

নীরবে সায় দিয়ে শহেলি আবার নিচে নেমে গেল। আমি কান পেতে আছি। —একটু শব্দ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো।

শহেলি দোতলায় উঠে আসতে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হল। চোখ দিয়েই আমি ভিতরে টেনে আনলাম তাকে।—কি বলেছ?

বলেছি, কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে আপনি বাড়িতে দেখা করেন না, সে-রকম দরকার থাকলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে স্টুডিওতে দেখা করতে পারেন।

তারপর?

একথা শুনে ভদ্রলোক বেশ অবাক হয়ে কিছু একটা বার করার জন্যে পকেটে হাত দিলেন। আমি ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

ঠিক আছে।

শহেলি চলে যেতে আমি ঠিক করলাম মাসকাবারে এবার ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেব।

এতক্ষণ বাদে ভিতরের একটা উত্তেজনা শান্ত হল যেন। যেটুকু অপমান বিনায়ক প্যাটেলকে করতে পেরেছি তার থেকে সহস্র গুণ বেশি রাগ আর ঘৃণা আর বিদ্বেষ আমার। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু করার সুযোগ নেই আপাতত।

এক ঘণ্টারও বাদে আবার টেলিফোন এলো—বিকেল ছ'টা তখন। এবারে ধীরে সুস্থে নিজেই টেলিফোন তুলে নিলাম।—হ্যালো।

আমার নাম বিনায়ক প্যাটেল।

মুহূর্তের মধ্যে একটা উষ্ণ স্রোত মাথার দিকে উঠতে থাকল। ডাইরেক্টরীতে

আমার টেলিফোন নম্বর নেই। আনলিস্টেড নম্বর। পরিচালকের কাছ থেকে নম্বর সংগ্রহ করে থাকবে।

বিনয়...প্যাটেল...ও ব্যারিস্টার মিস্টার প্যাটেল? ঘৃণার ওপর দিয়ে গলায় এবার বিস্ময় মেশানো আগ্রহের সুর ফুটল।

ওদিক থেকে ভারি গলায় সাড়া এলো, হ্যাঁ...।

কি খবর বলুন।

আপনার শরীর কেমন?

টেলিফোনের রিসিভার আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে কবছিল।—এখন একটু ভালো। আজও স্টুডিওতে গেছলেন?

গিয়েছিলাম। যাব যে হরিহরদা সে-কথা আপনাকে বলে রেখেছিলেন শুনলাম।

হঠাৎ শরীবটা খারাপ লাগল, গিয়ে উঠতে পারলাম না। হ্যাড টু মিস ইউ...

ওধার থেকে আবার ঠাণ্ডা গলার স্বব কানে এলো।—অসুস্থ শুনে ঘণ্টাখানেক আগে স্টুডিও ফেরত আপনাকে একবার দেখে যাওযাব ইচ্ছে ছিল। নাম পাঠানো সত্ত্বেও আপনাব আযা এসে জানালো অচেনা কোনো লোকেব সঙ্গে বাড়িতে আপনি দেখা করেন না...তারপর মুখেব ওপর দরজা বন্ধ কবে দিল।

ও...আপনি এসেছিলেন। বিতৃষ্ণায় ভিতরে ভিতরে মুণ্ডুপাত করছি আমি তার। আমি অ্যাম সো সরি...অনেক বাজে লোক এসে বিরক্ত কবে...আপনি এসেছিলেন আমি ঠিক বুঝতে পাবি নি...রিয়েলি সো সরি...শরীরটাও ভালো ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি।—কাল বিকেল পাঁচটায় ওই সেট সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আপনাদেব পরিচালক মিস্টাব শর্মা আমার বাড়ি আসছেন...আপনারও তখন আসাব সুবিধে হবে?

জবাব দিলাম, সেট-ফেট সব ডাইরেক্টরের ব্যাপাব, এর মধ্যে আমি কেন!

এলে খুশি হতাম।

গলায় যতটুকু সম্ভব বিনয় ঢেলে বললাম, কিছু মনে করবেন না ..আমি কোথাও যাই না। আপনি যখন যেতে বলেছেন তাতেই খুশি...আচ্ছা নমস্কার।'

ফোন নামিয়ে রাখলাম। এটুকু অভিনয করতে গিয়ে আমাব দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ কবছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতরেব চাপা আক্রোশ একটু যেন মুক্তির পথ পেয়েছে। আগের দিনের সাক্ষাতে আমাকে মস্ত একজন ভক্ত ভেবে ভিতরটা ডগমগ করে উঠেছিল তার, কোর্ট-কেসে কোনো মেয়ের এত ইন্টারেস্ট ভাবতে পারে না বলেছিল। আজ কি ভাবছে? স্টুডিওয় এত ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বাড়িতে খবর নিতে এলে নাকের ডগায় দরজা বন্ধ হতে দেখে কি ভেবেছে ওই প্রবল-প্রতাপ ইয়ং ব্যারিস্টার?

...ওই লোকের সঙ্গে গোড়া থেকে বাড়ি পৌছে দেওয়া পর্যন্ত কাল যা-যা কথা হয়েছিল সব এখনও আমার মগজে ঠাসা। কতটা ভালো লেগেছে বোঝাই গেছে। মুখেও বলেছিল, শুধু অভিনয় নয়, আমার চালচলন কথাবার্তা সবই তার ভালো লেগেছে।...আজ কেমন লাগছে?

সন্ধ্যার একটু পরে রমেশ সামতানি এলো। এই একজন মাত্র লোকের কাছে আমি যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক। এসেই আমাকে নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। —ভালোই তো আছ দেখছি, শরীর খারাপ বলে স্টুডিও যাও নি শুনলাম?

বাবা! সত্যিই অবাক আমি, তোমার কানেও সে-কথা পৌঁছে গেছে? অনেক দিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছি বলে তোমার প্রোডিউসারের সঙ্গে একটু বৈষয়িক আলোচনা ছিল, সে-ই খবরটা দিল, শরীর খারাপ বলে আজ তুমি সেটে আস নি।...কি হয়েছিল?

কপট গাম্ভীর্যে জবাব দিলাম, শরীর নয়, মেজাজ খারাপ হয়েছিল, হঠাৎ ছ'মাসের জন্যে তুমি বাইরে যাচ্ছ মানে?

শুনে খুশি হল।—বাইরে যাচ্ছি মানে যাচ্ছি।

কেন যাচ্ছ? জীবনে আর কত টাকা দরকার তোমার?

হাসতে লাগল।—আই অলওয়েজ লাভ টু ডু মাই ওউন লিটল থিংস। তাছাড়া এটা একটা নেশার মতো, নিজের মাথার কসরতে যা কিছু, এ যত ফুলে ফেঁপে ওঠে ততো আনন্দ। হাত পা ছড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসল।

—কাল কে একজন খুব দামী লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেছিল...কে?

এই প্রসঙ্গে আসার জন্যেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, কে অনুমান কর তো?

ভাবল একটু। তারপর মাথা নাড়ল।—পারলাম না, তুমি বল।

বিনায়ক প্যাটেল।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল।—সে আবার কে?

লোনাভালা বীরকর কেসের হীরো ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল।

মনে পড়ল এবারে। ওই একটা মানুষকে আমি কত ঘৃণা করি এই একজনই জানে সে কথা।—তার সঙ্গে দেখা হল মানে সে কি তোমাকে চেনে নাকি?

না, সে আমাকে ছবির জগতের খুব এক প্রমিসিং স্টার সুজাতা পাণ্ডুরং নামেই চিনেছে। বয়সে অনেক ছোট হলেও আমাদের ডাইরেক্টর হরিহর শর্মার খুব বন্ধু, কোর্ট সীন স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা যাচাইয়ের জন্যে তাকে এক্সপার্ট হিসেবে আনা হয়েছে।...আজও সেটে এসেছিল।

তারপর?

কাল থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বলে গেলাম। বলার মধ্যে আমার ঘৃণা আর উষ্মার ঝাঁঝ বুঝতে বাকি থাকল না রমেশ সামতানির। সব শোনার পর প্রথমে হেসেই বলল, তুমি এখনও একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি, আজ পর্যন্তও ওই লোকটার ওপর এত রাগ পুষে বসে আছ! কতবার তোমাকে বলেছি, ও একজন পেশাদার ব্যারিস্টার পেশাদারী কাজ করেছে, ফী দিয়ে তুমি বহাল করলে আবার তোমার জন্যেও ওই রকম লড়বে।

আমি ঝাঁঝ দেখিয়ে বললাম, লোনাভালা কেসে জেতার পর তার সম্পর্কে কত ব্যক্তিগত সুখ্যাতি কাগজে বেরিয়েছিল তুমি জানো না। তার বিবেচনায় ক্লায়েন্ট দোষী বুঝলে সে নাকি অজস্র টাকার বিনিময়েও কেস হাতে নেয় না। আবার নির্দোষ

বুঝলে টাকা পয়সার জন্যে কেয়ার না করে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ে তার জন্য।

রমেশ সামতানির হালছাড়া বিরক্তির অভিব্যক্তি একটু।—সেই এক পুরনো কথা আবার। কাগজ যখন যাকে তোলে ওই রকম করেই তোলে। ওই একটা লোকের কথা ভেবে একদিন হাফ-ডে আর একদিন ফুল-ডে'র শুটিং নষ্ট করলে তুমি, প্রোডিউসারের তাতে কত লোকশান হল জানো?

এই এক ব্যাপারে সায় বা সমর্থন না পাওয়ার দরুন আমারও ভিতরটা তিক্ত হয়ে গেল। জবাব দিলাম, তেমন কিছুই ক্ষতি হয় নি, ডাইরেক্টর ওই সেটে অন্য লোকের কাজ সেরেছে।...ওই লোকের জন্যে আমার মা গেছে বাবা গেছে আর বংশের ওপর এত বড় কলঙ্কের বোঝা চেপেছে যে নিজের পুরো নামটা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি না, সেই লোককে চোখের সামনে দেখেও আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যেতে বলছ?

আমাকে এতটা উত্তপ্ত হতে দেখে রমেশ সামতানি হাসিমুখে সামাল দিতে চেষ্টা করল।—আচ্ছা বাবা, যা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু ও নিয়ে আর বেশি মাথা গরম কোরো না। তাতে শুধু তোমার নিজের ক্ষতি, আর কারো কিছু না। এরপর উপদেশের সুরে বলল, অনেক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি তুমি এর মধ্যে ভালো করে একমনে নিজের কাজটি সেরে নাও। তোমার প্রোডিউসারের সঙ্গে কথা হলেই সে আগে তোমার প্রশংসা করে নেয়, বলে ইউ উইল বি এ গ্রেট আর্টিস্ট। আমিও তোমাকে গ্রেট আর্টিস্ট দেখার অপেক্ষাতেই বসে আছি—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, নইলে এবারের লম্বা সফরে তোমাকে নিয়েই হাওয়া হয়ে যেতাম। আমি কম ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি?

আমি থমকে তাকালাম। ওর কথায় আবার অনেক দিন আগের সেই হালকা সুর। চাউনিটাও আগের মতোই ইঙ্গিত মাখা। দু-দুটো অত বড় অঘটনের ফলে আমার ও রকম মানসিক অবস্থা দেখে এই ন'মাসে একটা দিনের জন্যেও তার কথা বা চাউনিতে কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ চোখে পড়ে নি। এই একজন না থাকলে আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম তাও জানি না। সেদিক থেকে তার প্রতি যত শ্রদ্ধা ততো কৃতজ্ঞতা আমার। কিন্তু এ কথা শোনার পর আর এই চাউনি দেখার পর থমকালাম অন্য কারণে।...বিগত ন'টা মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবার অবকাশ আমার হয় নি। মনের সেই অবস্থাও ছিল না। কিন্তু এতদিন বাদে আবার সেই পুরনো ইঙ্গিত শুনে আর দেখে হঠাৎ নিজেরই মনে হল ওর সম্পর্কে আমি আজও সেই পুরনো অনিশ্চয়তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার জীবনবাস্তবের পুরুষ এই মানুষটাই—অনেক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও এ রকম একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয় এখনো আমার মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে নি। ন'মাস আগে যেমন ছিল আজও সেই সম্ভাবনাটা আগের ওই একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। সেটা দূরে না সরুক কাছে এগিয়ে আসার ফুরসত পায় নি।

আরো কিছু হালকা উপদেশ দিয়ে সে চলে যেতে ওই চিন্তাও মন থেকে সরে গেল। অশান্ত ক্ষুব্ধ মনের দর্পণে ফিরে আবার যে দাম্ভিক মানুষের ছায়া পড়ল, সে বিনায়ক প্যাটেল। সে আমার চির শত্রু। আমার গ্রেট আর্টিস্ট হওয়ার ব্যাপারে

এই শত্রুতাকে আমি কোনো রকম বাধা মনে করি না। রমেশকে আমি দোষ দিই না, আমার মানসিক অবস্থা জানে বলেই সে উতলা হয়, ওই শত্রুকে তুচ্ছ করতে বলে, ভুলে যেতে বলে।

...সেই রাতে আবার আমি স্বপ্ন দেখলাম। উল্টোপাল্টা স্বপ্ন। মায়ের চিতা জ্বলছে, বাবার চিতা জ্বলছে। তারপর আবার সেই বাবাকেই দেখলাম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। একটা মানুষ তার দিকে লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে আর পুরু দুই ঠোঁট নেড়ে নেড়ে ঘাতকের মতো বলে চলেছে কি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা কাঁপছে থরথর করে আর ঘামছে দরদর করে, মাথা নেড়ে অব্যক্ত যাতনায় বলতে চাইছে কি, আর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

৫

শুটিং না থাকলে আমি বিকেলে বাড়ির ধারে-কাছে একটু বেড়াই, সন্ধ্যা না হতে আবার বাড়ি চলে আসি। আজ আর রমেশ আসবে মনে হয় না, কাল লম্বা ট্যুরে বেরুবে, তার কাজ থাকাই স্বাভাবিক। এমনিতেই রোজ আসার সময় পায় না। একই সময় বাড়ি ফিরলাম তবু।

দোতলার বসার ঘরে যে মূর্তি বসে তাকে আমি আশা করি নি। পরিচালক হরিহর শর্মা। ভদ্রলোক সুরসিক হলেও কোনো আর্টিস্টের বাড়ি আসে না বড় একটা। এ লাইনের সম্মানী মানুষ। আমার প্রথম ছবির পরিচালক, আমার কাছে সম্মানী তো বটেই। আমাকে দেখেই বলে উঠল, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি...সত্যি অসুখ করেছিল?

চকিতে একবার শহেলির কথা মনে হল। কিন্তু সে কাঁচা মেয়ে নয়। হেসেই বললাম, সত্যি না হলে এই ন'মাসের মধ্যে ক'দিন কামাই করতে দেখেছেন?

দেখি নি বলেই তো ঘাবড়েছি...কিন্তু তোমাকে দেখে কিছু মনে হচ্ছে না...এখন কেমন?

ভালো।...আপনার তো আজ কোর্ট সীন্ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক্সপার্টের কাছে যাওয়ার কথা ছিল?

সেখান থেকেই তো সোজা তোমার এখানে। ভদ্রলোক হাসতে লাগল। কিন্তু আলোচনা সে-রকম জমল না। তুমি ভায়ার মনে বড় দাগা দিয়েছ—

কার মনে? বুঝেও বুঝতে চাইছি না।

ওই ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেলের কথা বলছি। তাকে আমি নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসি, ওরকম সৎ আর গুণী ছেলে বড় একটা দেখা যায় না, যারা ওকে জানে সকলেই শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে।...আর তুমি সরাসরি তার নেমন্তন্নটাই বাতিল করে দিলে? নাই যাবে তো অন্য কোনো অজুহাত দেখাও, সোজা বলে দিলে কোথাও যাও না! বিশেষ করে যেখানে আমি থাকছি!

কানের পর্দা দুটো যেন কড়কড় করছে। তবু সহজ সুরেই বললাম, নেমন্তন্নটা আপনি জানালে অত অসুবিধে হত না...আপনিই বলুন, একদিনের সামান্য আলাপে

কেউ বাড়িতে ডাকলেই হুট করে চলে যাব?

একদিনের আলাপে কি গো। সে না হয় তোমাকে চিনত না, কিন্তু তুমি তো তাকে আগে থেকেই চিনতে জানতে, পরশু তো নিজের মুখেই কত কি বললে, কত কেস কাগজে পড়েছ, ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে আপোসশূন্য লড়াই করে...ও রুখে দাঁড়ালে অপরাধীর মাথায় সর্বনাশের খড়্‌গ নেমে আসবেই...একান্ত ভক্তের মতো কাগজে ছবি দেখেই মানুষটাকে চিনেছ, বেচারাকে ওভাবে ঘায়েল করার পরে কিনা তোমার এই ব্যবহার!

এটা কোর্ট নয় যে মুখে লাগাম বেঁধে রাখতে হবে। কপট কৌতুকে একটু উচ্ছল আমি।—ভদ্রলোক ওতেই ঘায়েল হয়ে গেছেন বলছেন?

ঘায়েল বলে ঘায়েল! ফ্লোরে আমাকে যেমন দেখে সে-রকম দেখছে না বলেই হরিহর শর্মা আরো খুশি। একটা সত্যি কথা ফাঁস করে দেওয়ার মতো করে বলল, ওই সীরিয়াস মানুষগুলোকে নিয়ে বিপদই এই, বুঝলে? চোখ বুজে ধ্যানে বসল তো বসলই, আবার চোখ খুলে কাউকে মনে ধরল তো তক্ষুণি শরাহত। ও ছেলে কত সীরিয়াস খুব ভালো করে জানি বলেই বলছি, নইলে কল্পনা দেশাই কবে ওর গলায় ঝুলত, কিন্তু—

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কল্পনা দেশাই কে?

ওর এক দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতির বোন আর আমারও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, একই পেশার মেয়ে, মানে সে লইয়ার। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, প্যাটেল ওকে বিয়ে করবে সেই আশায় আমাকে পর্যন্ত কত ভাবে তোয়াজ করে, ছেলেবেলা থেকে ভাবসাব দু'জনের, কিন্তু বাবুর ধ্যানভঙ্গের নাম নেই, অথচ একদিন মাত্র তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আর নিজের গাড়িতে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ফাঁকে কি কথা-বার্তা হয়েছে, তাইতেই সে ধ্যানের জগৎ থেকে একেবারে অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছে। যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সেকেণ্ড অ্যাণ্ড থার্ড সাইট, প্রথম শুটিং-এ তারপর স্টুডিও ঘরের আলাপে আর তারপর গাড়ির লিফট-এ।

নিজের রসিকতায় বেশ জোরেই হেসে উঠল হরিহর শর্মা। তাকে চা দিতে বলার অছিলায় আমিও হাসিমুখে পাশের ঘরে চলে এলাম একবার। এক বিজাতীয় আক্রোশে আমার দু'কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কানে মুখে জল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে আর শহেলিকে চা পাঠাবার কথা বলে আবার হাসিমুখেই ঘরে ঢুকলাম।...একটা দিনের আলাপ খুব কম সময় নয়, জুনাগড়ে দেখেছি আর বিকেলে বেড়াবার সময় এই বোম্বাই শহরেও দেখছি, বিনা আলাপেই সভ্যভব্য কতজন সামনে পিছনে ঘুরঘুর করে। আমার ধারণা, সুরসিক হরিহর শর্মাও নিছক শরীরের খবর নেবার জন্যেই এখানে আসেনি, ছোট ভাইয়ের মতো মানী বন্ধুর মন বুঝে একটু সুপারিশের ইচ্ছেও মনের তলায় আছে তার। সুবিধে এই, মনের তলায় কোনো কথা তার চাপা থাকে না।

—তারপর বলুন, আমারও ভালো লাগছে শুনতে। এত বড় একজন ব্যারিস্টারকে নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টাই করছেন মনে হচ্ছে—

ঠাট্টা! হাসি মাখা দু'চোখ গোল হরিহর শর্মার।—সেদিন লিফ্‌ট দেবার পর টেলিফোনে সে কি উচ্ছ্বাস আর তোমার জন্যে সে কি দুশ্চিন্তা ছেলেটার! এত লেখাপড়া শিখে এ লাইনে আসা কেন জিজ্ঞাসা করতে তুমি নাকি জবাব দিয়েছ. মাথার ওপর গার্জেন নেই বলে—আর সত্যিই ভালো লাগছিল বলে সে নাকি আস্তে চালাচ্ছিল গাড়ি, তোমার শরীর বেশি খারাপ ভেবে তক্ষুণি ডাক্তার দেখানোর কথা বলতে তুমি জবাব দিয়েছ, তার দরকার হবে না, আপনি শুধু আর একটু স্পীড বাড়ান গাড়ির। এই থেকেই সে ফোরকাস্ট করেছে অদূর ভবিষ্যতে আর কোনো আর্টিস্ট তোমার ধারে কাছে থাকবে না।

হাসি ভরা চোখ দুটো আমার মুখেব ওপর একবার বুলিয়ে নিল হরিহর শর্মা। —তারপর তোমার লাল মুখ দেখে বিষম ভাবনা তার, আমাকে তাগিদ, শিগ্‌গীর টেলিফোনে খোঁজ নাও, ব্লাড প্রেসার চেক-আপ করতে বল।...তোমার টেলিফোনে ঠাট্টার কথাও বলে দিয়েছি, অমন ভক্তি শ্রদ্ধার মানুষকে হঠাৎ অত কাছে পাওয়ার ফলে রক্তেব তাপ ও চাপ বাড়ার কথা শুনে প্যাটেল হেসে বাঁচে না, বলে সী ইজ রিয়েলি সো ইনটেলিজেন্ট! আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন আরো পুলকিত হরিহর শর্মা, মুখ যে এখনো বেশ লাল দেখি গো, বোথ ওয়েজ নাকি!

শহেলি চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢোকাব ফলে জবাব দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেলাম। হরিহর শর্মা একটা পেয়ালা হাতে নিল, আমারও পেয়ালা তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে চোখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা। শহেলি চলে যাবার ফাঁকে পেয়ালায় দু-তিনটে চুমুক দিয়ে ঘটা করে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল হরিহর শর্মা।—কিন্তু কাল সকাল থেকে সবকিছুর ওপর তুমি একেবার বাসন-মাজা জল ঢেলে দিলে, বেচারা হকচকিয়ে গেছে একেবারে।

আমি আবার কি করলাম?

তুমি আবার কি করলে? স্টুডিওয় আসছ বলেও এলে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে শেষে উঠে যাচ্ছে দেখে প্রোগ্রাম শর্ট করে তাকে মিনিয়েচারে এনে তোমার এতদিনের অ্যাকটিং দেখালাম। তাই দেখে আবার এক দফা মুগ্ধ সে, হন্তদন্ত হয়ে অসুস্থতার খবর নেবার জন্যে তোমার বাড়ি ছুটে এলো, আর তারপরেই একেবারে মোক্ষম ঘা খেয়ে বাড়ি ফিরল। প্যাটেল নামে কাউকে তুমি চিনতেই পারলে না—আয়াকে দিয়ে বলে পাঠালে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে তুমি বাড়িতে দেখা কর না, সে-রকম দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেন স্টুডিওতে দেখা করা হয়। শুধু তাই নয়, ওকথা বলেই তোমার আয়া নাকি তার নাকের ডগায় ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল।...কাল অবশ্য তারপর সে টেলিফোন করতে তুমি অ্যাপোলজি চেয়েছ কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজে তার নেমন্তন্ন নাকচ করেছ। আমাকে বলেছে, তোমার আর্টিস্ট সুজাতা পাণ্ডুরং আমার ভক্ত হলেও বড় কঠিন ভক্ত দাদা—সত্যিই কতটা কি অসুখ দেখে এসো।

হাতের পেয়ালা নামিয়ে আমি শুধু বললাম, কি লজ্জা—

আমার দিকে চেয়ে হরিহর শর্মা মুচকি হাসল একটু। বলল, এই লজ্জায় সুফল

ছাড়া কুফল নেই, তোমার আচার আচরণ দেখে ছেলেটার কৌতূহল বরং চারগুণ বেড়েছে আরো। আর আমিও এক ঘন্টা ধরে তোমার ঢালা প্রশংসা করে সেটা তুঙ্গে তুলে দিয়েছি।

খুব হয়েছে, আর বেশি বলবেন না।

হাসছে হরিহর শর্মা।—আরো একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি বলে যাই। সময়ের মাপটাই বড় কথা নয়, এ রকম হঠাৎ দুনিয়ায় অনেক কিছু ঘটে। তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার জানা নেই, কিন্তু ওই রকম ছেলেও হাজারে দশহাজারে একটাই মেলে, হি ইজ রিয়েলি এ জেম্।

জেম্ প্রসঙ্গে আমার মুখে আরক্ত ছটা দেখেই সম্ভবত খুশি চিত্তে বিদায় নিল পরিচালক হরিহর শর্মা। কিন্তু সত্যিই এক দুর্বার আক্রোশে খুশি আমিও। মন বলছে আরো কিছু ঘটবে। মন বলছে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমি পাব। তক্ষুণি আহার সেরে ডবল ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আজও আমি আধা ঘুমের মধ্যে একজনের লম্বা-লম্বা আঙুল নাড়া আব পুরু ঠোঁট নাড়ার বিভীষিকা দেখতে চাই না।

পরের দিন বিকেল পাঁচটার ফ্লাইটে রমেশ সামতানিকে বিদায় দিয়ে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। বাইরেব দিকের লাউঞ্জে সেই লোক।...ব্যারিস্টার বিনায়ক প্যাটেল। লম্বা শরীরটা সোফায় ছেড়ে দিয়ে যেন কারো প্রতীক্ষায় এদিকে চেয়েই বসে আছে। চোখোচোখি হতে মুখে কাঁচা হাসি ছড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখামাত্র বিতৃষ্ণায় ভেতর ছেয়ে গেল আমার। প্রথমেই হাতের লম্বা আঙুল আর পুরু ঠোঁটেব দিকে চোখ গেল। কোনোটাই বেমানান কুৎসিত নয়, কিন্তু আমার চোখে বীভৎস।

রক্ত ঠাণ্ডা রাখার জন্যেই গতি মন্থর আমার। হাসি মুখে বিনায়ক প্যাটেল বলল, অ্যাটর্নি জেনারেলকে সী-অফ করতে এসেছিলাম, আপনাকে তাড়াতাড়ি ঢুকতে দেখে বসে গেলাম।

অর্থাৎ আমার অপেক্ষাতেই বসে আছে। অনেক চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর টেনে তুললাম। সে আবারও হেসে জিজ্ঞাসা করল, আরও প্যাটেল নামে কাউকে চিনতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

যতখানি সম্ভব মিষ্টি করে হাসলাম আমি, আর মাথাও নাড়লাম।—চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে নিজেকেই শাসন করছি, সুজাতা বীরকর আজ তুমি অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং...ভবিষ্যতে আরো ঢের বড় অভিনেত্রী হবে, শত্রু দেখেই এ রকম বিচলিত হওয়া তোমার সাজে না। বরং ঠাণ্ডা সহজ স্বাভাবিক থাকলে অনেক বেশি জোর পাবে।

জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাকে সী-অফ করতে এসেছিলেন?

আমার এক বন্ধুকে, রমেশ সামতানি—

বন্ধু শুনেই চাউনিটা মুখের ওপর ধাক্কা খেল। রমেশ সামতানি...নামটা শোনা-শোনা লাগছে। বিজনেস ম্যাগনেট?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই।

চলুন। এখন বাড়ি যাবেন তো?

হেসে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, লিফ্‌ট্‌ দেবেন?

মুখে আবার সেই কাঁচা হাসি। ভিতরে বিতৃষ্ণা বাসা বেঁধে না থাকলে হয়তো মন্দ লাগত না। উৎফুল্ল জবাব দিল, আমার বরাত আপনি খণ্ডাবেন কি করে, এখান থেকে সোজা আপনার বাড়ি যাব ঠিক করেছিলাম, প্যাটেলকে আজও চিনতে পারেন কিনা দেখার ইচ্ছে ছিল, তার বদলে সশরীরে এখানেই পেয়ে গেলাম আপনাকে। আসুন—

আমি নিজেও বেশ লম্বা গড়নের মেয়ে, কিন্তু এই লোক পাশে পাশে আসতে মনে হল তার কাঁধের কাছে পড়ে আছি। এয়ারপোর্ট থেকে আমার সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট-এর ফ্ল্যাট খুব দূরের পথ নয়। মিষ্টি করেই বললাম, রোজ অনেকটা হাঁটা অভ্যেস আমার, হেঁটেই বাড়ি ফিরব ভেবেছিলাম...।

থমকে দাঁড়িয়ে সোজা ঘুরে তাকালো।—আপনি আমাকে এড়াতে চান কিনা বলুন তো?

আহত বিস্ময়ে বলে উঠলাম, এ কথা কেন?

স্টুডিওতে সেদিন এত খাতির কদর করলেন, খবরের কাগজেব পুবনো ছবি দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন, গাড়িতে একসঙ্গে গল্প করতে করতে এলাম, অথচ বাড়িতে গিয়ে খবর পাঠানোর পরেও প্যাটেল নামে কাউকে চিনতে পারলেন না, তার ওপর আয়াকে দিয়ে বলে পাঠালেন অচেনা লোকের সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেন না, আজ অসুস্থ শরীর নিয়ে বলছেন আপনার হাঁটতে ইচ্ছে করছে—

নিজের ওপর দখল ফিরে আসছে। মুখের দিকে চেয়েই মৃদু মৃদু হাসছি আমি। বললাম, অসুস্থ শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যেই হাঁটা, ঠিক আছে চলুন...সেদিন ঘুম চোখে ও-রকম বলে ফেলেছিলাম বোধহয়।

এটুকু শুনেই খুশি আবার। চলতে চলতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হরিহরদাও এই কথাই বলছিলেন...আজও টেলিফোনে তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করছিলেন, কাল সন্ধ্যায় তিনি আপনার বাড়িতে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এসেছেন শুনলাম।

হ্যাঁ, আর আপনারও অজস্র প্রশংসা করে গেছেন।

হাসতে লাগল।—তাঁর প্রশংসায় তো দেখছি বিশ্বাস নেই তাহলে।

এই হাসি দেখলে কেউ বলবে না, কোর্টে সংকল্পের খড়্গ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে এই মানুষই অত নির্মম, অমন ভয়ঙ্কর হতে পারে।

লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে চাবি লাগিয়ে গাড়ির দরজা খুলল। তারপর পাশের দরজা খুলে দিয়ে সাদর আহ্বান জানাল, আসুন—

স্টার্ট দিয়েই ঘাড় ফেরালো, স্পীড বেশি হবে কি কম?

যেমন খুশি। চেষ্টা করে হাসা আর জল ঢেলে গায়ের জ্বর ছাড়ানোর চেষ্টা দুইই যেন সমান পণ্ডশ্রম।

এয়ারপোর্ট চত্বর ছাড়িয়েই ছেলেমানুষি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সত্যি বলুন তো, আমার কোর্ট কেস অত আগ্রহ নিয়ে পড়েন আপনি?

আগে পড়তাম...এখন অত সময় পেয়ে উঠিনে।

কি দুর্ভাগ্য! অথচ মজা দেখুন, আমি এক আইনের বই ছাড়া আর কোনো কিছুই পড়তাম না, সেদিন স্টুডিওতে আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সিনেমার যে পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনার ছবি থাকছে বা আপনার সম্পর্কে আলোচনা থাকছে তার সবগুলোই আমি কিনে ফেলছি আর পড়ছি।

...সুজাতা বীরকর তুমি আগামী দিনের যশস্বিনী চিত্রতারকা সুজাতা পাণ্ডুরং, তুমি চেষ্টা করলে ঠিক হাসতে পারো, চেষ্টা করে ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি লাজুক-লাজুক হাসি অন্তত ধরে রাখতে পারো।

পাশের লোকটার প্রশ্ন শুনে সচকিত একটু।—আপনার কি হয়েছে বলুন তো...মুখ তো এখনো বেশ লাল দেখছি!

দেখবেন না। কেউ গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

স্টিয়ারিং হাতে ভালো করেই ঘুরে তাকালো আর জোরেই হেসে উঠল।—ঠিক আছে, চাপা পড়বে না, আপনি বলুন কি অসুখ।

অসুখ কিছুই না, মাথা একটু আধটু রীল করে...।

ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

না...।

ব্লাড প্রেসারও চেক আপ করা হয় নি?

না...।

তাহলে কার প্রেসক্রিপশনে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন সেদিন?

নিজের প্রেসক্রিপশনেই...।

মাথাটা আবারও আমার দিকে ঘুরল একবার। তারপর গাড়িটার হঠাৎ স্পীড বেড়ে গিয়ে সামনের বাঁকের রাস্তায় চলল। আমার বাড়ি সোজা পথে। এবার নীরব জিজ্ঞাসায় আমি তাকালাম তার দিকে।

সে জানান দিল, মিনিট পাঁচেকের জন্যে একজায়গায় হয়ে তারপর যাচ্ছি।

জবাবদিহি শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করেই বললাম, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন তাহলে—

ঘাবড়াবেন না, আসুন।

দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ি একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। সামনের প্রশস্ত ঘরের দরজা খোলা। বিনায়ক প্যাটেল নেমে সরাসরি ঘরে ঢুকে গেল। আধ-মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে দরজার কাছে এলো আবার। তার পাশে টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক। সেখানে দাঁড়িয়েই বিনায়ক প্যাটেল ডাকল, নেমে আসুন—

তুমি সুজাতা বীরকর নও আর, তুমি অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং, আপরিচিতের সামনে সীন ক্রিয়েট কোরো না, সহজ সপ্রতিভ মুখে নেমে যাও।

নেমে এলাম। টাক-মাথা ভদ্রলোক সাদরে ঘরে এনে বসালেন আমাকে। ঘরের দিকে একবার তাকাতেই বোঝা গেল ডাক্তারের চেম্বার এটা। আর এই ভদ্রলোকই ডাক্তার, কারণ প্যাটেল তাকেই বলল, চট্‌পট্‌ ডক্টর—

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, মাথা রীল করে কেন, হজমের কি কোনো ব্যাঘাত হয়?

রাগে রি রি করছে ভিতরটা, আমার স্বাস্থ্য দেখে এমন কথা মনেও আসা উচিত নয়। মাথা নাড়লাম, ব্যাঘাত হয় না।

মাথার পিছনে ব্যথা হয়?

না।

উঠে এসে চোখ টেনে দেখল, জিভ দেখাতে বলল, পালস্ দেখল। তারপর বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরে ব্লাড প্রেসারের ফেটি জড়াল। মেসিনে বার দুই রক্ত চাপের ওঠা-নামা দেখে ফেটি খুলে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল, বয়েস কত?

তেইশ।

এবারে প্যাটেলের দিকে তাকালো ডাক্তার। ব্লাড প্রেসার নরম্যাল, পালস্ নরম্যাল, এভরিথিং নরম্যাল, তোমার দুশ্চিন্তার তো কিছু দেখছি না। ওভার স্ট্রেনে ও রকম হয়।

থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর। আমাকে ডাকল, চলুন—

ডাক্তারটি তার বন্ধুস্থানীয় বোঝা গেল। আমার উদ্দেশ্যে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে তার দিকে চেয়ে একটু অর্থপূর্ণ খুশির ইশারা করল যেন।

গাড়ি চলতে আমি বললাম, আপনার এতটা ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না।

সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল, আমি বড় একরোখা মানুষ, যখন যা মাথায় আসে তাই করে ফেলি। আপনার কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই, এ ডাক্তার আমার পুরনো বন্ধু।...স্টুডিওর অত গরমে আর অত আলোয় আপনাদের খুব স্ট্রেন হয়, তাই না?

কিছু একটা উল্টোপাল্টা বলে বসার ইচ্ছে আমার। সামান্য মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না।

গাড়ি আমার বাড়ির দরজার কাছে এসে থামল। দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালাম। যে-রকম চেয়ে আছে, ভব্যতার প্রশ্নটা আপনিই মুখে এসে গেল।—আসবেন?

খুশি মুখে নেমে এলো। বলল, এ সময় বাড়ি ফিরলে আমার সময় কাটানো খুব ভার হত। আমার পার্ট-টাইম বেয়ারার শুধু মুখ দেখতে হত।

কলিং-বেল টিপতে শহেলি দরজা খুলে দিল। যে মূর্তিকে সঙ্গে করে ঢুকলাম তাকে দেখে ওর চোখ বড় বড়। রূঢ় আচরণে এই লোকেরই নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করেছিল মনে আছে।

ওপরের ড্রইং রুমে বসালাম।—বসুন। কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

যা খাওয়াবেন তাই খাব। চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু হলেও আপত্তি নেই। হাসি মুখে একটা সচিত্র জার্নাল টেনে নিল।

দু'মিনিটে আসছি।

আমার ঘরের অ্যাটাচড় বাথে এসে চোখে মুখে ভালো করে জলের ঝাপটা মেরে বিতৃষ্ণার তাপ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা আমার।...আবার ও-ঘরে যেতে হবে, অভিনয় করতে হবে। তারপর রাতে বোধহয় আজও ঘুমের ওষুধ গিলতে হবে।

...জীবনের সব থেকে বড় শত্রু এখন আমারই ঘরে বসে। আমারই খুশির আপ্যায়নের আশায় বসে। কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা থাকতেই হবে। যতদিন না অস্ত্র ঠিক হয় আর সুযোগ হাতের মুঠোয় আসে ততদিন বেসামাল কাজ করা ঠিক

হবে না। কি অস্ত্র কি রকম সুযোগ আসতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। অতএব অভিনেত্রী সুজাতা পাণ্ডুরং, তুমি ধৈর্য ধর, ভুল কোর না।

ভুল করি নি। হাসিয়েছি। নিজে হাসতে পেরেছি। চা জলখাবার খেয়ে, সিনেমা জগতের প্রসঙ্গে অনেক কৌতূহল মিটিয়ে, আর তার জগৎ সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার বহর দেখে খুশি হয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে হাওয়ায় ভেসে বিদায় নিয়েছে। একটা দুটো জটিল কেসের অবতারণা করেও আমার কোর্ট কেস সম্পর্কে পুরনো আগ্রহ আবার ঝালিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। যাবার আগে নিজেই হাসি মুখে বলেছে, কোর্টের বাইরে আমি নিঃসঙ্গ মানুষ, বাড়ির সঙ্গী কেবল আইনের বই, যে রকম লোভ দেখালেন, আমি প্রায়ই এসে হানা দেব—আমার চক্ষুলজ্জার বালাই নেই বুঝতেই পেরেছেন বোধহয়।

ভিতরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল। বাইরে বোধহয় হাসি মুখেই সায় দিয়েছি। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করতে তখনই আবার বাথে ছুটে গেছি।

মুখে যা বলে গেল কাজেও তাই করবে আর সেটা এত ঘন ঘন হবে ভাবি নি। পরের বিশ দিনের মধ্যে কম করে পাঁচ দিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। শুধু দেখা নয়, ভিতরের সমস্ত জ্বালা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে সেই একই হৃদ্যতার অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে। পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথম একদিন আবার স্টুডিওর সেটে এসেছিল। পরিচালক হরিহর শর্মার কৌতুক মাখা হাসি মুখ দেখেই বুঝেছি আমাকে নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে একাধিক বার আলোচনা হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে নিজের সেই চুপি চুপি কথার ফল দেখছে হয়তো হরিহরবাবু, বলেছিল, সময়ের মাপটাই বড় কথা নয়, এরকম হঠাৎ দুনিয়ায় অনেক কিছু ঘটে।...আর বলেছিল, হি ইজ্ রিয়েলি এ জেম্।

পরের দেখা হরিহর শর্মার বাড়িতেই। ছবির এক জায়গায় আমার গলায় সুরেলা স্তোত্রের পার্ট আছে একটু। ছুটির দিনে সঙ্গীত পরিচালক এসেছে তাঁর বাড়িতে। গান আর সুরের মহড়া পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালকের বাড়িতেও হয়ে থাকে। হরিহর শর্মা তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। কাজ শেষ করে ফিরে আসার আগেই দেখি সেখানে ওই মানুষ...। আমি আসছি সেটা হয়তো হরিহর শর্মাই টেলিফোনে বলে থাকবে তাকে। সেদিনও তার গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে আমাকে। আর দু'কানে কিছু স্তুতিও শুনতে হয়েছে, যেমন, এত কাল ফিল্ম আর্টিস্টদের সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল, আমাকে দেখা আর জানার পর থেকে সেটা একেবারে বদলেছে।

তৃতীয় আর চতুর্থ বারের দেখাটা আবার আমার বাড়িতে। বেল বাজতে শহেলি দরজা খুলে দিতে আমি আছি জেনে নিয়ে তার পাশ কাটিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এসেছে। নিজেই চা বা কফির হুকুম করেছে। শহেলি কি রকম কড়া আয়া সে-কথা বলে নিজেই হেসেছে। ওঠার আগে একদিন তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে বারবার আন্তরিক জুলুমের সুরে অনুরোধ করেছে।

...পঞ্চম বারের দেখা, একজন মস্ত শিল্পীর অভিনয়ের পঁচিশ বছর পূর্তির

জাঁকজমকের অভিনন্দন উৎসবে। এখানে অন্তত ওই আইনজীবী মানুষটা প্রত্যাশিত নয় আদৌ। কিন্তু উৎসব পরিচালনার পাণ্ডাদের একজন যখন হরিহর শর্মা, নেমন্তন্ন পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার তক্ষুণি মনে হয়েছে, এ-ধরনের আমন্ত্রণে যোগ দেওয়ার আকর্ষণ আমি। ধারণাটা যে সত্যি দশ মিনিট না যেতেই সেটা বোঝা গেল। জনাকয়েক বিশিষ্ট পরিচালক আর প্রযোজকের সঙ্গে পরিচিত হবার পর যেই একটা টেবিলের সামনে বসেছি, তক্ষুণি ওই মূর্তি সহাস্যে মুখোমুখি চেয়ারখানা দখল করে বসেছে। আর তারপর নির্লজ্জের মতোই সরল স্বীকৃতি। —আপনি আসছেন শুনেই এলাম, নইলে এ-পরিবেশে হাঁসের সভায় বকের দশা আমার।

প্রতিবারের সাক্ষাতে ভিতরে ভিতরে আমার সেই রাগ সেই ঘৃণা সেই বিদ্বেষ সেই বিতৃষ্ণা। এই একজনকে দেখলেই আমার চোখেব সামনে মায়ের রক্তাক্ত মবা মুখ আর বাবার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ ভেসে ওঠে।

এই লোক, এই মেজাজী জাঁদরেল তরুণ ব্যারিস্টার আর আমার সঙ্গ সহজে ছাড়বে না, সুযোগ পেলে আরো অনেক বেশি আকৃষ্ট হবে সেটা আমার পক্ষে বোঝা জলের মতো সোজা এখন। হ্যাঁ, ওপরওয়ালা একটা সুযোগ যেন ক্রমে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু কখন আঘাতের কোন্ অমোঘ অব্যর্থ অস্ত্রটা আমি হাতে তুলে নেব ঠিক করে উঠতে পারছি না বলেই যত ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা আমার। তার সান্নিধ্য মাত্রে এমন একটা বিষাক্ত বাষ্প আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে কোনো একটা স্বচ্ছ চিন্তা পর্যন্ত মাথায় আসে না। ফলে আমি স্বাভাবিক থাকার তাড়নায় শুধু অভিনয়ই করে যাই।

খানিক আগে ফিরেছি। মুখ-হাত ধুয়ে সবে ঠাণ্ডা হয়ে বসেছি। টেলিফোন। বিরক্তির একশেষ। এ-সময়ে কে আবার।—হ্যালো!

পরমুহূর্তে কানের পর্দা কিরকির করে উঠল।—বিনায়ক বলছি। বিরক্ত করলাম না তো?

না...বলুন। রাগের চোটে এখন জিভ ভেংচালেও দেখতে পাবে না।

আজ একটায় হঠাৎ কোর্ট ছুটি হয়ে গেল, সেই থেকে বাড়িতে বসে বসে আর ভালো লাগছিল না।

গলা একটু শানিয়ে জবাব দিলাম কোর্ট নেই, কেস নেই, আসামী নেই আপনার তো খারাপ লাগারই কথা।

তার মানে। ওধার থেকে হাসি এবং প্রতিবাদ।—আমি কি কেবল আসামী খুঁজে বেড়াই নাকি?

রক্তের তাপ বাড়ছে। গলার স্বরের তারতম্য নেই।—সেই রকমই তো ভেবে বসে আছি আমি।

খুব অবিচার করেছেন।-আসামী সত্যিকারের দোষী হলে আমি ছাড়ি না অবশ্য, কিন্তু মানুষকে আমি ভালোবাসি।

রাগে মনে মনে আবারও ভেঙচি কাটলাম একটা।—খুব তাজ্জব কথা, যাক, কি বলছিলেন বলুন।

অনুমতি করেন তো আজ নিজে গিয়ে আপনাকে এই অধমের ডেরায় নিয়ে আসি।

ঠেলে-ওঠা বিতৃষ্ণা আবার ভিতরে চালান দিলাম। হাসলাম। আজ হল না, বেরুতে হচ্ছে।

তাহলে কি আর বলব, দুর্ভাগ্য আমার। আজ ছাড়ি তাহলে, আবার একদিন ট্রাই নেব।

টেলিফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কি যেন হয়ে গেল আমার। বিদ্যুৎ চমকের মতো ভিতরটা ঝলসে গেল এক প্রস্থ। তারপর কি একটা অশ্রুত গুণগুণ প্রস্তাব ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। প্রতিশোধের একটা পথ বুঝি হাতছানি দিচ্ছে। অব্যর্থ অমোঘ একটা অস্ত্র হাতে উঠে আসতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিজের তপ্ত লাল মুখের ওপর নিজেরই চোখ দুটো ঝলসে উঠল। ভিতরের সেই গুণগুণানি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আয়নায় নিজের দিকে চোখ রেখেই কান পাতলাম।

...নয় কেন? নয় কেন? নয় কেন? নয় কেন...?

আয়নায় নিজের মুখ টকটকে লাল দেখছি।...নয় কেন? কেন নয়...? নিজের মাথাটাই ওই অমোঘ অব্যর্থ সঙ্কল্পে ঠাসা হয়ে যাচ্ছে।...কেন নয়? নয় কেন?

আয়নার কাছ থেকে সরে এলাম। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। নিস্পন্দের মতো বসে থাকলাম খানিক। তারপর উঠে এলাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালাম। অনায়াসেই টেলিফোন নম্বরটা চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল। টেলিফোনের রিসিভারে হাত রাখলাম। আবার নিস্পন্দ কয়েক পলক। চোখের সামনে মায়ের মরা মুখ ভেসে উঠল। তারপর বাবার মরা মুখ। এক ঝটকায় রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়েল করলাম।

হ্যালো? সেই ভারী গলা।

আমি...সুজাতা।

হাউ লাকি। এরই মধ্যে আপনি আবার...কি ব্যাপার?

আপনার ইচ্ছেটা বাতিল করতে শেষ পর্যন্ত আর মন সরল না। চলে আসুন।

টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়েই বিনায়ক প্যাটেলের আনন্দ উপছানো মুখখানা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। গলার স্বর আরো উৎফুল্ল, বিস্ময়াপ্লুত।—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, আমি ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই উড়ে চলে যাচ্ছি।

বারো মিনিট করুন, কাউকে চাপা দিয়ে বসলে কোর্টের হাত থেকে আপনিও রেহাই পাবেন না।

৬

সেই শুরু। সত্যিকারের অভিনয়ের সেখানেই শুরু।

এক মানুষের রুদ্ধ আবেগ আমার যৌবন তটে যত বেশি আছড়ে পড়তে চেয়েছে, আমি ততো সহিষ্ণু, ততো বেশি উদার প্রসন্ন শক্তির আধার। আমার আচরণে রমণীর পরিতুষ্ট প্রশ্রয় আছে, চপল প্রগল্‌ভতা নেই। আমার ঠোঁটের কোণে আর চোখের কোণে হাসি ঝিলিক দেয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। আমি সদয় বটে, কিন্তু হাত বাড়ালেই সহজলভ্য নই।

ওই লোককে আমার পাগল করে দেবারই ইচ্ছে, উচ্ছৃঙ্খল হতে দেব না।

...হ্যাঁ, দিনে দিনে ছেলেমানুষ হয়ে উঠছে আর পাগল হয়ে উঠছে। একে একে চারটে মাস কেটে গেছে। দিনে দিনে সে কাছে এসেছে, আরো কাছে আসতে চেয়েছে। আমি তাকে বাধা দিই নি, আবার দু'হাত বাড়িয়ে একেবারে শেষের গণ্ডীটুকু পার হয়ে আসার মতো প্রশ্রয়ও দিই নি।

...কোর্ট থেকে একটু আগে বেরুতে পারলে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা স্টুডিওতে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। হোটেল রেস্তোরাঁয় একটু খাওয়া-দাওয়া সেরে যেদিকে খুশি গাড়ি ছোটে। কখনো মেরিন ড্রাইভ, কোনোদিন মালাবার হিল্‌স, কখনো জুহু বীচ, কোনোদিন পাওয়াই লেক, কখনো চার্চগেট থেকে বোরিভিলিতে লম্বা পাড়ি, কোনোদিন বা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে বান্দ্রায়। ঠিক পরিকল্পনা মতোই হিসেব করে পা ফেলে তাকে টেনে আনছি আমি। আরো অনেক অনেক কাছে আসতে দিতে হবে তাকে এটা জানি বলেই। যেদিন তার একতলাব চমৎকার বাংলোয় ধরে নিয়ে যায়, সে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে হাঁস ফাঁস করতে থাকে। কাবণ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তেমন নেই। হোটেলে লাঞ্চ ডিনার সারে। একটা মাত্র পার্টটাইম বেয়ারা। আমি তখন সামনের সুন্দব ছোট্ট বাগানটুকুব ধারে বসে থাকি। পিছনে এসে সেও চুপ করে দাঁড়ায় একসময়। বাগানের ফুল দেখে কি আমাকে দেখে তাও পিছন ফিরে না তাকিয়েই আমি অনুভব করতে পারি।

এই চার মাসের মধ্যে রমেশ সামতানির কথা এক এক সময় আমার মনে হয় নি এমন নয়। কিন্তু কোনো দুর্বলতা বিবেকের কোনো দংশন আমি ধারে কাছে ঘেঁসতে দিই না। এর মধ্যে তাকে বঞ্চিত কবার কোনো প্রশ্ন নেই। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। আমি শুধু একটা সুপরিকল্পিত কাজ নিয়ে আছি, যেটা সফল হলে আমার ধারণা, আমার মায়ের শান্তি আমার বাবার শান্তি। সব থেকে বেশি আমার শান্তি তো বটেই।

এর মধ্যে একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, হরিহরদা বলছিল, এই ফিল্ম লাইনে এসে একেবারে হিরোইন হয়ে বসার পিছনে তোমার কে একজন নাকি খুব শাঁসালো মুরুব্বি আছে?

চোখে চোখ রেখে আমি মাথা নেড়েছি, আছে।

তার স্বাভাবিক কৌতুহল।—কে বল তো?

রমেশ সামতানি।

ভাবল একটু।—সেই যাকে এরোড্রোমে সী-অফ করতে গেছলে?

হ্যাঁ।...আমার বাবার আমলের লোক। বয়সে বছর চৌদ্দ বড় আমার থেকে,

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, তার স্নেহ ভালোবাসা না পেলে আজ কোথায় দাঁড়াতাম ঠিক নেই।

আমার দিকে চেয়ে অকৃত্রিম সরলতাই দেখেছে বিনায়ক প্যাটেল। নিশ্চিন্ত হয়েছে।

...তারপর একদিন। স্টুডিও থেকে ঘরে ফিরে দেখি আগে ভাগে সে এসে বসে আছে। গম্ভীর রাগ রাগ মুখ। খুশি মেজাজে থাকলে ওই মুখই কাঁচা আর তাজা দেখায়। কিন্তু রাগলে বা সঙ্কল্পবদ্ধ হলে চোয়াল থেকে চিবুক পর্যন্ত শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। সেই ভয়াবহ মুখ আমার দেখা আছে। কিন্তু এখন মানুষটার মনের অবস্থা টের পেলেও ভিতরে আমার ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই।

কি ব্যাপার?

উঠে দাঁড়াল।—এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাড়ি।

হল কি?

গেলেই দেখবে। এসো।

জামাকাপড় বদলাবার অবকাশ দিল না। টেনে নিয়ে চলল। তার বাড়িতে। তারপর তার নিজের ঘরে। বিছানার ওপর দুটো শস্তা মার্কা সিনেমা পত্রিকা পড়ে ছিল। পাতা খোলা আর উপুড় করা। একটা টেনে নিয়ে আমার চোখের সামনে ধরল। কেচ্ছা ছড়িয়ে দু'পয়সা কামায় সেই রকম কাগজ এ দুটো। নবাগত সুন্দরী চিত্রতারকা সুজাতা পাণ্ডুরংয়ের সঙ্গে কোন নামী তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম চলছে সেই মুখরোচক খবর। দ্বিতীয় কাগজটার খবরও তাই। বোম্বাই শহরের হরেক-রকম জায়গায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। তার সঙ্গে একটু টিপ্পনী, অমুক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে সুন্দরী চিত্র-তারকার এ-রকম ঘনিষ্ঠতা দেখে এ লাইনের কোনো পয়সাওলা বিশিষ্ট-জনের বুক ফাটছে কিনা সেটাই এখন ছবির জগতে গবেষণার বিষয়।

পড়া শেষ করে আমি তাকালাম তার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ফাটল দেখা গেল কি গেল না।

কাগজ দুটো বিছানায় আছড়ে ফেলে সে বলে উঠল, এদের নামে আমি ডিফার্মেশন স্যুট করব।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্যুট ফাইল করে ঘনিষ্ঠতা আছে সেটা অস্বীকার করবে?

তা না, এদের এই নোঙরা ইঙ্গিতগুলো মানহানিকর। তোমার রাগ হচ্ছে না?

মুখের দিকে চেয়ে হাসছি অল্প-অল্প। মাথা নাড়লাম, রাগ হচ্ছে না।

স্কুলের গোঁয়ার ছেলের মতো সে জিজ্ঞাসা করল, কেন রাগ হচ্ছে না?

আমাদের নিয়ে এ-রকম লেখা হয়েই থাকে! তুমিও এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোর না, কাদা ছোঁড়াছুঁড়িই সার হবে, তখন এ লাইনের বড় বড় কাগজগুলোও আমাদের দিকে ঘুরে তাকাবে।

ঘরের মধ্যে একদফা অসহিষ্ণু পায়চারি করে নিয়ে আবার সামনে দাঁড়াল।

—তুমি বুঝছ না, সৎ ব্যারিস্টার হিসেবে আমার এত নাম যে সামনের তিন চার মাসের মধ্যে গভর্ণমেন্ট খুব সম্ভব আমাকে স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে, কিন্তু নৈতিক চরিত্র নিয়ে এ-ভাবে আলোচনা হতে থাকলে মুশকিলে পড়ে যাব।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না।—স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল কি জিনিস?

এ লাইনে একটা মস্ত সম্মানের পোস্ট। গভর্ণমেন্ট রিটেনার্স ফী দেবে আবার প্রত্যেক কেসে আমার যেমন ফী তেমনি দেবে—কেবল সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কেসে দাঁড়াতে পারব না। এ-রকম সম্মানের পোস্ট পেতে হলে যোগ্যতার আর সুনামের প্রশ্নটাই বড়, নীতিগত আদর্শে দাগ পড়লে মুশকিল।

আমি দেখছি। চোখে পলক পড়ে না।—তাহলে সময় থাকতে সরে পড।

সরে পড়ব মানে। পছন্দমতো কাউকে ভালোবাসার অধিকাব নেই নাকি আমার!

ফিল্ম আর্টিস্টকে ভালোবাসার অধিকার আছে?

হাজার বার আছে।

তাহলে তুমি ভাবছ কেন...রটনার সুযোগ দিচ্ছ কেন?

বা রে, কাগজে ছাপলে আমি আটকাব কি করে, সেই জন্যেই কেস্ ঠুকে দেবার কথা ভাবছি।

তেমনি অপলক চেয়ে আছি। আমার ঠোঁটের ফাঁকের হাসি আরো স্পষ্ট। দু'হাতে তার দুই বাহু ধরে নিজের দিকে ফেরালাম।—লোকে কতদিন আর রটিয়ে মজা পায়, ওদের মুখ বন্ধ করার রাস্তাটা তোমার চোখে পড়ছে না?

কি বললাম মাথায় ঢুকছে যেন এতক্ষণে। চোয়াল আর চিবুকেব কঠিন রেখাগুলো নরম হতে হতে মিলিয়েই গেল। চোখে হাসিব আভাস চিকচিক করতে লাগল। নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দ যেন।

তারপর...তারপর দু'হাতের যে লম্বা আঙুলগুলোকে অনেকদিন ধরে ঘৃণা করেছি, সেই আঙুলগুলো আমার দুদিকের পাঁজরের পাশের লোহার মতো চেপে বসতে লাগল। যে দুটো পুরু ঠোঁট আমার অনেক রাতের দুঃস্বপ্ন সেই দুই ঠোঁট অফুরন্ত তৃষ্ণায় আমার দুই অধরে এঁটে বসতে লাগল।

...আর আমি? মেয়ে মাকড়সার মতো একজনকে জালে আটকেছি। আমার চোখে মুখে বুকে দুই বাহুতে আর দু'হাতের দশ আঙুলে প্রশ্রয়ের নিবিড় জাল বিছানো। তাই যতখানি তৃষ্ণা তার নিবিড় আকর্ষণে এই নিথর দীর্ঘ মুহূর্তগুলোকে তার থেকে বেশি ভরাট করে দিতে চেয়েছি।

প্রাপ্তির এক অনিঃশেষ গভীরে ডুব দিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ বাদে যেন নিজের মধ্যে ফিরে এলো সে। ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর কাঁধের ওপরে আবার দু'হাত রেখে পরম যত্নে নিজের বিছানার ওপর বসাল আমাকে। ঝুঁকে আবার ঠোঁটে আর দুই গালে পাঁচ সাতটা ছোট ছোট চুমু খেয়ে নিল।

তারপর আবার দেখতে লাগল। মুখে সেই কাঁচা লাজুক-লাজুক হাসি। যে কোনো মেয়েরই ভালো লাগার কথা, সুন্দর লাগার কথা।

বলল, এই প্রথম ছবিটা শেষ হওয়ার আগে তুমি বিয়েতে রাজি হবে আমি

ভাবি নি, আর কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই আমার।

আমাকে আবার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাতাস সাঁতরে ফিরে গেছে সে।

আমি দোতলায় এসে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকেছি। সেই জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই মাথার ওপরে শাওয়ার পুরোদমে খুলে দিয়েছি। কতক্ষণে সেই স্নান শেষ হয়েছিল আমার হিসেব নেই।

বিনায়ক প্যাটেলের বাবা নেই, মা আছে। সেই মা বোরিভিলিতে তার এক বড় বোনের কাছে থাকে। সেই মাসিও বিধবা এবং নিঃসন্তান। শহর ছড়িয়ে সেই দূরের উপকণ্ঠে মস্ত বড় বাড়ি তার। তারও অবস্থা ভালো, টাকা পয়সা আছে কিছু। ওই সব কিছুরও ভবিষ্যৎ মালিক তার আদরের বোনপো বিনায়ক প্যাটেল। মা প্রায় বারো মাসই সেই বড় বোনটির কাছে থাকে। সপ্তাহের ছুটি-ছাটাতে ছেলে মা আর মাসির কাছে যায়। কাজ থাকলে সেই দিনই ফিরে আসে নয়তো পরদিন। মা ক্বচিত কখনো ছেলের বাড়ি আসে, কিন্তু থাকে না বড় একটা। শহরে তার হাঁফ ধরে যায় নাকি।

বিনায়ক প্যাটেলই বলেছে, তার মা আর মাসি একাত্ম হলেও স্বভাবে বিপরীত। মা গম্ভীর একটু, কিন্তু মাসিটি সুরসিকা।

এই মা আর মাসিকে দেখানোর তাগিদে গাড়ি হাঁকিয়ে আমাকে নিয়ে চলেছে। যাওয়া আরো দরকার এই কারণে যে আসন্ন বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে আসতে হবে। এ ব্যাপারে মা-মাসি যেমন বলবে সেই রকমই ব্যবস্থা হবে।

ছুটির দিনের উপকণ্ঠের নির্জন রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটেছে। আকাশ মেঘলা একটু, ফলে এই ট্রিপ আরো উপভোগ্য হবার কথা। আমি আড়চোখে থেকে থেকে দেখছি তাকে। আনন্দে টইটম্বুর মুখ। একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, একজন অভিনেত্রীকে বিয়ে করতে যাচ্ছ শুনলে তোমার মা-মাসি কি বলবেন?

কিছুই বলবে না। দেখবে চেয়ে চেয়ে।

আপত্তি হবে না?

জবাবে টুক করে একটা চুমু খেয়ে নেওয়ার চেষ্টায় স্টিয়ারিং ঘুরে যাবার ফলে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে মাঠে ওঠার উপক্রম। সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিল, আমার মা আর মাসি আমার বউই শুধু দেখবে, আর কিছু দেখবে না। এ ব্যাপারে আমার ওপর তাদের অটুট আস্থা।

মস্ত বাড়ির দরজায় গাড়িটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোনাভালার বাড়িটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। সে-বাড়ি এর থেকে ঢের বড় হলেও অনেকটা এই রকমই স্নিগ্ধ নির্জন পরিবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক বিস্মৃতির রেশ কাটল। বাইরে প্রকাশ না পেলেও ভিতরের নরম মনের ওপর একটি কঠিন আবরণ পড়ে গেল।

আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে পা দিয়েই ছোট ছেলের মতো চিৎকার চেঁচামিচি শুরু করে দিল লোকটা।—মা! মাসি! জলদি! দু'জন মহিলা ঘরে এসে দাঁড়াতেই ঝুপ ঝুপ প্রণাম সারল। তারপর আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে বললে, যা দেখার খুব ভালো করে দেখে নাও—এর পর আর টুঁ শব্দটি করলে চলবে না। বাতিল

করতে হয় তো এক্ষুণি কর। হেসে আমার দিকে ফিরল, এই মাসি আর এই মা।

নম্র বিনয়ে দুজনকেই একে একে প্রণাম সারলাম। দুজনেই তারা নির্বাক খানিক। দেখছে আমাকে।

মাসিরই বাকস্ফূরণ হল প্রথম।—খাসা জিনিস দেখি যে রে, অ্যাঁ! কার মেয়ে রে? কোথা থেকে জোগাড় করলি?

তার মায়ের মুখেও মৃদু হাসি।—দিদির কথার ছিরি দেখ। এগিয়ে এসে আমার চিবুক তুলে ধরলেন। খুব সুন্দর, নাম কি তোমার মা?

সুজাতা।

মাসির ডবল উচ্ছ্বাস আবার।—সুজাতাই বটে! তুই তো দেখি কম নোস ছোঁড়া, আমাদের এত ভাগিদের পরেও এ-রকম একজন ধরে আনবি বলে ঘাপটি মেরে বসে ছিলি!

মা-টি আবারও হাসি মুখেই সতর্ক করল তাকে, আসা মাত্র তুমি এমন করে বলছ দিদি, মেয়েটা না ঘাবড়ে যায়।

হ্যাঁ ঃ তোরও যেমন, মাসিরও তক্ষুণি হালকা প্রতিবাদ, আমাদের এই ছেলেকে ঘায়েল করতে পেরেছে যে মেয়ে সে আবার এত সহজে ঘাবড়াবে। এগিয়ে এসে হাত ধরে টানল, এস গো মেয়ে, মুখ হাত ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর নিজের ঘরদোর বুঝে নাও, তারপর যত খুশি ভক্তিশ্রদ্ধা করগে, তোমার ওই শাশুড়িকে, আমি বাপু কি করে ও-ছেলের ধ্যানভঙ্গ হল শুনে তবে ছাড়ব।

তাদের ছেলে আমাদের দিকে চেয়ে হাসি মুখে ভুরু নাচালো একটু। অর্থাৎ মাসির কথা বলেছিলাম কি-না?

এত বড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রৌঢ়া প্রাণী, জনা দুই ঝি আর একটা বয়স্ক চাকর। আমরা আসার খানিকক্ষণের মধ্যে এই নির্জন বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসে গেল। ওই মা-মাসি দুজনকেই আমার ভালো লেগেছে।...ভালো লেগেছে বলেই ভিতরে কি একটা অস্বস্তির বোঝা। আমার নির্মম সংকল্পের জগতে কারো কোনো মা-মাসির অস্তিত্ব ছিল না। এখনো দুনিয়ায় আর কারো ওপরেই এতটুকু রফা নেই আমার। যত ক্ষোভ আর যত বিদ্বেষ শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

আমার মধ্যে মানুষ বশ করার কোনো সহজাত প্রবণতা আছে কিনা জানি না। দুপুরে ওই দুই মহিলার খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ ছেড়ে নড়লাম না। তাদের জন্যে দুই একটা ব্যঞ্জনও রাঁধলাম। রান্নার হাত আমার খারাপ নয়। মা-টি'র প্রসন্ন মুখ। আর মাসি বলল, অমৃত খেলাম।

তাদের ছেলেটি চতুরও বটে। ঠিক এই প্রসন্ন মুহূর্তটিতে বলল, তার ওপর যদি শোন বউ তোমাদের জুনাগড় য়ুনিভার্সিটির হাই সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ.?

মায়ের মুখে খুশির ঝিলিক লক্ষ্য করলাম। মাসির বিস্ময়াপ্লুত উচ্ছ্বাস।—তাই নাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য, এত পাস দেখে বোঝার উপায় নেই। রয়ে সয়ে ছেলে এবারে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটাল—আরো খবর আছে। মা শোন, মাসি শোন, শুধু এম. এ. পাস নয়, ওর অভিনয়ের ঝোঁকও খুব। এই প্রথম একটা ছবিতে অভিনয়ে

নেমেছে...খুব ডিগনিফায়েড রোল,...আর মাসির কথায় আমিও তাই দেখেই প্রথম, যাকগে, আর বলব না—

মা থমকে তাকালো, মাসির গলায় অস্ফুট উক্তি, ওমা, বলিস কি রে।

একটু থেমে মা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ছবিতে নেমেছে?

ছেলে ছবির নাম বলল।

এ ছবি শেষ হলে বিয়ের পরেও আবার ছবিতে নামবে?

একটু থমকে ছেলে জবাব দিলে, আমার মনে হয় মা এ-ব্যাপারটা ওর ওপরেই দেওয়া ভালো, ভালো লাগে করবে, না লাগে করবে না।

মাসি বলে উঠল, সেই ভালো, ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

এরপর বিশ্রামের জন্যে আমাকে আর এক ঘরে পাঠিয়ে তারা বিয়ের আলোচনায় বসল। খানিক বাদে তার ফলাফলও জানা গেল। ছেলে আচমকা ঘরে ঢুকে বেশ বড়সড় একটা চুমু খেয়ে অনেকক্ষণের তৃষ্ণা মেটাল যেন। তারপর ব্যবস্থার কথা শোনাল। মা-মাসি দু'জনের কেউ ছেলের ইচ্ছেয় আপত্তি করে নি। রেজেস্ট্রি বিয়ে হবে। তারপর এখানে ফুলশয্যা। বোম্বাইতে ফিরে এসে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা। মা-মাসি দু'জনেরই তো ব্লাড প্রেসার, শেষের ওই হৈ-চৈয়ের মধ্যে তারা থাকতে পারবে না।

বিকেলে জলযোগের পর ফেরার কথা আমাদের। বেশ-বাসের উদ্দেশ্যে একটা ছোট ঘরে ঢুকতে পিছনের বারান্দা থেকে মাসি আর বোনপোর একটু সরস আলোচনা কানে এলো আমার।

মাসি বলছে, যা হয়েছে বাপু চমৎকার হয়েছে, ওই যে এক উকিল মেয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিলি, কল্পনা দেশাই, তার থেকে বলব ঢের ঢের ভালো হয়েছে।

বোনপোর প্রতিবাদ, বা রে, আমি আনলাম কোথায়, তোমাদের বশ করার জন্যে বরং সে-ই আমাকে ধরে এনেছিল!

মাসি বলল, যা-ই হোক এনেছিলি তো, আমরা ভাবলাম সেখানেই মজে গেলি।

যাক বাবা, তুমি এখন থাম, কি শুনতে কি শুনে ফেলবে, তোমরা খুশি, ব্যস।

...কল্পনা দেশাই, নামটা কার মুখে শুনেছিলাম? মনে পড়ল, হরিহর শর্মা।

ফেরার পথে বিনায়ক প্যাটেল জিজ্ঞাসা করল, মা-মাসিকে কি রকম লাগল বল।

জবাব দিলাম, খুব ভালো। এত ভালো ভাবি নি।

মনে মনে সত্যিই এদের কথাই ভাবছিলাম আমি। এত ভালো বলেই ভিতরে ভিতরে সেই অস্বস্তি। এমন কি পাশের লোককেও যা দেখছি তার সঙ্গেও বাবার সেই দুঃসহ ঘটনার যোগ না থাকলেই যেন ভালো হত। বাবার কথা মনে হতেই আমার কোমল দিকটা কঠিন আবার।...হ্যাঁ, শত্রুতা আমার একজনের সঙ্গেই। কোনোদিন একে আমি ক্ষমা করতে পারব না। কোনোদিন না।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। বোম্বাইয়ের স্টুডিও মহলে খবরটা গোপন

থাকল না। প্যাটেল হরিহর শর্মাকে এত বড় খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারে কি করে? আর হরিহর শর্মা জানলে কারো আর জানতে বাকি থাকবে না।

চলতি ছবির চৌদ্দ আনা কাজ শেষ প্রায়। পরিচালক আর প্রযোজক প্রায়ই ছবির প্রোজেকশান দেখে। হরিহর শর্মা আমার পিঠ চাপড়ায়—সুপার সুপার হিট ছবি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এই সুপারহিট ছবির খবর বম্বের আরো প্রযোজকের কানে গেছে। ফলে এরই মধ্যে দু-দুটো ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথম, একজন নামী প্রযোজক আমার কাছে এসে হাজির, তার একটা ছবির জন্যে কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিতে চায়। আগে যা তুচ্ছ করা গেছল এখন আর তা পারা গেল না। যে ব্যাপারে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কি আছে আমার অদৃষ্টে কে জানে। এমন কি রমেশ সামতানিও ফিরে এসে আমাকে ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া এই প্রযোজকটিও নামী। দু' লাখ টাকা পর্যন্ত দেবে এই সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিল, আমার সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথাবার্তার ফলে অনায়াসে সেই অঙ্ক তিন লাখে উঠে গেল। কনট্রাক্ট সই হল, নগদে আর চেকে বেশ মোটা টাকা অ্যাডভান্স করে গেল সে। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও প্রায় অনুরূপ। আমার বর্তমান প্রযোজকটি আমার বিয়ের কথা শুনে একটু চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। রমেশ সামতানি এখানে নেই, এদিকে বিয়েটা হয়ে গেলে আর আমাকে ছবির জগতে পাওয়া যাবে কি যাবে না। অতএব সে বাড়িতে এসে হাজির, তার পরের ছবির জন্যে একটা শস্তার কনট্রাক্ট সেরে নেবার জন্যে। বিনায়ক প্যাটেলও তখন আমার ঘরে বসে। প্রযোজক আসামাত্র আমি তার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছি। তার ইতস্তত ভাব দেখে বিনায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার যা বলার এঁর সামনে অনায়াসে তা বলতে পারেন।

অগত্যা বিনায়কের সামনেই প্রযোজক তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। শুনে আমি হাসতে লাগলাম, এত তাড়ার কি আছে, এ ছবি রিলিজ হোক না।

ছবি রিলিজ হয়ে গেলে দাম কত চড়বে সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানে। একটা অন্তত কনট্রাক্ট সই করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

নিরুপায় মুখ করে বিনায়কের দিকে ফিরলাম আমি।—তুমি কি বল?

বিনায়ক জবাব দিল, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

অগত্যা প্রযোজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কততে সই করতে বলছেন?

প্রযোজক এবার নড়ে চড়ে বসল, তুমি বল।

একটু ভেবে আমি বললাম, সাড়ে তিন লাখ।

শুনে প্রযোজকের থেকেও বিনায়ক বোধহয় বেশি চমকে উঠেছিল।

প্রযোজক বলল, এ ছবির ফেট তো এখনো জানো না, এত চাইলে হবে কি করে।

তেমনি হেসেই আমি জবাব দিলাম, ছবির ফেট তাহলে দেখেই নিন না, আর রমেশ সামতানিও ততদিনে এসে যাবে নিশ্চয়।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আর বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে কনট্রাক্ট ফর্ম বার করল।—সই কর।

সই হল। এখানেও নগদে আর চেকে মোটা টাকা অ্যাডভান্স হাতে এলো। ভদ্রলোক চলে যাবার পরেও বিনায়ক নির্বাক কিছুক্ষণ। টাকাটা চোখের সামনে দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।—এ লাইনে এই ব্যাপার?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।—এই ব্যাপার।

৭

দিন যত এগিয়ে আসছে আমার ভিতরটা তত কঠিন হয়ে উঠছে। চেষ্টা করেও আগের মতো ওই লোকের সামনে হাসি ছড়াতে পারি না, খুশি ছড়াতে পারি না। নিজের আনন্দে বিভোর ওই একজন, তাই টের পায় না। তাছাড়া বিয়ের পর বোরিভিলিতে মা-মাসির কাছ থেকে ফিরে এসে এখানকার উৎসবের ব্যবস্থাটা সেরে রাখার চিন্তায় ব্যস্ত। কোর্টের কেসের চাপে বেশি দিনেব ছুটি নেবারও উপায় নেই।

তারপর সেই দিন...। যেদিন আমি সুজাতা প্যাটেল।

বেলা এগারোটার মধ্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল। আমরা দুজন সেখান থেকেই গাড়িতে বোরিভিলির দিকে রওনা হয়ে গেলাম। শহেলির ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে আসে। পাশের লোক ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি আনি নি। দিন কয়েকের ছুটি দিয়ে তাকে তার গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে বলেছি।

গাড়ি ছুটেছে। পাশেব লোকের উদ্ভাসিত মুখ বার বার আমার দিকে ঘুরছে। আমার সব থেকে কঠিন কাজ এখনো বাকি। অথচ অদ্ভুত অবসন্ন লাগছে ভিতরটা। ভয়ংকর রকমের একটা ধকলের পর যে-রকম অবসাদ আসে। সামনের দিকে চোখ রেখে আমি স্থির বসে আছি।

কি ভাবছ বল তো, অত গম্ভীর কেন?

শরীরটা ভালো নেই।

স্টিয়ারিং হাতে ঘুরে দেখল একটু।—আসলে তোমার মন ভাল নেই।

কি ভাবছ সত্যি করে বল... বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ছে বোধহয়?

এতক্ষণের অবসন্ন স্নায়ুগুলো সব এক লহমায় টানটান হয়ে উঠল বুঝি। বক্তকণাগুলো আগুন হয়ে উঠতে চাইল। মুখ ঘুরিয়ে সোজা তার মুখের দিকে তাকালাম। অনুচ্চ গলায় বললাম, খুব মনে পড়ছে।

আজকের দিনে মনে পড়ারই কথা, আমারও নিজের বাবাকে মনে পড়ছে খুব।

মাথার মধ্যে কি যে হতে থাকল আমার জানি না। কি করব এখন? এই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর ফয়সলা করে ফেলব?

কিছুই করলাম না। ভিতরটা ধারালো ছুরির ফলার মতো হয়ে উঠছে।

পৌঁছুলাম। মা-মাসি বউ বরণ করল। রেজিস্ট্রি বিয়ে হোক আর যাই হোক, তাদের অনুষ্ঠানে তারা ত্রুটি রাখবে কেন? যত সময় নেয় তত যেন ভালো।

দিনটা তাদের হৈ-চৈয়ের মধ্যে কাটল এক-রকম করে। এখন রাতের চিন্তা। কিন্তু আজকের রাতের চিন্তা থেকে মাসি অব্যাহতি দিল আমাকে। ভ্রূকুটি করে তাদের

ছেলেকে বলল, পিছন পিছন অত ঘুরঘুর করছিস কি, আজ কালরাত্রি খেয়াল আছে? বউ আজ আমাদের কাছে থাকবে, কাল একেবারে ফুলশয্যের রাতে পাবি —যা ভাগ্‌ এখান থেকে।

ভয়ানক অবসন্ন লাগছে কেন তবু? নিশ্চিন্ত বলে? কাল ফুলশয্যা... তবু কালই বা অত দুশ্চিন্তা কিসের। পুরুষকে দু-চার দিনের মতো নিরাপদ ব্যবধানে রাখার অব্যর্থ অজুহাত মেয়েদের কিছু আছে। এখানে না, সঙ্কল্পের চরম ফয়সলা যা হবার পালি হিলের বাংলোয় গিয়ে হবে। সেখানকার বড়-আশার উৎসবের আগেই হবে। এই মা-মাসিকে এতটুকু আঘাত দিতে চাই না।

পরদিন। সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে ফুলশয্যার রাতও এল।

ফুলে ফুলে ঘরের দেয়াল দেখা যায় না, শয্যাও ফুলে আর ফুলরেণুতে একাকার।

কিন্তু আমার মগজের ছকে-বাঁধা পরিকল্পনাটার আকস্মিক দিন-বদল হয়ে গেল।

ঘর থেকে মা আগেই চলে গেছল, মাসিও যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে থামল। বলল, তোর বোম্বাইয়ের পার্টি-ফার্টি শেষ হলেই পনেরো বিশ দিনের জন্যে বউকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।

আমি পালঙ্কের একটা ফুল মোড়া বাজু ধরে দাঁড়িয়ে। মাসির কথা শুনে ওই একজন হাসি মুখে মাথা নাড়ছে। বলল, এখন হবে না, কাজের চাপ খুব।

কাজ-কাজ করেই গেলি, তুই বিয়ের খাতিরেও ছুটি নিতে পারিস না?

এখন হবে না, পরে ছুটি নিয়ে বেরুব। হাসছে।—এখন সরে পড় তো।

মাসিরও হাসি মুখ।—যাচ্ছি, যাচ্ছি, আচ্ছা বেহায়া তুই বাপু।

ঘর ছাড়তেই দরজা বন্ধ করল।

আর সেই মুহূর্তেই মাথার মধ্যে কি যেন হয়ে গেল আমার, শরীরের রক্ত যেন দাপাদাপি করে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। চোখাচোখি হতেই অনুচ্চ কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বেরুনো হবে না কেন?

বা রে, মাথার ওপর একটা ইম্‌পর্ট্যান্ট কেস ঝুলছে বলেছিলাম না?

কেসটা কার কাছে ইম্‌পর্ট্যান্ট?

সকলের কাছেই।

তুমি আসামীর পক্ষ না উল্টো পক্ষ?

উল্টো পক্ষ। সুর বদল আর ভোল বদল দেখেও অভিনেত্রী বউয়ের নতুন ধরনের রসালাপ ভাবছে।

আমার দু'চোখে আগুন ঠিকরোল কিনা আমি জানি না।—তোমার আসামী দোষী না নির্দোষ?

আমার বিবেচনায় দোষী তো বটেই। নির্দোষ মনে হলে আমি সর্বদা তার হয়েই লড়াই করে থাকি।... কিন্তু তোমার হল কি হঠাৎ?

তখনো দু'চোখে তার কাছে আসার লোভ চিকচিক করছে। ক্ষিপ্ত হাতের টানে মাথার ঘোমটা খসে গেল আমার। গলার স্বর এখনো চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণ।—বিবেচনা। তোমার বিবেচনা! কতটুকু বিবেচনার শক্তি তোমার? কি দেখে বিবেচনার ওপর এত নির্ভর তোমার?

বিষম চকচকিয়ে গেল।—সুজাতা! আজকের দিনে আবার কি হল তোমার?

হ্যাঁ আমি সুজাতা। সুজাতা বীরকর ছিলাম, তোমার বিবেচনার দাপটে মায়ের পদবী আঁকড়ে সুজাতা পাণ্ডুরং হয়েছিলাম, আর আজ সুজাতা প্যাটেল।

বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে। এক বর্ণও মাথায় ঢোকে নি এখনো।—তার মানে?

পাগলের মতো রাগ চড়ছে আমার।—তার মানে তোমার দাম্ভিক বিবেচনার ওই লম্বা লম্বা আঙুল নেড়ে আর মোটা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কোনো অসহায় মানুষকে যুক্তির জালে আটকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দাও নি তুমি?

কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে একটু একটু। এ কাকে দেখছে ভেবে পাচ্ছে না যেন। ব্যাকুল মুখে সামনে পা বাড়ালো।—সুজাতা, কি হয়েছে তোমার? আজকের দিনে এসব কি বলছ তুমি?

ডোণ্ট টাচ্ মি! দু'পা সরে গিয়ে ছুরির ফলার মতোই আবার একটা কোপ বসালাম।—আই হেট ইউ, আই অলওয়েজ হেটেড্ ইউ। আর সেইজন্যেই আজকের এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরকে জেলে পাঠিয়ে গর্বে আর আনন্দে খ্যাতির চুড়োয় ওঠ নি তুমি?

কপালের ঘাম আরো বাড়ছে।...তুমি, তুমি তাহলে লোনাভালার সেই বসন্তরাও বীরকরের মেয়ে?

হ্যাঁ, খুব ভালো করে শুনে নাও, আমি সেই লোনাভালার বসন্তরাও বীরকরের মেয়ে। তোমার জয়ের বিচারের রায় শুনে সেদিনই আমার অসুস্থ মা হাহাকার করে ছুটে আসতে গিয়ে দোতলা থেকে সিঁড়ি টপকে পড়ে সেই সন্ধ্যাতেই রক্তাক্ত মৃত্যু ডেকে এনেছে, আর আমার নিরাপরাধ বাবা তোমাদের বিচারেই ওই বুক-ভাঙা আঘাতে অপমানে উনিশ দিনের মধ্যে সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছে। দু'দুটো মানুষকে হত্যা করেছ তুমি—তোমার বিচার কে করে? কোন ফুলশয্যার জন্যে আমি তৈরি তুমি বুঝতে পারছ না?

শয্যায় বসে পড়ল আস্তে আস্তে। চেয়ে আছে। রক্তশূন্য মুখ—তোমার বাবা নিরপরাধ তোমাকে কে বলল? তিনি তোমাকে জানিয়ে শুনিয়ে এত বড় জালিয়াতির মধ্যে ঢুকবেন এ তুমি আশা কর কি করে?

শ্যাট আপ! আমার বাবাকে আমি চিনি না তুমি চেনো? তাকে চেনাবার জন্যে দিশেহারার মতো তোমার হোটেলে গেছলাম, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে মনে নেই? আজ সেই তোমার সঙ্গে ফুলশয্যা হবে বলে মিসেস প্যাটেল হয়েছি—কেমন?

বিবর্ণ মুখের চোয়াল শক্ত হয়েছে, চিবুক শক্ত হয়েছে। আমি কেয়ার করি না, তাই দেখে আরো ফুঁসছি আমি।

সে বলল, সেই জবাব দেবার জন্যেই তাহলে অসুখের নামে স্টুডিও কামাই করেছ তুমি...ঝি দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, তারপরে এই শোধ নেবার জন্যে এতদিন ধরে এই অভিনয় করে গেছ...আমি যখন আদর করে কাছে টেনেছি ভিতরে ভিতরে তুমি তখন ঘৃণা ছিটিয়েছ আর ছুরি শানিয়েছ?

হ্যাঁ, খুব বুঝেছ। সব শুধু সেইজন্যেই, শুধু এই রাতটার জন্যেই।

ইউ ফাইন ডার্টি অ্যাকট্রেস।...

ইউ প্রাউড স্লেভ অফল। এখন কোর্টে যাও, কোর্টে অ্যানালমেন্ট চাও, আমি যা করতে চেয়েছিলাম করেছি, এখন তুমি কি করবে তাই ভাবো।

কপালের ঘাম মুছছে। মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর এখন। চেয়েই আছে। দেখছে। চোয়াল শক্ত। চিবুক শক্ত। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। হয়তো আমারও।

...ফুলশয্যার রাত ভোর হয়ে এলো। সে শয্যায় বসে। এক-একবার উঠে দাঁড়িয়েছে ঘুরেছে, আবার এসে বসেছে।

আমি ঘরের কোণে একখানা চেয়ারে বসেই আছি।

আবার উঠল। শয্যার দিকে চেয়ে দেখল। ফুল ছড়ানো তেমনি। কেউ শোযনি দেখলেই বোঝা যাবে। এক হ্যাঁচকা টানে বালিশসুদ্ধ বিছানার চাদরটা তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। দু'বার পায়চারি করে চাদরটা তুলে হেলাফেলা করে বিছানায় ছড়াল। বালিশ ক'টাও তুলে বিছানায় ছুঁড়ে মারল।

রাগে একটা দুরন্ত দুর্দান্ত ছেলের মতোই তছনছ করে ফেলতে চাইছে সবকিছু।

বেলা যত বাড়ছে মুখ তত ঠাণ্ডা কিন্তু তত কঠিন।

এক সময় দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই মা আর মাসি এলো। তাদের আদর যত্ন শুরু হয়ে গেল। এখানেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কোনো আপনার মা মাসির সঙ্গেই তফাৎ নেই তাদের।

প্রাতরাশের সময় মাসির গজগজ উক্তি শুনে কান খাড়া হল। ছেলের মাথায় ঢুকেছে আজই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা হতে হবে, নইলে ওদিকের সব রাজকার্য পণ্ড। কেন রে বাপু, আর একটা রাত থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতিস, আগে তো সেই রকমই কথা ছিল।

আমি লক্ষ্য করলাম ছেলে ধারে কাছে নেই। দুপুরেই যাওয়া হবে শুনে স্বস্তি পেলাম একটু। ছেলের কাছে নয়, এদের কাছে যেন অপরাধী আমি।

যাবার আগে মাসি আমার হাত ধরল। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে আসতেই হবে। অভিনেত্রী হয়েও ঠোঁটে সলাজ হাসি দেখাতে পারছি না আমি। বিনায়ক প্যাটেল মা মাসির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠল। তারপর আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে বলল, পড়লে তো ফ্যাসাদে? এখন সত্যি কথা বল—না মাসি, প্রত্যেক সপ্তাহে আসা হবে না, ওর ছবির শেষের দিকের কাজ চলছে—ক'টা মাস এখন আমিই কতক্ষণ দেখা পাই কে জানে। চল, আর দেরি না—

গাড়ি ছুটেছে। পাশাপাশি বসে আছি। এবারে আর ঘাড় মুখ ফিরছে না একবারও। সামনের দিকে চোখ। চোয়াল শক্ত চিবুক শক্ত।

ওখানকার পার্টি হবে কি হবে না?

আমি জানি না।

তোমার জানা দরকার। এই নোংরা খেলা তুমিই শুরু করেছ। আমি মিথ্যে কথা বলি না, তোমার জন্য মা-মাসির কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে।

এই রাগ আর এই অসহিষ্ণুতা দেখে আনন্দ পাচ্ছি। বললাম, মিথ্যে বলা আমারও অভ্যেস ছিল না—তোমার জন্যে শিখতে হয়েছে।

তোমার সবটাই মিথ্যে, সবটাই অভিনয়। শোন, তোমার আমার দু'জনের স্বার্থেই

পার্টি হবে—দুজনে সর্বত্র একত্র হয়ে দু দিকের নেমন্তন্ন সারা হয়েছে। ভবিষ্যতের রাস্তা তারপর ঠিক হবে।

প্রতিশোধ নেওয়াটাই লক্ষ্য ছিল। কাম্য ছিল। পরের কথা মনে ঠাঁই পায় নি। স্টুডিও মহলেও এক্ষুণি আমাকে নিয়ে সাড়া না পড়তে দেওয়াটা আমারও স্বার্থ বটে। তার ঝাঁঝের উত্তরে আমি নির্লিপ্ত জবাব দিলাম, হ্যাঁ, পার্টি হতে পারে।

সেখানে আমাদের আচরণে কেউ কিছু বুঝবে না কেউ কিছু জানবে না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বাইরের কারো জানার দরকার নেই। আর একটিও কথা হল না। পালি হিলের বাংলোয় এসে উঠলাম। একটা সকালের মালী আর একজন পার্টটাইম বেয়ারা শুধু এখানে—বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে নেই। বাংলোয় পাশাপাশি তিনখানা বড় ঘর। সামনের বিশাল হল ঘরটা লাইব্রেরিসহ বসার ঘর। তার পিছনে পর পর দু'খানা বেড রুম, দু'ঘরের মাঝে দরজা। বাইরে দিয়েও দরজা আছে। আর একদিকে ডাইনিং স্পেস। কালই শহেলির এই ঠিকানায় চলে আসার কথা। ডাইনিং স্পেসের ওপাশে আর একটু খুপরি ঘর আছে। সেখানে তার থাকার অসুবিধে হবে না। আজ থেকে তিন দিন পরে পার্টি। তারপর ভবিষ্যতের চিন্তা। সান্তাক্রুজের ফ্ল্যাট ছাড়ি নি আমি।

পার্টির দিন আলোয় আলোয় বাংলো ঝলমল করে উঠল, বাগানের রূপ খুলল। বসার ঘরের আর লাইব্রেরি হলের আসবাব পত্র আগে থেকেই বদলানো হয়েছিল। সেগুলোও ঝকমক করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর থেকেই অভ্যাগতরা আসতে লাগল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা তাদের উচ্ছল আপ্যায়ন জানালাম। এদিকে স্টুডিও মহলের বাকি থাকল না কেউ, ওদিকে বার এবং কোর্টের। যারা আগে দেখে নি আমাকে, তারা প্রকাশ্যেই পঞ্চমুখে কংগ্রাচুলেট করতে লাগল বিনায়ক প্যাটেলকে। সবুরের অর্থাৎ এতদিন বিয়ে না করার সুফলটা সে নাকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সকলকে, এমন রসিকতাও করে গেল অনেকে।

বিনায়ক মিটিমিটি হেসেছে, বলেছে, দেখলে? তুমিই সব, আমি যেন কিছুই না। আমিও পরিতুষ্ট মুখেই সব গ্রহণ করেছি। আজই সব থেকে একাগ্র মনে সাজসজ্জা করেছি। তারপর আয়নায় যাচাই করেছি সহজে কেউ মুখ ফেরাতে পারবে কিনা। একজন অতিথি আসার আগেও ঘরের এই লোকই ফিরে ফিরে তাকিয়েছে অনেক-বার। আমার মনে হয়েছে বুক থেকে তখন নিশ্বাস ঠেলে উঠেছে। সর্বনাশ যে দু'দিকেরই হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

...দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতির বোন কল্পনা দেশাইও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছে। মোটামুটি সুশ্রীই বটে মেয়েটা। চশমা দেখে চোখের পাওয়ার বেশি মনে হল। হাসিমুখে দু'জনকেই অভিনন্দন জানাল সে। কিন্তু আমাকে দেখে চশমার ওধারের চোখ দুটো খুশি হয়েছে মনে হয় নি। আমি সানন্দে তার হাত থেকে উপহার নিয়েছি, প্রচুর আদর যত্ন করেছি। বলেছি, তোমার কথা অনেক শুনেছি।

কল্পনা দেশাই জবাব দেবে কি দেবে না ভেবেছে। বলেছে, তোমাকে পাশে

পাওয়ার পর আমার কথা কারো মনে হতে পারে বলে তো মনে হয় না।

শুনে বিনায়ক প্যাটেল মুখখানা কাঁচুমাচু করে ফেলেছে।

রাত এগারোটার মধ্যে সমস্ত অভ্যাগত বিদায় নিয়েছে।

আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত। একটা সোফায় বসে আছি। অদূরের একটা সোফায় সে। ধকল তারও আমার থেকে বেশি ছাড়া কম যায় নি। আমাদের মাঝের দু-তিনটে বড় টেবিল জুড়ে উপহারের জিনিসপত্র জমে আছে। বাড়ির আর বাগানের আলোগুলো তেমনি জ্বলছে।

...ভাবছে কিছু। এক একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। উঠে কাছে এলো।

সুজাতা!

আমি চেয়ে আছি।

যা হয়ে গেছে তারপরেও আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি। এই রাত থেকে যা শুরু তা সত্যি হোক। এর আগের যা কিছু সব ভুলে যাওয়া সম্ভব কি না?

চোখে চোখ রেখে জবাব দিলাম, আগের যা কিছু তা আমার কাছে অনেকখানি। ...তুমি কতটা অনুতপ্ত?

আমার কোনো অনুতাপ নেই।

সোজা হয়ে বললাম, আইনের জালে ফেলে একজন নির্দোষ মানুষকে জেলে পাঠিয়েছ এ তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না তাহলে?

না। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গই ভুলে যেতে বলছি।

ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম।—তুমি জাহান্নমে যাও। ঘরে চলে এলাম। এই সাজসজ্জা, গয়নাপত্র সব যেন গায়ের মধ্যে জ্বলছে এখন।

পরদিন বিকেলে আবার চূড়ান্ত ফয়সলার জন্য মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। চোয়াল কঠিন, চিবুক শক্ত।

প্রতিশোধ নেওয়াটাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহলে?

হ্যাঁ।

তারপর এখন? তুমি কি করবে আর আমিই বা কি করব?

ভাবি নি।

এত বড় সর্বনাশ ডেকে আনার আগে ভাবা উচিত। এতে শুধু আমার ক্ষতি, তোমার ক্ষতি নেই? আজ আমি তোমাকে সান্তাক্রুজের বাড়িতে সরিয়ে দিয়ে অ্যানালমেন্ট চাইলে তোমার ছবির জগতে সুনাম বাড়বে?

জবাব দেওয়া গেল না। চরম আঘাত হানতে পারাটাই সঙ্কল্পের শেষ ভেবে রেখেছিলাম।

শোন, আইনের দিকটা আরো একটু ভালো করে জানা থাকলে তুমি আর একটু ভাবতে। তবু তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, সত্যি কথা বলার দুর্জয় সাহস তোমার আছে। সেজন্য ধন্যবাদ।

অসহিষ্ণু ক্ষোভে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিল। তারপর আবার সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল—এবারে বেশ বুঝে নাও, কোর্টে তুমি অ্যানালমেন্ট চাইতে

পারো না, কারণ তোমার কোনো যুক্তি নেই। ঘৃণা করে প্রতিশোধ নেবার জন্যে কাউকে বিয়ে করলেও বিয়েটা আইন অগ্রাহ্য করবে না। তাছাড়া আমি কনটেস্ট করব, আর আমি কোনো অভিনয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নেই বলে জিতবও। আমি অ্যানালমেন্ট চাইলে তুমি কনটেস্ট করতে পারছ না, কারণ, করলে আমি হার স্বীকার করে তোমার ওপর দখল নেব। যে ভাবেই হোক, তুমি আমার দখল ছাড়াতে পারছ না। পরিষ্কার বুঝেছ?

হ্যাঁ। বল।

কিন্তু এভাবে দখল নিতে আমার রুচিতে বাধে ভদ্রতায় বাধে, এইটুকু বিশ্বাস করে একটা বছর এখানে এই বাড়িতে থাকতে হবে, ঠিক এখন যেমন আছি সেই রকম। তুমি অভিনেত্রী না হলে এই একটা বছর তোমাকে মায়ের কাছে রাখা যেত, কোনোদিক থেকে কোনো কথা উঠত না।

আমি শুনছি। সমস্যা আছে অস্বীকার করতে পারছি না। পাল্টা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আইনের আশ্রয়ে এই লোক যে আমার এই দেহটার ওপর দখল নিতে পারে বুঝছি। কিন্তু এই স্বরে তাকে নামালাম না, বিশ্বাস করলাম।

সে আবার একটা পাক খেয়ে সামনে দাঁড়াল।—আমি মিথ্যে বলিনে, তাই সত্যি কথাটা শুনে রাখ, এক্ষুণি আমি অ্যানালমেন্ট চাইব না তার দুটো কারণ। এক আমার মা আর মাসি, তাদের একটু একটু করে প্রস্তুত করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, আর দু' আড়াই মাসের মধ্যে আমি সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হতে যাচ্ছি, এ সময়ের মধ্যে আর তার পরেও কিছুকাল আমাকে নিয়ে কোথাও কোনো রকম আলোচনা হোক বা কাগজে কোনো রকম রিপোর্ট বেরুক এ আমি চাইব না। আমাদের ভিতরের সম্পর্কটা বাইরের কাক-পক্ষীতে জানবে না, বরং উল্টো জানলে ভালো হয়। এই শর্ত মেনে একটা বছর তুমি এখানে সসম্মানে থাকবে। এর অন্যথা হলে তুমি আমার কাছে কোনো রকম দয়া মায়া ক্ষমা আশা কোর না। এক বছর বাদে আমরা ডিভোর্স স্যুট ফাইল করব। আমিই করব, তুমি বাধা না দিলে কোনো অসুবিধে হবে না।

প্রস্তাবটা শুধু তার দিক থেকে নয়, আমার দিক থেকেও সমানই বাঞ্ছনীয়। কালকের ওই উৎসবের পর দু' দিনের মধ্যে বা দু পাঁচ মাসের মধ্যে আমাকে নিয়েও কৌতূহলে সরগরম হয়ে উঠুক সকলে, ভাবতেও বিতৃষ্ণা। না, শুধু প্রতিশোধ নেওয়া ভিন্ন এসব চিন্তা আমার মাথায় আসে নি আগে।

বললাম, আমি কারো দয়া মায়া ক্ষমা প্রার্থী নই। সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারার শর্তেই রাজি আছি।

তোমার লাঞ্চ স্টুডিওতে হয়, আমারও আগের মতো বাইরেই হতে পারে। সকালের ব্রেকফাস্ট আর রাতের ডিনারের ব্যবস্থা বাড়িতেই হওয়া দরকার।

শহেলি করবে।

ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।—শহেলি রোববারে দেশে চলে যায়, আমার জন্যে চিন্তা নেই, আমি সেদিন মায়ের কাছে বা অন্য কোথাও যাই, তোমার ব্যবস্থা?

একটা দিন আমারও বাইরে ব্যবস্থা হতে পারে, নিজেও করে নিতে পারি।

ঠিক আছে। কাছের ব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি, তোমার টাকার জোর আছে আমি জানি, কিন্তু আমার সংসারে তার একটা পয়সাও খরচ হবে না।

একথার জবাব নিষ্প্রয়োজন। লম্বা পা ফেলে আর জোরে জোরে মাটি মাড়িয়ে সে মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিচিত্র সংসার যাত্রা আরম্ভ হল আমাদের। বাইরে কেউ কিছু টের পেল না। এমন কি ভিতরের শহেলিও না। দুদিকের কারো বন্ধু বান্ধব এলে অন্তরঙ্গ হাসিমুখে দুজনেই তাদের আদর অভ্যর্থনা করি। দুজনে জুটি বেঁধে চোখে-মুখে খুশি ছড়িয়ে বাইরের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাই। যে কেউ দেখলে বলবে, সুখী দম্পতি বটে। বলেও কেউ কেউ। কিন্তু ভিতরের ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দুই ঘরের দু'জন অজানা অচেনা বাসিন্দা যেন আমরা। সে তার ঘরে ঢোকে, ভিতরের দরজা দিয়ে আমি আমার ঘরে।

দুজনের দরকারী কথাবার্তা যা কিছু সব সকালের চায়ের টেবিলে নয়তো ডাইনিং টেবিলে। আর তা না হলে লাইব্রেরি হলে। সকালে আমি স্টুডিও চলে যাই, সে কোর্টে। সন্ধ্যার পর বা রাতের আগে কারো দেখাও হয় না। কোনো সামাজিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

একটু বিব্রত বোধ করি শুধু বোরিভিলির মা-মাসির টেলিফোন এলে। আমাদের টেলিফোন দু'ঘরের সামনের বারান্দায়। দু-একদিন পরে পরেই সেখান থেকে টেলিফোন আসে। মা'টি যদি তিন মিনিট কথা বলে মাসিটি দশ মিনিট। কথাবার্তা সবই ভিতরের ঘর থেকে শোনা যায়। বিশেষ কবে তাদেব ছেলে যদি তখন শোবার ঘরে থাকে। ওই মা-মাসির সঙ্গে অভিনয় চালাতে গিযেই যা একটু অস্বস্তি বোধ করি। তবে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে প্রথম দু-তিন সপ্তাহ আমি তার সঙ্গে বোরিভিলিতে তাদের কাছেও গেছি। সে প্রস্তাব করেছে, আমি তক্ষুণি সম্মতি দিয়েছি।

এক বছরের এই ঘরকন্না স্বাভাবিক রাখতে আমার দিক থেকে আমি ত্রুটি করি নি। ঘর-দোর আসবাব পত্রের দিকে চোখ রেখেছি। মস্ত লাইব্রেরি ঘরটা নতুন করে সাজিয়েছি। বইয়ের র‍্যাকগুলোর সামনে বেশ বড়সড় একটা পার্টিশন এনে বসিয়েছি। ফলে এত বড় ঘরটার চেহারাই বদলে গেছে। ওই লোক মনে মনে তারিফ করেছে কিনা জানি না, মুখে কিছু বলে নি।

একে একে বিয়ের তিন সপ্তাহ পার হল। সকালে চায়ের টেবিলে বা রাতের ডিনার টেবিলেও দরকারি কথাবার্তা কমে আসছে। গত পাঁচ দিনে পাঁচটা কথাও হয় নি বোধহয়। সেদিন শনিবার। সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে সে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দেখলাম। আমাদের দু'ঘরের মাঝের দরজা সকালে খোলা হয়, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধ হয়। অন্যথায় শহেলি বা পার্টটাইম বেয়ারাটা কিছু ভেবে বসতে পারে।

আমার শুটিং নেই সেদিন। তবু একবার স্টুডিও যাব কিনা ভাবতে ভাবতে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটাই আমার সব থেকে ভালো লাগে। হল্ ঘরের

চারিদিকে র‍্যাকে যে আইনের বই তা নয়, আরো বহু রকমের বই আছে। কিছু পড়ার আগ্রহ থাকলে এখানে বসেও সময় কেটে যেতে পারে। সামনের দিকে সব আইনের বই, পার্টিশনটার ওধারে অন্যান্য বই। আগে এলোমেলো ছিল, আস্তে আস্তে আমিই গোছগাছ করেছি সব।

বাইরে ভারী পায়ের শব্দ। এই অসহিষ্ণু পদক্ষেপ আমার চেনা হয়ে গেছে।

সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ঘুরে তাকালাম।

মিস্টার রমেশ সামতানি।..এখানে পাঠিয়ে দেব?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরের প্রতিক্রিয়া সে কি টের পেল? জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লাম শুধু।

চলে গেল। আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। নিজের বুকের ধুপধুপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন।

৮

না, থমথমে মুখ নয় রমেশ সামতানির। এত বড় ঘরে আর বলতে গেলে বাড়িটাতেও আমাকে একলা দেখে ফেটে পড়ল না। অপরিসীম ধৈর্য বটে মানুষটার। সমস্ত মুখে একটা অপরিসীম বিস্ময় যেন টসটস করছে।

বোসো। কবে এলে?

চেয়ার টেনে একবারে আমার মুখোমুখি বসল। কাল রাত বারোটায়। বাড়ি ফিরেই অত রাতে তোমাকে টেলিফোন করলাম। না পেয়ে অপারেটারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তোমার লাইন ডিসকানেকটেড। সকালে তোমার ফ্ল্যাটে এসে দেখি সেখানে অন্য ভাড়াটে। তারপর তোমার প্রোডিউসারকে ফোন করতে চিচিং ফাঁক। ঝুঁকে একটু ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখে নিল আমাকে। দেন...ইউ আর রিয়েলি মিসেস প্যাটেল নাও, মিসেস সুজাতা প্যাটেল?

হ্যাঁ। এক বছরের জন্য।

..শর্ত ছিল কাক-পক্ষীতেও জানবে না, কিন্তু রমেশ সামতানি কাক-পক্ষীর মধ্যে পড়ে না। তার জানার সঙ্গে আমার জানার কোনো তফাৎ মনে করি না।

এবারে মুখে একপ্রস্থ বিস্ময়ের ওপর আর একপ্রস্থ বিস্ময় চাপল যেন।

এক বছরের জন্য মানে? চা-কফি কিছু খাবে?

হ্যাং ইওর চা-কফি। আমি দেখতে এসেছিলাম তোমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে—এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না...এত যাকে ঘৃণা করতে সেই প্যাটেলকে তুমি বিয়ে করলে। এক বছরের জন্য মানে কি, তারপর খুন-টুন করবে তাকে?

এখানে কথা নয়, তোমার কাজ নেই তো কিছু এখন?

তোমাকে বোঝাটাই এখন আমার আসল কাজ। গেট রেডি—

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। একটু বাদে সমুদ্র ঘেঁষা একটা নির্জন রাস্তায় গাড়িটা থামিয়ে পাশের দরজায় পিঠ দিয়ে আমার দিকে ঘুরে বলল, নাও, হোয়াটস দ্য বিগ জোক?

বললাম সব। স্টুডিওতে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে বিয়ে, ফুলশয্যার রাত, এখানকার পাটি আর তারপরে লোকের চোখে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক-বছরের জন্য বসবাসের শর্ত, কোনো প্রসঙ্গই বাদ দিলাম না।

রমেশ সামতানি প্রথম থেকেই হাঁ করে শুনছিল, দু'ঘণ্টা নিশ্চুপ বসে গত ছ'মাসের সমস্ত ঘটনা শোনার পরেও হতবাক খানিকক্ষণ। তারপর মন্তব্য করল, একটা এম্-এ পাস মেয়েও যে এ-রকম অবুঝ রাম-বোকা হয় আমার ধারণা ছিল না।

আমি রেগেই গেলাম।—তুমি তো বলবেই, আমার যন্ত্রণা তুমি জানবে কি করে?

তোমার যন্ত্রণার মূল কারণ যে সে তো পোর্ট সৈয়দ থেকে ভবসমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, আর মাঝখান থেকে তুমি এই লোকটাকে নিয়ে পড়লে।

তুমি কার কথা বলছ?

তোমার সেই শেখর নায়েক। ফেরার সময় পোর্ট সৈয়দে দিনকতক ছিলাম। একদিন শুনলাম, বোম্বাইয়ের কে একজন সেখানকার হাসপাতালে মরে পড়ে আছে, সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। গিয়ে দেখি শেখর নায়েক।

শোনার পরেও আমার অনুভূতির খুব একটা রকমফের হল না। যে-কাজ করে বসেছি, তার পরে ভিতরের সেই উত্তেজনা যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে রমেশ সামতানি আমাকে লক্ষ্য করল একটু। তারপর বলল, আমারই ভুল হয়েছে, নিজের ছোট্ট কাজটুকু সেরে রেখে যাওয়াই উচিত ছিল।

কি কাজ?

তোমাকে বিয়ে করে যাওয়া।...আমি বোকার মতো ভাবলাম, বাজারের এক সেরা অভিনেত্রীকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবার পর বিয়েটা করলে নিজের কদর বাড়বে। যাক, এখন চট্‌পট্ ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা কর তো, আব এক বছর টেনে কাজ নেই।

মনঃপূত হল না।—সেটা করতে গেলে হার অনিবার্য, তাকে ব্যারিস্টার ছোট ভেব না—তখন উল্টো বিপদ হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রমেশ সামতানি বলল, কিন্তু এক বছর ধরে তুমি অন্যের ঘব করবে আর আমি দেখব চেয়ে চেয়ে?

হেসেই জবাব দিলাম, যেমন ছিলাম তেমনই পাচ্ছ, তফাৎ তো শুধু এক বছরের।

ঘটা করে আবার এক দফা হাঁটু থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল সে। বলল, মাত্র তো তিন সপ্তাহ গেছে পাশাপাশি ঘরে আছ, বক-ধার্মিকের মতো ব্যারিস্টার সাহেব শুধু বসেই থাকবে, ভবিষ্যতেও তোমার ওপর হামলা হবে না তার বিশ্বাস কি?

খুব না ভেবেই জবাব দিলাম, যতটা চিনেছি ওটুকু বিশ্বাস করা যেতে পারে।

শুনে ব্যারিস্টার সাহেবের সম্পর্কে একটা অশ্লীল মন্তব্য করল সে, অর্থাৎ তাই যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটা একটা সত্যিই পুরুষ কিনা সেই সন্দেহ থেকে যায়।

সেই সকালে বেরিয়েছিলাম, রাতে একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর রমেশ সামতানি বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গেল আমাকে। ভিতরে ভিতরে আমার কেমন হাঁপ ধরে গেছল, অনেকটা হালকা হওয়া গেছে এখন।

কিন্তু ভিতরে পা দিয়ে খারাপ লাগল একটু। ডিনারের সময় পার হয়ে গেছে, বিনায়ক প্যাটেল তার ঘরে বসে। দ্বিধা কাটিয়ে বললাম, আমি খেয়ে এসেছি।

সেই গম্ভীর মুখ, কঠিন চোয়াল আর শক্ত চিবুক।—সেটা ঠিক সময়ে টেলিফোন করে জানানো উচিত ছিল।

আমার দ্বিধা-ভাব কেটে গেল। সোজা নিজের ঘরে পা দিয়ে মাঝের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পরদিন রবিবার। সকালে একলাই বোরিভিলিতে মা-মাসির কাছে চলে গেল। আমি যাব কি যাব না জিজ্ঞাসা করল না। জিজ্ঞাসা করলে যাওয়া হবে না-ই বলে দিতাম। বলা থেকে অব্যাহতি পেলাম।

খানিক বাদে রমেশ সামতানি এলো। আসার কথা ছিল। লাইব্রেরিতে বসে গল্প করলাম কিছুক্ষণ, তাবপর বেরিয়ে পড়লাম। আজ আরো নিশ্চিন্ত। শহেলি রবিবারের ছুটিতে তার গ্রামে চলে গেছে। কাল ভোরের আগে ফিরবে না। আর পাশের ঘরের লোকও কাল ন'টার আগে ফিরছে না।

সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রমেশের সঙ্গে কাটিয়ে রাতে একটা নামী হোটেলে খেতে ঢুকেছি। আলাদা ঘর। এর মধ্যে রমেশ আমাকে হঠকারিতার জন্যে অর্থাৎ মিসেস প্যাটেল হয়ে বসার জন্যে অনেকবার বোকা, ভাবাবেগের দাস ইত্যাদি বলে কম গঞ্জনা দেয় নি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর যে কাণ্ডটা করে বসল সে তার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। দরজা ঠেলে দু'জনে একসঙ্গে বেরুবার আগেই তার দু'হাত আমার কাঁধের ওপর উঠে এলো। কিছু বোঝবার আগেই সজোরে বুকে টেনে নিল সে। তারপর দম ফেলার অবকাশ না দিয়ে উপর্যুপরি চুমু খেয়ে চলল।

আত্মস্থ হবার পর বেশ জোর করেই ঠেলে সরালাম তাকে। একটু কঠিন সুরেই স্থির চোখে তাকিয়ে বললাম, কাজটা তুমি ভালো করলে না।

কেন ভালো করলাম না? গলাব স্বর নীরস তারও।

বললাম, আমি একজনকে শর্ত দিয়েছি এক বছরের জন্যে সে-শর্ত রাখব। আবার যদি এ-রকম কর, তোমার সঙ্গে একলা কাটানো আমার পক্ষে মুশকিল হবে।

তারও অসহিষ্ণু চাউনি—ঠিক আছে, মনে রাখতে চেষ্টা করব।

বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেল যখন রাত দশটা। কিন্তু পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ালাম আমি। আমার পাশের লোকের ঘরে আলো জ্বলছে।

দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। বন্ধ করে ও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ও-ঘরের ভিতর দিয়েই নিজের ঘরে যেতে হবে।

পরদা সরিয়ে ভিতরে এলাম।...নিবিষ্ট মনে একটা আইনের বই পড়ছে। হঠাৎ মনে হল জিজ্ঞাসা করি রাতের মধ্যেই বোরিভিলি থেকে ফেরার কারণটা কি।...কিন্তু

রমেশ যে-কাণ্ড করেছে, কিছুই বলা গেল না। বই থেকে মুখ তুলে সে তাকালোও না। আমি নিজের ঘরে এসে মাঝের দরজা বন্ধ করলাম।

একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি রমেশের, যেন অত কাজ নেই এখন হাতে। শুটিং শেষ হবার আগেই আমার জন্যে স্টুডিওতে এসে বসে থাকে। তারপর তার পাল্লায় পড়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় প্রায়ই। অবশ্য বেশি দেরি হবে বুঝলে ডিনারের আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দিই। ও-ধারের টেলিফোন্ নামিয়ে রাখা ছাড়া একটি শব্দও কানে আসে না। শনিবার বা ছুটির দিনে রমেশ বাড়ি এসে আড্ডা জমায় খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে টেনে বার করে।

মাসখানেক কাটল এইভাবে।

সেদিনও একটু রাত হয়েছে ফিরতে। নিজের ঘরে যাচ্ছি, বাধা পড়ল।—শোন!

ফিরে দাঁড়ালাম। সেই ঋজু কঠিন মুখ।

এক বছর বাদে ওই রমেশ সামতানিকে তুমি বিয়ে করবে?

হতে পারে।...কেন?

হলেও সেটা এক বছবের আগে হচ্ছে না নিশ্চয়?

সেই রকমই তো শর্ত।

হ্যাঁ সেই রকমই শর্ত। তুমি রূপসী ফিল্ম আর্টিস্ট, বাইরের একজনের সঙ্গে এত বেশি বাইরে মাখামাখি করে বেড়ালে সেটা খবর হয়ে ওঠে। তাতে আমাব অসুবিধে আছে। লাইব্রেরি ঘরে বসে যত খুশি গল্প কর কিছু বলব না।

শুনে রাগ হল বটে, কিন্তু জবাব দেওয়া গেল না। রমেশ সামতানির জুলুম চেষ্টা করেও ঠেকানো সহজ নয।

পরদিন খোলাখুলিই ব্যাবিস্টার সাহেবের আপত্তিব কথাটা তাকে জানালাম। বললাম, বাইরে অত মেলামেশা সত্যিই আর চলবে না।

রমেশ সামতানি ঠাণ্ডা মেজাজে বলল, তোমার আপত্তি না থাকে তো ওব মাথাটা আমি গুঁড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

বাজে বোকো না।

এরপর বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরি ঘরে বসেই আড্ডা হয় আমাদের। বাইরে বেরুলেও তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করি।

আরো মাসখানেক বাদে স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরেই হঠাৎ টেলিফোন পেলাম একটা। মেয়ের গলা। চেনা গলা। কল্পনা দেশাই। গোড়ায় দু-চার দিন বাড়ি এসেছে। এখন আর আসে না। তবে মাঝে মাঝে টেলিফোন করে।

ব্যারিস্টার সাহেবের খোঁজ করল। বাড়ি নেই শুনে আমাকেই বলল, দুদিন ছিলাম না এখানে তাই তোমার কর্তাকে অভিনন্দন জানাতে দেরি হয়ে গেল।

অভিনন্দন কেন?

বা রে, তুমি জানোই না নাকি। কতজনকে টপকে স্ট্যাণ্ডিং সিনিয়র কাউনসেল হয়েছে—কত বড় সম্মান।

একটা ধাক্কা সামলে হাসতে চেষ্টা করলাম।—পুরোনো খবর, ভুলে গেছি।

ও-দিক থেকে টিপ্পনিব সুব, ছবিব জগৎ নিয়ে আছ, ভুলবেই তো।

সন্ধ্যাব পব বাড়ি ফেরাব সঙ্গে সঙ্গে আমাব আব সবুব সইল না। চাপা ঝাঁঝে জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব সঙ্গে আমাব শর্তটা কি একতবফা নাকি?

গম্ভীব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো।

তুমি সিনিয়ব স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হযেছ, কল্পনা দেশাই তাই তোমাকে অভিনন্দন জানানোব জন্য টেলিফোন কবেছিল। আমি বুঝতে পাবি নি কেন। তাই দেখে সে ঠাট্টা কবেছে আমাকে, কিছু সন্দেহ হওযাও বিচিত্র নয।

জবাব না দিযে গম্ভীব মুখেই সে জামা-কাপড বদলাতে গেল।

তাব সঙ্গে দু-তিনটে অভিনন্দন সভায যোগ দিতে হল আমাকে। সকলেব চোখে সেখানে আমবা আদর্শ দম্পতি।

এবপব ক্রমশ দেখা যেতে লাগল বাড়ি ফিবতে তাবই বাত হয। গোড়ায় গোডায আমি ভাবতাম নতুন কাজেব চাপ। কিন্তু এবপব ডিনাবেব আগে মাঝে মাঝে তাব টেলিফোন আসতে লাগল, সে খেযে আসবে, অপেক্ষা কবাব দবকাব নেই। সেই টেলিফোন এক-আধদিন কল্পনা দেশাইও কবল। তখন বুঝলাম সন্ধ্যাটা তাব কোথায কাটছে। আব, ইদানিং প্রাযই টেলিফোন কবে কল্পনা দেশাই—কিন্তু আমি টেলিফোন ধবলে কাঠ কাঠ দুটো কথা বলে কিংবা বাড়িব মালিক নেই শুনলে নামিযে বাখে। আমি নিঃসংশয আমাদেব ভিতবেব অবস্থাটা সে জেনেছে। জেনে খুশি হযেছে।

বাগেব মাথায আবাব বোঝাপডায নামলাম আমি।—বমেশ সামতানিব সঙ্গে আমি বেশি ঘোবাঘুবি কবলে সেটা খবব হয, কল্পনা দেশাইযেব সঙ্গে তুমি প্রাযই সন্ধ্যা থেকে অত বাত পর্যন্ত কাটালে সেটা খবব হতে পাবে না?

না। তাব সঙ্গে আমাব কেসেব আলোচনা থাকতে পাবে।

তুমি সিনিযব স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল আব সে উকিল, আলোচনাব দবকাব থাকলে তাবই আসাব কথা তোমাব কাছে।

সে গম্ভীব এবং নিরুত্তব।

শোন, তুমি তো মিথ্যে বল না। আমি যদি বলি, আমাদেব ভিতবেব অবস্থাটা তোমাব দোষেই সে বুঝে নিযেছে?

হতে পাবে। আব আমি যদি বলি আমাদেব ভিতবেব অবস্থাটা তোমাব দোষে বমেশ সামতানিও ভালো কবেই বুঝে নিযেছে?

এবাবে আমি নিরুত্তব।

কিন্তু দিন যত যাচ্ছে ক্রমশ আমাব ধৈর্য কমছে কেন জানি না।

দিন যাচ্ছে। মাস যাচ্ছে। এব মধ্যে একদিন বোবিভিলিব থেকে খবব এলো, মাযেব হঠাৎ বক্তচাপ খুব বেডে স্ট্রোকেব মতো হযেছে, এক্ষুণি আসা দবকাব।

খববটা পেযেই সে যাবাব জন্যে প্রস্তুত হল। ববং ভালো দিন-কতক আমার এখন শুটিং-এব ডেট নেই। কাজ প্রায শেষ হযে এসেছে। বললাম, আমিও যাব।

গেলাম। অসুখ বেশিই বটে। সেখানকাব সব থেকে বড ডাক্তাব আনা হল।

চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষা চলল। দুটো দিন থেকে তাদের ছেলেকে চলে আসতে হল। কাজের চাপ। আমি স্বেচ্ছায় থেকে গেলাম। যে দু'দিন সে ছিল, আমি তার মায়ের শিয়রে বসেই রাত কাটিয়েছি।

রোজ টেলিফোনে খবর নেয়। আমি বলি, ভালোর দিকে যাচ্ছে, চিন্তা কোর না। সাতদিন বাদে আবার এসে মাকে দেখে গেল। অনেকটা ভালো। শুটিং কামাই করে তারপরেও সাত দিন থেকে গেলাম আমি। এবারে এসে প্রায় সুস্থই দেখল মাকে। এ-ঘরে থেকে শুনলাম, মাসি শত মুখে প্রশংসা করছে আমার। বলছেন, এম-এ পাশ মেয়ে, তায় ছবি করে, কিন্তু এ-মেয়ে যে এমন অক্লান্ত সেবা করতে জানে তা কি একবারও ভেবেছি। মেয়ে নয়তো রত্ন, যত্নআত্তি করিস বাপু একটু, দিনরাত নিজের কাজে ডুবে থেকে হেলাফেলা করিস না।

এবারে সঙ্গে ফিরতে হল আমাকে। আর শুটিং কামাই করা চলে না। গাড়িতে সে বলল, মাসি খুব প্রশংসা করছিল তোমার, মায়ের অক্লান্ত সেবা করেছ।

জবাব দিলাম, আমি পাকা অভিনেত্রী সে-তো তোমার জানাই আছে। মাসির কথায় বিশ্বাস করার কি আছে।

তোমাকে আগেও বলেছি, তোমাকে বিশ্বাস কবি কারণ তোমার সত্যি বলার সাহস আছে। তাই মাসির কথাও অবিশ্বাস করছি না। শুধু একটা অবসেশনই তোমার বিকৃতি।

আমার কথায় আমার বাবাকে বিশ্বাস না কবাটা তোমার শুধু বিকৃতি নয়, দম্ভও।

আর কোনো কথা হল না।

এর পর কৃতজ্ঞতা বোধে কিছুটা ঠাণ্ডা হবার বদলে দিনে দিনে মানুষটার যেন ক্ষোভ বাড়ছে মনে হল। খাওয়া ভুলে অনেক সময় বিমনা হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চোখোচোখি হলে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ বিরক্তি।

বিয়ের আট মাস হয়ে গেছে। আর চার মাস বাদে আমার এই খেলার শেষ। কিন্তু আমিও যেন শ্রান্ত ক্লান্ত। বর্তমানের এই ছবি শেষ হয়ে গেছে, ভালো হাউসে রিলিজ পেতে কিছু দেরি। বর্তমান প্রোডিউসার আর সেই নতুন প্রোডিউসার দুজনেই তাদের নয়া ছবির কাজ শুরু করার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু আমার যেন কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই আর।

সেদিন। রাত তখন আটটা। আমার ঘরের মাঝেব দরজা বন্ধ। বাইরের দিকের দরজাও। ঘরের আলো নিভানো।

...একজন আমাকে, প্রাণপণে বুকে আঁকড়ে ধরেছে। আমি প্রায় আর্তনাদ করছি, ছাড়ো ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো। আমার স্বামী আছে, তার আসার সময় হয়েছে, আমাকে বিপদে ফেলো না, ছাড়ো। দোহাই তোমার, ছাড়ো।

...কিন্তু ওই পুরুষ বড় অবুঝ। আরো শক্ত করে বাহু বন্ধ করেছে আমায়। বলছে, কেন ছাড়ব, তুমি আমাকে ভালোবাস আমি তোমাকে ভালবাসি। আসুক সে, তুমি এত ভয় পাও—কেন? এভাবে আর কত অপেক্ষা করব আমি।

বাইরে কার পায়ের বেদম আঘাতে সশব্দে দরজা দুটো খুলে গেল। তখনও

ঘর অন্ধকার, তখনও আমি ওই পুরুষের বাহু বন্দী।

শব্দ করেই আলোটা জ্বালা হল।

পরক্ষণে নির্বাক বিমূঢ় বাড়ির মালিক বিনায়ক প্যাটেল।

শয্যায় একলা আমি বসে। আমার সামনে সাউণ্ড ফিট করা একটা যন্ত্র। দেয়ালে মিনিয়েচার প্রজেকশনে আমি আমার সদ্য সমাপ্ত ছবি দেখছিলাম।

ফিরে তাকালাম তার দিকে।

চোখোচোখি হতে নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ব্যাপারখানা কি আমার বুঝতে দেরি হয় নি। হাসি পাবার কথা। আনন্দ পাবার কথা। এত জব্দ ওই লোক বুঝি জীবনেও হয নি। কিন্তু হাসা গেল না। ভিতরটা ইদানীং সর্বদাই কেমন ভারাক্রান্ত আমার। মনে হয়, অভিনয়ের থেকেও জীবনের এই খেলাটা আরও বেশি অসহ্য। এ-যেন এখন শেষ হলে বাঁচি।

৯

রমেশ সামতানিরও কাজের চাপ বেড়েছে। রোজ আসছে না। এলেও বেশিক্ষণ আড্ডা জমাতে পারছে না। সেদিনও রাত আটটার আগেই উঠি উঠি করছে।

বাইরে গাড়ি আসার শব্দে বুঝলাম বাড়ির মালিক ফিরল। তার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে শহেলি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, সাহেব এক্ষুণি একবার ডাকছেন।

এ রকম কখনও ঘটে নি। আমি যথার্থই অবাক। আমার এই বিস্ময় রমেশও সকৌতুকে লক্ষ্য করল। চোখোচোখি হতে বলল, আমিও চলি, কি বল?

কিছুই না বলে আমি বেরিয়ে এলাম।...তার ঘরের আলো নেভানো। ভিতরে পা দিতেই অন্ধকারে মৃদু গম্ভীর ফিসফিস শব্দ।—চুপ, জোরে কথা বোলো না। আলো জ্বালতে হবে না, এদিকে এস, লাইব্রেরি ঘরে কেউ আছে?

হঠাৎ হকচকিয়েই গেছি আমি।—মিস্টার রমেশ ছিল, উঠবে বলছিল...কেন?

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে বিদায় দিয়ে এসো। খুব দরকার। আর শোন, শহেলিকে কোনো কাজের ছুতোয় মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে এটুকু বুঝেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দেখি রমেশ চলেই গেছে। শহেলিকেও কাজের ছুতোয় বাইরে পাঠিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে ফিরলাম।

চলে গেছে?

হ্যাঁ।

শহেলি?

বাইরে।

ঠিক আছে। লাইব্রেরি ঘরে এসো। সে আগে আগে চলল। আমি পিছনে। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আর একটা চেয়ার কাছে টেনে সে মুখোমুখি বসল। এই লোকের কঠিন চোয়াল আর শক্ত চিবুক অনেক দেখেছি, কিন্তু এ রকম চিন্তাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখ বড় দেখি নি।

চোখে চোখ রেখে সামনে ঝুঁকল।—শোন, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা-ই হোক, তোমাকে আমি কখনও অবিশ্বাস করি নি। করেছি?

জবাব দিলাম, অবিশ্বাস করার মতো কোনো কাজ আমি করেছি বলে মনে পড়ে না।

না, কর নি। করলে আমি বুঝতে পারতাম। আজ যে কথাটা বলব, তোমার আর আমার বাইরে পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় লোক জানবে না। জানলে একজনের প্রাণ যেতে পারে।

তাহলে আমাকে বলছ কেন?

কারণ বিশ্বাস করার মতো একজনকে আমার দরকার। এটা তোমার আমার ব্যাপার নয়, দেশের স্বার্থের ব্যাপার।

বল।

প্রাণের ভয়ে অর্ধ উন্মাদ একটি মেয়েকে কয়েকটা দিন লুকিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, মাদক ওষুধ খাইয়ে বা ইনজেকশন করে দিন রাতের বেশির ভাগ সময় তাকে বেহুঁশ করে রাখা হয়। তাইতেও সমস্ত স্নায়ু এখন বিকল প্রায়। বাইরের এক বিরাট র‍্যাকেটের দল থেকে হঠাৎ কি করে সে বম্বে চলে এসেছে। তাকে সুস্থ করে কোর্টে নিয়ে আসতে পারলে সেই গ্যাং ধরা পড়বে। সোনা আর হাসিস চোরাই চালানের গ্যাং—হাসিস হল ভয়ানক রকমের একটি মাদক। এই চোরাই চালানে কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে। গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করেও তাদের হদিশ পাচ্ছে না।

শোনার পর আমারও উত্তেজনা বাড়ল—সেই মেয়েটি কোথায়?

তোমার ঘরে।

আমি আঁতকে উঠলাম।—সর্বনাশ! কেউ দেখে ফেলে নি?

না, আমি আগে দেখে-শুনে সাবধান হয়ে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছি। এখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থা তার।...শোন, এই-রাতেই তাকে এখান থেকে সরাতে হবে। একেবারে নির্ভয়ে খুব ঠাণ্ডা মতো থাকতে পারে এমন কোনো জায়গায়। আমি তাকে মায়ের কাছে বোরিভিলিতে রেখে আসতে পারতাম, কিন্তু সেটা একটুও নিরাপদ হবে না, কারণ আমি স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল...কেস সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার চেনা-জানা চারদিকে তারা সেই মেয়েকে খুঁজে বেড়াবে। তোমার জানা এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তাকে দিনকতক রাখতে পারি? সী মাস্ট বি অ্যাবসলিউটলি ইন্ সেফ হ্যাণ্ডস—

আমি একাগ্র চিত্তে ভাবতে লাগলাম। ওপরঅলা যেন মুহূর্তের মধ্যে জায়গার হদিশ দিয়ে দিল। লক্ষ্মীমাসি আর মংগেশের মুখ মনে পড়ল আমার—আছে। শিবলিতে—সেখানে আমার এমন দু'জন লোক আছে যারা আমাকে ছোট থেকে মেয়ের মতো মানুষ করেছে—নিজের ছেলেদের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসে।

শিবলি...কতদূর এখান থেকে?

পঁচিশ-তিরিশ মাইলের মধ্যে।

ঠিক আছে। এবার সে উঠে দাঁড়াল।—শহেলি ফিরলে তাকে বল, আমরা একটু

কাজে বেরুচ্ছি, রাত সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরব। আমার বেশবাস দেখে নিল। বদলাবার দরকার নেই, যদিই বেরুতে হয় ভেবে প্রসাধন আর বেশবাস সেরেই রেখেছিলাম।—তুমি শহেলিকে কিচেনে আগলে রেখ খানিক, মেয়েটিকে নিয়ে আমি গাড়িতে উঠলে বেরিয়ে আসবে। রাত করে দেখতে পাবে না, তবু সে এসে বাইরের দরজা বন্ধ করার আগে তুমি গাড়িতে উঠবে।

লঘু ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। আমিও বেরিয়ে এলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে বাইরের কাজ সেরে শহেলি এল। আমি তাকে সঙ্গে করে কিচেনে ঢুকলাম। তক্ষুণি আবার একটা রান্নার ফরমাশ করলাম তাকে। ঘড়ি ধরে সাত মিনিট সেখানেই অপেক্ষা করলাম। শহেলি তখন আমার ফরমাশ মত বাটনা বাটছে। ঘণ্টা আড়াই তিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি শুনে মাথা নাড়ল। আমি বেরিয়ে দালানের মাঝামাঝি এসে চেঁচিয়ে বললাম, বাইরের দরজা বন্ধ করে দিও।

আধ মিনিটের মধ্যে বাইরের দরজা ভেজিয়ে গাড়িতে তার পাশে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটল। আমি সভয়ে পিছন দিকে তাকালাম একবার।

কোণে স্তূপের মতো পিছনে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন।

রাত সোয়া ন'টার মধ্যে আমরা শিবলিতে পৌঁছে গেলাম। দু'বার এসেছি, বাড়িটা চিনতে ভুল হল না।

লক্ষ্মী মাসি আমাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল প্রথম। তারপর সানন্দে খুশিতে হাউমাউ করে জাপটে ধরলো আমাকে। পিছনের লোককে দেখে থমকালো একটু, তারপর ডবল আনন্দ।—এ কে? জামাই?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, খুব একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছি মাসি, আজ বেশি কথা বলবার সময় নেই, মংগেশ কোথায়?

লক্ষ্মী মাসি কপাল চাপড়ালো।—হা রে আমার পোড়া কপাল, তুমি আর জানবে কি করে—লোনাভালা ছেড়ে এখানে এসে বসার দু'মাসের মধ্যেই তো সে চোখ বুজেছে।

বড় সড় একটা ধাক্কা সামলাতে হল।

পরে তাকে বক্তব্য বোঝালাম। শুনে প্রথমে হাঁ সে। তারপর বলল, ঠিক আছে, আমার এখানে কেউ টের পাবে না—নির্ভয়ে রেখে যাও।

বিনায়ক জিজ্ঞাসা করল, খুব জানাশোনা ডাক্তার আছে এখানে?

আছে।

সে রকম দরকার পড়লে তাঁকে এনে দেখাতে হবে। কিন্তু কিছু বলা চলবে না, শুধু বলতে হবে একজন আত্মীয়, মাদক ওষুধ খেয়ে খেয়ে এই দশা হয়েছে, এখন সর্বদাই তার প্রাণের ভয় আর আতঙ্ক, ভালো করে কথাও বলতে পারে না।

বিনায়ক আবার গিয়ে প্রায় টেনে হিঁচড়েই নিয়ে এল রমণীটিকে। ভিতরের একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। ওই প্রথম ভালো করে তাকে দেখলাম আমি। বয়স ঠাওর করা গেল না। পঁয়তিরিশ হতে পারে। পঞ্চাশও হতে পারে। নিষ্প্রভ বিকৃত মুখ। সর্বাঙ্গে কালচে ছোপ। চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করল। টেনে

টেনে বিড়বিড় করে বলল, ওরা আমাকে ঠিক ধরবে...খুন করবে...

কানের কাছে মুখ নিয়ে বিনায়ক বলল, কোনো ভয় নেই, এটা আমাদের নিজেদের বাড়ি, এখানে কেউ আপনার খোঁজ পাবে না।

দু-চারবার মাথা নেড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের শিশি বার করে বিনায়ক লক্ষ্মী মাসির হাতে দিল। বলল, জাগলেই খুনের ভয় পাচ্ছে দেখবে, আর মাদক ওষুধ চাইবে। বেশি কষ্ট পাচ্ছে দেখলেই এই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবে। সমস্ত দিন রাতে চারটে পর্যন্ত ট্যাবলেট দিতে পারো, তার বেশি দরকার হবে না।

এরপর লক্ষ্মী মাসির হাতে জোর করেই কতগুলো নোট গুঁজে দিল সে।

আবার গাড়ি ছুটছে। দুজনেই চুপচাপ খানিকক্ষণ। একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, একে ওরা একেবারে শেষ না করে জিইয়ে রেখেছিল কেন?

স্টিয়ারিং ধরা হাত, সামনের দিকে চোখ রেখেই সে জবাব দিল, ঠিক জানি না, তবে আমার যা অনুমান পরে বলব। মেয়েটা একটু সুস্থ হোক।

মেয়েটার নাম কি?

তাও জানি না, আধা বেহুঁশ অবস্থায় ছ'টা সাতটা নাম বলেছে। কোনটা ঠিক কে জানে, হয়তো একটাও ঠিক নয়।

আর কোনো কথা হল না। কিন্তু এই লোকের এ-ভাবে সাহায্যে আসতে পেরে কেন যেন ভালো লাগছে।

বাড়ি পৌঁছে কলিং বেল টেপার আগে দরজা ঠেলতেই দরজা দুটো খুলে গেল। বিরক্তি চেপে ভিতরে ঢুকলাম। বিনায়ক চিন্তিত মুখে নিজের ঘরে চলে গেল।

শাসনের সুরে শহেলিকে বললাম, বাইরের দরজা বন্ধ করে রাখতে পার নি?

আকাশ থেকে পড়ার মতো শহেলি বলল, বন্ধ করেছিলাম মনে হচ্ছে!

রাগত মুখে চলে এলাম। মুখের ওপর এ-রকম মিথ্যা কথা আগে বলত না।

এতদিনের অভ্যাস মতোই মাঝের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কি ভেবে ঘুরে তাকালাম জানি না।...আমার দিকেই চেয়ে আছে সে। চোয়াল আর চিবুক কঠিন নয় একটুও, চাউনিটাও নরম।

পরদিন সকালের দিকে নতুন ছবির মহরত ছিল আমার। পুরনো প্রযোজকের সঙ্গেই আগে দ্বিতীয় ছবি শুরু হবে। বিকেলের আগেই ফিরলাম। সন্ধ্যায় রমেশ সামতানি এল। তার সঙ্গে নতুন ছবি নিয়ে খোশ গল্প হল কিছুক্ষণ। তারপর সে চলে গেল। বিনায়ক ফেরে নি তখনো। সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন কল্পনা দেশাইয়ের কথা মনে হল আমার। আর তক্ষুণি একটা চাপা বিরক্তি।

তারপর দিন। শনিবার। সকাল তখন সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। পাশের ঘর থেকে একটা উত্তেজিত চিৎকার।—সুজাতা! শিগ্‌গীর এদিকে এসো।

ছুটে এলাম। তার সামনে খবরের কাগজ। মুখ থমথম করছে। চোয়াল চিবুক শক্ত। ঘোরালো চোখে তাকালো আমার দিকে।—তোমার শিবলির সেই লক্ষ্মীর নাম কি? লক্ষ্মী যোশী?

হ্যাঁ কেন? আমি চমকেই উঠলাম।

সর্বনাশ হয়েছে। তাকে কেউ খুন করেছে।

আমি আঁতকে উঠলাম।—কাকে? লক্ষ্মী মাসিকে?

হ্যাঁ। এই দেখ।

রুদ্ধশ্বাসে খবর পড়লাম। গতকাল বেলা তিনটের সময় রাস্তার ধারের এক দুধের ক্যানটিন থেকে শ'খানেক গজ দূরে ফাঁকা মাঠের এক গাছের আড়ালে লক্ষ্মী যোশী নামে শিবলির প্রায়-বৃদ্ধা এক রমণীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ক্যানটিনের মহিলা কর্মী জানিয়েছে, লক্ষ্মী যোশী দুটো দুধের বোতল নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। বোতল একটু বাদে নিচ্ছে জানিয়ে সে বেরিয়ে যায়। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপার।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বসেই পড়লাম।

সে ঝাঁজিয়ে উঠল, দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও, এক্ষুণি বেরুতে হবে।

গাড়ি ছুটছে। আমি নির্বাক স্তব্ধ। শিবলি পৌঁছুলাম। বাড়িতে লোক দেখলাম। লক্ষ্মী মাসির দুই ছেলেই এসে গেছে। তারা আমাকে চিনল। আমি কিছু বলার আগেই প্যাটেল জানান দিল, আমরা সকালের কাগজ পড়ে এসেছি। তার চোখে চোখ পড়তে ইশারা বুঝলাম। আমি চুপ। না, বাড়িতে সেই একজনের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ তার খবরও জানে না।

গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটল আবার। দু'হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরা। ভয়াবহ কঠিন মুখ। বার দুই তিন আমার দিকে ফিরল। গলার স্বরও যেন ইস্পাত কঠিন।

—তাহলে পরশু রাতের সেই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তুমি কারো কাছে করেছ?

শোনামাত্র আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম।—কক্ষনো না! আমি কাউকে বলি নি।

শহেলিকে?

না।

রমেশ সামতানিকে?

না না।

স্টুডিওর কাউকে?

না না না! কাউকে না। তুমি বিশ্বাস করছ না কেন?

পৃথিবীতে একমাত্র আমি তুমি আর তোমার লক্ষ্মী মাসি ছাড়া আর কেউ এই মেয়েকে এখানে এনে রাখার খবর জানে না। তুমি কাউকে না বলে থাকলে এ-রকম ব্যাপার ঘটল কি করে?

দু'চোখ দিয়ে যেন ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, আমি কাউকে বলিনি বলিনি বলিনি! আর যেভাবে হোক কেউ যদি জেনেই থাকে, ওই মেয়েটাকে খুন না করে তারা লক্ষ্মী মাসিকে খুন করতে গেল কেন?

হিস হিস জবাব এল, একটু মাথা খাটালেই সেটা বোঝা সহজ। ওই মেয়ের নামে ছ-সাতটা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে স্মাগলাররা তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল। দরকার মতো তাকে খুনের ভয় দেখিয়ে সই করিয়ে নেয়, তারপর ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখে। সব টাকা সরানোর আগে তাকে মারলে হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি

তাদের, তার সই ভিন্ন ব্যাঙ্ক টাকা দেবে কেন!

বুকের ভিতরটা কাঁপছে আমার। মানুষ এমন পশুও হয়!

বাড়ি ফিরলাম। ভিতরটা রাগে আর গ্লানিতে ভরে যাচ্ছে। পাশের ঘরের এই লোক আমাকে বিশ্বাস করে নি ঘৃণা আর রাগ তার চোখে মুখে। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যখন জানে না তখন সন্দেহ আমারই ওপর।...কিন্তু আশ্চর্য, এ-রকম ঘটনা ঘটল কি করে!

বিকেলে রমেশ আসতে বলে দিলাম, আজ শরীর মন কিছুই ভালো না, বেরুনো হবে না, আর বসতেও পারব না, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে।

সকৌতুকে ও আমার দিকে চেয়ে রইল একটু।—মুখ তো শুকনোই দেখছি, কিছু নিয়ে আবার ব্যারিস্টার সাহেবেব সঙ্গে একপ্রস্থ হয়ে গেছে নাকি?

না, কাল এসো, কাল কথা হবে।

কাল তো রবিবার, কখন আসব?

বিকেল চারটে নাগাদ এসো।

সে চলে গেল। আমি একলা ঘরে ছটফট করতে লাগলাম। আমাদের জন্যেই লক্ষ্মী মাসির প্রাণটা গেল, ঘরের এই লোক সে-কথা একবারও ভাবছে না।

রাতে ভাল ঘুম হল না। নানারকমের দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

পরদিন সকালে থমথমে মুখে বিনায়ক গাড়ি হাঁকিয়ে বোরিভিলি চলে গেল। সকালের ব্রেকফাস্ট খাইয়ে শহেলিও তার গ্রামেব বাড়িতে ছুটি ভোগ করতে গেল। আমার দুপুরের রান্নাটাও সে সেরে রেখে গেছে। পার্টটাইম বেয়ারা বা মালী রবিবাব আসেই না।

আজ মনে হল বাংলোটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। লক্ষ্মী মাসির কথা বার বার মনে পড়ছে। বিনায়কের ঘৃণা মাখা চাউনিটা যেন আমার গায়ে লেগে আছে।

মাথার মধ্যে একটা চিন্তার জট পাকাতে লাগল। আমরা দু'জনে যখন মাত্র জানি তখন কি করে কি হতে পারে? সেই প্রাণভয়ে ভীত আধমরা মেয়েটাকে যেদিন এখান থেকে সরানো হল, সেই দিন বিকেল থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি। এই ভাবনা যেন পেয়েই বসল আমাকে। দুপুরের খাওয়াও হল না ভালো করে। ভেবেই চলেছি। ভাবনার মধ্যে কেমন করে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ...বিনায়ক প্যাটেল...আমি...রমেশ সামতানি...শহেলি...সেই আধমরা মেয়েটা...লক্ষ্মী মাসি...দুধের ক্যানটিন...বোতল নিয়ে আবার ফিরে এসে রেখে যাওয়া...একশো গজ দূরের মস্ত গাছের ওধারে খুন...পুলিশের রিপোর্টে একেবারে কাছের থেকে খুন, পাঁজরের সঙ্গে রিভলবার ঠেকিয়ে।...আগের মেয়েটাকে রেখে বাড়ি ফেরা...দরজা খোলা...দরজা বন্ধ করার সম্পর্কে. শহেলির মিথ্যে কথা বলা...

কি যে আমার মাথায় আসছে আমি নিজেই সঠিক বুঝছি না। যা আসছে সেটা আবার জোর করেই ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তত বেশি যেন সেটা মগজে চেপে বসতে চাইছে। হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চমকে উঠলাম আমি। একটা ষষ্ঠ চেতনার ঘায়ে যেন কয়েক মুহূর্ত অসাড় হয়ে থাকলাম আমি। তারপর ছুটে লাইব্রেরিতে এলাম। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকালাম।

তারপরেই ছুটে বেরিয়ে এলাম।—শহেলি। শহেলি। কিন্তু শহেলিকে কোথায় পাব? সে তো এতক্ষণে তার গাঁয়ের বাড়িতে। কিন্তু তাকে যে ভয়ানক দরকার আমার। চেনা থাকলে তক্ষুণি আমি ট্যাক্সি করে তার বাড়ি চলে যেতাম।

অস্থির চিত্তে নিজের ঘরে এসে বসলাম। আবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে পাকানো জটটা খুলে যাচ্ছে। আমার সমস্ত মুখ উত্তেজনায় রক্তবর্ণ। খুব সঙ্কটের মুহূর্তে আমার ষষ্ঠ অনুভূতি সর্বদাই আমাকে কিছু যেন বলে দেয়। তার যা ইঙ্গিত তাতে শরীরের রক্ত হিম হওয়ার দাখিল আমার।...কিন্তু এ-ছাড়া আর কি হতে পারে? আর হতে পারে কি?

ঘড়ি দেখলাম, তিনটে পনেরো।

ছুটে গিয়ে বোরিভিলিতে ফোন করলাম। মাসির গলা। প্রাণপণ শক্তিতে গলার স্বর সংযত করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের ছেলে কোথায়?

এই এদিক-ওদিক হাঁটতে বেরিয়েছে একটু। কেন বল তো, বিনুর মন মেজাজ আজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে।

হবারই কথা। শুনুন, সে ফেরা-মাত্র তাকে জানাবেন আমি ফোন করে বলেছি, হদিশ মিলেছে। শুধু এই কথা বললেই সে বুঝবে। তাকে ধরার জন্যে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিন। খবব পাওয়ামাত্র সে-যেন আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যে বাড়ি চলে আসে। আমাকে আর টেলিফোন করার দরকার নেই, তবে আসতে দেরি হলে আমি মুশকিলে পড়ে যেতে পারি। একটুও দেরি করবেন না, আর ফোন করবেন না, শুধু দেখুন সে কোথায়।

রিসিভার রেখে দিলাম। এবারে যে ভাবেই হোক সহজ স্বাভাবিক হতে হবে। আমি অভিনেত্রী। এটুকু পারব না?

মুখে চোখে জল দিয়ে আগে একটু ঠাণ্ডা হলাম। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নিলাম। তারপরে একটা সিনেমার পত্রিকা হাতে করে লাইব্রেরিতে এসে বসলাম। ঠিক চারটেয় রমেশ সামতানি লাইব্রেরিতে এলো। আমি হাসি মুখে সিনেমা-পত্র রাখলাম।

সামনে বসে রমেশ বলল, আজ তো বাড়িতে একলা তুমি, চল বেরিয়ে পড়া যাক।

বললাম, বেরুতে ভালো লাগছে না, মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। তাছাড়া মনটাও বেজায় খারাপ। ঘরে বসেই গল্প করা যাক।

বেশ। মন খারাপ কেন? দিব্বি তো নতুন ছবিতে আবার কাজ শুরু করছ। আর এদিকে বছর কাবার হতে মাস চারেকও বাকি নেই।

তারপর বিয়ে?

তারপর বিয়ে।

হাসলাম। চা বা কফি কিছু খাবে?

নাঃ, থাক্।

খাও না, তুমি খেলে আমিও একটু খাই।

কে করে দেবে, বাড়ি তো ফাঁকা।

ওমা, এটুকু আমি করতে পারব না। ব'সো, করে আনছি।

ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় নিলাম। ঘড়ি দেখছি। চারটে পনেরো। সোয়া তিনটেয় ফোন করেছিলাম খবর পেয়ে থাকলে এতক্ষণে অনেকটা পথ চলে আসার কথা।

কফি আর বিস্কিট নিয়ে ঢুকলাম। সামনের টেবিলে ট্রে রেখে বড় টেবিলটার দু'দিকে দু'জনে বসেছি। কফি খেতে খেতে টুকটাক গল্প চলল। রমেশ আবার বলল, চল বেরিয়ে পড়া যাক, মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।

না, সত্যি ভালো লাগছে না। বেশ তো গল্প করছি। আমাকে বাইরে নিয়ে বেরুলেই তোমার কেবল দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় চাপে।

হাসতে লাগল।—দেখ, বাড়িয়ে বোলো না, সেদিনের পর থেকে লোভে হাড় পাঁজর দুমড়ালেও নিজেকে সামলে চলছি।

হাসছে বটে। কিন্তু চোখে লোভ চিক চিক করছে। ওর অলক্ষ্যে হাতঘড়ি দেখে নিলাম। চারটে পঁয়ত্রিশ। এবারে শুরু করা যেতে পারে। আচ্ছা মিস্টাব বমেশ...

বিয়ের পরেও কি আমাকে তুমি মিস্টার বমেশ বলে ডাকবে নাকি।

কেন, এ ডাক তো তোমাব ভালোই লাগে।

ঠিক আছে, বল।

আমার এই প্রোডিউসারের কাছে তোমার অনেক ডাকা খাটছে...না?

এ-খবর তোমাকে আবার কে দিলে?

নিজেই বুঝি। অনেকদিন তো হয়ে গেল।

হৃষ্ট মুখে জবাব দিল, খুব অনেক নয়. লাখ পঞ্চাশ ষাট খাটছে।

ও বাবা, এ-টাকাও তোমার কাছে অনেক নয়, তাহলে কত টাকা আছে তোমাব। ভালো কথা, মহরতের দিন প্রোডিউসার তো নিশ্চয় নেমন্তন্ন করেছিল তোমায়, তুমি যাও নি কেন?

ও-সব ভালো লাগে না...তাছাড়া একটু কাজও ছিল।

ও। এত আনন্দে কাটলো দিনটা, কিন্তু পরদিন কি যে মন খারাপ হয়ে গেল কাগজ পড়ে।...আচ্ছা, শিবলির লক্ষ্মী যোশীকে তো তুমি চিনতে, তাই না?

কে লক্ষ্মী যোশী?

বা রে, মংগেশ যোশীর বউ, সেই লোনাভালার আউট হাউসে থাকত!

হ্যাঁ মনে পড়েছে। কেন তার কি হয়েছে?

কাগজে পড় নি? শিবলিতে একটা বড় গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে কে তার পাঁজরে রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করে মেরেছে!

আ-হা তাই নাকি। আমার অত খুঁটিয়ে কাগজ পড়া হয় না।

তোমার আর সময় কোথায়। কিন্তু সেই থেকেই ব্যাপারটা ভাবছি আমি। ক্যানটিন থেকে লক্ষ্মী মাসি দুটো দুধের বোতল নিয়ে বেরিয়েছিল, তারপর বেরিয়ে এসে হয়তো গাড়িতে চেনা কাউকে দেখেই বোতল দুটো আবার ক্যানটিনে রেখে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে মাঠ ভেঙে সেই বড় গাছটার দিকে গেছে। চেনা লোক, তাই তার একটুও সন্দেহ হয় নি। সেই লোক আচমকা পাঁজরে রিভলবার ঠেকিয়ে

তাকে গুলি কবে মেবেই ফিবে এসে গাড়ি হাঁকিযে চলে গেছে। এ ছাড়া আব কি হতে পাবে বল তো?

বমেশ সামতানি হাঁ কবে খানিক চেযে বইল আমাব দিকে।—কিন্তু হঠাৎ ওই বুড়িকে মাবাব স্বার্থ কি?

স্বার্থ বুড়িব বাড়ি থেকে প্রাণেব ভযে অর্ধ উন্মাদ একটি মেযেকে সবিযে আনা। ...এক বিবাট গোল্ড আব হাসিস স্মাগলাবেব দলেব সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। প্রাণেব ভযে কোনবকমে আধমবা অবস্থায পালিযে আসে। তাব অনেক নাম—এক-একটা নামে এক-এক মোটা টাকাব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অপাবেট কবত বোধহয। প্রাণেব ভয দেখিযে আব মাদক ওষুধ খাইযে বা ইনজেক্ট কবে তাকে প্রায শেষ কবে আনা হযেছিল।

বমেশ সামতানিব তখনো হাসি-হাসিমুখ। কিন্তু চাউনি বদলাচ্ছে।—হাউ ইন্টাবেস্টিং! তা সে শিবলিতে লক্ষ্মী যোশীব বাড়িতে গিযে উঠল কি কবে?

আমি আব তোমাদেব ব্যাবিস্টাব সাহেব নিজেদেব গাড়ি কবে তাকে সেখানে বেখে এসেছিলাম। আমবা দু'জন ছাড়া দুনিযায কাবো সে-কথা জানাব কথা নয। ...সেই বাতে, যেদিন আমি আব তুমি এখানে বসে গল্প কবছিলাম, শহেলি এসে বলল, সাহেব ডাকছে আব আমি চলে গেলাম—মনে আছে?

হ্যাঁ...তুমিও গেলে আমিও গেলাম।

না, আমি আগে গেলাম। একটু বাদে ফিবে এসে দেখলাম তুমি নেই। তাবপব তোমাদেব ব্যাবিস্টাব আব আমি এই লাইব্রেবিতে বসে সেই অপ্রকৃতিস্থ মেযেটাকে শিবলিতে সবাবাব পবামর্শ কবলাম। আমাদেব দুজনেব বাইবে একটি প্রাণীবও তা জানাব কথা নয, তবু একজন সে খবব জানলো।

তাই নাকি! কে জানলো?

তুমি! তীক্ষ্ণ স্ববে আমি বলে ফেললাম।

আমি! আমি কোথায তখন?

তুমি তখন ওই পার্টিশনেব আড়ালে। আমবা দেখে ফেললে দেখলাম একটা বই-টই খুঁজছো। কিন্তু ওদিকে আমাদেব তখন যাবাবই কোনো কাবণ নেই। ওই মেযেকে নিযে আমবা বেবিযে গেলাম। ফিবে এসে দেখলাম বাইবেব দবজা শুধু ভেজানো, অথচ শহেলি বলল সে নিজেব হাতে দবজা বন্ধ কবেছে। অর্থাৎ, সে আবাব কিচেনে ফেবাব পব তুমি লাইব্রেবি ঘব থেকে বেবিযে নিঃশব্দে দবজা খুলে চলে গেছ।

...সমস্ত ব্যাপাবটা কেমন লাগছে, বমেশ?

ওযাণ্ডাবফুল।

ভেবি ওযাণ্ডাবফুল। পবদিনেব মহবতে তুমি আস নি কাবণ তখন তুমি শিবলিতে সুযোগেব অপেক্ষায বসে আছ। দুপুবে লক্ষ্মী বেবিযে যেতেই তুমি সেই মেযেকে অজ্ঞান কবে স্ক্রীন লাগানো গাড়িব পিছনে তুলেছ। কিন্তু ক্যানটিনেব সামনে লক্ষ্মী দেখে ফেলল তোমাকে। আনন্দে হযতো চিৎকাব কবে উঠল। তাব সঙ্গে তোমাব শিবলিতে দেখা হবাব খবব আমাদেব কানে আসবেই। তাই কিছু দবকাবি কথা

বলার জন্যে তাকে মাঠের ভিতর দিয়ে গাছের ওধারে নিয়ে গেলে।...তারপর আর বলার দরকার আছে কিছু?

না না কিছু না। এই আষাঢ়ে গল্পটা ব্যারিস্টার সাহেবও শুনেছেন তো?

তিনি আসছেন, এসে শুনবেন।

সেই মুহূর্তে মনে হল কি প্রচণ্ড একটা ভুল করে ফেললাম।

দু'চোখ চিকচিক করছে রমেশ সামতানির। ঠোঁটে হাসি। উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা শিশি বার করে রুমালে কি ঢাললো। চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তিন পা সরে দাঁড়ালাম।—কি করছ?

আমি কিছুই করতে চাই নি, কিন্তু কেন যে তোমার এত বুদ্ধি...কেন যে এত জানতে গেলে। অথচ আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি...সেই কবে থেকে ভালোবেসে আসছি। এত ভালোবাসি বলেই লীলা সামতানির এই আধা-উন্মাদ অবস্থা এখন...তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট অপারেশন শেষ হলেই আমার জীবনে তার প্রয়োজন ফুরাত—তুমি আসতে।

সে একটু করে এগোচ্ছে। বিবর্ণ মুখে আমি সবে যাচ্ছি।...তোমার জন্যেই আরো কত না মেহনত করেছি, অবশ্য টাকাও দরকার ছিল...আমিও তোমার বাবাকে নিখুঁত জালে ফেলার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা কবে বোম্বাই ছেড়ে চলে গেছি।...আর তুমি কি আমাব এত পবিশ্রমের এই প্রতিদান দিলে—

আবক ভেজানো রুমাল হাতে সে হাসিমুখেই এগিয়ে আসছে। আমাব হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। এখনও সে আসছে না কেন?

কিচ্ছু ভয় নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসি—বেশি কষ্ট দেব না। একটু বাদেই অজ্ঞান হয়ে যাবে তুমি। তারপর আর কিছু টেবও পাবে না—দু'মিনিটের মধ্যে আমার কাজ শেষ করে চলে যাব।...আমার কি দোষ, এত জানা কি ভালো? তুমিই বল।—

আরো এগিয়ে আসছে। পার্টিশনে আমার পিঠ ঠেকে গেল। আমি তীব্রস্বরে একটা চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। কিন্তু চিৎকারটা বেরুবার আগেই রুমালসুদ্ধ হাত মুখে চাপা দিল। তখনো বলছে, ডোণ্ট ওয়ারি, আমার কাছে রিভলবার আছে, বাট ইট উইল বি পিসফুল—আই লাভ টু ডু মাই ওউন লিটল থিংস দি কুইকার দি বেটার।

লোহার মতো হাতে রুমালটা মুখে আর নাকে চেপে ধরে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমি ছাড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শরীর অবশ হয়ে আসছে।...জ্ঞান হারাচ্ছি। চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছে।...বাইরে কতগুলো পায়ের শব্দ, তারপর একটা গুলির শব্দ, তারপর আর মনে নেই। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল, আমি হাসপাতালে একটা কেবিনে। আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে আছে বিনায়ক প্যাটেল।...এত কোমল এত উদ্বিগ্ন চাউনি কেন...।

কেমন আছ?

বললাম, ভালো।

সে কোথায়?

রমেশ সামতানি?...

সে ফাঁকি দিয়েছে আমাদের। আমি পুলিশের লোক সঙ্গে করে এনেছিলাম। হাত তুলে দাঁড়াতে বলার ফাঁকেই সে পকেট থেকে রিভলবার বার করে নিজেকে গুলি করেছে।

...বিকেলের দিকে আরো একটু সুস্থ হয়ে তার আসার আগের মোটামুটি ব্যাপারটা বলতে গিয়ে আবার শ্রান্ত আমি।

সে আমার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামালো।—আর নয় সব বুঝেছি। মুগ্ধ কোমল নরম চাউনি। একটু বাদে আবার সামনে ঝুঁকে বলল, আমরা মিথ্যেই অনেক সময় নষ্ট কবেছি, আব নষ্ট করার দরকার আছে?

আমি চেয়ে আছি। চোখের কোণ দুটো শিরশির করে উঠল। তারপব জলে ভবে গেল। ঝুঁকে পড়া মুখটা ঝাপসা লাগছে। তবু মনে হল এত সুন্দর কোমল নবম একখানা মুখ জীবনে দেখি নি।

মাথা নাড়লাম। দরকাব নেই।